উৎসর্গ

শ্রীমতী ইতি গঙ্গোপাধ্যায়

কল্যাণীয়াসু

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

ঈশ্বরীতলার রূপোকথা

অর্জুনের অজ্ঞাতবাস

বার বার ভেঙে পড়েও কিছু মানুষ বার বার উঠে দাঁড়ায়। কিছু বানাবে বলে। বানানোর আনন্দে মশগুল এই মানুষকে কখনো শয়তান, কখনো স্বার্থপর—কখনো ঈশ্বর মনে হয়।

এমনই একজন মানুষ মধ্যবয়সে পৌঁছে দেখলেন—এতদিন যাদের সঙ্গে মিশেছি—তারা আমার কেউ নয়। আমিও তাঁদের কেউ নই। এই আবিষ্কার তাকে খেঁতলে দিল। কয়লার খাদান থেকে মোটর গাড়ি—একটার পর একটা আত্মঘাতী অভিমানে তার অবগাহন শুরু হোল।

এবার ভেঙে পড়েও সে উঠে দাঁড়াতে চাইলো। কিছু বানিয়ে তোলার নেশায় সে আবার কাজে ডুবলো। সামনে প্রতিপক্ষ তার নিজেরই ছেলে রবি। মানুষের ভালোর জন্যে মানুষ খতমেও রবি পিছপাও নয়। কিন্তু রবির বাবা হিসেবে তার বিশ্বাস : মানুষকে নিশ্চিহ্ন করলেও তার স্মৃতি মোছা যায় না।

এই দুই চিন্তার সঙ্ঘর্ষে ভেতরে ভেতরে অবিরাম রক্তপাত হতে থাকে।

এই গ্রন্থের প্রুফ দেখেছেন কবি ও গল্পকার শ্রীসমীর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

এক

দিলীপ বসুর কোন কুষ্ঠী ঠিকুজী ছিল না কোনদিন। চল্লিশ পার হয়ে গিয়ে চার-পাঁচ বছর আগে একদিন সে একজন গণৎকারের পাল্লায় পড়ে রাশিচক্র করেছে। দিলীপের কেটে যাচ্ছে এখন আশায় আশায়। মীন রাশি কর্কট লগ্ন—সামনে নাকি সুবর্ণ সময়।

সেই সময়টা এই এসে গেল বলে। সামান্য বাকি আছে।

সে মাঝে মাঝে স্মৃতি থেকে তার নিজের চেহারা তুলে এনে নিজেই বলে—বেশ দেখতে ছিলাম। আজকাল আর আগের মত ভালো আনাজ পাওয়া যায় না।

এখন দিলীপ বসু পাকাপোক্ত চোখে চশমা নিয়েছে। পড়বার সময় তার রিডিং গ্লাস লাগে। তার বউয়ের নাম [illegible]। এখন দিলীপ চুয়াল্লিশ।

দিলীপের অফিসের নাম বোল কোম্পানি। এখন দিলীপ পরিষ্কার বুঝতে পারে এই তো সেদিন জীবন শুরু করেছিলাম। এরই ভেতর! ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গিয়ে একদম আলাদা রকমের মানুষ হয়ে যাচ্ছে। তারা এখন বাবা মায়ের কাছে ঘেঁষতে চায় না। বাজারে গিয়ে তারা মাছ দেখে কিনতে পারে। গুঁড়ো সাবানে সোডা মেশানো থাকলে তাও ধরে ফেলতে পারে। আটত্রিশ সাইজের ব্লাউজ কিনে সেলাই করে নিলে ফিট হয় তার গায়ে।

দিলীপ তার জীবনকে কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারে। যেমন—যৌবন। বিষাদ। অনিশ্চিত তোলপাড়। তারপর গেরস্থ বাঙালী হিসেবে থিতু হয়ে যাওয়ার পর্ব।

পেছনে তাকালে দিলীপ এখন যা যা দেখতে পায়—তা হোল—উনিশশো উন-চল্লিশের এক মফস্বলের লাল সুরকির রাস্তা দিয়ে জয়ঢাক বাজিয়ে ব্যাণ্ডপার্টি যাচ্ছে। দু'ধারে তার বয়সী ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে পড়েছে। সে নিজেও ছুটছে। সিনেমার হ্যাণ্ডবিল কুড়োবে। একটা লোক ঘোড়ার গাড়ির ছাদে বসে হলদে কাগজের হ্যাণ্ডবিল বিলোচ্ছে। আরেকজন ব্যাণ্ডপার্টির ব্যাগপাইপ আর জয়ঢাকের আওয়াজের ফাঁকে মুখে চোং দিয়ে চেঁচাচ্ছে—

আসিতেছে। আসিতেছে।

ছবিটার নাম কিছুতেই মনে পড়ছে না দিলীপের।

কেটেল ড্রামের ওপর আলতো কাঠির তরতরে আওয়াজ। ত-ওর-র্‌—

শ্রেষ্ঠাংশে—কাননবালা। প্রমথেশ। যমুনা—

প্রথম চারদিন সর্বপ্রকার ফ্রী পাশ বন্ধ।

মোট চারখানা হ্যাণ্ডবিল কুড়িয়ে চালতেতলা দিয়ে একটি ছেলে শর্টকাটে বাড়ির পথে এসে পড়ল।

ন্যাশনালাইজ্‌ড কোল কোম্পানির মাঝারি চাকুরে দিলীপ বসু এই অব্দি মনে করতে পেরে টেবিল থেকে সাধারণতঃ একটা কলম তুলে—কিংবা নিজেরই চশমার ডাঁটি কামড়াতে থাকে। আর মনে নেই। আর মনে নেই। এই কিছুকাল আগেও সে অনেক কিছু মনে করতে পারত। আস্তে আস্তে তার মনে রাখার—ধরে রাখার স্মৃতিশক্তি আলগা হয়ে যাচ্ছে। অনেক কিছুই তার এখন ঝাপসা লাগে। এক ঘণ্টা আগের কথাও সে অনেক সময় ভুলে যায়।

সে নিজেকে নির্জনে এবিষয়ে প্রশ্ন করেছে। নির্জন মানে—ধরা যাক—বাড়িতে কেউ নেই—ঠিক তখন—ড্রেসিং টেবিলের সামনে। আয়নায় মোটাসোটা নিজের চেহারাটার চোখে তাকিয়ে দিলীপ বসু কোশ্চেন করেছে। সত্যি করে বলুন—আমিই কি সেই দিলীপ বসু?

কেন? কোন সন্দেহ আছে?

তা নয়। কিন্তু আমি যে কিছুই মেলাতে পারছিনে। পেছনদিক থেকে এখন নাকি আমার চোয়াল দেখা যায়। ভ্রূ দেখুন। প্রায় নেই। মাথাটা পুরনো বাড়ির মত দু ইঞ্চি শরীরের ভেতর ডেবে বসে গেছে। আমি কতকাল হাসি না—

আয়নার দিলীপ বসু পাল্টা প্রশ্ন করেছে। হাসেন না কেন?

সে অনেক কথা। শর্টে বলছি। হাসলে কোন শব্দ বেরোয় না। দুই গালে দুই থোবা মাংস ফুলে ওঠে। চোখ কুঁচকে যায়। আর—

আর?

তখন আমাকে খুনীর মত দেখায়। আমার বড় দুঃখ—আমি হো হো করে হেসে উঠতে পারি না। আমার ঘাড় বলতে আর কিছু নেই। সিঁথির চুল-গুলো পাক ধরছে। সব ট্রাউজার ছোট হয়ে যাচ্ছে। দশটা দামি শার্ট দর্জি দিয়ে বুকে বড় করালাম—পটি জুড়ে—সেগুলো আবার ছোট হয়ে গেছে। ভাল ভাল শার্ট রাণী বাসনওয়ালীকে দিয়ে থালা রাখছে—বাটি রাখছে—দান করছে।

কেমন লাগে বলুন তো ? আমি কি আরও ফুলে যাব ?

সে তো ডাক্তার বলবে।

ডাক্তার তো অনেক কথা বলছে। আমার নাকি বিকেলের দিকে শীত শীত ভাব হয়। হয়তো হয়। সব সময় তো নিজের ওপর নজর রাখা যায় না। অবিশ্যি আজকাল অফিসে কেউ আমার দিকে হ্যাণ্ডশেকের জন্যে হাত বাড়ালে—আমার নিজের হাত বাড়াতে একটু দেরি হয়ে যায়। একদিন এক প্রাইভেট পার্টির বড় কর্তা রেগে তার বাড়ানো হাত গুটিয়ে কোটের পকেটে পুরে ফেলেছিল। হাত তুলতে আমার দেরি দেখে—

খিদে হয় ?

প্রচণ্ড। নর্মাল লোকের চেয়ে অন্তত দ্বিগুণ খিদে। এটাই তো আমার ডিজিজ। আমি কি আর আগেকার চেহারা ফিরে পাবো না ?

আগে তো আপনি স্লিম ছিলেন।

একশোবার। এই আয়নাতেই যদি আমাকে বিয়ের পর দেখতেন ! কোন ভুঁড়ি ছিল না। গালে কোন ফ্যাট ছিল না। হাত ছিল গোল আর শক্ত—

আপনি নিজেকে খুব বেশি ভালোবাসেন। এত ব্যস্ত পৃথিবী। এর ভেতর নিজের চেহারা মনে করে রাখার সময় পান ?

আগে কোনদিন নিজেকে ভালোবাসিনি। বিশ্বাস করুন। এই বছর তিনেক হোল—নিজের ওপর খুব মায়া পড়ে যাচ্ছে। মায়া পড়ার একটা কারণ আছে অবশ্য—

থামলেন কেন ? বলুন—

আমার লজ্জা করছে বলতে।

আয়নার দিলীপ বলল, আমাকে লজ্জা পাবার তো কিছু নেই। আমিই তো আপনি—

দেখুন—বলে দিলীপ ফাঁকা বাড়িতে তাকিয়ে দেখেছে—রাণী বাজারে গিয়ে ফিরে আসেনি তো ! কিংবা বড়ছেলেটা আচমকা যদি বাড়ি ফিরে আসে। এখন নিশ্চয় ফুটপাথে ক্রিকেট খেলছে রবি। রবির ছোট বোন কুটু এবারে টেস্ট দেবে। সামনের বছর এগারো ক্লাশ।

আয়নার দিলীপ বলল, বলে যান। লজ্জা কিসের ?

রক্তমাংসের দিলীপ বসু গল গল করে বলতে লাগলো, দেখুন। আগে তো কোনদিন নিজের শরীরটার দিকে তাকাইনি। শরীর বলে যে কিছু ছিল—তা কোনদিন লক্ষ্যই করিনি। আমার জীবনটাই চাপের ভেতর দিয়ে কেটেছে। জন্ম থেকেই। আমার কথাগুলো কিন্তু আপনার লেকচার মনে হতে পারে—

হোক না। বলে যান। থামবেন না।

কোনদিন আমি স্বস্তিতে থাকিনি। সবসময় একটা না একটা ক্রাইসিস। পারবো কি পারবো না! তার তো একটা টেনশন থাকবেই। সেই টেনশন থাকতে থাকতে একদিন আমার বুকের বাঁ দিকটা হঠাৎ ইটপাথরে বোঝাই হয়ে গেল—কি ভারি বুক! নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। রবিকে বললাম—ড্রাইভারকে ডাক। গাড়ি আনুক। আমায় এখনি হাসপাতালে নিয়ে চল—

হার্ট অ্যাটাক?

হ্যাঁ। সেই প্রথমবার। এই তো গতবছর। পর দিন জ্ঞান হতে দেখি মাথার কাছে অক্সিজেন সিলিণ্ডার। কাছাকাছি বেডে অনেকেরই তাই। সবাই সাবধান। কারও বুকে পেসমেকার লাগানো হয়েছে। ডাক্তাররা দেবদূতের মত ফিসফিস করে কথা বলে। সিগারেট বারণ। সেদিন থেকে—

বুঝলাম—খেলাগুলো শেষ হয়ে আসছে। শরীর বলে একটা জিনিসের যদি শেষ হয়ে যায়—তাহলে কে আর আমাকে দিলীপ বলে ডাকবে! হাসপাতাল থেকে ফিরে এলাম মোটা হয়ে। তখনো বুঝিনি। ক'দিন পরে বুঝলাম। চেক আপে গিয়ে—

আয়নার দিলীপকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই স্বয়ং দিলীপ বলতে লাগলো, আমি মোটা হয়েই গেছি। আমার জ্ব মুছে যাচ্ছে। আর তেরো কিলো ওজন বাড়লেই আমি পুরোপুরি এক কুইন্টাল হয়ে যাবো। আর কি খিদে! যা খাই—তাই হজম। একটা গ্ল্যাণ্ডে কোন সিক্রিশন নেই। কোনরকম ক্ষরণ হয় না। এসব নাকি অতিরিক্ত টেনশনের ফল। কারও কারও বেশি সিক্রিশন। তারা রোগা হয়ে যায়। আমার ঠিক উল্টো।

ডাক্তারবাবু কি বললেন?

সব শুনে কি হবে ভাই! আমার জীবন—আমারই। কোন অ্যাবনরম্যাল ফুলো ফুলো লোক দেখলেই বুঝতে পারি—এ আমার কেস। নির্ঘাৎ হাইপো থায়রয়েড—

সিম্পটম্ কি?

অনেক—অনেক। বিকেলবেলা মনে হবে জীবন শেষ হয়ে এলো। ভোরবেলা ইচ্ছে হবে—আবার ক্লাশ থ্রি থেকে জীবন শুরু করি। অথচ ফিরে তো আর শুরু করা যায় না।

ডাক্তারবাবু কি বললেন?

হার্ট, লিভার, কিডনি—সব কিছু একটা অর্কেস্ট্রার সুরে বাঁধা। সবক'টা একটু একটু করে জখম হচ্ছে। আজকাল তো পেচ্ছাপ হয় না ঠিকমত। পা ফুলে যায় মাঝে মাঝে—

ব্লাডপ্রেসার ?

এখনো নর্মাল। কিন্তু ওজন যে ভাবে বাড়ছে আমার—তাতে হার্ট কতদিন আর পাম্প করবে! মাঝে মাঝে একটা দু'টো বিট্ ফেল করছে। আর ভীষণ খিদে—। কিন্তু মাংস, দুধ, আলু, চিনি, ঘি, মাখন—সব বারণ

খাবে কি তাহলে ?

ছোট মাছ। সামান্য ভাত। আর শাক -এভাবে বেঁচে থাকা যায় ?

ওজন কমেছে ?

তিন কেজি-র মত।

তিন কেজি-র মত।

আসলে সবটাই টেনশন। ডাক্তার বিল্যাক্স করতে বলেছিল। হাসির বই নিয়ে পড়তে বসে চোখ জড়িয়ে আসে। পড়তে পড়তে—আগে পড়ে আসা পাতায় কি ছিল—তা আর মনে থাকে না। এখন মনে করতে গিয়ে দেখি—কত জিনিস ভুলে বসে আছি। যেন অন্য কারও জীবনের হারানো সব ঘটনা। আসলে কিন্তু আমারই জীবনের ঘটনা। নানা একটা করে মনে পড়তেই টেনশন আরও বেড়ে যায়। ট্রেনের জানলায় বসে দেখা—ছড়ানো অগোছালো মাঠ হয়ে পড়ে আছে জীবনটা—এ বার ভালো লাগে ? তখনও মনে পড়ে, আর তো সময় নেই—কি করে এত তাড়াতাড়ি এত বড় মাঠ গোটাবো ? আর অমনি আমার গ্ল্যাণ্ড শুকিয়ে যায়। প্লেয়ারে রেকর্ড পড়ে থাকে —বাজিয়ে শোনা হয় না। আমার মাথার ওজন এখন অন্তত তেরো কেজি। ঘাড় আর নেই এখন। ধড়ের ওপর মাথাটা কাটামুণ্ডু করে জুড়ে দেওয়া। আমি এখন আর কিছু মনে রাখতে পারছি না। আধঘণ্টা আগে কে দেখা করতে এসেছিল—তা মনে থাকে না।

টুকে রাখলে মনে থাকে।

টুকে রাখি। ছোট স্লিপে। এক এক সময় মনে হয় -আমি শুধু খিদে আর ওজনের ভেতর একটু ঠিক এখন এই সময়টায় বেঁচে আছি। আগে ছিলাম না কোনদিন। পিউচারেও থাকবো না। থাকলেও- এখন তো জানি না।

ছোট কাগজে সব টুকে রেখো। তাহলে ভুলবে না।

কত জিনিস ভুলে গেছি। একদম ছোটবেলায় কার যেন বিয়ে হোল—একটা পুকুর-পাড়ে। রাতে কার্বাইডের আলো পুকুরের জলে পড়ে বাতাস মেশানো ঢেউয়ের সঙ্গে ভেঙে যাচ্ছিল। আমাদের ছোট শহরে একদিন বিকেলে যুদ্ধ শুরুর খবর রটে গেল। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে হেডস্যার ছুটি দিয়েছিলেন থার্ড পিরিয়ডে। নবমী পুজোর দিন থেকেই বৃষ্টি। তারপরই শোনা গেল—বড়রা বলাবলি করছে—

কাঁথি সমুদ্রের জলের নিচে। তার কয়েক মাসের ভেতর—মহাত্মা গান্ধী জিন্দাবাদ। অনেকে জেলে। রাধুর ভাগ্নের অন্নপ্রাশনে রেকর্ড বাজালো—আমি তোমায় যত শুনিয়েছিলাম গান। কস্তুরবার মৃত্যুতে সারা শহরে হরতাল। বিকেল থেকেই। সন্ধ্যেবেলা তো ব্ল্যাকআউট। আমি তখন কিশোর হয়ে উঠছিলাম।

কোল কোম্পানির নতুন মালটিস্টোরিড বিল্ডিং। ফোর্টিন্থ ফ্লোরের জানলা দিয়ে বিখ্যাত বড় বড় বাড়ির প্রায় টেসেল দেখা যাচ্ছিল। গ্রেট ইস্টার্নের ছাদ। রাজভবনের ব্যালকনি। হাইকোর্টের গায়ে সাঁতারের ক্লাব। গঙ্গায় গাধাবোট।

এই বাড়ির একতলার চারদিকে ডালহৌসি স্কোয়ার। খনির কয়লা। তার হিসেব। ওভারশিয়ার ড্রাফটসম্যানদের মাইনে, আগেকার মালিকদের কমপেনসেসন—নানান জটিল অঙ্কের ভেতর দিয়ে রোজ দিলীপ বসু অফিস করে যায়।

এখনো দিলীপের সামনে পনের ষোল বছরের চাকরি পড়ে আছে।

এই ভাবে এতগুলো বছর কাটাতে হবে তাকে। ভাবলেই দিলীপের কেমন লাগে।

খারাপ লাগে এজন্যে যে, সামনে আর কোন বিস্ময় নেই। একই নিয়মে তাকে চাকরি করে যেতে হবে। এই পৃথিবীর পিঠের ওপর আমরা সবাই কেমন করে বেঁচে আছি—একথা ভাবলেই দিলীপের আরও খারাপ লাগে। সংসার-জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে সে এখন ভোরবেলা রাণীর সঙ্গে বিছানায় বসে বেড টি খায়।

ফোন বেজে উঠতেই দিলীপ বসু তার চেয়ারে ফিরে এল। বাঁ হাত বাড়িয়ে ফোন তোলার সময় সাবধানে রিসিভারের দিকে ঝুঁকলো। কারণ সে লক্ষ্য করেছে—আগের মত ঝুঁকে পড়া—কিংবা কাত হওয়া—তার পক্ষে বিপজ্জনক। একবার ওরকম অবস্থায় তার লিভার আর আশপাশের নাড়িভুঁড়ি পাঁজরার হাড়ের ওপর উঠে গিয়েছিল। সে কি কষ্ট! বুকের ভেতর আটকানো দম বেরোয় না। শরীরটা দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে যাচ্ছিল। দিলীপ আজকাল জানে না—তার ভেতরকার যন্ত্রপাতির কোথায় কি হয়ে আছে।

হ্যালো?

ওপাশ থেকে রিজিওন্যাল মার্কেটিং ম্যানেজার জানতে চাইছে, আসামে কত ওয়াগন গিয়েছে?

খানিক আগেও দিলীপের মনে ছিল। ঠিক এই মাত্র সে ভুলে গিয়েছে। একটু আগে সে ওয়াগনের নম্বর দিয়ে চিঠি লিখতে দিয়েছে স্টেনোকে। আন্দাজে

বলল, তিনশো বারো—

এ মাসে ?

এর জবাবও দিলীপের মনে এলো না। অথচ এসব তার নখদর্পণে থাকে। কিন্তু কিছুকাল হোল সে সবই ভুলতে বসেছে। সেটা যাতে ধরা না পড়ে—সেজন্য দিলীপ বসু বেশ জোর দিয়ে বলল, তা নয়তো কি !

তাহলে অবস্থা ভালো বলতে হবে।

নিশ্চই। বলে ফোন রেখে দিল দিলীপ। একবার মনে হোল—আগাগোড়া গোলমেলে সব হিসেব তো দিয়ে দিলাম। আসামে গিয়ে কয়লার ওয়াগনগুলো নিয়ে নির্ঘাৎ গোলমাল হবে। বারোটা ওয়াগন মলিগাঁও সাইডিং-এ গিয়ে পড়ে থাকবে। দু'টো পাওয়া যাবে জোড়হাটে। সব ধরা পড়তে পড়তে নতুন লটের ওয়াগন এসে যাবে।

আমি কেন সব মনে রাখতে পারছি না ? স্মৃতিশক্তি কমে যাচ্ছে কেন ? দিলীপ এই কটি কথা বলে ফেলল বিড় বিড় করে। তার ঘরে এখন কেউ নেই। টেলিফোন তুলে বাড়িতে লাইন চাইলো।

হ্যালো ! রাণী ?

না। আমি কুটু।

তোর মাকে দে—

কি ব্যাপার ?

রাণী ?

হ্যাঁ। কেন ?

আশ্চর্য ! লোকে বউয়ের সঙ্গে কথা বলে না ?

বাড়ি ফিরে এসেই বলতে পারবে। এখন অফিসের কাজ কর।

বিয়ের সময় তোমার ঠোঁট এখনকার চেয়ে অনেক কালো ছিল। মনে আছে ?

এটা একটা কথা হোল ! রাখছি—

শোন। শোন। কালো ঠোঁটই কিন্তু মেয়েদের বিউটি—

রাণী ছেড়ে দিয়েছে। ফোর্টিন্থ ফ্লোরের এই সাজানো গোছানো কামরায় পৌঁছতে তাকে অনেক রকমের জিনিসের ভেতর দিয়ে আসতে হয়েছে। কি কি এবং পরস্পর কোন্ কোন্ জায়গার ভেতর দিয়ে সে এখানে এসেছে—চেষ্টা করলেও

দিলীপ তার সবটা মনে করতে পারবে না

এখন বেলা তিনটে। নিচে অক্টোবরের বিকেলবেলা। চলন্ত দেশলাই বাক্সের স্টাইলে এক একটা মোটরগাড়ি আগেকার ডেড লেটার অফিসের সামনে মোড় নিচ্ছিল। ওদের ছাদ দেখে দিলীপ দিশী বিলিতির ফারাক ধরতে পারছিল। ফিয়াট, ফোর্ড, কোর্টিনা, অ্যামব্যাসাডর, টয়োটা, এটার নাম মনে আসছে না। ওটা হোল গিয়ে রেপিয়ার। একটা লাল গাড়িকে প্রায়ই দেখতে পায় দিলীপ। পথে-ঘাটে।—ঠিক গাড়ি নয়। স্কুটার রিকসাকে যেন বডি-মিস্ত্রি গাড়ি বানিয়ে দিয়েছে—পিটিয়ে-পাটিয়ে। দু' সিলিণ্ডারের গাড়ি হবে। ফুয়েল খুব কম খায়। গাড়িটার সঙ্গে দেখা হলে দিলীপ ঘুরে তাকাবেই।

কি মনে হোল তার। ড্রয়ারে চাবি ঘুরিয়ে লিফ্‌টে গিয়ে ঢুকলো।

ময়দানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ির পেছনের সিটে বসে সে পরিষ্কার দেখলো, সারা মাঠে ঘাস অন্তত দু' ইঞ্চি বড় হয়ে বসে আছে। ভালো করে মো করলে অন্তত পাঁচ হাজার ঘোড়ার এক বেলার খাবার পাওয়া যাবে।

টেলিফোন কারখানা, রেসকোর্স, পুলিশ হাসপাতাল পেরিয়ে গাড়ি যখন ডান-হাতের সাতপুরনো গোরস্তান পার হচ্ছিল—ঠিক সেই সময় দিলীপ বলল, গাড়ি ঘোরাও সনাতন। পার্ক-স্ট্রীটে যাবো। কি গাড়ি বিক্রি আছে—একবার দেখলে হয়—

সনাতন গাড়ির মুখ ঘোরাতে ঘোরাতে আবার জিরাতপুল পার হোল।

একটা জারমান ওপেল আছে—

ছ' সিলিণ্ডারের ?

না। চার সিলিণ্ডার বোধ হয়।

তাহলে তো অ্যামব্যাসাডরের মতই তেল কনজামশন। দেখলে হয়।

পার্ক স্ট্রীট থেকে যে-রাস্তাটা মার্কেটের দিকে গেছে—তার মুখেই চৌধুরী এজেন্সি। মটর সাইকেল, স্কুটার, ফোম কুশনের ডিলার। বাঙালী কোম্পানী। দু' ভাই মিলে চালায়। তাদের বড়জন এগিয়ে এসে বলল, কি খবর মিস্টার বোস ?

অনেকবার এসেছে দিলীপ। কখনো দিশী, কখনো বিলিতি গাড়ি ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রাখে চৌধুরীরা। এটা ওদের সাইড বিজ্‌নেস। লোক গাড়ি বেচতে রেখে যায়। ওরা বেচে দিয়ে কমিশন পায়। অনেক সময় খদ্দের বুঝে গাড়ির

খবর আনে। এদের এখানেই একবার একটা ইটালিয়ান গাড়ি দেখেছিল। কারমান ঘিয়া। নামটা অনেকটা ডিটেকটিভ্ গল্পের স্পাই নর্তকীর মত। বেশ আলুথালু বেশে অন্ধকার অডিটোরিয়ামের স্পট-লাইটের ভেতর যারা নাচে আর কি।

একটা জারমান ওপেল আছে—সনাতন বলছিল।

ছিল মিস্টার বোস। আজই সকালে ডিল কমপ্লিট হোল। ওপেল বাদে অন্য গাড়ি হলে চলবে?

চার সিলিণ্ডার হলে ভালো হয়।

চার সিলিণ্ডারের বিলিতি গাড়ি বলতে তো হিলম্যান সুপারমিনক্স—কিংবা মরিস অক্সফোর্ড—

কেন? অসটিন কেমব্রিজ—

ওই একই জিনিস। একটা মরিস অক্সফোর্ড আছে। এ ওয়ান কণ্ডিশন। কোন খরচ নেই।

কি রকম দাম?

তা সতেরোর ভেতর করিয়ে দেব আপনাকে—

সতেরো মানে সতেরো হাজার। এইভাবেই বলার রেওয়াজ।

বড় চৌধুরী বললে, কিন্তু—

কিন্তু কি?

মরিস অক্সফোর্ড আছে—তবে স্টেশন ওয়াগন। তাতে চলবে আপনার?

না। আর দামটা আপনারা বেশিই বলছেন। হরেন দত্ত কিংবা বরেন দত্ত—ওরা দু' ভাই-এর একজন তো আরও কম দাম বলছিলেন।

ওঁরা তো কমই বলবে। কোন্ মডেল বলুন তো—

তা তো মনে নেই। তবে নম্বর বলেছিল ডবলু বি ই—

নাইন্টিন সিক্সটি! আমি দেব আপনাকে সিক্সটিসেভেনের গাড়ি। দত্ত ব্রাদার্সের কথা রিলাই করা যায় বলুন?

কেন?

ওদের দু' ভাইতে কোন ভাব আছে? আলাদা শো রুম। আলাদা অফিস। যা ইচ্ছে দাম বলছে—

দাম তো আপনার চেয়ে কম।

দিলীপ আজ ক' বছরে জানে—হাতফেরতা হাওয়াগাড়ির ব্যবসাদাররা কখনও সত্যি কথা বলবে না। সত্যি কথা বলাও তাদের কাজ নয়। ব্যবসা করতে বসেছে। কথা বেচে পয়সা।

ছোট চৌধুরী বলল, ওরা আমাদের জ্ঞাতির ভেতর পড়ে। ছোট ভাই বরেন ছ' আনা রোজে কাজে ঢুকেছিল—বড়মামার কাছে শুনেছি। আমরা তখন ছোট—

দিলীপ দেখলো, সনাতন গাড়ি পার্ক করে এসে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যের মুখে লেজে আলো জেলে গাড়িগুলো এ-বাড়ির সামনে দিয়ে মোড় ঘুরছে। বরেন দত্তর কথাগুলো দিলীপ বসুর কানে বাজছিল। বরেন কত গর্ব করে চৌধুরীদের কথা বলেছিল। বলেছিল—ওরা আমাদের ভাই হয়। আমরা এক সময় সবাই একসঙ্গে থাকতাম। কর্তাদের আমলে। তখন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের জমিটাও আমাদের ছিল। সে আমল অবিশ্যি আমাদের জন্মের আগে। ঠাকুদ্দারা তিন ভাই ছিলেন। তিনজনের তিনদুগুণি ছ'খানা বউ। লতাপাতায় আমরা অনেক ভাই। আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়লে আমরা এদিকটায় উঠে আসি। বুঝেছেন কিনা।

আরও অনেক কথা বলেছিল বরেন। যেমন—

হরেন দত্তর শো রুম তো আপনি দেখেছেন মিস্টার বোস। ওখানে আমি আর দাদা একসঙ্গে জয়েন্ট ব্যবসা করেছি। যুদ্ধের আগে একখানা অসটিন বেচলে পঁচিশ টাকা প্রফিট থাকত। দাদা নিয়েছে পনের টাকা। আমি দশ টাকা। কখনও আট টাকা। তাতেই খুশী ছিলাম! কিন্তু দাদাই শেষে আমায় আলাদা করে দিলে। তখন আমরা দিল্লি থেকে—জয়পুর থেকে—কাশ্মীর থেকে সব বড় লোকদের বড় বড় গাড়ি কলকাতায় নিয়ে আসতুম ওয়াগন করে। বাঙালী ক্যাপ্টেন-বাবুরা কিনে নিত মোটা পয়সায়। তখনি তো এই জায়গা কিনলাম দিলীপবাবু। মা বেঁচে। এ বাড়ি অবিশ্যি তিনি দেখে যাননি। আজাদ সাহেব তখন সেণ্টারে ক্যাবিনেট মিনিস্টার। তাঁর কাছ থেকে এগার শো টাকা কাঠার এগার বিঘে জমি কিনে বসলাম। সবই ভাগ্যের খেলা। দাদা তখন আলাদা—

বড় চৌধুরীর কথায় চমকে উঠল দিলীপ। সে তখন বলছে, বরেন দত্ত তো আপনাকে ফরেন গাড়ি বেচে স্পেয়ার পার্টস দিতে পারবে না। আমরা কিন্তু ঠিক দিয়ে যাবো—

আপনারা কোত্থেকে দেবেন?

বম্বের দুটো ফার্ম এখনো ইমপোর্ট করে। লিখলে তারাই আনিয়ে দেবে। খরচা পড়বে অবশ্য।

দিলীপ মনে মনে বলল, রাবিশ! ইমপোর্ট একদম বন্ধ। আর তুমি আনিয়ে দেবে স্পেয়ার! গুলের জায়গা পাওনি বাছাধন!

চৌধুরীদের দু ভাইকে দেখতে বেশ ফিটফাট। বড়জন বছর পঁয়তাল্লিশ। ছোটজন সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ। শাদা ফুলশার্ট, সেই সঙ্গে সাদা গ্যাবার্ডিনের ট্রাউজার। পায়ে কালো সু। শো-রুম খুলে—একদম পাকা সেলসম্যানের ড্রেস।

সেই তুলনায় হরেন এখন খাকির ট্রাউজারের ওপর তোয়ালে গেঞ্জি পরে থাকে। প্রায় সত্তর। শো-রুমের গায়েই তেতলা বাড়ি। মেয়ের ঘরে—ছেলের ঘরে—দুদিকেই নাতিনাতনী হয়েছে। গাড়ির খোঁজে গিয়ে একটু একটু আলাপ জমে উঠতেই এতসব জানতে পেরেছে দিলীপ।

সোমবার টেলিফোন ধরে না হরেন। সেদিনটা কথাও বলে না। বরেনের কথায়—দাদার ওসব বুজরুকি। পয়সা হতেই এসব শুরু করেছে। সে তুলনায় বরেন অনেক সাদাসিধে। খাট পেরিয়ে গিয়েও সারাদিন খাটে। ভোরে টেনিস কোর্ট থেকে সোজা এসে শর্টস পরেই কাজে বসে। টেলিফোন, পার্টিকে গাড়ি দেখানো, ওয়ার্কশপে যাওয়া—সবই এই পোশাকে। সাউথ ক্লাবে খেলার কোর্টে দাঁড়িয়েই সে পার্টি পায়। কেউ বেচবে· কেউ কিনবে। আর দৌড়োদৌড়িতে শরীরটাও ভাল থাকে।

এসব কথা বরেন দত্তর বাড়িতে সকালের দিকে গাড়ির খোঁজে গিয়ে দিলীপ শুনেছে।

ছোট চৌধুরী বলল, আমাদের কারখানায় বিলিতি গাড়ির অনেক স্পেয়ার আমরা লেদে বানিয়ে থাকি। কোন অসুবিধে হবে না আপনার। গাড়ি বেগড়ালে আমরাই সারিয়ে দেব।

আজ আসি।

তাহলে গাড়ি কি দেখাবো?

দেখান।

কবে? কাল বিকেলে?

অত তাড়াতাড়ি পারবো না। ফোন নম্বর তো রয়েছে আমার। দু'-চারদিন পরে খবর দেবেন আমায়। বলতে বলতে বেরিয়ে পড়ল দিলীপ। কয়েক পা এগিয়ে নীলাম-বাড়িটার গায়ে তার গাড়ি দাঁড়ানো। অফিস আর দোকান-পাড়া। কাচের বড় বড় দেওয়ালের ওপাশে সারি সারি মপেড—বিক্রির জন্যে দাঁড়ানো। মাথার ওপরেই বড করে টায়ারের হোর্ডিং। আরেকটু এগোলেই শুয়োরের মাংস, পিয়ানো, প্রভিশন, পুরনো রেকর্ডের দোকান। তারপর একটা চীনে রেস্তোরাঁ। তার উল্টোদিকেই পাসপোর্ট আর ফুডের অফিস। গাড়িতে উঠতে উঠতেই দিলীপ

ফিক করে হেসে ফেলল। আমি তো খানিক বাদে মরিস অক্সফোর্ডের কথা ভুলে যাবো।

আবার জিরাতপুল। পড়ে থাকা গোরস্তান। নিউ রোডে উঁচু মালটিস্টোরিড বাড়িটার পার্কিং বেসে গাড়ি থেকে নামতেই দিলীপের পা দুখানা লিফটের দিকে যাচ্ছিল।

গুরু এই ফিরলে? একটা সিগারেট দিয়ে যাও।

প্যাকেট বের করে একটা দিতে না দিতেই আর তিনখানা হাত এগিয়ে এলো, সন্তুর সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চু, বিশ্বনাথ, বাকু।

তোরা কি করছিলি এখানে?

কোথায় যাবো গুরু? তোমাদের বেসমেণ্টে বৃষ্টি নেই, রোদ নেই। আলো আছে। ছায়া আছে।

গুরু বলিস কেন আমায়? গুরু তো উত্তমকুমারকে বলে—

বাঃ। তোমায় আমরা কত শ্রদ্ধা করি—তাই তো গুরু বলি। দেশলাইটা দাও।

এই বুঝি শ্রদ্ধা। বিড়ি দেশলাই চাস আমার কাছে? প্রায় তোদের বাপের বয়সী আমি—

তুমি অন্য স্টাইলের গার্জেন গুরু। পাড়ার অন্যসব গার্জেনদের দেখ। আমাদের দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আমাদের ওই কেসটার কি গেল?

কোন্ কেস?

বাঃ! সব ভুলে মেরে বসে আছো! আমাদের নাম ঠিকানা নিলে।

ওঃ! অফিসে দিয়েছিলাম। পার্সোনেল ডিপার্টমেণ্ট বলেছে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের থ্রু দিয়ে আসতে হবে।

বাচ্চু বলল, ওসব চেষ্টা করে লাভ নেই দিলীপদা। আমাদের ভাগ্য কেউ ঘোরাতে পারবে না। কটা টাকা দাও না। একটু টাণ্টু করে আসি। মাইরি দাও না দশটা টাকা।

বাঃ। প্রথমে সিগারেট। তারপর বোতলের টাকা? যা না নিজের বাবার কাছে গিয়ে চা—

কলকাতায় থাকলে তো চাইতাম!

কোথায় গেলেন?

বিশ্বনাথ বলল, ওর বাবা দিল্লি গেছে।

কি ব্যাপার? বদলি হলেন নাকি?

সেসব কথায় কি হবে বল?

দিলীপ বুঝলো, ওরা এখন কথা বাড়াতে চায় না। তার নিজের ছেলে রবির চেয়ে বাচ্চু ওরা বছর দু' তিনের বড়। ন' তলার ব্যালকনি থেকে চেতলা বেকারির চিমনি, সেন্ট্রাল পার্ক, আদি গঙ্গা, টালির ছাদ, পাকা বাড়ি এট্সেটরার ভেতর বাচ্চু, বিশ্বনাথ, বাকুদের বাড়িগুলো মিশে আছে। একদম গায়েগায়ে। কালীপুজোর সময় তুবড়ি প্রতিযোগিতার আলোয় সারা পাড়া দিনের আলো হয়ে যায়। তখন খানিকক্ষণের জন্যে সব পরিষ্কার দেখা যায়।

এইটথ্ ফ্লোরের ঘরে বসে রেসকোর্স, টাটা সেন্টার, ভিক্টোরিয়া, হাওড়া ব্রিজের কঙ্কাল—তাও পরিষ্কার দেখা যায়। তখন নিচের চেতলায় মানুষজন, গাড়ি-ঘোড়া, ধর্মের ষাঁড়—সবই স্লো-মোশান পিকচারের অলস চালে চলে। তার ভেতর শীতের দুপুরে বাচ্চু, সন্তু, বাকু, বাবুলাল, বিশ্বনাথ ক্রিকেট খেলে। দোলে আবির নিয়ে বেরোয়। একবার ওপর থেকে দিলীপ লম্বা সুতোয় টিন বেঁধে নিচে ফেলেছিল। বাবু সিগারেট কিনে সুতোয় বেঁধে দিতে তবে দিলীপ গুটিয়েছিল। কি করবে? প্যাকেট একদম ফাঁকা।

বাচ্চুর দিকে তাকিয়ে দিলীপ বসু বলল, এখন? দিল্লিতে? কি ব্যাপারে?

আর কেন বলছো! রাজধানীতে গেছে বাবা। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মামলা করতে!

দুই

আদি ডালহৌসি বলে যদি কিছু থাকে তা হোল রাইটার্সের গা ঘেঁষে নেতাজী সুভাষ রোডে—আগেকার ক্লাইভ স্ট্রিটের—দুধারের বড় বড় বাড়িগুলো। মোটা থাম। পেতলের প্লেটে অফিসের নাম। বাড়ির মাথায় সিমেন্টের ঈগল। এ পাড়ায় শান্ত, গম্ভীর হাউসগুলো দেখে মনে হবে—এখানকার ব্যবসাপত্তর কুবের—না হয় নিদেনপক্ষে চাঁদ সদাগরের আমলে শুরু হয়েছিল।

এরকমই একটা বাড়ির ভেতর এখন ঢুকলে দেখা যাবে—ঝোলানো ফ্লুরেসেণ্ট আলোয় একদম দিন হয়ে আছে। তার নিচে কেরানীবাবুরা খাতাপত্তর সাজিয়ে বসে গেছে। একদিকে চওড়া প্যাসেজ। প্যাসেজের গায়ে সারি সারি চেম্বার। ডিরেক্টর। একজিকিউটিভ ডিরেক্টর। পার্সোনাল সেক্রেটারি টু এম-ডি। একে-

বারে শেষে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘর। প্যাসেজের মাথায় বিরাট দেওয়াল জুড়ে দুটি ছবি।

ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে—একটি ছবি চা বাগানের। অন্যটি তামাক ক্ষেতের। একটি আসামের। অন্যটি দক্ষিণ ভারতের।

সম্ভবত পূর্ব ভারতে এরাই তামাক আর চায়ের ব্যবসা করে আসছে একশো বছরের ওপর।

বোর্ড ঘরগুলোর একটির ভেতরে তখন এয়ারকুলার বেশ স্বস্তির আবহাওয়া তৈরি করেছে। বাইরে ডালহৌসি তখন গরমকালের শেষ গরমে ঘেমে যাচ্ছিল।

ম্যাকনর্টন ব্রাদার্সের একজিকিউটিভ ডাইরেক্টর চন্দ্রকান্ত বকসি টেবিলের ওপারে বাঙালী মহিলাকে মন দিয়ে দেখছিল। সুন্দর চেহারা। তার চেয়ে সুন্দর হাসি। ইংরাজি কথাগুলো মিসেস মুখার্জির ঠোঁট দিয়ে ঝরনা হয়ে ঝরে পড়ছিল। ফরসা কপালে নীল শিরার অস্পষ্ট উল্কি।

চন্দ্রকান্ত পরিষ্কার বাংলায় বললেন, আপনি ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিতে কতদিন আছেন?

স্বাতী অবাক হয়ে বলল, বাংলা জানেন?

বাঃ! কলকাতার ছেলে আমি। সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়েছি।

আপনি বাঙালী?

না। টাইটেল দেখে বলছেন তো? আমরা গুজরাটী।

আপনি একবার আমাদের লরিতে তামাক আনিয়ে দেখুন। সময়মত সব জিনিস পৌঁছুবে।

টেবিলের ওপর শাদা সুন্দর কার্ডে স্বাতীর নাম ছাপানো। মিসেস স্বাতী মুখার্জি। ফিল্ড অফিসার। ইস্টার্ন রেঞ্জ। দি গ্রেট সাউথ ইস্টার্ন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি। চন্দ্রকান্ত বলল, আপনাদের ফ্রাইট চার্জ কিছু বেশি।

আপনি তো গুণ্টুর থেকে ওয়াগনে তামাক আনিয়ে থাকেন। কাশীপুর নয়তো চিৎপুর ইয়ার্ড থেকে ওঠানো নামানোরও একটা খরচ থাকে। আমাদের লরি সোজা আপনাদের গোডাউনে গিয়ে দাঁড়াবে।

অক্ট্রোয় তো ফাঁকি দিতে পারবে না মিসেস—

স্বাতী কথা যুগিয়ে দিল—মিসেস স্বাতী মুখার্জি। নিজের নামটা দাঁত চেপে উচ্চারণ করে খোলা হাওয়ার মত হেসে উঠলো স্বাতী। তার সামনে এখন একজন পুরুষলোক বসে আছে। হোক না একজিকিউটিভ ডিরেক্টর। আসলে তো পুরুষ। চাই কি চল্লিশের নিচেও বয়স হতে পারে। একগাদা ট্রান্সপোর্ট

কোম্পানির ভেতর ম্যাকনর্টন ব্রাদার্সই বা কেন সাউথ ইস্টার্নের লরি ভাড়া নেবে? গুণ্টুর থেকে বছরে অন্তত কয়েক হাজার লরি তামাক এনে ফেলবে ওদের কলকাতার গোডাউনে। এ অর্ডার পাবার জন্যে অন্তত তিরিশটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে। স্বাতী মাস গেলে সাতশো টাকা রিটেইনার পায়। তার সঙ্গে যোগ হয় লরি ভাড়ার ফাইভ পারসেণ্ট।

আমি তো লাঞ্চেই বেরুবো। চলুন আপনাকে ছেড়ে দিয়ে আসি।

কোন দরকার নেই। আমি দিব্যি চলে যাবো।

স্বাতী উঠে দাঁড়াতেই চন্দ্রকান্ত ওর দুই ভ্রূর মাঝখানে তাকালো। চোখে দৃষ্টি ঘন করে ফেললো। সে-দৃষ্টিতে চোখ রাখতে না পেরে অস্বস্তি কাটাতে হেসে উঠলো স্বাতী। চলুন তাহলে।

তখন তখনই স্বাতীকে ছেড়ে আসা সম্ভব হোল না চন্দ্রকান্তর। পথে বেরিয়ে ওদের গাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো পার্ক স্ট্রীটে। খানিক বাদে খাবারের টেবিলে ওয়েটার ওদের অর্ডার লিখে নিচ্ছিল। বাইরে দুপুরের আলো। ভেতরে কাগজের ফুলে ঢাকা সন্ধ্যার আলো।

একটা আট মাসের মুর্গিকে কে বা কারা ছাল ছাড়িয়ে ভেজে এনে দিল স্বাতীর সামনে। পাশাপাশি দুটি ফলের রসের গ্লাস। চন্দ্রকান্ত বলল, আপনি নিন। হেল্প ইওর্সেল্ফ। আমি একটু বিয়ার নিচ্ছি।

তবু কেমন অস্বস্তি লাগছিল স্বাতীর। আজই খানিক আগে চন্দ্রকান্তর সঙ্গে তার পরিচয়। ঝকঝকে সফল-চেহারার পুরুষলোক। হয়তো তার চেয়ে বয়সেও ছোট হবে কিছু। এখন কি করে সে একজন অজানা লোকের সামনে হাঁ করে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুর্গির মাংস খায়? সারাটা সকাল ধরে খোঁপা বাঁধতে হয়েছে। ঠোঁটে গালে এখন ময়েসচারাইজার লাগানো। উজ্জ্বল আলো থাকলে দেখা যেত—স্বাতী মুখার্জির গাল, ঠোঁট, স্কিন—কেমন যেন ভোরের কুয়াশায় আলতো করে মোড়া। মুখ কাছে আনলে যে কোন পুরুষের নাকে মৃদু সুগন্ধ উঠে আসবে। স্বাতী জানে—সে যখন একদিকে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে হাসে—তখন পুরুষমাত্রেই তার কান, গলা, খোঁপার দিকে না তাকিয়ে পারবে না। তাকায় না শুধু একজন লোক। তার নাম সুধীর। সে ফিল্মস ডিভিশনের ক্যামেরাম্যান।

ঠিক এই সময় কয়েকটা টেবিল পার হয়ে আরেকটা জিনিস হচ্ছিল। পার্ক স্ট্রীটকে সামনে রেখে এই রেস্তোরাঁটা দাঁড়ানো। বেলা দশটা থেকে রাত দুটো অব্দি খোলা থাকে। বাইরে থেকে আরব্য উপন্যাসের সরাইখানার কায়দায় সাজানো। ভেতরে ড্রিংকসের সঙ্গে নানা রকমের খাবার। মেনুতে আস্ত রোস্ট

করা ডাক অব্দি দর লেখা আছে।

রেস্তোরাঁর একদম শেষে রসুইঘরে যাবার রাস্তায় বাঁ হাতে ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ড। ছোট মত ঘেরা জায়গা। একটু উঁচু। সেখানে বাজনদারদের বসবার জায়গা। সিলিং থেকে ঝুলে পড়েছে একটা মাইক। ওপর থেকে এখন ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডের ওপর স্পট লাইট পড়লো। আর সঙ্গে সঙ্গে আধো অন্ধকার আধো আলোয় টুকরো টুকরো টেবিল ঘিরে বসে থাকা লোকজনের ভেতর স্বাতী চন্দ্রকান্ত দুজনেই চমকে উঠলো একসঙ্গে।

নতুন কলকারখানা, ব্যবসাপাতি ফেঁপে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এসব রেঁস্তোরাতেও খদ্দের উপচে উঠেছে। এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট, কমিশন, পাবলিক রিলেশন্স ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপারের জোরে এসব জায়গায় গত ক বছর হোল বেশ ভিড। কোম্পানি এক্জিকিউটিভ, বিক্রি বাড়ানোর সেলস্ প্রোমোশনের লোকজন, ব্যাঙ্কের অ্যাডভ্যান্স ডিপার্টমেণ্টের ছোট বড় কর্তারা—কি দুপুরে কি রাতে—এখানকার আলো-আঁধারিতে সুন্দর পোশাকে—কামানো গাল নিয়ে এক একজন এক একটি নীলমণি হয়ে বসে থাকে। কথা বলার ধরন ধারণ খুব আস্তে।

স্পট লাইটের ভেতর বিশ্বনাথ থরথর করে কাঁপছিল। অন্ধকারের ভেতর কে বা কারা বসে আছে—তা সে দেখতে পাচ্ছে না। তার পেছনে এখন ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে বাচ্চু, বাকু, বাবুলাল আর সন্তু।

বাকু বাজাচ্ছে বিগ ড্রাম। বাচ্চু স্প্যানিশ গিটারে সুন্দর স্ট্রোক দিচ্ছিল। সন্তু বাজাচ্ছে বঙ্গো। বাবুলালের হাতে বড় সাইজের করতাল।

আজই প্রথম। এরকম বড় জায়গায় তাদের এই প্রথম। না এলেই ভালো হোত। বিশ্বনাথ স্পট লাইটের ভেতর দাঁড়িয়ে গাইছিল আর এসব কথা ভাবছিল। আর থর থর করে কেঁপে উঠছিল।

স্বাতী চন্দ্রকান্তকে বলল, ভীষণ কম বয়স, তাই না!

স্বাতীর কানের লতিতে অন্ধকারের ভেতর ঝকঝকে কি এক কুচি গেঁথে বসে আছে। সেদিকে তাকিয়ে চন্দ্রকান্ত বলল, গাইছে ভালো। গলাটা সুন্দর। মনে মনে বলল, কানের ওটা হীরে হতে পারে।

বছর কুড়িও বয়স হয়নি।

বিশ্বনাথ তখন পায়ে তাল রেখে গাইছিল। তার এই নীল রংয়ের ট্রাউজার বানানোর টাকা দিয়েছে নিউ রোডের দিলীপদা। দশ তলা ফ্ল্যাটবাড়ির দিলীপ বোস। গায়ের শার্টের কাপড় আর নগদ তিরিশ টাকা পেয়েছিল অ্যাসেমব্লি ইলেকশনে খেটে। বেপাড়ার ক্যাণ্ডিডেটের কিছু টাকাই খসলো শুধু। গলার এই

গানটা তুলেছিল মেনকা সিনেমায় বসে। পর পর তিনদিন ম্যাটিনিতে। তারপর একখানা গানের বই কিনতে হয়েছে তাকে। আজকাল বাচ্চুও বই কিনে আনে।

চন্দ্রকান্ত বলল, বাঙালীরাই হিন্দি গানের সবচেয়ে বড় পেট্রন।

বিশ্বনাথ চোখের সামনে হিন্দি ছবির পাহাড়ী গাঁ দেখতে পাচ্ছিল।

গোরী তেরা গাঁও বড়া পেয়ারা—

ম্যায় তো গয়া মারা

আকে ইহারে…আকে ইহারে…

হেমামালিনী পাহাড়ী রাস্তায় ভেড়ার পাল নিয়ে নিচে নামছে।

বাচ্চুর হাতে স্প্যানিশ গিটারে একসঙ্গে তিনটে টানা স্ট্রোক পড়লো।

গানের শেষে বিশ্বনাথ বাও করলো। বার বার তিনবার। তিনদিকে ঝুঁকে। তখনো সে পরিষ্কার কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। অন্ধকারের ভেতর থেকে খদ্দেরদের হাততালি। এসব গান এত-ভালো লাগে? আশ্চর্য! সে কতদিন এসব গান শুনিয়েছে সবাইকে। পাড়ায় বিভূতিদের লাল বারান্দায় বসে। দিলীপদা বেশি রাতে সিগারেট কিনতে নামলে তাকেও শুনিয়েছে। বাচ্চুর বাজনার বিহার্সেলের সঙ্গে গলা মিলিয়েছে কতবার। এজন্যে যে পয়সা পাওয়া যায়—খাতির করে লোকে—এ তার জানা ছিল না।

মিনিট খানেকের ইণ্টারভ্যালের পর আবার আরেকখানা গাইলো। এবার গাইবার সময় বিশ্বনাথ দেখলো—সে নিজে আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়ে উঠেছে। সামনের আধো অন্ধকারে মানুষজনের মুখও দেখতে পাচ্ছে। বিয়ারের বোতলের মুখে উপচে-ওঠা ফেনা। ওয়েটাররা ছোটাছুটি করে খাবার পৌছে দিচ্ছে। টেবিল পরিষ্কার করছে। তার পেছনে ব্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডে বাচ্চু, বাকু, সন্তু, বাবুলাল। আমার আর ভয় কিসের? পাবলিক তো আমায় নিচ্ছে। আরেকখানা! আরেকখানা!! আরেকখানা প্লিজ!!!

বেলা পৌনে চারটের সময় বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। ভেতরটা তখন ফাঁকা। রোডসাইড রেস্তোরাঁর মালিকের ছেলের সঙ্গে ওরা তখন খেতে বসেছে। বড় টেবিলের একদিকে বাকু, সন্তু আর বাবুলাল। আরেক দিকে বিশ্বনাথ, বাচ্চু। কড়ার ছিল বেলা পৌনে একটা থেকে পৌনে তিনটে অব্দি গাইতে হবে। তারপরেই লাঞ্চ খেতে আসা মোটা মানিব্যাগের লোকজন চলে যায়।

মালিকের ছেলেটি এদের চেয়ে বয়সে কিছু বড়। বাচ্চু তার পুরো নাম ধরে ডাকলো।

মিস্টার মাতাসিকি কোঠারি!

ইয়েস।

বাচ্চু মনে মনে বাংলা কথা ইংরেজিতে ট্রানশ্লেট করছিল। পুরো সেণ্টেন্স তৈরি হয়নি বলে গলা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিল না। সে শুনেছে, রোডসাইডের মালিক মিস্টার কোঠারি এখন থাকেন টোকিওতে। সেখানকার রেস্তোরাঁ আর জাপানী বউ নিয়ে। জাপানী ছেলেকে রেখেছে এই কলকাতায়—দেখাশুনোর জন্যে।

গিভ্ আস অ্যানাদার রাউণ্ড অব বিয়ার।

ও ইয়েস—

তখন ময়দানে একটা ডবল্ এম ডি নম্বরের আনকোরা অ্যামবাসাডর ক্যাসুরিনা অ্যাভিনিউ ধরলো। স্টিয়ারিংয়ে স্বাতী। পাশে চন্দ্রকান্ত। ওয়াইপার গুঁড়ো বৃষ্টি মুছে দিচ্ছিল।

আপনার তো পাকা হাত।

স্টেটসে থাকতে লাইসেন্স নিয়েছিলাম। আমেরিকায় লাইসেন্স পেতে অনেক ঝামেলা।

কোন্ স্টেটে?

নিউইয়র্ক স্টেটে। ম্যাডিসন স্কোয়ারে আমার চেম্বার ছিল। বলতে বলতে পিচ-রাস্তার পাশে শক্ত ঘাসের জমিতে গাড়ি তুলে দিয়ে স্পিড কমিয়ে দিল স্বাতী। তার পর একদম থামিয়ে দিল।

ভিজে বাতাসে স্বাতীর শরীর থেকে সুগন্ধ উঠে গিয়ে চন্দ্রকান্তর নাকে গেল। দুপুরে খাওয়াটা ভালোই হয়েছে। হাই প্রোটিন। চকোলেট আইসক্রিম। ফিস মেওয়ালেজ। তন্দুরী। চন্দ্রকান্ত বকসি বুঝলো, সে এতকাল কলকাতায় আছে—তবু এমন একটি বাঙালী রমণীর দেখা সে এর আগে পায়নি। এইসব ক্যারেকটার নিয়েই হয়তো ট্যাগোর নভেল লিখেছে। বাংলাটা পড়তে পারে না বলেই তার পড়া হয়নি। দেওয়ালীর সময় আমেদাবাদে গিয়েও সে থেকে দেখেছে। মেলাতে পারে না। ছোটবেলা থেকে কলকাতার সঙ্গেই তার সম্পর্ক।

চেম্বার? কিসের চেম্বার মিসেস মুখার্জি?

কল মি স্বাতী। জাস্ট সিম্পিল স্বাতী। আই ওয়াজ এ বিউটিসিয়ান। আমার বিউটি পারলার ছিল।

আমেরিকান মেয়েদের সাজিয়ে দিতেন?

হ্যাঁ, শুধু মেয়ে কেন? পুরুষরাও আসতেন। ওদেশে ছেলেরাও সাজে। পার্টি, কনফারেন্স, সেমিনারে যাবার আগে আপনার মত ইম্পর্টান্ট পুরুষরাও সাজতে আসতো।

আমি মোটেই ইম্পর্টান্ট নই। ইস্! এদেশে যদি পারলার খুলতেন— আমি নিশ্চয়ই সাজতে যেতাম-—

থামানো গাড়ির ভেতর একটি সুগন্ধী মেয়ের কাঁধে নিজের মাথাটা রাখলো চন্দ্রকান্ত। স্বাতী কোন আপত্তি করলো না। প্রশ্রয়ও দিল না। শুধু চুপ করে থেকে খুব আস্তে বলল, হাতে টাকা হলে পারলার করবো। সেজন্যেই তো খাটছি এখন। ভাল রাস্তায় ঘর পেতে হলে মোটা সেলামী লাগে।

আপনি শিখলেন কি করে?

একটা কসমেটিক কোম্পানির ফিল্ড অফিসার ছিলাম। ওরাই ট্রেনিং দিয়ে পাঠিয়েছিল। এবার আমায় যেতে হবে মিস্টার বকসি।

তাড়া কিসের স্বাতী?

না। আমার ছেলেব স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। ট্রাম-লাইনে ছেড়ে দিন আমায় —

স্কুল গেট অব্দি যেতে পারি?

স্বচ্ছন্দে।

মোট তেরোশো সত্তর স্কয়ার ফুটের এ ফ্ল্যাটে দিলীপের সবচেয়ে রহস্যময় লাগে দক্ষিণ-পূবের ব্যালকনিটা। একদম আকাশের ভেতর। কোন শেকড় নেই। কারণ, মাটির কাছাকাছি মশা, ধুলো, ধোঁয়া, আওয়াজ—কোনোটাই এত উঁচুতে পৌঁছতে পারে না।

শীত এবার দেরিতে পড়বে। শিলং কিংবা রাঁচির মতই যতদূর দেখা যায়— কলকাতার গেরস্থদের ঘরগেরস্থালী থরে থরে সাজানো। একতলা, দোতলা, পাঁচতলা, দশতলা। অনেকটা পাহাড়ী শহরে থাক থাক উঠে যাওয়া ঢঙে।

আজ নভেম্বরের দশ তারিখ। এখনো শীতের দেখা নেই। ঘড়িতে বেলা দশটা। কুটু এবার স্কুল থেকে ফিরবে। কলকাতায় যত উঁচুতে ওঠা যায়—রোদ্দুর তত পরিষ্কার। রান্নাঘর থেকে রাণী বেরিয়ে এসে দিলীপকে ব্যালকনিতে পেল। এই চিঠিখানা ছাখো তো! আজই যুগান্তরে পোস্ট করে দেব। রবি আসুক।

রবি কোথায় ?   কলেজে যাবে না ?

ছাখো গিয়ে কোন্ ফ্ল্যাটে আড্ডা দিচ্ছে। তখনই বলেছিলাম—বারোজনের ফ্ল্যাটবাড়িতে অনেক কিছু তোমায় মেনে নিতে হবে।

তোমার ছেলে যদি অনার্সের বই টেবিলে মেলে রেখে আড্ডা দিতে যায়—তাহলে আমাকে দোষ দিয়ে লাভ কি ?

নিজের স্টুডেন্ট লাইফের কথা ভেবে দেখো। তুমিও কি আড্ডা দাওনি ? এবার আমার চিঠিখানা পড়ে ছাখো তো। কড়াইতে মাছ রয়েছে—আমি যাই।

ততক্ষণে দিলীপের যা হবার তাই হয়ে গেছে। এই মাত্র রাণী বলেছে—নিজের স্টুডেন্ট লাইফের কথা ভেবে দেখো।

ভেবে দেখো। ভেবে দেখো। মাত্র দু'টি শব্দ। দুর্গের সিংহদরজা ভাঙার সময় হাতির পাল কাঠের গুঁড়ি শুঁড়ে তুলে নিয়ে গদাম করে পাল্লায় গুঁতো মারতো। রাণীর মুখের এই দুটো শব্দ ঠিক তেমনি তার মাথার ভেতরকার ঘিলুতে একদম সোজা গিয়ে গেঁথে গেল। ভেবে দেখো। ভেবে দেখো।

তখন আকাশের ভেতর ন'তলায় ঝুলন্ত ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দিলীপ বসু একবার উনিশশো আটত্রিশ, একবার আরও ধূসর কোন বছরের ঝাপসা সব জায়গায় হাতড়াতে শুরু করে দিয়েছে।

একটা কলের গান ঘিরে অনেক লোকের ভিড। একটি অল্পবয়সী ছেলে হাফপ্যান্টের ওপর ফতুয়া গায়ে দাঁড়ানো। পাশেই শান বাঁধানো চত্বরে বাজারের ব্যাপারীরা বসে।

কি একটা রিন-রিনে গান কলেরগানে ফুরোতেই—যে-লোকটা এতক্ষণ রেকর্ডের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইছিল—সে লোকটাই বড় কেটলি থেকে কাপে কাপে চা ঢেলে সবাইকে দিতে লাগলো। এক পয়সাও দাম লাগবে না। আপনারা মশাইরা একবার খেয়ে দেখুন শুধু। এর নাম চা। এ চা খেলে শরীর সুস্থ থাকে। আমাশা, কলেরার বীজ জব্দ। ঘুম তাড়াতে পারবেন। এক চুমুক মুখে দিয়ে দেখুন। আরেক কাপ দেবো ?

এ পর্যন্ত মনে করতে পেরে দিলীপের মুখখানা আনন্দে জ্বলে উঠেছিল। তারপর আর কিছুই সে মনে করতে পারলো না। আর তখনই তার ভেতরে সে নিজে নেমে পড়ে চারিদিক হাতড়াতে লাগলো। আমি কি সব ভুলে যাচ্ছি ? শেষ পর্যন্ত কিছুই মনে থাকবে না ? কিচ্ছু মনে পড়ে না আমার ? আগে কে ছিলাম আমি ? আমার নাম কি ? ওরে বাবা ! এ কি ভীষণ জিনিস ! কোথায় ছিলাম ? কোথেকে এলাম ?
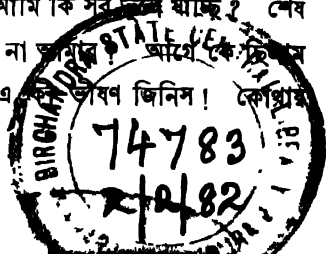
ব্যালকনি থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে এক সময় দিলীপ বুঝতে পারলো—তার শরীরের ওপরের ভারি দিকের বেশির ভাগই গ্রিলের বাইরে বিরাট ফাঁকা আকাশে চলে যাচ্ছে। সে কিছুতেই এই যাওয়াটা আটকাতে পারছে না।

বাবা! কি করছো কি বাবা?

একুশ বছরের রবি ততক্ষণে ছুটে এসে তার বাবাকে ধরে ফেলেছে। কি হচ্ছিলো? এখানে একা একা দাঁড়িয়ে কি করছিলে এখুনি?

নতুন, শক্ত, পুরুষালি দুই হাতের ভেতর নিজের ভারি শরীরটা ধরা পড়ে যাওয়ায় বড় বড় তিনটে নিঃশ্বাসে হাঁফ ছাড়লো দিলীপ বসু। মনে মনে একবার বলল, আমার ছেলে!

ও কোথায় ছিল? আমি তো দেখতে পাইনি! খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেই আমাকে এখানে দেখতে পেয়েছে।

কি করছিলে এখানে দাঁড়িয়ে?

এমনি। কিছু না। বলতে বলতে দিলীপ শুনলো, অনেক আগের এক কলি গান গলায় ফিরিয়ে ফিরিয়ে গাইছে রাণী। সে এসবের কিছুই টের পায়নি। প্রেসার-কুকারের টোপরটা খুলে দিল বোধহয়। কত নিশ্চিন্ত রাণী। একবার কাছে গিয়ে যদি এখন বলতে পারতো—জানো রাণী, এখনকার তুলনায় আমরা দু'জনে কত অল্পবয়সে সংসার শুরু করেছিলাম। এখন সবাই কত দেরিতে বিয়ে করে। মা বাবা মরে গেলে—ভাইবোন দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়লে—তখন আর কে থাকে! একটা বউ। গোটা কয়েক বাচ্চা। তারাই। তখন তারাই একটু একটু করে সব হয়ে ওঠে।

এসব ভাবতে ঘড়ির হিসেবে তিন সেকেণ্ডের বেশি লাগলো না দিলীপের। তখনো তার চোখে চোখ রেখে রবি দাঁড়িয়ে।

সে চোখের সামনে দিলীপ দাঁড়াতে পারছিল না। রাগ হচ্ছিল। আমারই ছেলে হয়ে আমার দিকে ওভাবে তাকানো! আবার গর্বও হচ্ছিল। কেমন ফন ফন করে বেড়ে উঠে রবিও শেষে যুবক হয়ে গেল! আশ্চর্য! এই তো সেদিন ওর জন্যে বেবি ফুড কিনেছি! মনে পড়তেই নিজেকে জোর করে সামলালো দিলীপ। আমি এখন আর কিছুই মনে করার চেষ্টা করবো না।

দিলীপ ঘরের ভেতর চলে যাচ্ছিল। রবি তাকে থামালো। তোমার কোন দরকারী কাগজ হবে।

ওঃ! দে। হাতে নিয়ে বুঝলো, রাণীর সেই চিঠিখানা। রবির চোখের আড়াল হবার জন্যে আরেকটু এগিয়ে বসবার ঘরের জানলায় দাঁড়ালো।

মাননীয় সম্পাদক মশায়,

দৈনিক যুগান্তর

কলিকাতা—৩

গত আট নভেম্বর আমার দু'টি ফুলকপি হারাইয়া গিয়াছে। চুরি গিয়াছেও বলিতে পারেন। আমি আমার পাশের ফ্ল্যাটের এক মহিলার সঙ্গে লোকাল ট্রেনে মদনপুর যাই। ফিরিবার পথে প্ল্যাটফর্মে দেখিলাম—আশপাশের গাঁ হইতে চাষীরা ফুলকপি, টমেটো, বাঁধাকপি, বেগুন ইত্যাদি বেচিতে আসিয়াছে। কি বলিব আপনাকে—টমেটোর কিলো পঁচিশ পয়সা। এক টাকায় একজোড়া ঠাসা ফুলকপি কিনিয়াছিলাম। দিশী ফুল। টাটকা। কোথাও বেড়াইতে গেলে আমি বাড়ির জন্য কিছু না কিছু কিনিয়া ফিরি।

পাশের ফ্ল্যাটের মহিলার পরামর্শে আমরা উল্টাডাঙ্গায় নামিয়া বিবাদি বাগের মিনিবাস ধরি। টিকিট কাটা ছিল শিয়ালদার। ভিড়ের ভেতর তাড়াতাড়ি নামিতে গিয়া ফুলকপি দুইটি আর নামাইতে পারি নাই। লোকের চাপে কামরার ভিতরে থাকিয়া যায়।

শিয়ালদায় স্টেশনমাস্টারকে ফোন করিয়াছিলাম। যদি কেহ পাইয়া জমা দিয়া যায়। সে আশা অবশ্য খুবই কম। তবু যদি কেউ পাইয়া সদয় মনে জমা দেয়—স্টেশনমাস্টার সব না শুনিয়া ফোন রাখিয়া দিলেন।

এই পত্র আপনার কাগজে প্রকাশিত হইলে অনেকে জানিবে। কাগজ পড়িয়া যদি কেউ ফেরৎ দিয়া যায়—সেই আশায় আপনাকে সব জানাইলাম। কেউ না লইয়া গেলে অত টাটকা কপি তিন চারদিনেও নষ্ট হইবার নয়। ইতি—

বিনীত

রাণী বসু

২৭।২ নিউ রোড, এফ ৯।এ

কলিকাতা—

দিলীপ রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। রাণী তখন পেছন ফিরে সিঙ্কে কি ধুচ্ছিল। গলায় সেই গানের কলি। সুচিত্রা সেন সিনেমায় একবার খুব ভাব দিয়ে এ গানটা গেয়েছিল। ভাল করে দিলীপ নিজের বউকে একবার দেখলো। সুচিত্রা সেনের চেয়েও সুন্দরী। তাঁর নিশ্চয় এমন রান্নাবান্না করতে হয় না। রাণী তো বলেই—আমি সারাদিন এত চলাফেরা করি—ওঠাবসা করতে হয় আমায়—

রানী ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, পড়লে? টাটকা দু'টো কপি। খুব পছন্দ করে কিনেছিলাম।

হাসবে না তর্ক করবে—কিছুই বুঝতে পারছিল না দিলীপ। হারানো কপির জন্যে কাগজে চিঠি? কি বলবে? সেদিকে না গিয়ে দিলীপ আস্তে বলল, আজ আর অফিসে যাবো না। কি রান্না করলে?

না। এখন তুমি খাবে না। এই তো খানিক আগে জলখাবার খেলে।

হজম হয়ে গেছে।

কি তুমি বল তো? আমি তো সেই কাল দুপুরে খেয়েছি।

রাতে খাওনি কাল?

কোথায় খেলাম?

সুন্দরী থাকার জন্যে স্লিমিং করছো।

সুন্দরী! আমার বয়সে আমাদের মা-মাসীরা রীতিমত গিন্নিবান্নি।

জানো রাণী—সুন্দর থাকার চেষ্টাও অপরাধ।

কেন?

সেটা তো একটা চেষ্টা। তাতে ভালোবাসা থাকে না।

তোমার কথা আমি বুঝি না। চিঠিটা ডাকে দিও কিন্তু।

দেবো। কি রান্না হয়েছে?

এখুনি খাবে? এই তো খেলে।

আমার যে খিদে পায় ভীষণ।

তাহলে চান করে এসো। রবি কলেজে যাবে। তার সঙ্গে খেতে বসবে।

না। আমি এখন চান করবো না। এখুনি খেতে দাও।

তুমি আর খেয়ো না তো। একটু হাঁটাচলা করো। কি ওজন হয়েছে তোমার জানো?

আমি ওজন নেওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

মুখ টিপে হেসে ফেললো রাণী। আমাকে তো নিতে হয়।

খুব ভারি আমি?

দম আটকে আসে। মনে হয়—মরে যাবো এক্ষুণি।

স্বামীর ভালো স্বাস্থ্য তোমার পছন্দ নয় রাণী?

স্বাস্থ্যটা একটু কমাও। আয়নায় দেখেছো একবার? ভ্রূ বলতে আর কিছু নেই তোমার। গালে এত মাংস হয় কি করে?

গ্ল্যাণ্ডের গোলমাল। আমি কি করবো রাণী? ঠিক তখুনি মনে মনে দিলীপ বলছিল, তোমার মনে একটুও দয়া নেই রাণী। একটা লোক যদি মোটা হয়ে যায়—অমনি সে বাতিল! এ কেমন যুক্তি? আমার ভেতরটা কি হয়ে আছে

আমি জানি না। হার্ট, লিভার, কিডনি—সবই নাকি আপনা-আপনি একটু করে জখম হয়ে চলেছে। তা মানুষ তো একদিন একদম চলে যায়। আমাদের বিয়ের সময় আমি কেমন দেখতে ছিলাম বলো। সেকথা বলো একবার। সে ব্যাপারে তো একদম চুপ।

গ্ল্যাণ্ডের ওষুধটা খাচ্ছো কি?

যে-মন নিয়ে চিঠি হাতে দিলীপ রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল—সে মন তার আর এখন নেই। প্রায় অন্যমনস্ক হতে হতে দিলীপ বললো, খাচ্ছি তো। কাজ হয় কোথায়?

হবে। হরমোন ট্যাবলেট তো। আজ খেলে চোদ্দদিন পরে অ্যাকশন শুরু হয়। খেয়ে যেতে থাকো।

সারাজীবন খেয়ে যাবো?

দরকার হলে খাবে। আর ওজনটা একটু কমাও, দোহাই। তোমার সবই হ্যাখোন-খিদে। ঘি, মাংস, আলু, চিনি, সিগারেট—একদম তো ছাড়োনি তুমি!

তাহলে কি নিয়ে থাকবো?

রুটি খাও। সবজি খাও।

সব সময় মনে হবে তাহলে—না-খেয়ে আছি। কোন কাজ করতে পারবো না। শুধু খাবার-দাবারের কথা মনের মধ্যে ভাসে তখন।

তাহলে আজ থেকে তোমায় আলাদা করে দিচ্ছি। বসবার ঘরে খাবে, শোবে, থাকবে। আমি তোমার সঙ্গে থাকছি না। সারারাত নাক ডাকে। আমায় জেগে কাটাতে হয়।

নাকও ডাকে আমার?

ডাকে মানে? রীতিমত ডাকে!

তোমার?

আমাদের ওসব নেই।

তোমরা সুন্দরী। তোমাদের নাক ডাকে না। তোমরা স্লিম। আর আমরা খারাপ—

হ্যাঁ—বলেই হেসে ফেলল রাণী। তারপর প্লেট নিয়ে দিলীপের জন্যে ঝোলের মাছ তুলে নিয়ে এগোলো। তখনই ক্লাস টেনের কুটু দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। বাথরুম থেকে রবি বেরোতে বেরোতে বলল, শুনলাম অফিস যাচ্ছো না তুমি। তাহলে গাড়িটা আমায় দাও না আজ।

কুটু খাটের ওপর বইপত্তর ঢেলে দিয়ে বলল, তিনটেয় আমার নাচের রিহার্সেল

আছে। তখন আমায় একটু পৌঁছে দিস দাদা।

পারবো না। তখন আমি গাড়ি নিয়ে আসবো কি করে?

কুটু ফোড়ন কাটলো, ছাখ, বাবা গাড়ি ছায় কি না। গাড়ি তো বাবার প্রাণ। ওকে নিয়েই সারাদিন থাকে।

গাড়ি থাকলে যত্ন করতে হয় না?

তুমি একটু বেশি যত্ন করো বাবা। তুমি গাড়ি-অন্ত প্রাণ।

তা তোমরা দু'জনে এখন বড় হয়ে গিয়ে দূরে দূরে থাকো। আমি আর কার সঙ্গে মিশবো?

এবারে রাণী এগিয়ে এলো। গাড়ি তো তুমিই চড়ো। ওরা পায় কোথায়? কয়েক পা হাঁটলে পারো। শরীর ভালো থাকে তাহলে।

শরীরের কথা একটু কমাবে! বলতে গিয়ে দিলীপ টের পেল, সে একরকম খিঁচিয়েই উঠেছে। তাই মুখখানা মোলায়েম করে আস্তে বলল, আমার জন্যে সস্তার একটা পুরনো গাড়ি খুঁজছি। অল্প তেল খাবে। নিজে চালিয়ে ঘুরে বেড়াবো। অফিসে যাবো। সনাতন তোমাদের জন্যে এ গাড়িটা চালাবে। টুকটাক ঘুরে ফিরে বাজারহাট করতে পারবে—

এই ফ্ল্যাটের ইন্সটলমেণ্ট। সংসার। দু-দুটো গাড়ির খরচ। চালাতে পারবে?

রাণীর এ কথায় দিলীপ সরাসরি তার মুখের দিকে তাকালো। আমরা কোত্থেকে জীবন শুরু করেছিলাম রাণী? মনে আছে?

রাণী চোখ নামালো। এসব কথা উঠলে এখন অনেক কথা বলতে হয়। মানুষ তো থেমে থাকে না। মানুষ বদলায়। তার মনের এ কথা সাজিয়ে বলতে পারলো না রাণী। তার মনে আছে সে আর দিলীপ মাস গেলে একসময় দু'শো টাকারও মুখ দেখেনি। দু'জনকে এক সময় ভয়ংকর খাটতে হয়েছিল। ভয়ংকর সব ঝুঁকি নিয়েছিল দিলীপ। টেনশন। যে-টেনশন মানুষের গ্ল্যাণ্ডের সিক্রিশন বাড়িয়ে দেয়—কিংবা একদম বন্ধ করে দেয়—যে-জন্যে এখন আর কয়েক কিলো ওজন বাডলেই দিলীপ বসু পুরো এক কুইণ্টাল হয়ে যেতে পারে। তাই কি আজ আমার স্বামীর চোখের ওপর দুই ভ্রূ মুছে যাবার জোগাড়? যাগ্‌গিয়ে! আমার চিঠিখানা এখন ডাকে দেওয়া দরকার।

রবির মনে হচ্ছিল, আমার বাবা আজ খানিক আগে কেন ব্যালকনির বাইরে শরীর অতটা ঝুঁকিয়ে দিয়েছিল, বুঝতে পারছি না। যদি পড়ে যেত! ভাগ্যিস ঠিক তখনি আমি এসে পড়েছিলাম।

কুটুর মনে পড়ছিল, মণিপুরী মাইভি নাচের তালটি খুব সুন্দর।

দিলীপ গাড়ির কথা তুলে নিজেই তার মাথার ভেতরে এক আশ্চর্য জগতে চলে গিয়েছিল। এখন তার মাথার ভেতরে পার্ক স্ট্রীটের মোড়। চারদিক থেকে নানারকমের গাড়ির চারটি লাইন। ট্রাফিক পুলিশ চারদিকে যাওয়া-আসা বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সারি সারি গাড়ি। দিলীপকে শুধু বেছে নিতে হবে— মরিস অকসফোর্ড, বেনো, পিজো, রেপিয়ার, অস্টিন কেমব্রিজ, অস্টিন ফোর্টিন, টুরার উলফলি, জাগুয়ার, হার্ড টরটয়োটা, ডাটসন, ভোকসওয়াগেন। একদম শেষে ফোর্ড কোর্টিনার, পেছনে পর পর একখানা মাজদা আর ঘিয়ে রঙের কারমান ঘিয়া। সবকিছু অনেকক্ষণের মধ্যে ভুলে যাবার আগে দিলীপ বুঝলো চার চাকার ওপর এ এক আশ্চর্য রহস্যময় আবিষ্কার। একটা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ঘোড়া। অত্যন্ত বাধ্য। নম্র। এর পিঠে চড়ে নানাভাবে পৃথিবীর ওপর দিয়ে চলে যাওয়া যায়। অল্প তেল খায়, এমন একখানা সস্তার গাড়ি ছাড়াও আমার আরও দু'টি জিনিস দরকার। দিলীপ জানে ও দু'টো জিনিস তার অনেকদিনের সাধ। এক নম্বর : দমকলের একটি ঘণ্টা। দু নম্বর : চিড়িয়াখানার হরিণের একটা বাচ্চা। ঘণ্টাটা সস্তার গাড়ির সামনে বেঁধে নেব। হর্নের বদলে। হরিণের বাচ্চাটা থাকবে পেছনের সিটে।

ফার্ন রোড, একডালিয়া, সুইনহো স্ট্রীট এসব রাস্তায় খানিক বাদে বাদে একটা করে কানাগলি থাকে। যেখানে গাড়ি ঢুকে ব্যাক করার জায়গা পায় না। সরু গলির দু ধারে মুখোমুখি জানলা ব্যালকনি লাগানো সব বাড়ি। এ ফ্ল্যাটে হাত থেকে বাটি পড়ে গেলে মনে হবে ও ফ্ল্যাটের মেঝেতে বুঝি পড়ে ঝনঝন করে আওয়াজ উঠলো।

এখন রাত আটটা। সারা এলাকা জুড়ে লোডশেডিং। গলিতে, সারি সারি বাড়িগুলোর দু-একটা বারান্দায়, এখানে সেখানে খানিক খানিক করে শহুরে জ্যোৎস্না। এরকমই আধো অন্ধকারে এক বারান্দায় একজন লোক দাঁড়ানো। উল্টো দিকের বাড়ির জানলার মুখোমুখি। পুরো শীতকাল বলে এমনিতেই এখন কোথাও পাখা চলে না। গলির আটখানা বাড়ি থেকে ট্রানজিস্টরে একই সঙ্গে যাত্রার বিজ্ঞাপন। পাশাপাশি দুটো বাড়ি থেকে দুটো কুকুর সমান তালে ঘেউ ঘেউ করে যাচ্ছে।

আজ স্বাতীর তিনটে ফেসিয়াল ছিল। সুনন্দকে স্কুলে পৌঁছে দিয়েই নাগাড়ে সাড়ে চার ঘণ্টা তাকে সাজাতে হয়েছে। তবে সুবিধে এই—তিন মহিলাই এক জায়গায় ছিল। পি জি.-র নার্স হসটেল—লিটন কোয়ার্টারে। তিনজন সিনিয়র

নার্স এক সঙ্গে কোথায় যাবে যেন। বোধহয় কোন নার্স বিয়ে করে চলে যাচ্ছে একদম। তার বিয়েতে সেজেগুজে গেল বোধহয়। তিন সখীতে। তার হাতে মুখ সাজিয়ে। শুকনো খড়খড়ে তিনখানা মুখ। গরম জল, ব্লিচ করার জিনিস-পত্র—সবই লেগেছে। তিনখানা মুখ হস্টেলের বিছানায় পাশাপাশি শুইয়ে নিয়ে স্বাতী ওদের সাজিয়েছে। প্রতি মুখ কনসেসনে পনর টাকা করে। বোঝেন তো —আমরা নার্স—আপনার কথা শুনে আমরাই খবর দিলাম আপনাকে। একটু সস্তা রেটে করে দিন দিদি। গরম জলটল সব রেডি করে রাখবো আমরা। অনেকদিন পরে মুখ, চোখ, ভ্রূ, মনোমত সাজিয়ে দিয়ে বেশ তৃপ্তি পেয়েছে স্বাতী। তাই একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল স্কুলে পৌঁছুতে। শীতের বিকেল। ছেলেটা কাঁদো কাঁদো হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মন ভালো করতে রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে হোল। তবে না এখন ছেলের মুখে হাসি।

লরির ভাড়া যোগাড়ের ঠিকে কাজটা কোনদিন থাকে—কোনদিন যায়—তার ঠিক কি। তাই স্বাতী চেম্বার করে বসার আগেই একটু-আধটু প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছে। এরাই পরে তার পাকা ক্লায়েণ্ট হয়ে যাবে।

কে? কে ওখানে? চমকে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিল স্বাতী। উল্টোদিকের বাড়ির জানলা থেকে সেই মেয়েটি জ্যোৎস্নার চৌকো মাড়িয়ে অন্ধকারে মিশে গেল। সাঁৎ করে।

বাবা? তুমি অন্ধকারে, ভয় করে না তোমার?

সুনন্দর এ-কথায় সুধীর ফিরে দাঁড়ালো। তোদের জন্যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এ মা, তুমি প্যাণ্টের বোতাম আটকাতে ভুলে গ্যাছো বাবা। একটাও আটকাওনি।

অন্ধকারে সুধীরের মুখ এবার দেখা গেল না। সে এখন ব্যালকনিতে পড়ে থাকা অসাড় জ্যোৎস্নাটুকুর বাইরে চলে এসেছে।

ছিঃ! ছিঃ!! এ-ও আমায় দেখতে হোল—বলে স্বাতী সুনন্দকে ধরলো, ঘরে আয় খোকা। আমরা এখুনি চলে যাবো।

দাঁড়াও। তুমি যেখানে ইচ্ছে যাও। নন্দ যাবে না। তুমি অস্পৃশ্য।

তিন

রেললাইন, কয়লাখনি এসব কাছাকাছি সময়ের জিনিস। কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে তার একটা হিসেব নিশ্চয় আছে। কিন্তু খনির দরকারেই রেললাইন বসেছিল, একথা ঠিক। কালীপাহাড়ি, বরাকর, চিরকুণ্ডা, নিরসা, এরকম কত নামের জায়গা যে কালো রঙের ধুলো মেখে আকাশের নিচে পড়ে আছে—বড় বড় খাদ, মালগাড়ির শান্টিং ইয়ার্ড, খনির ভেতরে বেন্টিং নেমে গেছে—তার চাকা লাগানো মাস্তুল মাঠের ভেতর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

কালীপাহাড়িতে ট্রেন থামলো না। লাইনের নিচে প্রায় আধ মাইল জুড়ে শুকনো কোন নদীর খাদ। ট্রেনের আওয়াজ সে-গর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু' পাশের জঙ্গলে বসে থাকা পাখিদের চমকে আকাশে উড়িয়ে দিল। খানিকক্ষণের জন্যে।

মীরা ভৌমিক জানলা থেকে মুখ ভেতরে নিয়ে এল। আমার আর ভালো লাগছে না। কখন নামবো আমরা?

ভালো লাগছে না কথাটা এত আদুরে গলায় বলে উঠলো, যার দরুন কামরার সবাই তার দিকে না তাকিয়ে পারলো না। কেউ লুকিয়ে তাকালো। কেউ সরাসরি।

কামরা মানে রিজার্ভ করা কুপ। সবাই মানে দিলীপ বসু, দিলীপের কলিগ এবং পুরনো বন্ধু ঋষিরাজ রায়। মীরার স্বামী অনন্ত ভৌমিক—একটা ন্যাশনালাইজড্‌ ব্যাংকের অ্যাডভান্স ডিপার্টমেন্টের কন্ট্রোলার। এরা সবাই কাছাকাছি বয়সের। তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ আর কি। আরও তিনজন পুরুষলোক। যেমন—

(১) গোকুল দত্ত। বয়স সাতান্ন। দাবি করেন একান্ন। দশাসই শরীর। সেলফ্‌-মেড মানুষ। কলকাতার বুকে তিনটি মোষের খাটাল আছে। দুটি স্ত্রী। একটি অফিসিয়াল। অন্যটি বেআইনী। কিন্তু পুরোপুরি বউয়ের মর্যাদা তিনি তাকে দিয়েছেন। গোকুল দিলদার লোক। জীবন শুরু করেছিলেন—একটিমাত্র দিশী গাই নিয়ে। যার দুধ হোত এ-বেলা একপো ও-বেলা একপো। সারাদিনে মোট আধ সের। আগেকার হিসেবে। এখন দিনে দুধ হয় বারো কুইন্টাল। কেজি সাড়ে তিন টাকা। মোষের দুধ তো বটের আঠা।

(২) অনাথ চক্রবর্তী। বয়স আটান্ন। বেঁটেখাটো মানুষটি একদা কোন কোম্পানির পিলার ছিলেন। এখনো চিফ কন্ট্রোলার অব অ্যাকাউন্টস্‌। জীবন

শুরু করেছিলেন ডেসপ্যাচ ক্লার্ক হিসেবে। কোল কোম্পানিকে এই মানুষটি বড় করে তুলেছিলেন। গত সতেরো-আঠারো বছর প্রায় রিটায়ারমেণ্টে আছেন। ইনিই দিলীপ আর ঋষিকে প্রায় রাস্তা থেকে ধরে এনে কোল কোম্পানির টেবিলে বসিয়ে দিয়েছিলেন। ওদের দুজনের তিনি আজও অনাথদা। এই অনাথদা দুপুরের দিকে নিয়মিত জিন খেয়ে আলুথালু হন। আবার অফিসে অন্য কারও চেম্বারের কার্পেটের চেয়ে তাঁর নিজের ঘরের কার্পেট ছোট হলে তিনদিন অফিসেই আসেন না। নিজের বাবা খুব অল্প বয়সে নিরুদ্দেশ হন বলে একবার আন্দাজে শ্রাদ্ধ করেছিলেন। তিনি পৃথিবীতে যাকে সবচেয়ে ভালবাসেন—সেও সেই অনাথ চক্রবর্তী। ছেলে-মেয়েদের বিয়ে-থা হয়ে গেছে। স্ত্রী গত আজ তিন বছর।

(৩) সাধন গুপ্ত। বয়স তেষট্টি। রিটায়ারের তিন বছর পরেও এক্সটেনশনে ডিরেক্টর বোর্ডের মেম্বার। চল্লিশ বছর আগে কোল কোম্পানির গোড়ার দিককার সব খাদানে ছত্তিশগড়, জগদলপুর থেকে কোল-কাটার ধরে ধরে আনতেন। গ্যাং-খালাসী, সার্ভেয়ার, কোল-কাটার—সবকিছু এককালে জড়ো করে আনতেন। এখনো ওসব এলাকা তাঁর নখদর্পণে। কোথাও কোন বড় রকমের লেবার আনরেস্ট হলে কোম্পানি সবার আগে সাধন গুপ্তর পরামর্শ নেবেন। কি করে স্ট্রাইক ভাঙতে হয়, কি করে স্ট্রাইক বাধাতে হয়—দুটো জিনিসই সাধন জানেন। লোকটি এখনো মদের টেবিলে গুনগুন করে খেউড় গেয়ে তার চেয়ে তিরিশ বছরের ছোট নাবালকদের নিষুতি রাত অব্দি চাঙ্গা করে রাখেন। কারও বিরুদ্ধে রাগও পুষে রাখতে পারেন তিরিশ বছর।

অর্থাৎ সারা কামরায় এখন ছ'জন পুরুষ। শেষের এই তিনজনও প্রায় সম-বয়সী। এখন বেলা তিনটে। জানুয়ারির শেষ। গোকুল আদর করে বলল, এই মীরা, এদিকে আয়! এই ঠাণ্ডা বিয়ারটা খেয়ে ছাখ্।

ঋষি আদর করে পিঠে হাত রাখলো মীরার। খিদে পেয়েছে? খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়—

ইংরাজিতে যাকে বলে অ্যাডভান্সেস্—বাংলায় প্রশ্রয়—তার খানিকটা খানি-কটা মীরা সব সময়েই লোক বুঝে দিয়ে থাকে। এই প্রশ্রয়ের সাক্ষী হতেও স্বামী হিসেবে অনন্তর মন্দ লাগে না। যেমন—

ঋষি মীরার পিঠে হাত দিয়ে কাছে টেনে বলল, কি হয়েছে? অ্যাঁ?

মীরা আদরে তখন আইসক্রিম। সে বলল, উ-হু-হু—আঁ। আমার কিছু ভালো লাগছে না।

তখন ঋষি সবার সামনে পিঠে হাত আরও ভারি করে রাখলো। মীরাকে

প্রবলভাবে আকর্ষণ করলো। সবারই সামনে মীরার কানে, গলায়, খোঁপায় নাক, ঠোঁট বুলিয়ে উ উ শব্দ করে নিঃশ্বাস টানলো।

মীরার স্বামী অনন্ত ভৌমিক তখন একগাল হেসে বউকে বলল, অমন করছো কেন? ঋষির মনটাও খারাপ করে দিলে। ও বেচারী কি করেছে?

মীরা তখনো মুখে উ আ নানারকম শব্দ করে খারাপ লাগা বোঝাচ্ছিল। মানে অস্বস্তি। ক্লান্তি। রিজার্ভ কামরায় খাবারের কোন অভাব নেই। আইস-বক্সে বিয়ার এসেছে মীরার জন্যে। অন্যদের জন্যে রাম। অনাথের ড্রাই জিন। ভাজা মাংসের শুকনো প্যাকেট। মাছের চপ। সবই অনন্তর বাড়ি থেকে এসেছে।

দিলীপ প্রায় বিশ-পঁচিশ বছর চেনে অনন্তকে। তুই বলে ডাকে। অনন্ত ডাকে দিলীপদা। সেই সুবাদে দিলীপ মীরাকেও তুই বলে। দিলীপ আর কি করবে, স্বামী সমেত এতজন পুরুষ সাক্ষী রেখে! মীরা যেখানে আদুরে গলায় আদর কাড়ছে—সেখানে তো সে দাদা হিসাবে আসরে যোগ দিতে পারে না। তাই আন্তরিকভাবে বলল, মীরা, তোর শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো? আর তো দু'টো স্টেশন মোটে।

না দিলীপদা! বলে মীরা তার খোঁপা ঠিক করতে লাগলো। আজ সকালের ট্রেনে সবার সঙ্গে বেরোবে বলে কালই সন্ধ্যেবেলা মাথার চুল কার্ল করিয়েছে। খোঁপা বাঁধিয়েছে। সারারাত অনন্তকে কাছাকাছি ঘেঁষতে দেয়নি। এক কাতে শুয়ে মাথাটি ঠিক রাখতে হয়েছে। চুলের একটি কাঁটাও এপাশ-ওপাশ হয়নি। ছেলে হস্টেলে। মেয়ে ছোট। শাশুড়ির সঙ্গে শোয়।

গোকুল দত্তর হাত থেকে বিয়ারের বোতলটা দিলীপ মীরার হাতে তুলে দিল। ও বোতলে মুখ দিয়েই খেতে ভালবাসে। গোকুলের ব্যবসার লগ্নী অনন্তর ব্যাংক থেকে আসে। সেই সুবাদে ওদের দেখাশুনো অনেকদিনের। অনন্ত আর ঋষি মীরার বাপের বাড়ির সুবাদে লতাপাতায় কি একরকমের আত্মীয়। এরকম নানা-ভাবে, নানা আড্ডার ভেতর দিয়ে আজ এই ছয়জন পুরুষ রিজার্ভ-করা কামরায় একসঙ্গে উঠেছে। সঙ্গে একজন মোটে মেয়ে-লোক। খাবারদাবার। ড্রিংকস্।

স্টেশনে নামতেই উঁচু প্ল্যাটফর্ম থেকে দেখা গেল—তিন-তিনখানা গাড়ি দাঁড়ানো। একজন লোক গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অনন্তকে লক্ষ্য করে হাত নাড়লো।

গোকুল দত্ত বলে উঠলো, ওই তো এসে গেছে। এবার তোদের গেস্টহাউসে চলে যাবো সিধে। সব বলা আছে তো অনন্ত?

বলেছি তো। মুর্গিটা যদি না পায় তাহলেই তো কেলেংকারি।

ওসব কথায় না গিয়ে মীরা পরিষ্কার বলল, না গোকুলদা—এ গেস্টহাউস ব্যাংকের নয়। আমার দাদাশ্বশুরের।

অনন্ত গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, না। আমার বাবার ঠাকুর্দা বানিয়েছিলেন। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ফ্রেণ্ড ছিলেন। একসঙ্গে কয়লাখনি করেছিলেন। ব্যাংক করেছিলেন।

ব্যাংকেই তো আমার দাদাশ্বশুর কাজ করতেন।

অনন্ত মীরাকে থামিয়ে বলল, জানো ঋষি—আমার ঠাকুর্দা দেবেন ঠাকুরের গ্যারাণ্টর হয়েছিলেন একবার। বেঙ্গল ব্যাংকের এজেণ্ট ছিলেন তো।

সেই সুবাদেই তোমরা ব্যাংকে? অনাথ চক্রবর্তীর এ-কথায় অনন্ত ভৌমিক যেন উৎসাহ পেয়ে গেল। দু'ধারে জঙ্গল। তার ভেতর দিয়ে প্লেন রাস্তায় গাড়ি ছুটছে। ঋষি মীরাকে পেছনের দরজায় প্রায় ঠেসে ধরে বসেছে। শীতের সন্ধ্যেবেলা। হেডলাইটের আলো জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সূর্যটা খসে পড়লো। ঋষি মীরার হাঁটুতে হাত রাখলো তখন। সে হাত এখন মীরা চেপে ধরলো। পাছে আরও এগোয়।

ব্যাংক আর খনি—দুটো জিনিসই আমাদের রক্তে।

সামনের সিট থেকে অনাথ চক্রবর্তী বলল, শ্বেত কণিকা, লোহিত কণিকা!

তার পাশ থেকে এই প্রথম সাধন গুপ্ত কথা বললো, আমি অনন্তর ঠাকুর্দাকে দেখেছি আমার প্রথম যৌবনে। ওদের গুষ্টির নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি। ওর ঠাকুর্দাই আমায় ছত্রিশগড় জগদলপুরের খবর দেন। সুলুকসন্ধান জানান।

অনাথ বলল, সাধনবাবু, আপনি ওর ঠাকুর্দার খনিতে [illegible]ছেন তাহলে?

তখন ওঁরা তো আর খনিতে নেই। ব্যাংকে। বেঙ্গল ব্যাংক নাম বদলে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক। তাতে ডালহৌসি ব্রাঞ্চের এজেণ্ট। আমরা কোল কোম্পানি থেকে টাকা জমা দিতে যেতাম। টাকা তুলতে যেতাম। সেখানেই ভৌমিক সাহেব আমাদের নানা কথা বলতেন। ওঁর তখন বেশ বয়স। কি রকম বয়সে মারা গেছেন অনন্ত?

বিরানব্বই। ওঁর কোলে আমার একখানা ছবি আছে। খনি এজেন্সি হাউসের হাতে তুলে দিয়ে অল্প বয়সে ব্যাংকে এসে ঢোকেন। তাও ওই সেঞ্চুরিতে। আপনি দেখেছেন পাকা বুড়োটি।

দু' ধারে অন্ধকার। গাড়ির ভেতরের কাচ পর্যন্ত ঠাণ্ডা। পেছনের দরজার ওদিকে মীরা। এদিকে দিলীপ। মাঝখানে ঋষি আর অনন্ত পাশাপাশি ঠাসাঠাসি। চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে সারাদিনে নানা সাইজের ফাঁকা বোতল লাইনের

পাশে ফেলতে ফেলতে আসতে হয়েছে ওদের। এমন নির্জন দিয়ে ট্রেন-লাইন— কাল সকালে সেগুলো কুড়িয়ে নেবারও কোন লোক নেই আশেপাশে। এখন গাড়ির ভেতর সাতজনের নিঃশ্বাসে নানা রকমের গন্ধ। বাইরে অন্ধকারে খাদ, খনি, রেললাইন, পিচ-রাস্তা। অনন্ত যেভাবে ড্রাইভারের কাছে মাইথনের খোঁজ-খবর নিচ্ছিল—তাতে বোঝাই যায়—এ গাড়ি তার ব্যাংকের মাইথন ব্রাঞ্চের।

সাধন গুপ্ত গুনগুন করে গান ধরলো—আমার কানের পাশা হারিয়ে গেল ওই ঘোলা জলে—। পাশা আর ঘোলা কথা দুটোয় গ্রাম দেশের গানের ঝোঁক।

ঠিক তখনই ঋষি একটা দুলসুদ্ধ মীরার ডান কানটা আলগোছে কামড়ালো। দাঁত না বসিয়ে। বাইটিং উইদাউট টিথ্।

যাকে বলে কপট রাগ—তাও দেখাতে পারলো না মীরা। কে দেখবে? গাড়ির ভেতরটা যে এখন একদম অন্ধকার। তাছাড়া ঋষির হাতখানা তার শরীরের নানা জায়গায় পুরনো ব্যথাটা এই খানিকক্ষণ হোল ফের চারিয়ে দিয়েছে। সূর্যটা ডুবে যাওয়ার পর থেকেই।

চেতলা বেকারির ওভেন থেকে প্রথম লটে তিনশো সত্তরখানা পাঁউরুটি বেরিয়ে এল। ওয়ালক্লকে রাত তিনটে বেজে দশ। সেই অবস্থাতেই প্যাকিং শুরু হয়ে গেল। প্রত্যেকখানা এক পাউণ্ডের। বাইরে বারো-চোদ্দখানা সাইকেল ভ্যান দাঁড়িয়ে। এতক্ষণে নিশ্চয় গোকুল দত্তর খাটালেও দুধ দোয়া শুরু হয়ে গিয়েছে।

এরও ঘণ্টাখানেক বাদে ১৭।২ সবজিবাগান লেনে কিরীটী পালিতের ঘুম ভেঙে গেল। সামনেই আদি গঙ্গা। তাতে ভাসন্ত খড়ের নৌকোয় নিভু-নিভু হেরিকেন। নিচু গলায় কথাবার্তা। অন্যদিন মসজিদ থেকে ভেসে আসা আজানের সুরে জেগে ওঠে কিরীটী। আজ যেন কী রকম অন্য সুরে ঘুম ছুটে গেল তার।

বিছানায় উঠে বসে ভালো করে শুনলো। নিচের ঘরে বসে বৃন্দাবন পালিত গাইছেন। তার বাবা। টপ্পার ভাঙা টুকরো শেষ রাতের আদি গঙ্গায় পড়ে যেন সুরসুদ্ধ থমকে থেমে থাকছে। বাবা অনেকদিন পরে গাইছেন। গলা খুলে।

আমার কাঁচা পীরিত পাড়ার লোকে পাকতে দিলো না—

পরিষ্কার গলা। এই বয়সে এতকাল পরে এমন গান? দোতলার দরজা খুলে ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়ালো কিরীটী। উল্টোদিকে আলিপুর, রাজা সন্তোষ রোড, মোমিনপুর রোডের নতুন নতুন দশ-বারো তলা ম্যাচবাকসো বাড়িগুলো খাড়া ভূত হয়ে দাঁড়ানো। বাবার ঘরে আবার অনেক কাল পরে শেষ রাতে আলো জ্বলছে।

ঘরে ফিরে এসে কিরীটী পালিত নিজেকেই বলল, বাবা আর বেশি দিন বাঁচবেন না।

এ-বাড়িটা সম্ভবত হওয়া ইস্তক পালিত পরিবারের দখলে। আগেকার ঘেঁস-চুনের গাঁথুনি। মোটা দেওয়াল বলে শীতকালে গরম। গরমে ঠাণ্ডা। কাছাকাছি ধানকলগুলো বিশ-পঁচিশ বছর বন্ধ। তাদের চিমনিগুলো আজও দু-একটা দাঁড়ানো। বাবা এই আদি গঙ্গার ঘাটে বসে বরিশালের চালের নৌকো থেকে বালাম চাল কিনেছেন। বাবা এ গান আজ গাইলেন কেন?

এ বাড়ির জায়গা ঠাকুর্দার আমলে খাজনা দিয়ে বন্দোবস্ত করা। এখন সরকারের ঘরে জমা দেয় কিরীটী। কাঠের পোল থাকতে এদিকটা ফাঁকা ছিল। সি. এম. ডি. এ. সিমেন্টের ব্রিজ বানিয়ে চেতলাকে পুরোদস্তুর কলকাতা করে দিল। মুরারি স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলন বসলে দোতলায় বসে দিব্যি গান শুনতে পাওয়া যেত। কোন শব্দ ছিল না। এখন গানের ভেতর মোটর গাড়ি হর্ন দিয়ে চলে যায়।

দোতলার এই ঘরখানা কিরীটী আজকাল একা ভোগ করে। খুকীকে নিয়ে ওর মা শোয় পাশের ঘরে। দক্ষিণের বড় ঘরে থাকে টাপু, বাচ্চু আর খোকন। বউমা মারা যাওয়ার পর খোকন এখন তার ঠাকুর্দার সঙ্গে শোয়। কিরীটীর পয়লা নাতিটি মাতৃহীন হবার পর থেকে মামাবাড়িতে।

দরজার খিল খোলার আওয়াজ হোল। বাবা বেরুচ্ছেন -মর্নিং ওয়াকে।

নিচে নেমে গেল কিরীটী। মেজো ছেলে খোকনের বউটি মারা যাওয়ার পর থেকেই সে নিজে থেকে তার ঠাকুর্দার দেখাশোনার ভার নিয়েছে। অবশ্য বৃন্দাবন পালিতকে খুব একটা দেখতে শুনতে হতো না। খটখটে বুড়ো দিব্যি হেঁটে চলে বেড়ায়। আজ ভোর ভোর কেন টপ্পা ধরলেন?

ভেজানো দরজায় খিল তুলে দিল কিরীটী। ঠাকুর্দার বিছানার পাশেই নাতি শুয়ে। কিরীটির পঁচিশ বছর বয়সের মেজো ছেলে। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। মেয়েটি বাচ্চা হওয়ার পরই হাসপাতালে মারা গেল। চাদরটা টেনে ছেলের বুক অব্দি ঢেকে দিল কিরীটী।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে কিরীটীর মনে পড়লো—কোথায় যেন বিবেকানন্দ লিখেছেন -এই পৃথিবী পুষ্পাচ্ছাদিত গলিত শব। এর যাত্রাপথ সূতিকাগার হইতে শ্মশান। আরও যেন কি লিখেছিলেন স্বামীজি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্যাচের মাথার ল্যাণ্ডিংয়ে যেটুকু জায়গা—তার পাশে দেওয়াল কেটে বড় কুলুঙ্গি। সেখানে কেটেলড্রাম। বিগড্রাম। গিটার রাখবার খাপ। টাপু আর বাচ্চু বাজায়। খোকন ওদিকে যায়নি। সে চাকরি করে। তাস

খেলে। হিন্দি ছবি দেখে। রাত হলে দাদুর পাশে এসে শুয়ে পড়ে। এ বাড়িতে খোকন ছাড়া আর যে চাকরি করে—সে হোল কিরীটী নিজে। জি. পি. ও -তে।

এইবার খুকী উঠবে। টেন থাউজ্যাণ্ড মিটার দৌড়বে বলে ভোর রাত থেকে প্র্যাকটিস করছে। সি. এম. ডি. এ. ব্রিজ থেকে নিউ রোড অব্দি। অন্তত দশবার যাবে আসবে। দৌড়ে দৌড়ে। তবে না দম তৈরি হবে। মালবিকা পালিত যেদিন ভিকট্রি স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে প্রাইজ নেবে—সেদিন ? সেদিন কি অবস্থা হয় কিরীটীর ? নিজেই নিজের কাছে লজ্জা পেয়ে—অথচ কেউ সাক্ষী নেই—কিরীটী পালিত বিড় বিড় করে বলে উঠলো, আমার বুক কাঁপে। খুকী যখন দৌড়োয়—যখন বেঙ্গল টিমের হয়ে লং জাম্প দেয়—তখন আমার বুক কাঁপে—যদি না পারে! যদি একটুর জন্যে বাদ পড়ে যায়!

বাথরুম সেরে কিরীটী যখন তার টেবিলে—তখন প্রায় পাঁচটা। সে খুব আর্লি-রাইজার। এই সময়টায় কিরীটী আজকাল তার লেখালেখির কাজকর্ম সারে। টেবিলের ওপরে ফটোস্ট্যাণ্ডে নিজেরই আগেকার ছবি। মাথায় চুল ছিল আরও বেশি। তার বাবা—এই বৃন্দাবন পালিত অল্প বয়সে তার বিয়ে দিয়েছিল। বিশ বছর বয়সে। শখের প্রাণ তখন। বিয়েতে যৌতুক নিলেন বৃন্দাবন এক-জোড়া ভালো বাঁয়া তবলা। নিজে গাইতেন—সঙ্গে ছেলেকে বাজাতে বলতেন।

বাবার থেকেই আমার—আমার ছেলেদের সুর-জ্ঞান, তাল-জ্ঞান। এক সময় আমি আর কেরামুতাল্লা একসঙ্গে বাজাতাম। তারপর তো অথৈ সংসার। নিজের মনের ভেতরে এইভাবেই কথা বলে যাচ্ছিল কিরীটী। সিনিয়র ইন্সপেকটর, ফরেন্ রেজিস্ট্রেশন, জি. পি. ও.।

টেবিলে এখন তার বসতেই হবে। নইলে নয়। বড় টেবিলের বড় ড্রয়ারে কাগজপত্তর। সুপরিম কোর্টের অ্যাড্ভোকেট গোপাল দাশ তাকে শুধু বলে দিয়েছে—আপনার কেসটা বাংলায় লিখে আনুন। ওটা পড়ে নিয়ে ওর থেকেই কেস সাজাবো। ওটাই হবে আমাদের সওয়াল যুক্তি। কিছু বাদ দেবেন না। সব লিখবেন। যখনই কোন আইডিয়া আসবে লিখে ফেলবেন।

গোপাল দাশ দশ বছর হলো দিল্লি গেছে। চেতলার লোক।

কিরীটী পালিত পরিষ্কার করে লিখতে শুরু করলো।

পরম শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি মহাশয়,
ভারত প্রজাতন্ত্র,
রাষ্ট্রপতিভবন,
নয়াদিল্লি।

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,—

মাঝে একখানা হিলম্যান সুপারমিনক্স পেয়েছিল দিলীপ। গাড়িখানা তাকে দেখায় বরেন দত্ত। সিকসটিফাইভ মডেলের। চার সিলিণ্ডারের। অনেকটা ট্রায়াম্প গাড়ির মত। সামনের বনেটের সঙ্গে খুব মিল। কিন্তু ডবল ডবল হেডলাইট একদম টয়েটোর মত বসানো। সনাতন রেড রোডে পড়েই বলল, গিয়ার দিতে হয় না দাদাবাবু। এ যে আপনা-আপনি পাল্টানো।

একটু গাড্ডায় ফেলে ত্থাখো তো—শক-অ্যাবজরবার কেমন ?

বলতে না বলতেই গর্ত। সত্তর কিলোমিটারে স্পিডের কাঁটা। টেরও পাওয়া গেল না।

এক চক্কর ঘুরে আসতেই বরেন দত্ত নিজে বলল, কেমন ? পছন্দ তো আপনার ? কিন্তু এ-গাড়ি আপনাকে এখন দেব না। কারবোরেটর পাল্টাতে হবে। অরিজিন্যালটা চেয়ে বোম্বেতে চিঠি লিখেছি। আসুন বোসসাহেব—একটু চা খাবেন—

চা খাওয়ার কোন দরকার ছিল না তার। তবু বরেন দত্তর সঙ্গে তার বাড়ির ভেতরে গেল। সন্ধ্যে হয় হয়। পুরো একতলাটাই প্রায় অফিস। গাড়ি কেনাবেচার কাগজপত্তর রেডি করে দিতে তিনজন লোক টাইপ করছে। টেলিফোন ধরছে। যখনই দিলীপ এসেছে—ওদের ব্যস্ত দেখেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে দিলীপ বলল, দিনে ক'খানা গাড়ি বিক্রি হয় ?

বিক্রি করা তো কঠিন নয়। কঠিন কাজ হোল ভাল গাড়ি খুঁজে বের করা।

আগাগোড়া মোজাইক করা তেতলা বাড়ি। চওড়া সিঁড়ি। বড় বড় ল্যাণ্ডিং। বসার ঘর।

তবু ? দিনে সাধারণত ক'খানা হয় ?

আগে তো এক সময় একদিনে পাঁচখানা গাড়িও বিক্রি করেছি।

এখন ?

কোন ঠিক নেই বোসসাহেব।

দিলীপ বুঝলো, পরিষ্কার কোন জবাব বরেন দত্ত দেবেন না। কেনই বা দেবেন ? কে কার ব্যবসার সিক্রেট ভাঙে ! দিনে দুখানা গাড়ি বিক্রি হওয়া আশ্চর্য নয়। দিনে দু হাজার টাকা কমিশন থাকাও কঠিন নয়। না হলে—এত লোকজন, কারখানা, খরচখরচা চলবে কি করে।

দোতলায় উঠতে উঠতে দিলীপ বলল, ও গাড়ির শক অ্যাবজরবার তো

একজোড়া ছশো টাকা। তাও তো বাজারে পাওয়া যাবে না।

এ কি আপনার দিশী গাড়ি! তিন বছরের আগে শক্ অ্যাবজরবারে হাত দিতে হবে না।

সিঁড়ি ভাঙছিল আর ভাবছিল দিলীপ। চার চাকার কী মায়া! নিঃশব্দে ছুটে যাচ্ছে। বাঁক নিচ্ছে। ব্যাক করছে। স্টার্ট নিলে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার ফ্রিডম। এর নাম গাড়ি। ছুটতে ছুটতে অন্ধকার হয়ে এলে হেডলাইট সামনেটা দিন করে দেবে। বৃষ্টি, ঠাণ্ডা—সবকিছু তখন কাঁচের বাইরে।

বাড়িটা দেখুন বোসসাহেব।

তা ঘুরে ঘুরে দেখলো দিলীপ। ঠাকুরঘর। বালক কৃষ্ণের গলায় চৌষট্টি ভরির সোনার হার। দোতলা তেতলায় আলাদা আলাদা বৈঠকখানা। এক এক ছেলের জন্যে এক একখানা ঘর।

একটা বড় ঘরে এসে বরেন দত্ত হাঁক দিল। কই গেলে গো?

এই তো আমি।

দিলীপ চমকে গিয়ে মেঝেতে তাকালো। একজন গিন্নিবান্নি মানুষ কার্পেটের ওপর বসে। পায়ের কাছে একখানা থান ইট।

বরেন দত্ত আলাপ করিয়ে দিতে মহিলা বললেন, আপনারা বসুন গে। চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার আবার পায়ের ব্যথাটা বাড়লো।

কি দিচ্ছেন ওখানে?

চুলোয় এই থান ইটখানা গরম করে ইটের সেক দিয়ে একটু কমেছে মনে হয়—

ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বরেন দত্ত বললো, পুরনো সায়টিকার ব্যথা—এত বড বাড়িতে একা থাকে। এবারে বড় ছেলে দিয়ে বউ আনবো। বয়স তো হোল আমার। কি বলেন? অনেক খেটেছি। দুজনে রেস্ট নেব।

চায়ের টেবিলে বসে বরেন দত্ত আবার শুরু করল ডলি ছ'আনা রেটে কাজ করতাম। ক্লিনার থেকে ড্রাইভার হলাম একদিন। তারপর সাহস করে একখানা উলসলে বেচে দেখলাম। বজবজে এক পাটকলের মেমসায়েবকে। সে চল্লিশ বছর আগে, পঁচিশ টাকা কমিশন—আজকের আড়াই হাজার টাকা। কি বলুন বোসসাহেব!

দিলীপ জানে—বরেন দত্ত এসব গল্প বলেই ইমপ্রেস করে লোকজনকে। তাকে অভিভূত করার আর দরকার নেই বরেনের। এমনিতেই এই কৃতকর্মা মানুষটিকে দেখে সে চমৎকৃত। জোর করে গল্পগাছা চালিয়ে বরেন যে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করছে—এটাই তার মজার লাগে। কোথায় যেন একটা ছেলেমানুষী আছে।

একই গল্প তিন মাস আগে তাকে আরেকবার বলেছিল বরেন। এসব কথা গত গরমকালের।

এখন শীতের রাত আটটা সাড়ে আটটা হবে। চারদিকে ঘোরানো বারান্দার একদিক থেকে মুর্গির মাংস রান্নার গন্ধ আসছিল।

তিনটে বাথরুমেই গরম জল ছিল। পালা করে গা ধুয়ে নিতে মোট সাতজনের বেশি সময় লাগলো না। মীরা মাথা ভেজায়নি। গলা অব্দি গরম জলের ভেতর পুরো দশ মিনিট শুয়ে ছিল বাথটাবে।

এখন বসার ঘরে সবাই ফ্রেশ। ফায়ার প্লেসে আগুন জালিয়ে দিয়ে গেছে। অনন্ত বলল, জানো গোকুলদা—এই ফায়ার প্লেসে আমার ঠাকুর্দার বাবাও আগুন পুইয়েছেন।

মীরা বলল, তারপর বলবে—দ্বারকানাথ ঠাকুর এই ফায়ার প্লেস থেকেই গড়গড়ায় তামাক ধরাতেন। রাখো তোমার গল্প। যত্রতত্র বাড়ি করে রেখে গেছেন—কোথাও কোন আয় নেই। বিয়ের আগে ভেবেছিলাম—না জানি কত বড়লোক! গাদা গাদা বাড়ি—সবই প্রায় দেখলাম। যেখানে যাও—সেখানে একখানা বাড়ি।

তা আমি কি করবো? বাপ-ঠাকুর্দা যদি করে রেখে যান। অনন্ত একটু থেমে নিরুপায়ের ভঙ্গীতে বলল, জানো দিলীপদা—এ গেস্টহাউসটার কথা আমি জানতামই না। ঠাকুর্দার ভৌমিক ট্রাস্ট থেকে এটা চলে আছে। আমাদের বেনারস আর রাঁচির বাড়ি তো ইটালিয়ান মার্বেলের—

থামো বলছি। নিষ্কর্মারা অমন বাড়ির গল্প করে—

ওকথা বলছিস কেন মীরা? তোর স্বামী তো বড় চাকরি করে।

তাতে আমাদের চলে দিলীপদা? ছেলে হস্টেলে। তার খরচ আছে। আমার গাড়ির পেট্রল, ড্রাইভার আছে। সে খরচা অবিশ্যি ট্রাস্ট দেয়।

তাহলে দুঃখুটা কিসের তোর?

ও একটু খাটুক দিলীপদা। আমি যে অনেক টাকা চাই তা নয়। কিন্তু অফিসের বাবুটি হয়ে দশটা পাঁচটা করুক—এ আমার একদম ভালো লাগে না।

ধমক খাচ্ছিল অনন্ত। সুন্দরী বউয়ের ধমক। বোধ হয় ভালোই লাগছিল ওর।

ঋষি বলল, সে জন্যেই তো আজ আমরা এখানে এসেছি। গোকুলদা আছেন

এখানে। সাধনদা, অনাথদাও আছেন এখানে। আমরা একটা খনি খুলতে চাই। যখন সব খনি সরকারের হাতে—তখন আমরা খনি খুলতে এসেছি। লোকে শুনে হাসবে।

সাধন গুপ্ত আর অনাথ চক্রবর্তী একই সঙ্গে বলে উঠলো, আমাদের বাদ দাও ভাই। এ বয়সে নতুন করে কিছু আর পারবো না। আমরা তোমাদের সঙ্গী হয়ে বেড়াতে এসেছি। এই তো গোকুল রয়েছে। ও আমাদের প্রতিনিধি।

গোকুল দত্ত অ্যাটাচি থেকে সেণ্টের শিশি রুমালে উপুড় করলো। আমরা সবাই আছি দিলীপ। আমরাস বাই আছি ঋসি। একটা দিশী গাই নিয়ে শুরু করেছিলাম। আশি টাকা দামের অর্ডিনারি দিশী গাই। এখন আমার চুয়ান্নটা অ্যানিমাল—

সবাই জানে, গোকুল দত্ত তার মোষগুলোকে কখনো মোষ বলবে না। তারা ওর ভাষায় অ্যানিমাল।

যদি সব যায়—তাতেই বা কি আসে যায়? আশি টাকায় শুরু। আশি টাকাও যদি না থাকে—দত্তজ্ বাটার, ঘি অ্যাণ্ড পনির যদি না থাকে -এই গোকুল দত্ত তো থাকবে। তখন আবার নতুন করে শুরু করা যাবে।

নিরিবিলিতে কাজের কথা বলবো বলে কলকাতা থেকে আমরা এতদূরে চলে এলাম—এখানে এখন কোন প্রকারের দাম্পত্য কলহ চলবে না। সাময়িক ট্রুস।

দিলীপ বলল, আমরা কোল কোম্পানির লোক হয়ে যদি খনি খুলি তাহলে কি অফিস আমাদের ভালো চোখে দেখবে?

গোকুল দত্ত বলল, সবই তো মীরা ভৌমিকের নামে। ওর দাদাশ্বশুরের জায়গা একশো বছরের লিজ ফুরোতে এখনো ত্রিশ বছর বাকি।

অনন্ত মাঝখানে বলে উঠলো, একত্রিশ বছর। ঠাকুর্দা খনির ব্যবসা ছাড়বার মুখে মুখে এই সেঞ্চুরির গোড়ায় এ-জায়গাটা লিজ নিয়েছিলেন। কাল দিনের আলোয় দেখা যাবে। বছর তিনেক কোল কাটিংয়ের পর খনি বন্ধ করে দিয়ে র‍্যাংকে চলে আসেন। হয়তো ইচ্ছে ছিল—পরে আবার খনিটা খুলবেন। কিন্তু তা আর হয়নি। এদিকে আর আসার সময় পাননি। ট্রাস্টের কাগজপত্তর ঘেঁটে আমি এসব জেনেছি। হয়তো ইস্পাত কারখানার দরকারী ভালো কয়লাও পেতে পারি আমরা এখানে। সবই ভাগ্যের ব্যাপার—

গোকুল দত্ত উৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলো। হু-র-রে। তাহলে তো মার দিয়া কেল্লা-—

মীরা সবাইকে চুপসে দিয়ে বলল, খনি খুলতে দেবে গভর্মেণ্ট?

ঋষি বলল, প্রাইভেট খোলা যেতে পারে—যদি রোজকার টনেজ হাজার না ছাড়িয়ে যায়। আরও কিসব শর্ত আছে।

সাধন গুপ্ত বলল, আমি লোকজন যোগাড় করে দেব ঘুরে ঘুরে।

অনাথ চক্রবর্তী জিনের বোতলটায় সাবধানে ছিপি আঁটলো। কস্টিং কষে দেব আমি। যাতে কম খরচে হয়। একজনকে তো লেটার অব ইনটেন্ট নিয়ে দিল্লি যেতে হবে।

অনন্ত বলল, জায়গাটাই আমার শেয়ার। কোন নগদ টাকা দিতে পারবো না।

গোকুল বলল, তোর ব্যাংক অ্যাডভ্যান্স করবে।

তা হয় না গোকুলদা। কয়লার প্রাইভেট সেকটরে ব্যাংক টাকা দেবে না। এখন আমরা চা-বাগানে কনসেনট্রেট করছি। আর টাকা তো অনেক লাগবে—

ঋষি বলল, আমি বিশ হাজার দেব।

অনাথ চক্রবর্তী হেসে ফেললো, খনির ব্যাপার, হাজারে হয় না ঋষি। একটা শূন্য বেশি লাগে।

গোকুল বললো, আমি এক লাখ টাকা দেব। তুই দিলীপ?

আমি কি পারবো তা জানি না। তবে একটা কথা মাথায় আসছে। আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে লোন ফ্লোট করতে পারি—

অনাথ চক্রবর্তী বলল, না, তা পারি না। দিল্লি পারমিশন দেবে না।

দিলীপ একটু থামলো। আচ্ছা। আমরা যদি প্রাইভেটলি শেয়ার বিক্রি করি?

সে তো সব সময়েই পারা যায়। কিন্তু কে আমাদের শেয়ার বিশ্বাস করে কিনবে?

যদি আমি বিশ্বাস করাতে পারি?

মীরা যে-চোখে দিলীপের মুখে তাকালো তাকে বলে প্রশংসা মিশ্রিত বিস্ময়। এই দৃষ্টি মীরা কখনো তার চোখে ফেলেনি বলে ঋষিরাজ রায়ের নিজেকে কেমন দুঃখী নিরাশ্রয় মনে হতে লাগলো।

চার

শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি মহাশয়,

আমারই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া ভারতীয় রেল এখন বছরে একশত কোটি টাকা লাভ করিতেছে। অথচ সেই বাবদে আমার কোন স্বীকৃতি নাই। আমি আর্থিক স্বীকৃতির কথা বলিতেছি। আপনার অবগতির জন্য আমি আদ্যোপান্ত সব

এই চিঠিতে জানাইলাম।

রেল দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ দেওয়া দূরে থাকুক—এক সময় দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি চাপিয়া যাওয়ার চেষ্টা হইত—এমন বহু গল্প প্রচলিত আছে। এদেশে সরকারী শাসন পুরোপুরি কায়েম হওয়ার পর জনমতের চাপে একটি জিনিস স্থির হইয়া গিয়াছে—যে, রেল দুর্ঘটনায় হতাহতের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ তিন বছর আগেও যথোপযুক্ত ছিল না। বিষয়টি লইয়া আমি দীর্ঘদিন ধরিয়া ভাবিয়া আসিতেছি। এই প্রসঙ্গে আমি প্রায় দশ বছর ধরিয়া নানা পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়াছি। দৈনিকের সম্পাদক সমীপে দীর্ঘ চিঠি লিখিয়াছি। তাহার অনেকগুলিই প্রকাশিত হইয়াছে।

মানুষের জীবনের দাম অল্প নহে। টাকায় তাহার পরিমাপ হইবার নয়। তবু ইহজগতে টাকা দিয়াই টিকিতে হয়। আমিই প্রথম প্রস্তাব করি—ভারতীয় রেলের প্রতি কুড়ি কিলোমিটারে যাত্রী-পিছু টিকিটে আরও পাঁচ পয়সা করিয়া নেওয়া হউক। এই অতিরিক্ত পাঁচটি পয়সার তহবিল হইতে দুর্ঘটনাজনিত প্রতিটি মৃত্যুর জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা করিয়া দেওয়া যাইবে।

আমার এই প্রস্তাবসম্বলিত থিসিসটি আমি আজ হইতে পাচ বছর আগে পেটেণ্ট করাই। তারপর রেল কর্তৃপক্ষ আমাকে চিঠি লিখিয়া আমার পেটেণ্ট-কৃত থিসিসের কপি চাহিয়া পাঠান। কিছুদিন পরে পত্রপত্রিকায় দেখিলাম—আমার পেটেণ্ট অনুযায়ী রেল কর্তৃপক্ষ সবই প্রবর্তন করিয়াছেন।

যাত্রী-পিছু প্রতি কুড়ি কিলোমিটারে অতিরিক্ত পাঁচটি পয়সা দুর্ঘটনাজনিত বীমা বাবদে লইয়া রেল কর্তৃপক্ষ উদ্বৃত্ত অর্থের এক বিপুল ভাণ্ডার গড়িয়া তুলিয়াছেন। সারা বছরের ক্ষতিপূরণ দিয়াও রেলের হাতে একশত কোটি টাকা থাকিয়া যাইতেছে।

এমন একটি সুষ্ঠু অর্থকরী ব্যবস্থার সবটুকু কৃতিত্ব ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ নিজেই অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিয়া বসিয়া আছেন। কাগজে-কলমে কোথাও আমাকে এক বিন্দুও স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। অথচ আমারই পেটেণ্ট-কৃত থিসিস অনুযায়ী সবকিছু হইয়াছে।

ভারতীয় নাগরিক হিসাবে আমিই প্রথম হিসাব করিয়া দেখাই যে প্রতি কুড়ি কিলোমিটারে মাত্র পাঁচটি করিয়া পয়সা অতিরিক্ত দিলে রেল কর্তৃপক্ষ, যাত্রী ও দুর্ঘটনায় পতিত সবারই সর্বদিক বজায় থাকে এবং স্বার্থ রক্ষা হয়।

এখন আমি বলিতে চাই, এমন একটি সফল ও সার্থক প্রকল্পের পরিণতি যখন উদ্বৃত্তের অঙ্কে একশত কোটি টাকা—তাহা হইলে ওই সাফল্যের খুব কম করিয়াও

এক শতাংশ কৃতিত্ব আমার প্রাপ্য—টাকার অঙ্কে যাহার পরিমাণ অতি সামান্য—মাত্র এক কোটি টাকা। আশা করি আপনি যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষকে আদেশ দিয়া আমাকে আমার প্রাপ্য স্বীকৃতি অর্থাৎ টাকার অঙ্কে অন্তত এক কোটি টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন। নমস্কারান্তে—
—সবজিবাগান লেন
কলিকাতা—

ইতি
বিনীত
আপনার একান্ত বিশ্বস্ত
কিরীটী পালিত

চিঠিখানা ভাঁজ করে কিরীটী পালিত খামে ভরলো। তারপর মুখ এঁটে ঠিকানা লিখলো।

পরম শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপতি মহাশয়,
ভারত প্রজাতন্ত্র,
রাষ্ট্রপতি ভবন,
নয়াদিল্লি।

পিনকোড্ জানা ছিল। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়লো না কিরীটীর। রাষ্ট্রপতির আবার পিনকোড্ লাগে নাকি! শুনেছে গান্ধীজির নাকি ঠিকানাই লাগতো না। চিঠি লিখে খামের ওপর অনেকে ঠিকানা দিতো মহাত্মা গান্ধী, ইণ্ডিয়া। চিঠি ঠিক পৌঁছে যেতো। ড্রয়ারেই সব কিছু থাকে কিরীটীর। খাম, স্ট্যাম্প, স্টিকার, ভালো ব্যাংক পেপার। নানারকম আইডিয়া তার মাথায় কাজ করে। সে সব লিখে রাখতে হয়। র‍্যাফ থেকে ফেয়ার করে কিরীটী। অফিস থেকে ফিরে অনেক রাত অব্দি টেবিলে বসে সে এসব করে। কাগজ ফুরোলে, স্ট্যাম্প ফুরোলে কোথায় যাবে অসময়ে? সবই হাতের কাছে তৈরি রাখতে হয় তার।

ক'দিন আগে 'রাস্তায় কার অধিকার?' কিংবা 'পথ তুমি কার?' এবিষয়ে একটি নতুন চিন্তা তার মাথায় খেলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে লিখে রেখেছে। বিছানায় শুয়ে রাত দশটা নাগাদ প্রথম আইডিয়াটা মাথায় এসেছিল কিরীটীর। সারা রাত জেগে লিখে রেখেছে। খুকীর মা একবার খেতে ডেকেছিল। টেবিল ছেড়ে ওঠেনি কিরীটী। পাছে ভুলে যায়।

রাস্তা আসলে মানুষের। চলার জন্যেই রাস্তা। কিন্তু সে রাস্তা দখল করেছে গাড়ি। রাস্তা থেকে মানুষ ফুটপাথে নির্বাসিত। সে রাস্তায় এখন এক একজন

লোক গাড়ি চড়ে যায়—সামনে পিছনে দু'পাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে গাড়ি যায়। অথচ রাস্তা তো মানুষেরই।

যুক্তি হিসেবে বলা হয়—গাড়ি তো ট্যাক্স দেয়। কিন্তু মানুষ সারা বছরে নানাভাবে তার চেয়ে অনেক বেশি ট্যাক্স দেয়। সিগারেট, রেডিও, কাপড়—সর্বত্র ট্যাক্স। মানুষের অধিকারই তো সবার আগে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার।

একতলায় টাপু বঙ্গো বাজাচ্ছিল। নিচে নেমে এলো কিরীটী। সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংয়ে এসে বুঝলো—টাপু সব ভুলে গিয়ে বাজিয়ে চলেছে। এখন ওকে ডেকে লাভ নেই। ও সুরকার হতে চায়। সব রকম বাজনা শিখেছে টাপু। বাচ্চু বলছিল—বড়দা রিদিমকে পিছে তুলে তারের বাজনাকে নিচু সুরে নিয়ে আসে।

খোকন নিশ্চয় পাড়ার মোড়ে। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কিরীটী লক্ষ্য করেছে—খোকন সব সময় ফূর্তিতে আছে। কখনো চায়ের দোকানের সামনে বেঞ্চে বসে তাস পেটায়। কখনো রাস্তা জুড়ে ক্রিকেট খেলে। কে বলবে—ওর বউ মারা গেছে! একটি বাচ্চা আছে!

সেই তুলনায় টাপু বা বাচ্চু দু'জনই গম্ভীর। খুকী তো রীতিমত নিয়ম মেনে চলে। মেয়ে অ্যাথেলেটদের বেঙ্গল টিমে রয়েছে। আলু খায় না। পাছে ওজন বেড়ে যায়। মেয়েটা এবার বাড়ি ফিরবে। এতক্ষণে চেতলার ফুটপাথ ধরে জজ-কোর্ট রোড, নিউ রোড, জিরাত পুল পেরিয়ে ময়দান হয়ে তার ফেরার টাইম হোল। দশ হাজার মিটারের ট্র্যাক রেস প্র্যাকটিস চালাচ্ছে আজ তিন মাস।

কলঘরে ঢুকে কিরীটীর মনে পড়লো, বাবা তো এখনো ফেরেননি! মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে কোনদিন তো এত দেরি করেন না!

ভি: আই. পি. রোডের কাছে আগেকার কবরখানার মাঠে দেশলাই কারখানার প্লাই শুকোতে দেওয়া হয়েছে। এগুলো চিরে কাঠি হবে। পর পর কয়েকখানা বাঁশের ঘর। একদম রেললাইন অব্দি চলে গেছে। রেললাইনের গা ধরে আবার অন্য রকমের ঝুপড়ি। দুটি মেয়ে গাছকোমর করে শাড়ি পরে চলন্ত ট্রেনের লোক-জনকে হাত নাড়ছিল। লাইনের ঢালু জমিতে দাঁড়িয়ে। শহরতলীর ট্রেন গুম-গুম করে ব্রিজ পেরুলো। ট্রেনের জানলায় বসে একটি ছেলে বাঁশের ঘরগুলোর একখানার ওপর ঝোলানো সাইনবোর্ডের কথাগুলো পড়ছিল।—

সরস্বতী মূলী বাঁশ কার্যালয়

সেই ঘরখানার সামনেই একটা ভ্যান এসে দাঁড়ালো। বেলা চারটে হবে। শীত

চলে গিয়ে নতুন গরম পড়তে শুরু করেছে। আমের টুকরি বোঝাই একটা সাইকেল ভ্যান গেল। চার-পাঁচজনের সঙ্গে সুধীরও গাড়ি থেকে নামলো। বাঁশ নিয়ে কার্যালয়! কী কাজ রে বাবা! এসব বলছিল সুধীর আর ক্যামেরা ঠিক করছিল।

ভ্যানের গায়ে 'ফিল্মস্ ডিভিশন' লেখা দেখে পথের অনেকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সেই ভিড়ে রেললাইনের মেয়ে দুটি এসে মিশে গেল।

ততক্ষণে সরস্বতী মুলী বাঁশ কার্যালয়ের প্রোপ্রাইটর, অন্য সব লোক বেরিয়ে এসেছে। কুটীর শিল্প দফতরের লেখা কমেন্টারি। দশ মিনিটের ডকুমেণ্টারি। স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী শর্ট ডিভিশন করা রয়েছে। কয়েকটা ছবি তুলে সুধীর মুখার্জি কার্যালয়ের লোকজনকে বলল, ক্যামেরার দিকে তাকাবেন না। যে যার কাজে লেগে যান।

সামান্য কাজ। কিন্তু ভিড়ের জন্যে, লোকজনকে বোঝাতে গিয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেল। রেললাইনের গায়ে ঝুপড়ির সেই মেয়ে দুটি সুধীরের নির্দেশে খানিকক্ষণ ক্যামেরার সামনে দিয়ে হাঁটাচলা করলো। হাসিমুখে। টিপছাপ দিয়ে ওরা এক একজন 'ছ' টাকা করে পেল।

এতক্ষণ আর্ক ল্যাম্পের চোখ ঝলসানো আলোয় প্রায় দিন বানিয়ে ছবি উঠছিল। সে আলো নিভিয়ে চাই গলায় একজন বলল, প্যাক আপ—

সন্ধ্যের অন্ধকারে ভ্যান চলে গেল ধুলো উড়িয়ে ওরা দু'জন তখন সুধীরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল রেললাইনের দিকে। এক একখানা হাত এক একজনের হাতে! ওদের নিজেদের এক একজনের কোমরে তখন নগদ ছয় ছয় [illegible]।

সুধীর দাঁড়িয়ে পড়লো। কিছু একটা খেয়ে নিলে হো?

খাবারের কথায় মেয়ে দুটি দাঁড়িয়ে পড়লো। আরেকখান লোকাল ট্রেন তখন আলো জ্বালিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

পার্ক স্ট্রীটের ওপর 'রোড সাইড ইন-এ' সবে টেবিলগুলো সাজানো হয়েছে। কড়কড়ে ইস্ত্রির শাদা রুমালগুলো গ্লাসের ভেতর গোঁজা। এখনো খদ্দের আসতে ঘণ্টা খানেক বাকি। মাতাসিকি কোঠারি রোড্ সাইড থেকে বেরিয়ে পার্ক হোটেলের ফুটপাথ ধরলো।

কাঁচের শো-কেসে কার্পেট, ক্যামেরা, রুপোর ফিলিগ্রি, মোপেড্। রাস্তার দু'ধারে ঝকঝক করছে সব দোকান। টেক্সটাইল, কসমেটিকস্, প্রভিসন, ফার্নিচার,

কনফেকসনারি। ডান হাতে আরেকটু এগোলেই এসপ্লানেড্। অনেকটা টোকিওর গিঞ্জা পাড়া। সেখানেও চারদিকে ঝলমলে দোকানপাট। স্টিরিও, হাতঘড়ি, রেকর্ডপ্লেয়ার, ক্যামেরা, হীরের আঙটির সাজানো শো-কেস। পাসপোর্ট দেখিয়ে টুরিস্টরা দশ পারসেন্ট কমিশানে জিনিসপত্র কিনছে।

ওখানেই আমাদের রেস্তোরাঁ। মহারাজা রেস্তোরাঁ। টোকিওর বড় বড় কোম্পানির একজিকিউটিভরা ওখানেই লাঞ্চ সারে। বান্ধবী নিয়ে সন্ধ্যেবেলা অনেকে বসে। ইণ্ডিয়ান চিকেন তন্দুরি, পালম-পনির, মটর-পনির হামেশা খাচ্ছে সবাই। ভীষণ ডিমাণ্ড। আগে থেকে বলে না রাখলে সিট পাওয়া যাবে না।

কাউণ্টারে বসে আছে আমার বাবা। এই রোড সাইডেরই প্রোপ্রাইটর। শিবশঙ্কর কোঠারি। তার পাশে বসে আছে আমার মা মাৎসুসীতা কোঠারি। আমি ওদের বড় ছেলে। আমি আমাদের ইণ্ডিয়ান ইণ্টারেস্টগুলো দেখাশুনো করি। আমার মা বুদ্ধিস্ট। বাবা হিন্দু। সিণ্টো মতে আমার দীক্ষা হয়েছে। হয়তো হিন্দুমতে এই ক্যালকাটাতেই আমার বিয়ে হবে।

রোড সাইডের একজন রেগুলার কাস্টমারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে বলল, হ্যালো—

মাৎসিকি কোঠারি একটু অন্যমনস্ক ছিল। সে ফুটপাথে দাড়িয়ে গেল। সামান্য ঝুঁকে পড়ে জাপানীতে বলে বসলো—আরি গাতো গোজাইমাস্তে—

লোকটি ততক্ষণে চলে গেছে। ফুটপাথে অফিসটাইমের ভিড়। পার্ক স্ট্রিট নানারঙের অ্যামবাসাডর-ফিয়াটে তখন রঙীন।

এই সময় টোকিওর রাস্তায় ঘণ্টায় সত্তর কিলোমিটারের নিচে চালালে জরিমানা দিতে হয়। আরও অনেক কিছু মাৎসিকির একসঙ্গে মনে পড়ে গেল। কদিন হোল—বাচ্চু, বিশ্বনাথ—ওরা কেউ আসছে না।

খুকী—ওরফে মালবিকা পালিত ভিক্টোরিয়াকে ডাইনে রেখে দৌড়োচ্ছিল। অন্ধকার ফিকে হয়ে রোদ উঠবো উঠবো। স্বামীজির মূর্তির সামনে সরকারী আলো জ্বলছে। তার পাশেই রেনট্রি গাছের সারা গা জুড়ে কুয়াশার মোড়ক।

মালবিকা তার টাইমিং আরও ক্লোজ করে আনতে চায়। ওজন কমাতে হবে এখনো তিন পাউণ্ড। তার পালস্ বিট মেপে দেখা হয়েছে। দৌড়ে দৌড়ে পায়ের কাফ মাস্‌ল্, উরু—সব শক্ত হয়ে গেছে। টাইট শর্টস পরে খুকী এখন একটা ছুটন্ত স্প্রিং।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পুরো চত্বরটা তিন পাক দিতে পারলে তবে না মনে হয় দৌড়োলাম। নইলে শুধু বাক তাল্লা। ওর কোন দাম নেই। পয়লা পাক দিয়ে এসে অরবিন্দর নতুন স্ট্যাচুর সামনে ছেলেটাকে দেখতে পেল মালবিকা। হাড় হাড় চেহারা। একটা শাদা পুলওভার গায়ে দাঁড়ানো। ট্রাউজারের পায়ের দিকে ভেজা। অনেক শুকনো ঘাসের মাথা লেপটে রয়েছে। মাথায় অনেক চুল। কেমন আনাড়ির মত দাঁড়িয়ে। দৌড়োচ্ছিল বলে মালবিকা থেমে দাঁড়িয়ে দেখতে পায়নি। থার্ড রাউণ্ডে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে ছেলেটার সামনে দাঁড়ালো মালবিকা।

রবি বুঝতে পারলো না—আপনি না তুমি বলবে। দেখেছে মেয়েটিকে। তাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ভোর রাতে দৌড়তে দৌড়তে যায়। বাঙালী না গুজরাটি—কে জানে।

মালবিকা হাঁপাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই এক জায়গাতেই দাড়িয়ে দৌড়চ্ছিল—যাকে বলে জগিং—তাই করতে করতে বলল, কি চাই?

রবি এবার পেছনে ফিরে তাকালো। কাকে বলছে? না, পেছনে তো কেউ নেই। মেয়েটা তাহলে বাঙালী। আমি তো কিছু চাইনি।

মালবিকা তখনো দুই পা তুলে দুই উরু দাপিয়ে এক জায়গাতেই লাফাচ্ছিল। ভোর ছটাও বাজেনি। শীতের ভাব ভোরের আলোয়। পা দাপিয়ে বডি টেম্পারেচার ঠিক রাখছিল মালবিকা। এবার থামলো। প্যাট প্যাট করে আমায় দেখছিলে, লজ্জা করে না!—বলে প্রায় চড় তুলে এগিয়ে এলো।

রবি রুখে দাঁড়াবে কি! সে ঘাবড়ে গিয়েছিল। এটা পাবলিক জায়গা। যে ইচ্ছে দাঁড়াতে পারে—

সত্যি করে বলো, আমায় দেখছিলে কি না?

চোখের দেখার ভিতর কেউ পড়ে গেলে কি করবো? একটা মোটরগাড়ি—কিংবা ষাঁড়ও যদি সামনে দিয়ে চলে যায়—দেখতে হবে না? ইচ্ছে না থাকলেও—চোখ খোলা রাখলে দেখতেই হবে। আমি তো অন্ধ নই—

কে বলেছে অন্ধ? সেয়ানা!

রবিও ছাড়লো না। রোজ রাত থাকতে ধিঙ্গির মত দৌড়ে বেড়াও—ইচ্ছে না থাকলেও দেখতে হবে, পাবলিক প্লেসে দৌড়লে চোখে পড়বেই তো—

সে জন্যেই ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে আমার দৌড় দেখতে এসেছো। বলেই মালবিকা রবির বাঁ হাতখানা ধরলো।

রবি এতক্ষণ অরবিন্দর স্ট্যাচুর ঘেরা জায়গার রেলিং-এ বাঁ হাতখানা রেখে

দাঁড়িয়েছিল। হাতের আঙুলসুদ্ধ কব্জিখানা রেলিংঘেরা ভেতরের দিকে ঝোলানো ছিল। এখানে এক সময় রানী ভিক্টোরিয়ার স্ট্যাচু থাকতো। তাকে সরিয়ে নেওয়ার পরেও চারদিকে আগেকার বাঘ সিংহের মূর্তিগুলো রয়ে গেছে।

রীতিমত জোর মালবিকার হাতে। এমন সেয়ানা ছেলেদের সে ভালো করেই জানে। এখুনি ছেলেটিকে কাঁদিয়ে ছাড়তে পারে সে। হাতখানা পেছনের দিকে পেঁচিয়ে ধরলেই ব্যথায় ককিয়ে উঠবে।

রবির বাঁ হাতখানা কিন্তু কিছুতেই সরাতে পারলো না মালবিকা। তাতে তার জেদ আরও বেড়ে গেল। এই ছেলেটাই তাহলে এক-একদিন তার পেছন পেছন সাইকেল চালিয়ে এসে শিস দেয়। বাছাধনকে আজ পছন্দ মত জায়গায় পেয়েছে মালবিকা।

মালবিকার ঝাঁকুনিতে এবার রবির হাত বেরিয়ে এলো। রেলিংয়ের বাইরে।

দূরে ময়দানের ভেতর এই সময় নানা দৃশ্য। কেউ হাঁটছে। কেউ দৌড়োচ্ছে। নতুন বসানো অরবিন্দ স্ট্যাচুর পায়ের কাছেও দেখবার মত জিনিস হয়ে গেল। শর্টস্ পরা একটা মেয়ের টানে একটা ছেলে পড়তে পড়তে টাল সামলাচ্ছে।

নেহাত ভোরবেলা। কাছে পিঠে কেউ একটা ছিল না। নয়তো ভিড় হয়ে যেত। সারা কলকাতায় তামাশা দেখতে কোথাও লোকের অভাব হয় না কোন দিন।

রবি পড়তে পড়তে স্ট্যাচু সার্কেলের বাঁধানো চাতালে ঝুঁকে পড়ে টাল সামলালো। তার বাঁ হাতের দিকে তাকিয়ে মালবিকা সামলাতে পারলো না। রক্ত!

রবির মুখে ভোরবেলার ঘুম। খানিকটা বুনো ভাব এসে সে মুখ অনেকটা হাঁ করে দিল। এক ঝটকায় মালবিকার মনে পড়ে গেল, মাঠ ঘুরে ঘুরে ছেলেটার ট্রাউজারের পায়া দুটো শিশিরে ভিজে গেছে। তাতে শুকনো ঘাসের মাথা।

মালবিকা খানিকটা পিছিয়ে গেল। তখন রবির হাতে রক্ত মাখানো ভোজালি-খানা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। এবার রবি মালবিকার চোখ থেকে চোখ নামিয়ে আনলো। পুলিশ প্যারেডের ঘোড়াগুলো ময়দানের কুয়াশার ভেতর ঠিক এই সময়টায়—প্রত্যেকে এক-একটি পেইন্টিং।

রবির গলায় চাপা ধমক। চুপ, চ্যাঁচালেই মেরে ফেলবো।

কোল ইণ্ডিয়ায় বসে বসে একটা জিনিস হয়েছে দিলীপ বসুর। কোন্

ইণ্ডাষ্ট্রিতে কে আছে—তা এখন তার নখদর্পণে। কোন্ ইণ্ডাষ্ট্রির না কয়লা লাগে! ফার্টিলাইজার, টেক্সস্টাইল, স্টিল, কাস্ট আয়রন—সর্বত্র। কিন্তু, মুস্কিল হয়েছে—কারও নাম মনে থাকে না তার। মনে থাকে না টেলিফোন নম্বর।

তাই একটা ডাইরি বানাতে হয়েছে তাকে। যেমন—

এ লেখা পাতা খুললে পাওয়া যাবে—আগরওয়ালা কেশব—পাশে লেখা—ফার্টিলাইজার। তারপর বাড়ি আর অফিসের ফোন নম্বর। দুটো ঠিকানা।

এমনিভাবে—

বি লেখা পাতা খুললে পাওয়া যাবে—বাজোরিয়া দীনেশ—পাশে লেখা—টেক্সটাইল।

এই ক'দিনে এমনি করে একটা ডাইরির পাতা ভরে গেছে।

এখন ডালহৌসিতে বেলা তিনটের রোদ্দুর। মোড়ে মোড়ে ডাবওয়ালারা বসে আছে। দিলীপ ডালহৌসির সবচেয়ে বড় সওদাগরী অফিসের রিসেপশনে বসে। প্রায় দশ কাঠা মত জায়গা এয়াবকণ্ডিশন করে একদম সিমলা। সেখানে ব্রিটিশ আমলের কায়দায় গুটি দশেক অ্যাংলো মেয়ে। দিলীপের মনে হচ্ছিল—ওদের সবাইকেই সে অলিভার টুইস্ট সিনেমাটায় দেখেছে। ওরা কেউ টেলিফোন অপারেটর। কেউ স্টেনো। কেউবা সেক্রেটাবি। কে কি আলাদা করে বোঝা যায় না।

প্রায় দেড়শো বছরের ওপর পুরনো কোম্পানি। চা, মদ, ফার্টিলাইজার ময়দা, কাপড়—সবকিছুর ব্যবসা আছে। গ্রাউণ্ড ফ্লোরে ঢুকতেই পেতলের ওপর খোদাই করা রানী ভিক্টোরিয়ার সনদ সদরে ঝোলানো। এরা কয়লার খদ্দের।

রিসেপশনের উল্টো দিকেই সারি সারি ডিরেকটরদের ঘর। একদম কোণে চেয়ারম্যানের দরজায় কোন নাম লেখা নেই। এটাই ফ্যাশন। সে দরজা খুলে স্বয়ং চেয়ারম্যান উঠে এলেন। আপনি কেন কার্ড দিয়ে আসবেন। আসুন—

এ আন্তরিকতার কারণ দিলীপ ভালোই জানে। লামডিং বাগানে এরা সারা বছর কয়েক হাজার টন কয়লা নেয়।

ব্রিটিশরা চলে যেতে এরা বড় বড় স্টার্লিং কোম্পানির গদিতে এসে বসেছে। আদি নিবাস রাজস্থান। চার পুরুষ কলকাতার বাসিন্দা। ভাষা: হিন্দি ঝোঁকের বাংলা।

ঘরে বসে দিলীপ বসু বলল, খৈতানজী, আমি আজ কোল ইণ্ডিয়ার হয়ে আসিনি।

সে তো আপনি বাসুসাহেব এমনিই আসতে পারেন।

আমরা একটা মাইনিং হাতে নিয়েছি। কয়লার—

প্রাইভেট মাইনিং?

ছোট রকমের মাইনিং।

বেওসা করবেন? খুব ভালো। বেশি টনের তো হবে না।

দিল্লির পারমিশন পাওয়া গেছে। কাজও চলছে। আপনাকে আমাদের কয়লা নিতে হবে।

সাইটে পাঠাতে পারবেন?

তা পারবো। তবে আপনাকে কিছু হেল্প করতে হবে। আপনি যদি শেয়ার নেন। সেটাই আমাদের ক্যাপিটাল হবে।

চায়ে তো খান আগে—

চা খেতে খেতে কথা হতে থাকলো। খৈতানজী একটা বিশাল কোম্পানির কর্তা। সেখানে দিলীপ বসু একটা সামান্য খাদান ফিরে চালু করতে পয়সাওয়ালা লোকজনের কাছে মূলধনের জন্যে হত্যা দিচ্ছে।

এভাবেই আজ ক' মাস চলছে। ডালহৌসিতে ব্যবসাপত্তরের কঠিন কঠোর জঙ্গলে একরত্তি এই খাদান খোলার জন্যে ঘোরাফেরা করে অদ্ভুত এক নতুন বাড়ির খোলা দরজা দিয়ে যেন আচমকাই ভেতরে ঢুকে পড়েছে দিলীপ। বাড়িটার নাম —বেওসা।

উঠবার মুখে খৈতানজী জানালেন, নিজের নামে তিনি আর কোন শেয়ার নিতে পারেন না। তবে দু লাখ টাকার মত শেয়ার তিনি প্রমিজ করছেন। অন্য কোন নামে ফার্স্ট কলে তিনি নিয়ে নেবেন।

খৈতান হাউস থেকে বেরিয়ে জি. পি. ও., ফেয়ারলি প্লেস, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাড়ি পার হতে হতে দিলীপ মনে করার চেষ্টা করলো—কোথায় পড়েছে—কোথায় পড়েছে? হে বাঙালী! ওরা সুদূর মাড়োয়ার হইতে এই কলকাতায় ব্যবসা করিতে আসিয়াছে। ওদের স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আশ্রয় দিও। ভাষাটা ঠিক ঠিক মনে নেই। কথাগুলো অনেকটা ওরকম। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন! তা একশো বছর আগে।

এখন খৈতানজী যদি দয়া করে আমায় স্নেহের চক্ষে দেখেন।

জীবনের এতগুলো বছর আমি কোল ইণ্ডিয়ায় বসে বসে ওয়াগন কমপেনসেসন, ডেমারেজ, সিমিং, অ্যাস কনটেণ্ট নিয়ে মাথা ঘামিয়ে এসেছি। তার পেছনে যে ক্যাপিট্যাল, লেবার, ব্রেন—তার কথা ভাবিনি। এ এক অন্য জায়গা।

কালীপাহাড়ি ছাড়িয়ে কোথায় মাঠের ভেতর একটা আধো-খোলা খনি পড়ে

আছে। তাকে ঘিরে কলকাতায় লগ্নী। সরাসরি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে লোন ফ্লোট করা যাবে না। সে রকম কোম্পানি নয়। অনন্ত ভৌমিকের সহধর্মিণী মীরা ভৌমিককে সামনে এগিয়ে দিয়ে ভৌমিক-ট্রাস্ট। সেই ট্রাস্টের হয়ে খাদান খোলা। ব্রেন, লেবার, ইনভেস্টমেণ্ট।

বড ব্যাঙ্ক বাড়িটার সামনে দিয়ে সনাতন গাড়ি ঘুরিয়ে নিল অ্যাম্বারের গলিতে। ব্যাঙ্ক বলো, খনি বলো, ব্যবসা বলো—সবই পার্সোনাল রিলেশন। ব্যক্তিগত সম্পর্ক। আজ যদি পশ্চিমবঙ্গের পৌনে পাঁচ কোটি লোকের সবাই একটা করে টাকা দিতো দিলীপকে—তাহলে শুধু বিশ্বাসের ওপর—শুধু ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর পৌনে পাঁচ কোটি টাকার মূলধন গড়ে উঠতো।

অন্য লোকের গচ্ছিত টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে ব্যাঙ্ক গড়ে ওঠে। গচ্ছিত মানেই তো বিশ্বাস। এই বিশ্বাস তৈরির ভেতর একটা নেশা আছে। সে নেশায় পড়ে দিলীপের মনে হচ্ছিল—পৃথিবী এত বিরাট—তা তো আমি জানতাম না এতদিন! এখানে এত লোক! এত রকমের কাজ! কী বিরাট সব ইনভেস্টমেণ্ট!

গোকুল দত্ত বৈঠকখানায় বসে দিলীপকে দেখতে পেয়েই উঠে দাঁড়ালো। বাড়ির সামনেই তিনটে দুধের ভ্যান দাঁড়ানো। ভ্যানের গায়ে বড় করে লেখা—দত্তস্ মিল্ক প্রোডাক্ট্স। গোকুল পনির অ্যাণ্ড বাটার।

আয় ভাই। আয়। বোস।

খবর তো ভালো গোকুলদা। আরও লাখ চারেকের প্রমিজ পাওয়া গেল।

চার লাখ! তুই তো কামাল করে দিলি দিলীপ। তোকে নিয়ে আমি যদি ঘিয়ের ব্যবসাও করতাম—তাহলে লাল হয়ে যেতাম।

ঋষি কোথায়? আসেনি?

ওকে তো অনাথ চক্কোত্তি নিয়ে বেরিয়েছে।

কোথায়?

সে তো জানিনা ভাই। কোথায় আর! তোদের কোল কোম্পানির কাজে হবে—

আমি তো জানি না। অবিশ্যি অফিসে বুড়ি ছুঁয়েই বেরিয়ে পড়েছি। এখন তো আমি ভৌমিক ট্রাস্টের লোক। কি বলো গোকুলদা?

খাটছিস তো ভয়ংকর।

খরচ হয়ে যাচ্ছে বেশ।

তা তো হবেই দিলীপ। বড় সাইজের লোকজন নিয়ে নাড়াচাড়া। তোকে কমিশন নিতে হবে।

ক্যাপিটাল যোগাড় করে দেব। তার জন্যে আবার কমিশন কেন গোকুলদা ?

বাঃ! সব কাজের একটা পরিশ্রম আছে না! তোর সময়ের দাম নেই ?

তাহলে তো আমি তোমাদের কর্মচারী হয়ে যাবো গোকুলদা। অনন্ত, ঋষি, তুমি—মিটিংয়ে বসলে আমাকে বাইরে ওয়েট করতে হবে।

পাগল! তা কেন ? এটা তো ব্যবসা। আমরা কি সবাই গ্র্যাটিসে খাটতে এসেছি ? তোর লগ্নী তো সবচেয়ে বেশি।

আমার টাকা কোথায় গোকুলদা!

তুই তো পার্টি যোগাড় করে ইনভেস্ট করছিস। সেটা ভুললে চলবে কেন ?

খনির কাজ কতদূর গোকুলদা ?

সবে তো খাদ খোলার কাজ চলছে। অনন্ত সাইটে গেছে। সাধনদা লোক-লস্কর খবর দিয়ে ঠিক পাঠিয়েছে। কাপড় কলের হাদা সাহেবকে আর কিছু শেয়ার নিতে বল না। ওরা তো আর নিজের নামে নেবে না। ভয় কিসের! ওর নিজের কলেও তো আমরা জিনিস ডেলিভারি দিচ্ছি। তা সামনের মাসের মাঝা-মাঝি থেকে তো কয়লা যাবে—

আমি অন্য কথা ভাবছি গোকুলদা।

কি ভাবছিস ?

এমন সময় টেলিফোন এসে যাওয়াতে গোকুল দত্ত ফোনের ওদিকে কার সঙ্গে ঘি নিয়ে পড়লো। এই ঘি এবং দুধ গোকুল দত্তর ব্যবসার স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ। ডেলিভারি ভ্যানের কয়েকজন লোক এসে পড়াতে দিলীপ উঠে পড়লো।

এখন সন্ধ্যের মুখে মুখে গরমকালের কলকাতা সবারই ভালো লাগে। কলকাতা এখন দিলীপ বসুর সামনে একখানা খোলা খাতা। তাতে কিছু নাম আর টেলিফোন নম্বর। সে এদের ভেতর বিশ্বাসের একখানা ম্যাজিক ওয়াণ্ড হাতে খেলা দেখাতে এসেছে। প্রিয় পাবলিক! একটু ভেবে দেখুন। এখনো সারা দেশে অনেক কিছু করার আছে। অনেক জিনিস ইনভেস্টমেণ্টের অভাবে পড়ে আছে। আসুন আমরা এবার একটা খাদ খুলি। কিছু লোক কাজ পাবে। আপনি নিশ্চিন্তে কয়লা পাবেন। একদম সাইটে পৌঁছে দেব আমরা। স্পেসি-ফিকেশন মত সেভেণ্টিন পারসেন্টের বেশি অ্যাশ কনটেণ্ট থাকবে না।

পেছনের সিটে বসে দিলীপ সনাতনকে বলল, গঙ্গার গা দিয়ে হেস্টিংস হয়ে ফিরবো আজ। হাওয়া পাবো ও রাস্তায়।

দিলীপের ভালোই লাগছিল। আজ কমিশন নামে একটা নতুন বাজনার কথা

গোকুল দত্ত খানিক আগে তাকে বাজিয়ে শুনিয়েছে। কত ক্যাপিটাল যোগাড় করে দিলে কত কমিশন পাওয়া যায়? ফাইভ পারসেণ্টও যদি হয়—সে তো অনেক টাকা। কিন্তু ভৌমিক ট্রাস্টের হয়ে সে-টাকা খাটিয়ে আগে তো মুনাফা তুলতে হবে। না, তার আগেই কমিশন?

গাড়ি ঘাসের ওপর থামিয়ে দিল সনাতন। ব্রেক নিচ্ছে না।

কি হোল?

এ গাড়ি নিয়ে এগোনো ঠিক হবে না।

গঙ্গার হাওয়া, কমিশন, কলকাতার খোলা খাতা—সবই বন্ধ হয়ে গেল। জগন্নাথ ঘাটের দিকটায় বাতিল টায়ার ঝোলানো ঝুপড়ি। সেটা দেখিয়ে সনাতন বলল, ট্যাক্সি ধরে দি আপনাকে আগে। ওখানে ঠিক মিস্ত্রি পেয়ে যাবো।

এখানে কোথায় ট্যাক্সি পাবে? এখন অফিসের ভিড়। সারাতে কতক্ষণ লাগবে?

কাজ তো বেশিক্ষণের নয়। কিন্তু লোক পেলে তো। আপনি বরং বেহালার মিনিবাস ধরুন। মোমিনপুরে নেমে যাবেন—। আমি ততক্ষণে মিস্ত্রি ধরে ফেলবো।

বেহালার মিনিবাস দিলীপের জন্যে একটা সুন্দর সারপ্রাইজ নিয়ে ওয়েট করে ছিল। ময়দানের শুকনো ঘাসের গুঁড়ো আর ধুলো একাকার করে পাগলা বাতাস দিল। সঙ্গে সঙ্গে বছরের প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা। বড় বড়। তবে সামান্য। গঙ্গার ওপর একখানা মেঘ নেমে এসেছে। সে একেবারে রীতিমত সিন। বর্ষা নয়—অথচ বর্ষাকালের ভান। ধুলো, অন্ধকার, বৃষ্টির ফোঁটা। তার ভেতর যে মিনিবাসটা পেয়ে গেল—সেটা একমাত্র ভগবানই পাঠাতে পারে। ফাঁকা। আকাশবাণীর গা দিয়ে বেরিয়ে এল।

কিন্তু উঠতেই দিলীপকে শুনতে হল, যাবে না। এ গাড়ি যাবে না।

এখানে কোথায় নাববো ভাই! তোমাদের সঙ্গেই নিয়ে চল। বলতে বলতে দিলীপ দেখলো—তারই মত আরেক প্যাসেঞ্জার—মহিলা—কাঁচ টেনে দিয়ে জবু-থবু হয়ে বসে আছে।

মিনিবাস ছুটছিল। ধুলো, ঘাসের শুকনো গুঁড়োয় অন্ধকার-করে-আসা ভিজে বাতাসের ভেতর দিয়ে। কণ্ডাক্টর বলল, দু টাকা দেবেন।

তা তো দেবো। কিন্তু নামবো কোথায়?

বেহালায় গ্যারেজ করবো।

তা বেশ। মোমিনপুরে নামিয়ে দিও।

মিনিবাসটাকে নিশ্চয় ভগবান পাঠিয়েছে। আকাশবাণীর পাশ দিয়ে। ভগবানের বাড়ি হিসেবে রাজভবনকেই শুধু মানায়। দিলীপ ছুটে এসে প্রায় সামনে দাঁড়ানোতেই মিনি থেমেছিল। নয়তো তাকে ফেলে চলে যেতো ঠিক। এসব ভাবতে গিয়ে ঝড়ের আগের ফ্যাকাশে মেঘটাকে গঙ্গার ওপর ঝুলতে দেখে দিলীপ বুঝলো, আমি কমিশনের কথায় ভেতরে ভেতরে এমনই নেচে উঠেছি যা আসলে একজন লোভীকেই শুধু মানায়। দৌড়ে উঠতে হয়েছে বলে দিলীপ তখনো ভেতরে ভেতরে হাঁফাচ্ছিল। সেই সঙ্গে খিদের একটা চিনচিনে ভাব আস্তে আস্তে ফুলে উঠছিল। আজই দুপুরে কাদের কাছ থেকে ইনভেস্টমেণ্টের প্রমিজ পেয়েছে—দিলীপ তা মনে করতে পারলো না। শুধু মনে আছে—নতুন ক্যাপিটাল চার লাখ টাকা আসছে। অনেক চেষ্টা করেও যখন কারও নাম মনে এলো না—তখন দিলীপ সবে আয়নায় সচরাচর ভেসে ওঠা তার নিজেরই মোটাসোটা চেহারাটা চোখের সামনে দেখবে বলে তৈরি হতে যাচ্ছিল—এইভাবেই সে খানিকক্ষণের জন্যে জমাটভাবে হতাশ হতে অভ্যস্ত—যখন তাকে আর কেউ চাঙ্গা করতে পারে না—ঠিক তখনই অন্ধকার মিনিবাসের ভেতর দৈববাণী হোল—দিলীপদা! এখানে এসে বোসো।

দিলীপ ফিরে দেখলো, কণ্ডাক্টর একদম পেছনের সিটে। জবুথবু মহিলা হাত তুলে তাকে ডাকছে।

এখানে এসো।

দিলীপ উঠে গিয়ে কাছে দাঁড়ালো।

বোসো।

দিলীপ বসলো। চলন্ত মিনিবাসের এ জায়গাটাতে বাতাস খানিক সুগন্ধী। আমি স্বাতী। কি হয়েছে তোমার? তুমি শুনতে পাচ্ছো না?

স্মৃতি আসলে একটি কার্নিভাল। সেখানে একটা ঘূর্ণিতে বসে দিলীপ বসু প্রায় বিশ বছর আগের এক সন্ধ্যায় দেড় সেকেণ্ডের ভেতর পাক খেয়ে এলো। একবার মাত্র। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, তুমি? এখানে?

তোমারই মত। ঝড় উঠতেই উঠে পড়েছি। রাজভবনের সামনে থেকে।

সেকেণ্ড হাওড়া ব্রিজের কঙ্কালের নিচু দিয়ে মিনিবাস ভূতে পাওয়া জন্তু হয়ে দৌড়োচ্ছিল। পাশাপাশি বসেও কেউ কারও কথা পরিষ্কার শুনতে পাবে না। এত আওয়াজ। জানলার কাঁচগুলো এখুনি খুলে যাবে।

তোমার ওঠা দেখেই চিনেছি।

কি রকম?

এত আনাড়ি আর কে হতে পারে! আরেকটু হলে তো চাপা পড়তে দিলীপদা।

দিলীপ এসব কথা কিছুই শুনতে পেল না। সে আন্দাজে বলল, কতদিন পরে দেখা হোল। আবার—

ঠিক পাঁচ বছর পরে।

হুঁ। তোমার সঙ্গে আমার পাঁচ বছর অন্তর দেখা হয় স্বাতী।

আবার পাঁচ বছর পরে দেখা হবে।

শেষবার দেখেছিলাম—তুমি গজকাঠি দিয়ে কাপড় মাপছো। শোরুমে। কাউণ্টারে সব মহিলা খদ্দের—

তার পাঁচ বছর আগে? মনে আছে দিলীপদা?

ঘোমটা দিয়ে অফিসটাইমের ভিড়ের ট্রামে উঠছো। কোথায় যেন চাকরি করতে তখন।

তার পাঁচ বছর আগে?

গোলপার্কের ওখানে ট্যাক্সি থামালে ঘ্যাচ্ করে। হাসপাতাল থেকে মা হয়ে ফিরছো। তোয়ালে সুদ্ধ তুলে ক'দিনের বাচ্চা দেখালে—

সে-ছেলেটা বেঁচে নেই আমার। তার পাঁচ বছর আগে?

হঠাৎ পড়াতে গিয়ে দেখি—তোমার সিঁথি জুড়ে সিঁদুর—একটু যেন বেশীই—

সুধীর ওভাবেই তোমার সামনে দেখা দিতে বলেছিল। তার পাঁচ বছর আগে? এটা নিশ্চয় মনে নেই তোমার।

আছে স্বাতী। সুধীরবাবু কেমন আছে?

সেকথা পরে বলছি। আমি কি তখন শাড়ি পরতাম?

হ্যাঁ। তোমরা তখন সবে গরীব হতে শুরু করেছো। তোমার দাদারা ওড়াতে শিখেছে। বাবা সবে মারা গেছেন। তোমাদের বাড়ি কলকাতায় একখানায় এসে ঠেকেছে। সে বাড়িরও আষ্টেপৃষ্টে ভাড়াটে। সকাল সন্ধ্যে উনুনের আঁচে অন্ধকার হয়ে যায় সিঁড়িঘর—

এসো আমরা এখানে নেমে পড়বো।

তুমি? এখানে?

এই তো মোমিনপুর।

তুমিও মোমিনপুরে?

তাই তো বলছিলে কণ্ডাকটরকে—

পাঁচ

লাবণ্য আরজেণ্ট অর্ডার দিয়ে একবেলার ভেতর দিলীপের জন্যে পাঞ্জাবি বানিয়ে দিল। টেরিসিল্কের। মজুরি সমেত একশো সাতচল্লিশ টাকা।

সেই পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে দিলীপ বলল, আমি নাচবো। পেটে তখন তার মোট পাঁচ পেগ হুইস্কি। ছু' বোতল বিয়ার। একসঙ্গে খায়নি। বেলা তিনটে থেকে রাত আটটার ভেতর—দফায় দফায় খেতে হয়েছে। মোট তিনবারে। তিনরকম লোকের সঙ্গে।

পশ্চিম ভারতে ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ার মত একই ফ্রাইট রেটে গোবিন্দ স্টিলকে কয়লা দেবার চুক্তি আজই করেছে দিলীপ। ওদের কলকাতার জোনাল অফিস সেই সুবাদে পার্টি দিল। ওরা ভৌমিক ট্রাস্টের সঙ্গে চুক্তি করলো। তিন বছরের কড়ারে। দিলীপদেরও খনি খুলতে হলে ক্যাপিটাল চাই। তার অনেকটাই গোবিন্দ স্টিল যোগাবে।

ব্যাঙ্ক ন্যাশানালাইজ করার পরেও অনেক ব্যাঙ্ক তার বাইরে। তেমনি কোল ন্যাশানালাইজেশনের পরেও রাজমহল, আসাম, মধ্যপ্রদেশ—অনেক জায়গায় কয়লার নতুন খনি কিংবা আগেকার লিজ খনি এখনও ন্যাশানালাইজেশনের বাইরে। ভৌমিক ট্রাস্টের এ-খনিও ন্যাশানালাইজেশনের আওতায় পড়ছে না। পিট ওপেন করাও খুব কঠিন হয়নি সেখানে। সাবসয়েলের শুরুতেই কয়লা। প্রায় কুপিয়েই পিট সাইড্ ওপেন করা সম্ভব হয়েছে।

আইনের মারপ্যাঁচ, খদ্দের, রেলের নিয়মকানুন—সবই এতদিনকার চাকরিতে বসে দিলীপ ভালোভাবেই চিনেছে। সেই সঙ্গে দিলীপ একথাও জানে—কয়লার স্তর শুরু হবার আগে যে সেল বা জমাট কাদা থাকে—তা যদি মিশেল দিয়ে দেওয়া যায়—তাহলে পড়তায় গিয়ে ভালো লাভ থাকারই কথা।

কে না জানে—প্রাইভেট ইনভেস্টমেণ্ট কোম্পানীগুলো গত ক'বছরে এল আই সি-র ব্যবসার বড় এক চাঙ্ কেড়ে নিয়েছে। টাকার অঙ্কে কয়েকশো কোটি। আজই দুপুরে গোবিন্দ স্টিলের সঙ্গে কয়লা ডেলিভারির কথা পাকা হয়ে যাওয়ার পর চুক্তির কাগজে টাকার অঙ্কটা দেখে নিজেই ভেতরে ভেতরে দুলে উঠেছিল দিলীপ। ছত্রিশ লক্ষ। সত্যিই যদি কোনদিন ভৌমিক ট্রাস্টের খনি সফল হয় —মুনাফার শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে যায়—তাহলে আশপাশের সব খাদান খুলতে হবে। কোল ইণ্ডিয়ার ব্যবসার একটা বড় অংশ ভৌমিক ট্রাস্ট কেড়ে নেবে সেদিন।

কোল ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বোর্ডের চেয়ারম্যান খোঁজ নেবে। কে এই দিলীপ বসু? কোথায় ছিল এতদিন? আমাদেরই স্টাফ? আশ্চর্য! ওকে গত চোদ্দ বছরে আমরা কোন প্রোমোশন দিইনি। আমাদের এতবড় ইন্সটিটিউশনের কমপেনসেশন ও ট্যারিফ, ক্লায়েন্ট, ওয়াগন মুভমেন্ট দেখতো। আশ্চর্য! আসলে তো লোকটা কয়লার উইজার্ড। আমরা কি করেছি এতকাল?

গোবিন্দ স্টিলের লোকজনের সঙ্গে পার্টিতে মজে যেতে যেতে এসব কথা আজই দুপুরে মনে হচ্ছিল দিলীপের। এরকম তো কোনদিন হতেও পারে। ওরা কোল-গ্যাস দিয়ে একটা তিরিশ টনের ওপেন হার্থ ফার্নেস চালায়। গুজরাট, রাজস্থান মহারাষ্ট্রের দিককার ইনগট সাপ্লাই দিয়ে উঠতে পারে না। ওরাও তো মাত্র কয়েক বছর আগে ভৌমিক ট্রাস্টের মতই সামান্য দিয়ে শুরু করেছিল। আমরাও তো একদিন গোবিন্দ স্টিলকে ছাড়িয়ে যেতে পারি। ওয়েস্ট কোস্টের খদ্দের সামলাতে এখুনি বোম্বাইয়ে অফিস খোলা দরকার। সেখানে বসে পশ্চিম ভারতের চাহিদা পরিষ্কার দেখা যাবে। বছরে অন্তত দু'বার গিয়ে দিলীপ সেখানে কাটিয়ে আসবে।

বিকেলে ভ্যান্সিটার্ট রোয়ের সেভিংস্ কোম্পানীগুলোর একটাতে গিয়ে ওদের কর্তাকে পাকড়েছিল দিলীপ। ওদের ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানটা খুলতে গিয়ে কিছুই বোঝা হলো না। মাঝখানে থেকে একটা বিয়ার গিলতে হলো। সন্ধ্যেবেলা ঋষির ফোন। অফিসে আসছিস নে কেন?

তুই তো অফিসের চোখে গুড বয়। সাধন চক্কোত্তির সঙ্গে জিন খেয়ে বেড়াচ্ছিস।

জোর করে ট্যুরে নিয়ে গেল। লোকটা বুড়ো হয়ে গেল চোখের সামনে—।

সে তো অফিসেরই ট্যুর ঋষি!

অনাথদা বললে, কি করবো বল দিলীপ।

আমি তো অফিসের চোখে ব্যাড বয় হয়ে যাচ্ছি।

তা কেন?

মার্কেটিং ডিভিশন নিশ্চয় জানতে পেরেছে।

ও চিন্তা করিস নে দিলীপ। ভৌমিক ট্রাস্টের কয়লা এতই সামান্য যে, কোল ইণ্ডিয়ার পক্ষে কিছু মনে করার মত নয়।

আমিও বেড়াতে যেতে পারতাম ঋষি।

যাবি।

কিন্তু যাইনি ঋষি।

ফোনের ওপাশে ঋষি খানিক থেমে থেমে বলল, সবাই তো একরকম হয় না দিলীপ। সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না।

কাজ কথাটা শুনে—এপাশে দিলীপের কানে ফোনের রিসিভার সিসের চেয়েও ভারি হয়ে উঠলো। আজ ক'মাস হলো—দিলীপ কাজের বদলে কমিশন পায়। সই করে চেক দেয় ঋষি। কখনো ঋষির বউ লাবণ্যও সই করে। লাবণ্যর সই করার ভঙ্গিটা খুব মন্থর। চেকটা এগিয়ে দিয়ে বলে—দেখুন তো দিলীপ—কোন ভুল হয়নি তো! খনি, ইনভেস্টমেণ্ট, কমিশন থেকে লাবণ্য যেন যোজন যোজন দূরে। শুধুমাত্র চেকের এই সইটা দিয়ে অলীক এক খাদানের সঙ্গে নিজেকে ছুঁয়ে রেখেছে লাবণ্য। যে-খাদান দ্বারকানাথ ঠাকুরের টাইমে হয়তো জরীপ হয়েছিল। খাদান খোলার কাজে হাত পড়েছিল হয়তো দেবেন ঠাকুরের দিনকালে। তারপর বন্ধ ছিল কয়েক যুগ। মীরা তার অনন্ত ভৌমিককে দৌড়ঝাঁপ করাতে গিয়ে খাদানটা খুলে দিয়ে বসে আছে। কলকাতা থেকে কালীপাহাড়ি—তারপর আরও খানিকটা—সেখানে মাঠের ভেতর অবিকল এক স্বপ্ন। যাকে সেণ্টার করে কলকাতায় ঋষি মীরা, অনন্ত, গোকুল, দিলীপ—যে যার মত টগবগ করে ফুটছে, বড় বাধা এসে দাঁড়ালে বিষাদ তার জাল ফেলে ওদের তুলে নিচ্ছে।

ঋষি আবার বলল, তুই যা পারিস—আমি কি তা পারি?

সেকথা হচ্ছে না। আমি তো সারাদিন পরে এই চান করে উঠলাম।

রানীকে নিয়ে চলে আয়।

কাল কিন্তু আমায় বিমলা গোয়েঙ্কার সঙ্গে দেখা করতে হবে। শিপিং—মাইনিং—দু জায়গাতেই মহিলার ফ্যামিলি ইণ্টারেস্ট—

তা যাবি। এখন তো আয়।

মহিলাকে যদি বোঝানো যায়—তাহলে আর আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয় না। একাই এগিয়ে আসবেন। প্যাসিফিকে ওঁর নিজেরই তিনখানা জাহাজ ঘুরে বেড়ায়—

এখন তো চলে আয়। পরে শুনবো। গোকুলদা এসেছে। রেখা বৌদি, মীরা, অনন্ত—সবাই এসেছে। চলে আয় এখুনি।

আমার একটা ভালো পাঞ্জাবি লাগবে। বাঙালীর পোশাকে যাবো ভেবেছি। ওদিকে অফিসেও যাই নে কতদিন। সব ছুটি যে ফুরোয় ঋষি—

লাবণ্য তোর জন্যে পাঞ্জাবি বানিয়ে রেখেছে। চলে আয়—

ঋষির ফ্ল্যাটে পৌঁছে সিঁড়ির মুখে রানী বলল, রোজ এতটা করে মদ খাচ্ছো। সকালে মাথা ধরে পড়ে থাকবে। এত কমিশন দিয়ে কি হবে আমাদের?

দরজার বেল টিপবার আগে দিলীপ রানীর মুখে ফিরে তাকালো। সিঁড়ির আলোটা নিভু নিভু। দিলীপের গলা দিয়ে চাপা শব্দ বেরিয়ে এলো। একটু আনন্দ করতে শেখো।

আনন্দ তুমি খুঁজে বেড়াও কেন? তোমার মনে আনন্দ নেই?

আরেকটু হলেই ডোরবেল বেজে উঠতো! ভাগ্যিস টিপিনি। নিজেই নিজেকে বলল দিলীপ। বন্ধ দরজার ওপাশে ঋষির গলার গান। গোকুলদার হা হা হাসি। দিলীপ আবার রানীর মুখে তাকালো। সেখানে সংসার বসে আছে।

রবি আজ তিনদিন বাড়ি ফেরেনি। কোন খোঁজ নিয়েছো তুমি?

তাই নাকি? আমায় বলোনি কেন?

কাকে বলবো। তুমি মাঝরাতে বেহুঁশ হয়ে ফিরছো আজ ক'মাস।

সে তো আমার কাজ।

কাজ না ছাই। ও কমিশনে তোমার কি দরকার? কুটুকে বিশ্বনাথ এক-খানা চিঠি দিয়েছে—

বিশ্বনাথ বড় ভালো ছেলে। সুন্দর গায়। ভারি সুরেলা গলা।

তাই বলে তোমার মেয়েকে চিঠি দেবে?

আজকালকার ছেলেমেয়েরা ওরকম দু-একখানা চিঠি লেখে। পায়। ও নিয়ে তুমি কোন ইম্পর্টান্স দিও না। আপনা-আপনি ভুলে যাবে সব ওরা। আমাদের চেয়ে ওরা কত অ্যাড্ভ্যান্সড্ তা জানো? রবিটা কোথায় যেতে পারে? আগেও তো এমন হাওয়া হয়ে যেত। ফিরেও এসেছে।

সামনে অনার্স পরীক্ষা। একটা খবর নেই।

দিলীপ ডোরবেলে চাপ দিল। ভেতরে ঢুকতেই রীতিমত হুল্লোড়। প্লেটভর্তি টাটকা মাছভাজা। কাঁচা লঙ্কা। নুন। মীরা বোতল থেকে বিয়ার খাচ্ছিল।

ঋষি মীরার কাঁধে হাত রেখে গান ধরলো। সেদিকে তাকিয়ে অনন্ত ভৌমিক হাসলো। তারপর একবার বলল, বেচারা—! খানিক বাদে সেই পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে দিলীপ বলল, আমি নাচবো। পেটে তখন তার মোট পাঁচ পেগ হুইস্কি। দু' বোতল বিয়ার।

এ ঘরে এখন নাচ সম্ভবত কেউ জানে না, দিলীপ নিজেও জানে না। বিকেলের ক পেগের পর সন্ধ্যায় স্নান নেশাটাকে ঝাঁঝিয়ে দিয়েছে। তারপর এখানে আরও খানিকটা। দিলীপের শরীরের ভেতরটা চনমন করে উঠলো। ঋষির গলায় তালের গান। দরাজ, মিষ্টি স্বর।

দিলীপ দুলতে লাগলো। সেই সঙ্গে গোকুলদার হাততালি। মীরার হাসি। গোকুলদার দুই নম্বর বউ এত সবের ধার ধারে না। এখানে কেউ তাকে রেখা বউদি বলে। কেউ বলে রেখা। সে আগে গোকুল দত্তর ঘিয়ের ক্যানভাসার ছিল। এখন তার জন্যে আলাদা ভাড়া করা বাঁড়িতে মাসে বড় এক কৌটো গোকুলস ঘি যায়। সেই ঘি খাওয়া শরীরে গরমের ভেতর লাল জর্জেটের আঁচল খসখস শব্দ করে খসে যাচ্ছিল। দিলীপ দু পাক নাচবার পরেই রেখা তার হাত ধরে দুলতে লাগলো। আর অমনি গোকুল দত্ত হাতে বাজের আওয়াজে তালি দিতে লাগলো। প্রায় কান ফাটানো শব্দে। সেদিকে তখন কারো খেয়াল নেই। খেয়াল রাখার অবস্থাও নয় কারও। শুধু রানী সেই আওয়াজে কেঁপে উঠে নিজের কান খোঁচাতে লাগলো। আমি তো জানতাম না—তুমি এত সুন্দর নাচতে পারো।

লাবণ্যের খুব ভালো লাগছিল। পাঞ্জাবি গায়ে দিলীপ দিব্যি গানের তালে নেচে যাচ্ছে। ঋষি হাসি মুখে গাইছে। তার হাতের সামনে কালো গম্ভীর রামের বোতল। মীরা এখনো ঋষির ভাবি ডান হাতখানা কাঁধের ওপর রেখেছে। অনন্ত তাতে একটুও আপত্তি করছে না। মীরা একবাব রাগ করে বললো, সব বিয়ার ফুরিয়ে গেছে? যাও। এক্ষুনি নিয়ে এসো এক বোতল।

অনন্ত উঠছিল।

লাবণ্য বললো, বোসো। যেতে হবে না। ফ্রিজের ভেতর থেকে একটা এনে দিল।

রেখা সমান তালে দিলীপের হাত ধরে নাচছে। দুজনেই ঘেমে অস্থির। গোকুল দত্ত হাততালি থামায়নি। এক জায়গায় ঝিম হয়ে দাঁড়িয়ে কান-ফাটানো আওয়াজ করছিল। সেটাই তার আনন্দ এখন।

দিলীপের নাচতে ভালোই লাগছিল। কিন্তু শরীরের ওজন তাকে দমবন্ধ করে দিতে লাগলো। নয়তো আজকের সারাটা দিনই তার—সাকসেস্। একটার পর একটা। এখন সে স্বচ্ছন্দে স্বপ্ন দেখতে পারে—কোল ইণ্ডিয়া ছাড়াই ভৌমিক ট্রাস্টের নতুন ক্যাপিটালে নতুন নতুন খাদ খোলা হচ্ছে। একটার পর একটা। একদিন হয়তো রাজমহলে—আসামে ভৌমিক ট্রাস্টের পতাকা উড়বে।

দিলীপ এখন জানে না, তাকে কেমন দেখাচ্ছে। তার গলার স্বর আদৌ সুরেলা নয়। তবু সে গেয়ে উঠলো—

কয়লার বয়স নাকি পঁচিশ কোটি বছর—অ—অ—

সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত গাইলো—তাই নাকি? তাই নাকি? মোটে?

দু পাক ঘুরে দিলীপ আবার গাইলো—

সেখানেই আমাদের ফরচুন—অ—অ—অ—

আ হা—বলেই সেই সুরে গলা মেলালো অনন্ত।

কোল রাস! কোল রাস!! ওনলি? টু হাণ্ড্রেড্ ইয়ার্স বিহাইণ্ড—

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। হাসি থামলে ঋষি আদর করে ডাকলো, এই পাগল! এদিকে আয়। একটু জিরিয়ে নে।

ঋষির গলায় এ-ডাক দিলীপের পক্ষে অনেকখানি। সে ঋষির গলায় গান পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। মনে হয়, সে গলায় আগেকার জাভার দানা চিনি ঝরে পড়ে। সে ঋষির মুখে কোনদিন কারও নিন্দা শোনেনি। আগে আগে একটু পেটে পড়লেই দিলীপের নেশা হয়ে যেতো। তখন কে তার কপালে হাত বুলিয়ে দিয়েছে? এই ঋষি তো! ঋষি তখনো এখনকার ঋষি নয়। লাবণ্যর সঙ্গে সবে বিয়ে হয়েছে। তখন একবার দিলীপ ঋষির সঙ্গে ওদের বাড়ি গিয়েছিল। সারারাত আড্ডা দেবে বলে। দোতলায় জ্যোৎস্নায় বসে। রাত আটটার পর। ট্যাক্সিতে। দোকান বন্ধ। পথে এক এক জায়গায় থামছিল ঋষি। সর্দারজীর হোটেলে খোঁজ নিচ্ছিল। যদি পাওয়া যায়। সেই ঋষি।

দিলীপের হাতে পেটির বড় মাছখানা তুলে দিল ঋষি। মোটা হয়ে গেছিস। এই শরীরে অতটা নাচিস নে। খেয়ে নে—

লাবণ্য দেখছিল—দু'জন পুরুষলোক—দু'জনকে কেমন করে ভালবাসে। দু'জনই মোটা। একই সময়ের মানুষ। তার স্বামী গেয়ে উঠলে দিলীপ যে কী প্রশংসার চোখে তার স্বামীর মুখে তাকায়! ভাবখানা—গ্যাখো, আমার বন্ধু শুধু কোল ইণ্ডিয়ার চাকরেই নয়—তার চেয়ে অনেক বড—কী সুন্দর গায়!

রানীও এ-দৃশ্য না দেখে পারেনি। সেও তাকিয়ে ছিল।

ঋষি প্রায় ঘোষণার গলায় বললো, দিলীপ আমাদের মিরাকল ম্যান।

গোকুল দত্তও চেঁচিয়ে বললো, সে একশোবার। পাগল যদি মাথাটা ঠিক রাখতো!

আমি পাগল নই গোকুলদা। আমি আস্তে আস্তে হাবা হয়ে যাচ্ছি।

সবার হাসির ভেতর ঋষি বলতে লাগলো, দিলীপ না হলে ভৌমিক ট্রাস্টের খনি খোলাই যেত না। আজ যে সেখান থেকে কয়লা তোলা হচ্ছে—তার পেছনে দিলীপের পরিশ্রম অনেকখানি।

মীরা একটা বিয়ার এগিয়ে দিল দিলীপকে। এইটে খেয়ে নাও দিলীপদা। অনেক নেচেছো।

তুই খা। তারপর দিলীপ চেঁচিয়ে বলল, একা আমি নই—সবাই মিলে—সবাই মিলে—

বোঝাই যাচ্ছিল, দিলীপের নেশা হয়েছে।

অনন্ত হাসতে হাসতে বললো, বুঝলে দিলীপদা—তুমি এখন 'টপ অব দি ওয়ার্ল্ডে' আছো।

সেখানে তো বরফ পড়ে!

টাকাও পড়ে দিলীপদা। এত অল্পদিনে এত যোগাড় করলে কি করে?

গোকুল দত্ত বলল, দিলীপ আমাদের সব পারে। সব—

নেশা এসে দিলীপের ঘাড় ধরলো। শক্ত করে। দিলীপের লজ্জা হচ্ছিল। সে এভাবে কোন আলাদা ক্রেডিট চায়নি। খনি একটা বড় জিনিস। সবাই মিলে একসঙ্গে এগোবার ব্যাপার। এসব ভাবতে ভাবতেই দিলীপ বলে ফেললো, একদিন ঋষি দেখবি—ঠিক রেল কোম্পানী আমাদের জন্যে লাইন পেতে দেবে। পিটসাইড অব্দি। তখন আমরাও বড় খনি চালাবো। সবাই আমাদের জানবে—

বড় জিনিসে আমার ভীষণ ভয় দিলীপ। তখন অনেক গভীরে গিয়ে কয়লা কাটতে হবে। এই তো বেশ চলছে। একদম ওপর থেকে মাটি কাটার মত কয়লা কাটা যাচ্ছে।

তাই বলে গভীরে যাবি নে?

বেশ তো আছি ভাই।

আমরা কোনদিন কোল ইণ্ডিয়াকে ছাড়িয়ে যেতে পারবো না?

ওসব পাগলামি দিলীপ। আমরা তো অরগানাইজেশন ইন্সটিটিউশন বানাতে আসিনি। কিংবা শিল্পপতিও হতে চাইনি।

মীরা বিয়ারের বোতলটা নামিয়ে রেখে বলল, হলে দোষটা কি? ভালোই তো হয়।

দিলীপ নেশার ভেতরেই বলল, তবে আমরা কি হতে চাই?

অনন্ত ঘরের থমথমে ভাবটা কাটিয়ে দিতে বলল, কথাবার্তা সব গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। এবার আমি একটা গাইবো।

রানী পরিষ্কার বুঝলো, তার স্বামী আজ এখানে একজন আগন্তুক মাত্র। অথচ আগন্তুক হয়েও দিলীপ একটু আগে এখানে নেচেছে। গেয়েছে।

সেদিন সেই ঝড়ের সন্ধ্যায় মিনিবাস থেকে নেমে স্বাতী বলল, এটাই তো মোমিনপুর তাই না?

দিলীপ ওকে কোন কথা বলতে না দিয়ে সোজা একটা গাড়িবারান্দার নিচে এনে দাঁড় করালো। আমি তো কাছেই থাকি। এখনি ট্যাক্সি পেলে চলে যাবো। কিন্তু তুমি তো ভিজে যাবে। ফার্ন রোডের ওদিকটাতেই আছো ?

স্বাতী বলল, না। মতিলাল নেহরু রোডে—

স্বধীরবাবু ও-পাড়ায় উঠে এলেন কবে ?

ও আসেনি তো। আমি এসেছি। আমরা আর একসঙ্গে থাকি না।

কি বলছো স্বাতী ? আমার জন্যেই স্বধীরবাবু সাত তাড়াতাড়ি তোমায় বিয়ে করে ফেললেন !

তখন তো আমার বয়স কম ছিল। কিছু বুঝতাম না দিলীপদা। তুমি আমাকে অঙ্ক কষাতে। স্বধীর এসে পাহারা দিতো।

একদিন আমায় খুব অপমান করেছিল স্বধীরবাবু। আমি তখন বেকার। ও তখন সরকারী দপ্তরে ক্যামেরাম্যান। তার ক'দিন বাদে তোমায় পড়াতে এসে দেখি—সিঁথি ভর্তি সিঁদুর।

খুব কষ্ট পেয়েছিলে ! আমিও বুঝিনি। বাবা নেই। মা স্বধীরের ইন-ফ্লুয়েন্সে পড়ে বিয়ে দিয়ে দিল।

তা পেয়েছি। কিন্তু এখন আর কোন কষ্ট নেই। অনেকদিনই নেই।

তাই হয় দিলীপদা।

ইস্ ! গাড়িটা যদি থাকতো এখন ! তোমায় পৌঁছে দিতাম। খারাপ হয়ে পড়ে আছে গঙ্গার ধারে। ড্রাইভার সারিয়ে নিয়ে তবে ফিরবে।

সোফার ড্রিভ্ন্। তুমি নিজে চালাও না ?

শেখার সময় পাইনি।

বড়লোক ! তা ভালো। ব্যস্ত লোকদের নিজে চালানো ভালো নয়। আমি কিন্তু নিজে চালাতাম।

গাড়ি ? কোথায় রেখেছো ?

এখানে নয়। আমেরিকায় থাকতে। নিউইয়র্কে—

আমেরিকায় গিয়েছিলে ? বলে নিজের মনেই হিসেব করছিল দিলীপ। কি করে গেল ? স্বাতী তো হায়ার স্টাডিজের মেয়ে ছিল না কোনদিন !

বিউটিসিয়ানের কোর্স করতে। একটা কসমেটিক কোম্পানী পাঠিয়েছিল। তারপর থেকেই তো স্বধীর বিগড়ে গেল। আচ্ছা বল তো দিলীপদা—আমি সাধারণ মেয়ে। নিজে থেকেই সবার সঙ্গে মিশতে বললো। চাকরি করতে পাঠালো। কাপড়ের শো-রুমে ছিলাম কিছুদিন। তারপর চাকরি পাল্টাতে পাল্টাতে

একদিন দেখি আমি একটা কসমেটিক কোম্পানীর ফিল্ড অর্গানাইজার বনে গেছি। তখন থেকেই ও আমায় ইনসাল্ট করতে শুরু করলো। দু'-দু'বার অ্যাবরশনের পর আমি সবে মা হয়েছি। সেই অবস্থায় সুনন্দকে মায়ের কাছে রেখে স্টেটসে চলে গেলাম।

বাতাসের ঝাপটায় বৃষ্টির ফোঁটাগুলো থেঁতলে যাচ্ছিল। অসময়ের মোমিনপুর কেমন ফাঁকা ফাঁকা। দিলীপ যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন কোন অজানা লোকের জীবনী শুনছিল। এই মেয়েটির জন্যে একদা আমি খুব কষ্ট পেয়েছিলাম।

তুমি নিশ্চয় কোন বড় অফিসে কাজ করো। অনেক কণ্ট্যাক্টস তোমার। আমায় একটু হেল্প করো না। আমি এখন একটা ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর হয়ে ভাড়ার কাজ যোগাড় করি। তুমি তো অনেককে চেনো। ছাখো না একটু দিলীপদা।

তোমার বিউটিসিয়ানের কোর্স?

তার জন্যে তো চেম্বার চাই। সে জন্যে তো টাকা চাই। সেলামি ছাড়া কি কেউ ভালো রাস্তায় ঘর দেবে? ভালো রাস্তায় সাজিয়ে না বসলে বড়লোকের বউ-ঝিরা কেন আসবে? সে জন্যে তো টাকা জমাচ্ছি।

এর চেয়ে তো সুধীরের বউ হয়ে থাকলে পারতে!

তা আর সম্ভব নয়। সবার সামনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে কথা বলে আমার মন নষ্ট করে দিয়েছে। অথচ একদিন নিজেই আমায় ঠেলে ডালহৌসি পাঠিয়েছিল। আমি কিছু জানতাম না সেদিন। ধাক্কা খেতে খেতে সব শেখার পর—আমায় বলে কিনা—আমি অস্পৃশ্য! আমি অশুচি! বোঝো মজা! এর পর আর এক সঙ্গে থাকার মানে হয় না।

সুধীর কোন খরচ দেয় না?

আগে ছেলের পড়ার খরচ দিতো। এখন আর দেবে কি করে!

কেন?

বাঃ! আমি তো পালিয়ে আছি। আমার ঠিকানাই জানে না। ছেলেকে স্কুল পালটে একদম অন্য পাড়ায় নিয়ে গেছি। সুধীর তো আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ছেলে কিছু বলে না?

বলে। কিন্তু আস্তে আস্তে বড় হতে হতে সব বুঝবে। আমি কিছুই ভাঙিনি ছেলের কাছে।

এই ক' বছরে এতগুলো গোলমাল পাকিয়ে বসে আছো?

আর বোলো না। জানোই তো বাবা কত খোলা মনের মানুষ ছিলেন।

অবস্থাও আমাদের ভালো ছিল তখন। বাবা চলে যেতে আমরা এমন গরিব হয়ে পড়লাম—নয়তো সুধীরের মত লোক মাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে? আমি তো সব বুঝতে পেরে বিয়ের প্রথম দশ বছর মা হইনি। সুধীরও চাইতো না। শেষের দিকে ও কিন্তু প্ল্যান করে আমায় মা করে দিল। আমাকে যেন তেন দখল করতে ও তখন উঠে পড়ে লেগেছে। একটু অসাবধান ছিলাম—আর অমনি। ততদিনে ওকে আমি চিনে ফেলেছি। সেলফিস। হিংসুটে। পারভার্ট। শেষ দিকে আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে পাড়ার কচি মেয়েগুলোর সঙ্গে ফ্লার্ট করতো।

সর্বাঙ্গ ভিজে একটা বাস এসে থামলো। সেটাকে যেতে দিয়ে স্বাতী বললো, বিশ্বাস করবে না দিলীপদা—বিবাহিত লোক—তবু আশপাশের বাড়িতে কাউকে দেখলে ইশারা করে, অঙ্গভঙ্গী করে।

এ পাগলামি তোমারই জন্যে স্বাতী। তোমাকে না পেয়ে।

হয়তো আমাদের একদিন ভালোবাসা ছিল দিলীপদা। তবে তা অনেকদিন আগে। আর কিছু পড়ে নেই। তোমার বউ নিশ্চয় খুব সুন্দরী।

ভীষণ। একদিন চলে এসো।

আমার তো বেড়িয়ে বেড়ানোর সময় নেই। কাজ আর ছেলেকে নিয়ে আছি।

এই কার্ডখানা রাখো। দরকার হলে ফোন করবে।

দরকার তো হবেই দিলীপদা। তুমি কোল ইণ্ডিয়ায়। বাঃ! আমায় দু'-একটা বড় খদ্দের ধরে দাও না। যাদের অনেক লরি চাই—

তোমায় আমি একটা ভালো কাজ দিতে পারি। ফোন করে চলে এসো।

আমি যাবো কিন্তু।

তোমার ঠিকানা তো দিলে না স্বাতী?

ফলো করার চেষ্টা কোরো না। আমি এখন কাউকে ঠিকানা দিচ্ছি না।

আমার ছেলে অনার্স পড়ছে।

পুরুষ লোকের আবার বয়স কি! একদম বিশ্বাস নেই। একই ছেলে?

ছেলে একটা। মেয়ে একটা। মেয়ে ছোট।

আমার খুব মেয়ের শখ ছিল।

রিফাইনারি থেকে ডিস্টিলারি। চা থেকে চিনি। সব ব্যবসাই আছে—এমন কোম্পানী তো স্যার লেজলি উডের। স্বাধীনতার মাত্র এক বছর আগে স্যার লেজলি স্যার হন। তখন ওঁর মোটে বাইশ বছর বয়স। ওঁরা বাপ থেকে ছেলে—সবাই এভাবে নাইট হয়ে আসছেন। রানী ভিক্টোরিয়ার আমল থেকে। ওঁদের বাড়ির

কেউ না কেউ রাজবাড়ির জন্যে প্রাণ দিয়েছেন। সম্মান এনেছেন।

বয়স বোঝার উপায় নেই। দিব্যি জোয়ান চেহারা। স্যার লেজলি দিলীপকে তাঁর ভিলায় নেমন্তন্ন করলেন। তোমাদের খনির সঙ্গীদের কাউকে এনো। আমায় সব বুঝিয়ে বলতে হবে।

দিলীপ বুঝলো, ঋষি নয় তো অনন্ত—কাউকে নিয়ে আসতে হবে। সে কাগজে দেখেছে, পার্লামেন্টে স্যার লেজলির খরচ-খরচা নিয়ে কোশ্চেন-আনসার হয়। বিলেতে 'সমিতিবদ্ধ' কথাটা কোম্পানীর দরজায় ব্রাসো দিয়ে ইংরেজি বাংলা—দুই ভাষাতেই লেখা।

পুরনো আমলের বাড়ি। তবু কোম্পানির ইতিহাস যে এদেশে দেড়শো বছরের পুরনো তা বোঝাতেই যেন বনেদী প্যাটার্নের দরজা, কাঠের প্যানেল, রিসেপশনে ঘন সবুজ কার্পেট, হাউস ম্যাগাজিনে কিছু সুখী কর্মচারীর ছবি।

একতলায় নেমে দিলীপ দেখলো, কোম্পানির লোকজনের প্রায় একশোখানা গাড়ি ফুটপাথে লেজ গুঁজে সারি সারি দাড়ানো। তার এক ফাঁকে সনাতন গাড়ি পার্ক করিয়েছে। কলকাতায় পুরো দস্তুর বর্ষা। গাড়িগুলোর ছাদে বর্ষা পড়ে নানা রকমের ছবি আঁকতে আঁকতে জলের ফোঁটাগুলো গড়িয়ে পড়ছিল।

এখন ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠতে গেলে একদম ভিজতে হবে। বৃষ্টি ধরা অব্দি দাঁড়িয়ে থাকবে বলেই ঠিক করলো দিলীপ। সামনেই কি একটা আদালত-বাড়ি—সাত-পুরনো—গায়ের ছাল-বাকল উঠে গেছে—পুরনো পাইপ দিয়ে গল গল করে জমা জল ছাড়ছে।

এখন গোকুলদা নিশ্চয় তার গোডাউনে বসে ঘিয়ের টিন সিল করাচ্ছে। কিংবা খাটালের মোষদের জন্যে খড়ের স্টক পরীক্ষা করে দেখছে। সামনে পুরো বর্ষা। অনন্ত তার ব্যাঙ্কের কনফারেন্স রুমে বসে হয়তো চেয়ারম্যানকে দরকারী স্ট্যাটিস-টিক্স এগিয়ে দিচ্ছে। পার্লামেণ্টারি কমিটির সামনে। এম-পি'রা ঘুরে ঘুরে কোশ্চেন করছেন। কলকাতার পর এম-পি-দের টিম যাবে মাদ্রাজে। মীরা পার্ক হোটেলের আর্কেডিয়ায় সম্ভবত সারা গায়ে অয়েণ্টমেণ্ট বাথ নিচ্ছে। তাতে কর্পূরের গন্ধ। মাথাটা জলের ওপরে। আজ সাতদিন হলো কার্ল করিয়েছে।

বৃষ্টির ছাট এসে পা ভিজে যাচ্ছিল দিলীপের। সনাতন কাঁচ তুলে দিয়ে ভেতরে ঘুমোচ্ছে নিশ্চয়। এখন কোন বিজনেস হাউসে—কিংবা বড় বাড়িতে ঢোকার মুখে—সনাতনের চোখের সামনে ডান হাতের দুটো আঙুল দোলায় দিলীপ। একটা ধরো। হবে? কি হবে না? শেয়ার নেবে তো? যদি নেয় তো আমার কমিশন থেকে কি চাই তোমার?

একটা হাতঘড়ি দেবেন দাদাবাবু।

কিংবা কোনদিন সনাতন বলে, এবার দাদাবাবু আমাদের দেশে দশ বিঘে ধানী জমি কিনুন।

কিনবো। কিনবো। এই ডিলটা কমপ্লিট হয়ে গেলেই কিনে ফেলবো। দশ নয়—একবারে পঞ্চাশ বিঘে। বড় করে দীঘি কাটবো।

এক লপ্তে তো অত জমি পাবেন না দাদাবাবু।

টাকা রেডি থাকলে সব পাওয়া যায় সনাতন।

এই পৃথিবী এখন দিলীপের অন্তহীন লাগে। বিশেষ করে ডালহৌসি। এইটুকু জায়গা। অথচ এর এক ফুট অন্তর শেয়ার, লগ্নী, কমিশন। আমি এত বছর তাহলে কি করেছি? শুধু চেয়ারে বসে অন্যের বোঝা বয়েছি—আর মাস মাইনে পেয়ে খুশী থেকেছি। এখন আমার সামনে সারা ডালহৌসি। তার ওপর দিয়ে শুধু হেঁটে গেলেই হয়। পুরো ডালহৌসিকে যদি বোঝাতে পারি—যদি কনভিন্স করা যায়—তাহলে তো অঢেল ক্যাপিটাল। সেই ক্যাপিটালের কার্পেটের ওপর দিয়ে আমি এখন হেঁটে যাবো। আমার গলায় দমকলের গাড়ির সেই ঘণ্টাটা বাজবে। পেছনে থাকবে চিড়িয়াখানার একটা হরিণের বাচ্চা। নতুন টাটকা গায়ের রং। রোদ পড়ে পিছলে যাবে। আমরা দুজন হেঁটে রাস্তা পার হবো জি পি. ও.-র সামনে। তখন সব গাড়ি থেমে যাবে। টয়োটা, কারমান ঘিয়া, ওপেল, অ্যামবাসাডর, অস্টিন টুরার। সবাই স্টিয়ারিং থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখবে। ওই যে সে আর তার হরিণশিশু ঘণ্টা বাজিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। সারা ডালহৌসিকে লোকটা কনভিন্স করেছে। আমার মত লোককেই ইংরেজিতে ট্রিকস্টার বলে। অথচ আমি আসলে মোটেই স্মার্ট নই। মোটা। সব ভুলে যাচ্ছি। হয়তো শীগগিরি হাবা হয়ে যাবো। অনেক দিন পরে নিজের চেয়ারে বসে দিলীপ বসু ইণ্টারকমে ঋষিকে চাইলো। ঘরে নেই। কোথায় যেতে পারে? বাইরে বৃষ্টি।

কোল ইণ্ডিয়ার সিক্সথ ফ্লোর সবচেয়ে বেশি সাজানো। সেখানে মেরুন রঙের কার্পেট, আগাগোড়া কাঠের প্যানেল, একজন অনামা খনি শ্রমিকের ব্রোঞ্জের স্ট্যাচু, গদিওয়ালা চেয়ার দিয়ে সাজানো ভিজিটার্স রুম, কনফারেন্স রুম, বড় বড় কর্তাদের পেল্লায় পেল্লায় ঘর। সে সব ঘরের একদিকের দেওয়াল পুরোটা কাঁচের। দরকারে ভারি পর্দা টানলে ঘরের আবহাওয়া ভারি গম্ভীর হয়ে যায়। পর্দা সরালেই ছাদের ওপর তৈরি সাজানো বাগান। সেখানে শীতের দুপুরে কিংবা গরমের সন্ধ্যায় ডিগনিটারিদের জন্যে গার্ডেন পার্টি বসে দুপুরবেলায়। রঙীন ছাতার

নিচে কখনো কখনো চেয়ারগুলো ঘনিষ্ঠ হয়।

এই ঘরগুলোর একদম কোণেরটায় বসেন চেয়ারম্যান। তার তিন ঘর আগে বসে অনাথ চক্রবর্তী। ন্যাশানালাইজেশনের অনেক আগে থেকেই কয়লায় যারা নিজেদের কাজের ছাপ রাখতে পেরেছে—তাদের ভেতর প্রথম দুটি নাম—অনাথ চক্রবর্তী আর সাধন গুপ্ত। অনাথদা আজকাল খুব অ্যাক্টিভ নয় ঠিকই—কিন্তু যারা জানে—তাদের চোখে সে একটি নাম। একদা তার কাজ তাকে এ নাম দিয়েছিল। এখন একদম কিছু না করায়--তার জিন খাওয়া—তার আড্ডা—তাকে আরেক রকমের নাম দিয়েছে। তাতে কিছু গল্প-কথা মেশানো। কিছু পাগলামি মেশানো। বছর বছর কোল ইণ্ডিয়া তার পুল থেকে অনাথকে নতুন গাড়ি দেয়। তার বেড়ানো, তার মেডিক্যাল, তাব এক্সপেন্স অ্যাকাউন্টস—যেন, এখন একদা কাজ করার—ভীষণ বেশি কাজ করার জন্যে ঋণ শোধের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে কোল ইণ্ডিয়ার পক্ষে। সেই তুলনায় সাধন গুপ্ত—অতটা কাছাখোলা নয়। সে নিয়মমাফিক এক্সটেনশনের মেয়াদ বাড়িয়ে চলেছে। গাম্ভীয সহকারে এই ফ্লোরে একটি ঘরও দখল করে আছে সাধন গুপ্ত। এই সাধন একদা নতুন খাদান খোলার লোক আমদানী করতো ছত্তিশগড় থেকে। পুরনো খাদান ছেড়ে আসার সময় বালি বোঝাই করে স্টোর করতো—পাছে না পাশের খাদান কোল কাটিংয়ের সময় ভেঙে পড়ে। সিক্সথ ফ্লোরে এলে গাঙ্গেয় উপত্যকায় কয়লার ইতিহাসের শেকড়সুদ্ধ যেন দেখতে পায় দিলীপ। এখানে সব পুরনো। এখানকার সেই ইতিহাসের গন্ধ সে পরিষ্কার টের পায় নিজেরই নিঃশ্বাসে। এই দেড় যুগের ওপর কোল ইণ্ডিয়ার চেয়ারে বসে বসে—পয়লা তারিখে মাইনে পেয়ে পেয়ে সে এইটুকু বুঝেছে—এই অফিস তাকে কিছুই দেয়নি। আরও বেশি করে বুঝতে পেরেছে এই ক'মাসে। ভৌমিক ট্রাস্টের হয়ে খাদান খোলার ক্যাপিটাল যোগাড়ে নেমে সে জানতে পেরেছে—এই ফ্লোরে বসে যারা ডিসিসন নেয়—তাদের অনেক কিছু করার ছিল তার জন্যে। কিন্তু কিছুই করেনি তারা। দিলীপ বসু এতকাল তাদের কাছে 'ফর গ্র্যান্টেড' হয়েই ছিল। এক এক সময় এদের অদ্ভুত লাগে দিলীপের। উঠতেও দেবে না তাকে। বাড়তেও দেবে না। প্রিয় দিলীপ—তোমাকে আমরা যে চেয়ারটি, যে টেলিফোনটি দিয়েছি—সেটি নিয়ে আমাদের পছন্দমত থাকো। ফাঁকি দাও তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু বাড়তে চেয়ো না। তোমায় যেমন রাখতে চাই তেমন থাকো দিলীপ। এক-একদিন ভালো গাঁইতি দিয়ে এই ফ্লোরটা আগাগোড়া তার উপড়ে ফেলতে ইচ্ছে করে।

অনাথ চক্রবর্তীর ঘরের দরজা খুলতেই যা আশা করেছিল—তাই দেখতে পেলো

দিলীপ। অনাথের মুখোমুখি ঋষি বসে। বাধ্য, সুবোধ, অনুগত অনুগামী যথা! মাইকেলের লাইনগুলোর টিউন এসে ধাক্কা দেয় কানে।

বোসো দিলীপ। বোসো। এখন আমি ঋষিকেই সবচেয়ে ভালোবাসি। তার পরেই তুমি।

অন্যদিনের মত দিলীপ এ হাসিতে যোগ দিতে পারলো না। তার মন বললো, ঋষি—আমি যখন অফিস ফেলে স্যার লেজলির টেবিলে সাত কাহন কথা পেড়ে চলেছি—তখন তুমি এ-ঘরে অনাথ চক্কোত্তির সঙ্গে বসে তার ইডিওসিনক্রেসিতে তা দিয়ে চলেছো। কারণটা আমি জানি ঋষি। ম্যানেজমেন্টের হাই পাওয়ার কমিটিতে অনাথ চক্কোত্তি আছে—তাই নয় কি?

ঋষিকে পরিষ্কার অনাথ চক্কোত্তির কথা বলতে ঋষি বলেছে—হি ইজ এ রেক নাউ। একসময় তো অনেক করেছে মানুষটা। কয়লাব জন্যে। আমাদের জন্যে তো বটেই। তোর জন্যেও—

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই দিলীপের। দিলীপও চুপ করে থেকেছে। কিন্তু একথাও সে ভুলতে পারে না—কৃতজ্ঞতার দাম কত? রাস্তা থেকে ধরে এনে অনাথ চক্কোত্তি তাকে, ঋষিকে এ অফিসে বসিয়ে দিয়েছিল একদিন। সেই বসানোর দাম কত? কতদিন ধরে সে দাম দিতে হবে?

. কি? কথা নেই কেন মুখে? এখন তো তুমি মোটা টাকার মানুষ!

কোথায় আর? আমি কি কাজ করি এ-অফিসে তা তো আপনি জানেন অনাথদা।

অফিসের বাইরেও তো করো!

সেও তো আপনি জানেন। একটু থেমে দিলীপের মনে হলো এখুনি তার ভেতরকার অনেক কথার ডালা খুলে ফেলা দরকার। হাসতে গিয়ে দেখলো, যদিও নিজের মুখ নিজে দেখা যায় না, তবু বুঝলো—তার মুখে সামান্য জ্বালা হচ্ছে। নিজের মুখটা যেন দুমড়ে যাচ্ছিল। সেই অবস্থাতেই বলল, আমার সামনে আর কোন রাস্তা খোলা রাখা হয়নি। আমি তো এতকাল এমন একটা সুযোগের জন্যে বসে ছিলাম। আমাকে ঋষি ওরা কাজে লাগানোতে আমি তো বেঁচে গেছি। এখানে তো জানিই—আমার কিছু হবার নয়। হবার নয় অনাথদা—

ধৈর্য ধরো।

একথা একদিন সাধন গুপ্তও বলেছিলো। অনেকদিন আগে।

ঋষি কথার মোড় অন্যদিকে ঘোরাবে বলে একদম অন্য জায়গা থেকে শুরু করলো। দিলীপ কিন্তু উইজার্ড লোক। কোত্থেকে যে ক্যাপিটাল আনছে—

কীভাবে আনছে—ভাবলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন অনাথদা।

সে-জন্যেই তো দিলীপের জন্যে আমার চিন্তা হয়।

দিলীপ মনে মনে একটা মার-খাওয়া মানুষ হয়েই ছিল। একথার মানে সে জানে। সে জানে—আজ হোক কাল হোক কোল ইণ্ডিয়ার মার্কেটিং ডিভিশন সব জানবে। কিংবা অলরেডি জেনে বসে আছে। আচমকাই দিলীপ বলে বসলো, অনাথদার ভালোবাসাবাসির নদীতে নিজেই উনি পছন্দমাফিক উঁচু-নিচু ঢেউ তোলেন। আর ও তো নিজেকে ছাড়া কাউকে ভালোবাসে না। কিন্তু তুই? তুই ঋষি? তোর তো এমন কথা ছিল না।

ঋষি কি বলবে বলে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু সব কথা সব জায়গায় বলা যায় না।

ছয়

দক্ষিণ দিকে কয়লা ভর্তি দশটা খোলা টাব তারের রশি বাঁধা অবস্থায় ইলেকট্রিক হলেজের জোরে পাতাল থেকে বাইরের পৃথিবীতে উঠে গেল। অবলীলায়। গোকুল দত্ত মাইনারের মেটাল হেলমেট পরা অবস্থায় ঐকদম অ্যাসট্রোণ্ট। প্রায় সেই ভঙ্গিতেই অনন্তকে বলল, গোবিন্দ স্টিল সময়মত কয়লা পেলেই সব মেনে নেবে।

না গোকুলদা। সেভেনটিন পারসেণ্টের বেশি অ্যাশকনটেণ্ট থাকলে ওরা কণ্ট্রাক্ট বাতিল করবে নির্ঘাত। চালান খালাসই করবে না।

তা উপায় কি বল?

এখানে তো দেখছি—সেল আর কয়লা একসঙ্গে কাটাই হয়ে মিশে যাচ্ছে। কোন বাছাইয়ের ব্যাপারই নেই।

দু-এক চালান গোবিন্দ স্টিল মেনে নেবে দেখিস। ওরাও তে দরে ওয়েস্ট কোস্টে কয়লা পাবে না। মাথা খুঁড়লেও পাবে না অনন্ত।

তাই নিয়ে তো, গোকুলদা, আপত্তি তুলেছে কোল ইণ্ডিয়া। ঋষি বলছিল। দিল্লিতে এখন ফাইল চালাচালি হচ্ছে।

তাহলে?

দিলীপদা বলছিল, ডেলিভারি দিয়ে যাও। তারপর দিল্লি দেখা যাবে। দরকার হলে দিল্লি যাবে দিলীপদা।

দিলীপ গেলে ঠিক সুরাহা হবে দেখিস। দিলীপের জন্যেই তো রেল কোম্পানি লাইন পেতে দিল। এত তাড়াতাড়ি দিত না।

পাতাল মুলুকে গাড়িঘোড়া বলতে এই হলেজ। এই সেদিন তারের রশি

ছিঁড়ে গিয়ে কাট্নি মেশিনের ড্রাইভার প্রায় মরতে বসেছিল। আজকের লুজ-ম্যান লক্ষ্মণ ডোমের কিন্তু ভয় নেই। কিছু হলে সেই হয়তো আগে যাবে। রশি ছিঁড়ে গেলে হলেজের গতি ঘণ্টায় দুশো মাইলও হতে পারে।

হলেজ রাবিশ করছে কয়লাবোঝাই টাবগুলোকে। ভেতরটায়—কী দিন—কী রাত—সমান অন্ধকার। রাস্তা দিয়ে চলেছে মেশিন কুলি, লোডার, মাইনিং সর্দার, ওভারম্যান, সর্ট ফায়ারার। পাতালের এ-দুনিয়া একেবারে আলাদা।

গোকুল দত্ত অনন্তর মুখ দেখতে পাচ্ছিল না। অন্ধকারেই অনন্তকে বললো, দিলীপটা একটা পাগল। না হলে এত কাণ্ডের জিনিসপত্তর এই এক বছরের ভেতর যোগাড় করা চাট্টিখানি কথা নয় রে—

দিলীপদার কথা বলো না। ওর পক্ষে সবই সম্ভব। একটা ব্যাঙ্ক স্টার্ট দিলেও দিতে পারে মানুষটা। ওকে তো আমি কম দিন জানি না—

ভিজে ভিজে রাস্তা। কোথাও ওপর থেকে ফোটা ফোঁটা জল পড়ছে। মনে হবে--ওপরে বৃষ্টি হচ্ছে। ওপরে বৃষ্টি হোক বা না হোক—এখানে এই পাতালে কোন রকমফের নেই। অমুনভাবে চুইয়ে চুইয়ে জল পড়বেই। কয়েকটা জায়গায় জায়গায় জল জমেছে।

গোকুল আর অনন্ত অন্ধকার কুরে কুরে এগোচ্ছিল। এক জায়গায় এসে রাস্তা শেষ। এই শেষটা অবশ্য পিছিয়েই যাচ্ছিল। কয়লা যত কাটাই হচ্ছে—রাস্তাও তত ভেতরে চলে যাচ্ছে। এর ঠিক ওপরেই পৃথিবীতে হয়তো একটা গ্রাম। সেখানে ঘরবাড়ি। হয়তো রান্নাবান্না—নয়তো অন্য কাজকর্ম চলছে। ওরা হয়তো ভাবতেও পারবে না—ঠিক ওদের নিচেই কী ভয়াবহ কাণ্ডকারখানা চলেছে।

মাইনিং সর্দার এগিয়ে এসে গোকুলদের সরে দাঁড়াতে বললো। এক-একবার বারুদ ঠেসে—জোর দাগানিতে—এক-একবারে টন চোদ্দ করে কয়লা উঠছিল।

ওরা দুজনে ওপরে উঠে এসে বুঝলো—কথায় কথায় গল্প করে এ-কাজে যেদিন সবাই মিলে নেমেছিল—তারপর এই এক বছরে—কাজ কি বিরাট করে এগিয়েছে—কাজ কী পরিমাণে বেড়েছে।

ভৌমিক ট্রাস্টের বাংলোর বারান্দায় বসে গোকুল দত্ত বললো, আজ এখানে দিলীপ থাকলে ভালো হতো রে অনন্ত—

দিলীপদা? তাকে পাবে কোথায়! সে এখন গ্যাখো গিয়ে কোন্ কোম্পানির চেয়ারম্যান নয়তো ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছে। নয়তো খৈতান কিংবা বাজোরিয়াদের প্রাইভেট পুলে সাঁতরাচ্ছে। ক্যাপিটাল। আরও ক্যাপিটাল চাই।

এক শীত ঘুরে আরেক শীত এসে গেল। কাছেই পাণ্ডবেশ্বরের পাহাড়। বিকেল মুছে যাবার আগে সূর্যটা এইমাত্র পাণ্ডবেশ্বরের মাথায় লাল আগুনে রংয়ের বল গড়িয়ে দিয়েছে একটা। বলটা অন্ধকারে হারিয়ে গেলেই অন্ধকার আর শীত একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেদিকে তাকিয়ে অনন্ত বললো, ঋষি আর দিলীপদা —দুজনে দুদিকে চলছে। কি করা যায় বল তো গোকুলদা ?

আমারও ভালো লাগছে না। একজন খাদান বাড়াতে চায়। ক্যাপিটাল আনতে চায় আরো। আরো ক্যাপিটাল। আরো লেবার। অন্যজন আর এগোতেই চায় না। ঋষির কথা হলো—কে এই ঝক্কি পোয়াবে! আমাদের তো বয়স হচ্ছে। দশ বছর আগে হলে অন্য কথা ছিল। সত্যিই তো অনন্ত—

কিন্তু দিলীপদাকে তার জেদ থেকে কে থামাবে! সে কোল ইণ্ডিয়াকে একটা লেস্‌ন্‌ দিতে চায়। পাগলামি নয় কি ? কোথায় কোল ইণ্ডিয়া! আর কোথায় আমাদের ভৌমিক ট্রাস্ট।

গোকুল দত্ত পাণ্ডবেশ্বরের পাহাড়ের মাথার ওপরকার লাল বলটাকে দেখে নিল। এই ডুবে যায়—অথচ ডোবে না। সেদিকে তাকিয়েই গোকুল দত্ত বললো, কাজের লোকটাকে কোল ইণ্ডিয়া কোনদিন কাজে লাগায়নি।

এটা আমার কাছে একটা মিস্ট্রি গোকুলদা।

সে জন্যেই তো দিলীপ এ-ব্যাপারে অত জিদি। গোকুল দত্ত আর কিছু বললো না। তার মনের ভেতর কোন গাছ উপড়ে পড়ার মত থমথমে ভাব। অথচ কেন গাছটা উপড়ে পড়বে--সে তা জানে না। গোকুলের চোখের সামনেই বাংলোর সামনের মাঠটা অন্ধকার হয়ে গেল। একদিকে দুমকা-সিউড়ির রাস্তা। ঠিক উল্টো দিকে পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ার ভেতর দিয়ে বড় বড় কোলিয়ারির গা ছুঁয়ে আরেকটা অজগরের ফিতে। দুটো পথই এখন অন্ধকারে তলিয়ে গেল। পথ যে ওখানে আছে—তা বোঝা যায় চলন্ত গাড়ির হেড-লাইট দেখে।

দিলীপদার এ খাটুনি যদি কোল ইণ্ডিয়া পেতো!

উরে ব্বাস! তাহলে তো রাজা হয়ে যেতো।

অথচ ছ্যাখো গোকুলদা—লোকটাকে কাজে লাগাবে না। টোয়েন্টি সেভেন হর্স পাওয়ার—সব সময় থর থর করে কাঁপছে।

এমন লোকের তো জেদ হবেই। অথচ এ-খনি আরও বড় করার হ্যাপা পোয়ানো কার সইবে বল ? আমার খাটাল কি আরও বড় হতে পারতো না ? পারতো। কিন্তু করিনি। সামলাবে কে ?

দিলীপদা চায় টক্কর দেওয়ার মত কোল এম্পায়ার। নিজেই জানে—টনেজ

বেড়ে গেলে ন্যাশানালাইজেশনের আওতায় পড়তে হবে। তবু—তবু বড় করা চাই। এইটা অন্ধ জেদ গোকুলদা। এখানেই তো মিলছে না—। কয়লার সাম্রাজ্য দিয়ে আমাদের মত মানুষের কি হবে?

ওটা একটা কষ্টের জায়গা দিলীপের। সবই বুঝি অনন্ত—অথচ কিছু করতেও পারবো না। এই মেশামেশি—দেখাশুনো—দিলীপ থাকলে হাসিতে—গল্পে—নাচে ভরাট হয়ে যায়। দেখিস—এই কয়লাই না একদিন আমাদের ভেঙে ছ্যায়—টুকরো টুকরো করে ছ্যায়।

অনন্তও ধরতে পারছিল না।—এত বড় একটা কাজের ভেতর—খাদান নিয়ে এতটা এগিয়ে যাওয়ার পর কোথাও যেন থেমে পড়ার ঘণ্টা বাজতে শুরু করে দিয়েছে। স্রোতের ভেতর উল্টো স্রোতের জল ভাঙার শব্দ।

তিরিশ মাইল দূর থেকে পাকা রুই আনিয়েছে অনন্ত। তার কয়েকখানা বড পিস ভাজা, বরফের কিউব, ওথেনার—সব সাজিয়ে দিয়ে গেল বাংলোর বেয়ারা।

অনন্ত বলছিল, জানো গোকুলদা---আমার পূর্বপুরুষরা শুধু বাড়ি বানিয়ে গেছে। বাড়ির পর বাড়ি। হরিদ্বারে বাড়ি। বৃন্দাবনে বাড়ি। সব জায়গায় একখানা দুখানা করে বাড়ি। অনেক বাড়ি আমি চোখেও দেখিনি।

আমি, অনন্ত, শুরু করেছিলাম একটা দিশী গাই নিয়ে। দুধের ক্যানভাসারি করতাম সাইকেলে সাইকেলে--

ক্যানভাসারি?

ওই হলো গিয়ে দুধের যোগান যাকে বলে। মীরাকে আনলি নে কেন এবারে? ভালো লাগতো ওর।

আসতে চাইলো না। কে বল কলকাতা ফেলে কয়লার ধুলো মাখতে আসবে। হাজার হোক মেয়েমানুষ তো। এখানে এলে মেকআপ বিগড়ে যাবে।

গোকুল দত্ত হেসে ফেললো। মেয়েছেলের মন ভালো রাখতে একটা কাজ করবি। মাঝে মাঝে দুজনায় মার্কেটে যাবি। শপিং করবি!

অনন্ত ভৌমিক এই সফল খাটাল-মালিকের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছিল।

হাসির কথা নয় রে! ওরা কেনাকাটা খুব ভালবাসে। একটা হার কিনে দিবি মাঝেমধ্যে।

উরে বাব্বা! তুমি হাসালে গোকুলদা। এই করে তুমি রেখা বৌদির মন পাও!

রেখা আমায় খুব ভালবাসে রে—

তোমার ছেলেরা কিছু বলে না?

বড়ছেলে তো দেখাশুনো করে ওদের এই মাকে।

তুমি একটা ছেলে দিলে পারতে এ বউকে !

আর হয় না রে। বয়স হয়েছে রেখার। তারপর মাথার গরম আছে। চত্তির-বোশেখে পাগল হয় মাঝে মাঝে। জানিস তো সব। এ অবস্থায় আবার যদি বাপ হই—ছেলেটা হয়তো পাগল হবে। লোকে আমাকেই দুষবে শেষে।

তার চেয়ে বল—আমাদের বড় বউদির ভয়ে তুমি আর বাপ হতে রাজি নও।

না রে পাগল। ছেলেদের বডমা রেখাকে খুব ভালবাসে। এই তো পুজোয় কাপড পাঠালে ছেলের হাত দিয়ে। যা, তোদের ছোট মাকে দিয়ে আয়—

বড বউদি কোথায় গো এখন ? সেদিন তো তোমাদের বাড়িতে খেতে বসে দেখতে পেলাম না।

বড় বউ ? সে এখন কাশী বেন্দাবন করছে মেজো ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। বেড়ালে মন ভালো হয়। মন বড় হয়। ও যে আমার কত কি মেনে নিয়েছে—ভাবলে অবাক লাগে। বলতে বলতে গোকুল দত্ত আবার পাণ্ডবেশ্বর পাহাড়ের মাথার দিকে তাকালো। খুঁজে পেল না। এখন সবটাই অন্ধকার। আলো শুধু এই বাংলোর হাতায়।

জানিস অনন্ত, আরও একজন আমার বউ হতে পারতো।

অনন্ত ভৌমিকের হাত থেকে হুইস্কির গ্লাস পড়ে যাচ্ছিল। আবার কোথায় কি করেছিলে ? কবে ? কিছুই তো জানি নে আমরা।

আমার এ জীবনটা একটা জীবন নয় রে।

তোমার নেশা হয়ে যাবে গোকুলদা। এমন একবারে খেয়ো না।

দিলীপের জন্যে মনটা বড় খারাপ লাগছে রে—

দিলীপদা ভাকাবুকো লোক। ওকে তুমি ফেরাতে পারবে না। বড়—আরও বড়—বিরাট বড় করতে হবে সব কিছু—এই যার রোগ—তাকে তুমি কি দিয়ে আটকাবে গোকুলদা ? ওর নিয়তি ওর নিজের হাতে। ওকে ফেরানো যাবে না গোকুলদা। যা বলছিলে বল।

যদি ফিরতো !

তারপর কি হলো ?

ও শুধু ঋষির কথাই শুনবে। আর কারও নয়।

ঋষিকে তো ভালোবাসে পাগলের মত। তারপর কি হলো গোকুলদা ?

তখন আমার বয়স কম ছিল। কুস্তি করতাম। আদ্দির সেরওয়ানি পরতাম। বছর বিশ-বাইশ বয়স হবে। লক্ষ্ণৌতে পড়ে আছি বাঈজি বাড়ি। গান শুনছি তিন মাস। বাবা লোক পাঠিয়েও ফেরত আনতে পারেননি।

কেন ?

ফিরবো কি ! তখন আমি মীনা বাঈয়ের মেজো মেয়ের পেটের ছেলের বাপ।

মীনা বাঈকে কোত্থেকে পেলে গোকুলদা ? তোমার নেশা হয়ে গেছে।

কেন বাজে বকছিস ? আমার পূর্বপুরুষদের—কর্তাদের কথা তুই জানিস কিছু যে কথা বলছিস ! মেজো কর্তার বাবা মেয়েমানুষ ন্যাংটো করে বাটনা বাটাতে বসাতো।

সত্যি ?

বাজে কথা রাখ তো। কেন বে-লাইন করে দিচ্ছিস ? মীনার মেজো মেয়েকে বিয়ে করবো। সব ঠিকঠাক। বাবা পুলিস দিয়ে অ্যারেস্ট করে কলকাতায় নিয়ে এলেন। একটি বছর পরে পালিয়ে আবার লখনৌ। কিন্তু দেখা হলো না।

কার সঙ্গে ?

তাঁর সঙ্গে। আমার প্রথমা স্ত্রী। বিয়ে হলে প্রথমা স্ত্রীই হতেন তিনি। তিনিই আমার প্রথমা স্ত্রী। বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেল। ছেলেটা আছে।

তোমায় চেনে ?

ফি বছর পুজোয় কাপড় পাঠায়। মেয়ের বে দিলাম। বেনারসী পাঠালো বোনের জন্যে।

কি নাম ছেলের ?

ওর দিদিমা নাম রেখেছিল প্রিন্স। প্রিন্স আমায় ইংরেজিতে চিঠি লেখে। ংলা তো শেখেনি। আমিও উর্দু জানি নে। তাই ইংরেজিতে লেখে।

ওই বড় মাছখানা খাও গোকুলদা। তোমাকে দেখা মানে বিশ্বরূপ দর্শন গোকুলদা। তুমি হলে গিয়ে তিনখণ্ডের উপন্যাস। যত জানছি তোমায়—তত অবাক হচ্ছি।

অবাকের কি আছে রে অনন্ত ? পুরুষমানুষের জীবনে তিন-চারটে গল্প থাকবে না ? তাহলে পুরুষমানুষ কিসের !

তোমার ঘি, তোমার দুধ, তোমার দুটি পরিবার, আশিটি অ্যানিমাল, তোমার খাটাল, তোমার প্রিন্স—তুমি অনাদি অপার আমার কাছে।

এসব কথায় গেল না গোকুল দত্ত। শুধু বললো, এখানে বড্ড মশা। চল, ঘরের ভেতর ফায়ার-প্লেসের কাছে গিয়ে বসি। ঠিক এই সময়টায়—লাস্ট ইয়ারে সবাই যেমন বসেছিলাম।

তখন তো দিলীপদা ছিল। মীরা ছিল। ঋষি। অনাথ চক্কোত্তি। সাধন গুপ্ত। দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল গোকুলদা। সেদিনটা কিন্তু

বড় সুন্দর ছিল।

দিলীপের কেমন বুকের পাটা ছিল—পরিষ্কার বলেছিল—আমি প্রাইভেটলি শেয়ার কেনাবো। ক্যাপিটাল যোগাবো। কতখানি কনফিডেন্স থাকলে একথা বলা যায় অনন্ত?

তা কথাও রেখেছে দিলীপদা।

আজ জানুয়ারির পাঁচ তারিখ। সুন্দর রোদ্দুর। সেই সঙ্গে শীত। দিলীপ বসু চান করে উঠে সুপ খেলো। ব্যালকনিতে পেতে রাখা ইজিচেয়ারে বসে বসে। রানী এসে বললো, শক্ত খাবার খাওয়া ছেড়েই দিলে!

ইচ্ছে করে না। কিছু ভালো লাগে না খেতে।

রোজ রাতে অতখানি করে মদ গিললে খেতে রুচি থাকে কারও?

খুব তো খাইনি। আমার চেয়ে ঋষি তো অনেক বেশি খায়। অজ্ঞান হয়ে যায়।

ঋষি অফিস করে। সময়মত লাবণ্যকে নিয়ে থিয়েটারও দেখে। তোমার ছেলেটা একটা গেছো মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে—সেদিকেও একবার দেখবে না!

ঘুরতে দাও। নিজের ফিউচার নিজের হাতে। ফাইনালে অ্যাপিয়ার হলো না?

ন'তলার ব্যালকনি থেকে চেতলা বেকারির চিমনি ঘিরে দাঁড়ানো একতলা দোতলা বাড়িগুলো দেখিয়ে রানী বললো, ওখানে থাকে মেয়েটা। আমি দেখিনি। কুটু বলছিল, রোজ সকালে দৌড় প্র্যাকটিস করতে বেরোয়।

অ্যাথলেট। ভালোই তো। বাঙালীর মেয়ে ভোররাতে দৌড়োয়—এ তো রেয়ার মেয়ে।

রাখো তোমার বাজে কথা। এখন যাচ্ছ কোথায়?

বরেন দত্তর ওখানে একটা গাড়ি এসেছে। থার্টি থ্রি্র ফিয়াট বেলিলা। স্পোর্টস কার। জাস্টিস্ চন্দ্রমাধব রোডের মল্লিক বাড়ির গাড়ি। এককালের সিনেমার হিরো দুর্গাদাসের বন্ধু ছিলেন ভদ্রলোক। তাঁরই নাতি গাড়িটা বেচে দিচ্ছে।

এখন সেটা দেখতে যাবে?

হ্যাঁ। সকালবেলাতেই তো শুভকাজ করতে হয়।

অফিস যাবে না?

ডালহৌসিটা হয়ে তবে যাবো।

সেই তোমার ক্যাপিটাল যোগাড়! কমিশন! এসব কবে শেষ হবে বলতে পারো? আমাদের তো এত টাকার দরকার নেই। লোভ ভয়ংকর খারাপ জিনিস।

টাকায় আমার লোভ নেই রানী।

কিসে তবে লোভ তোমার?

যদি বলি বন্ধুত্বে?

বাজে কথা। তুমি সবাইকে ভালোবাসো। আর কেউ তোমায় চায় না। এটা কখনো হতে পারে? নিশ্চয় তোমার কোন দোষ আছে।

হয়তো আছে। কিন্তু কি দোষ? কোথায় সে দোষ? তা আমি আজও জানি না।

ওই যে তোমার বেশি বেশি করে আগ বাড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া—আমিই সব করবো—এইটেই তোমার দোষ।

হতে পারে।

লোভও তোমার আছে! টাকায়!! গাড়িতে!!! বলতে পারো—একসঙ্গে একটা লোক ক'টা গাড়িতে চড়তে পারে? রোজ তুমি গাড়ি দেখে বেড়াও কেন? রোজ তুমি কমিশনের পেছনে ছুটে বেড়াও কেন? রোজ তুমি অফিসে যাও না কেন? গেলেও দেরি করে যাও কেন?

থেমেছো? তবে শোন এবারে। কমিশন আমার একটা অজুহাত মাত্র।

তাহলে? কিসের অজুহাত?

আমি একটা লোক—যে কিনা আজ অ্যাতো বছর এক চেয়ারে বসে কোল ইণ্ডিয়ার কমপেনসেশন, অ্যাশকনটেণ্ট, ওয়াগন মুভমেণ্ট হ্যাণ্ডল করে এসেছি—যার কোন জব স্যাটিসফ্যাকশন নেই, রেকগনিশন নেই—সেই লোক আস্ত একটা কয়লাখনি চালু করে দিল—ক্যাপিটাল যোগালো—ডালহৌসি জুড়ে যার মুখের কথায় তা-বড় তা-বড় হাউস শেয়ার নিল—এটা কি সে লোকটার কনফিডেন্স ফিরিয়ে দেয় না? আজকাল তো আমার মনে হয়—আমিই সেই লোক—যে কিনা নতুন একটা ব্যাঙ্ক খুলতে পারে। আমিই সেই লোক—যে কিনা নতুন একটা কোম্পানি খুলে জাহাজ ভাসাতে পারে জলে। যারা এসব করে—তাদের আমি দেখেছি—তারা আমারই মত লোক। একথা মনে পড়লে আমার আর অফিসে যেতে ইচ্ছে করে না।

শোন। তুমি নিজেকে বেশি বড় করে ভাবছো—আসলে তুমি কিন্তু তা নও।

সকালের রোদে চোখ তুলে তাকালো দিলীপ। রানীর মুখোমুখি। ন'তলার এ ব্যালকনিতে জীবন ছিমছাম। রোদে ধুলো থাকে না এখানে। বাতাসে পৃথিবীর কোন গন্ধ নেই। রানী দেখলো, দিলীপের বাঁ চোখের বাইরের দিককার কোণে দুটো খুব সরু শিরা ব্যথা পেয়ে লাল হয়েছে—তার চারদিকে নীল মেশানো ফ্যানের রং। রানী আস্তে বললো, তুমি আসলে একজন ছাপোষা মানুষ। তোমার সংসারের দিকে তাকাও এবার। রবিকে পরীক্ষায় অ্যাপিয়ার হতে বলো। চলো না—আমরা হোল ফ্যামিলি কোথাও গিয়ে বেড়িয়ে আসি। পুরী। চিল্কা। যশিডি—

আমার সময় নেই রানী। আর একটা ডিল বাকি। সেটা হয়ে গেলেই ফ্রি হয়ে যাবো। আর নয়। তখন শুধু রেস্ট। তখন আমি, তুমি, রবি, কুটু—আমরা সবাই মিলে তিন মাস ধরে বেড়াবো। লক্ষ্মীটি। আজ এখন বেরোবো।

রানী সরে দাঁড়ালো। চোখে জল এসে যাওয়ায় সে একটুও সাবধান হলো না। সোজাসুজি দিলীপের মুখে তাকিয়ে বললো, সেদিন আর কোনদিন আসবে না।

ন্যাশন্যাল লাইব্রেরির পাশ দিয়ে যাবার সময় দিলীপ বসু নাইন্টিন থার্টিথ্রি-র ফিয়াট বেলিলার ছবিটা ভাবছিল মনে মনে। দুজনের বসবার জায়গা। ড্রাইভার বাদ দিয়ে একজনের বসবার সিট। আরেকটা গাড়ি রংসাইড দিয়ে এসে পড়ায় ড্রাইভার ব্রেক কষলো। ঝুঁকে টাল সামলাতে গিয়ে একটা জিনিস দেখতে পেল দিলীপ।

চিড়িয়াখানার দেওয়াল ঘেঁষে একটা হরিণের বাচ্চা দাঁড়ানো। হরিণশিশু বলা যায়। সারা মুখে সকালবেলার রোদ। ওখানটায় হরিণদের জন্যে নকল পাহাড় বানানো আছে। তার মাথায় উঠে বাচ্চাটা চলন্ত মোটরগাড়ি, টায়ারের রঙীন হোর্ডিং, ন্যাশনাল লাইব্রেরির গেট—সবই দেখছে। আসলে বোধহয় ভাবছিল—একটা লাফ দিলেই তো মুক্তি। দেওয়ালের বাইরের পৃথিবী কী আশ্চর্য!

জিরাতপুল পেরোতেই দিলীপের মনে হলো, ফিয়াট বেলিলা গাড়িটা চালানোর সময় ওকে পাশে বসিয়ে নেবে। ডান হাতে ঝুলিয়ে দেবে দমকলের সেই ঘণ্টা। গাড়িটার দাম নিশ্চয় তিন-চার হাজারের বেশি হবে না। তেল বোধহয় বেশি খায় না।

একদিন রানী জানতে চেয়েছিল—আরেকটা গাড়ি দিয়ে কি হবে তোমার?

গুছিয়ে জবাব দিতে পারেনি দিলীপ। বলতে চেয়েছিল—ধরো কম দামী একটা গাড়ি। অথচ রাস্তা দিয়ে গড়ায় ভালো। হোক না পুরনো। তেল খায়

কম। তখন কেমন একটা ঘুরে-ফিরে বেড়ানোর স্বাধীনতা। সেটা কম নয় কি?

রানী বুঝতে পারেনি। বুঝতে চায়নি আসলে।

যেমন রানী বুঝতে চায়নি—ঋষিকে আমার কেন ভালো লাগে। অথচ ঋষি আস্তে আস্তে কোল ইণ্ডিয়ার নিজের লোক হয়ে উঠছে। সে-কি আমি যতখানি খাদান নিয়ে জড়িয়েছি—ঠিক ততটাই কোল ইণ্ডিয়া ওকে টেনে ধরেছে? এই কারণে? এ জন্যেই? আজও এ ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার নয়।

রানী হরিণশিশুর স্বাধীনতা কী জিনিস তা জানে না। দমকলের ঘণ্টাধ্বনির কী স্বাধীনতা—তা জানে না রানী। এই দুই স্বাধীনতা যেদিন আমার হাওয়া-গাড়ির সঙ্গে যোগ হবে—যে হাওয়াগাড়ির দাম কম, ফুয়েল কস্ট্ কম—অথচ গড়ায় ভালো—সেদিনই তো আসল মুক্তি। পৃথিবীর ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ঘোরাফেরার ইচ্ছেমত ফ্রিডম। সেই স্বাধীনতায় কোল ইণ্ডিয়া কখনো হাত দিতে পারবে না। আমি একটা জিনিস বুঝি না। ঋষি কেন খাদান বাড়াতে চায় না? যে ব্যবসার গ্রোথ্ নেই তার মৃত্যু অবধারিত। ও আমাদের খাদানের মৃত্যু চাইছে কি? আমি বুঝতে পারি না।

তাহলে কি ঋষি চায়—এই খাদান খেলা চলুক। আর বাড়িয়ে লাভ নেই। যা আসছে—যা পাওয়া যাচ্ছে—তাই-ই যথেষ্ট। আর কোল ইণ্ডিয়ার পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ায় ভৌমিক ট্রাস্টের কোল প্রোডাকসন যেন কোল ইণ্ডিয়াকে ছাড়িয়ে না যায়।

এসব ভাবছিল, আর দিলীপ বসুর মনে হচ্ছিল—আমি আর ঋষি আলাদা হয়ে গেলাম। এই সামান্য এক বছরের ভেতর। কি দরকার ছিল এখন খাদানে?

তার চেয়ে ও কি এ খাদানকে নিজের করে নিতে পারবে না? এ খাদান বড় করায়—আরও বড় করে তোলায় ওর কি আনন্দ হতো না? এই সকালবেলার রোদ্দুরও আমার কাছে অন্ধকার। আমি কোন পথ পাচ্ছি না।

অথচ ডালহৌসি আমার কাছে খোলা খাতা। এখানে ইনভেস্টমেণ্ট। এখানেই শেয়ার। খাটলে—স্কাই ইজ দি লিমিট। রাজমহল, আসাম, মধ্যপ্রদেশের মত—পাণ্ডবেশ্বর পাহাড়ের কোলে ভৌমিক খাদান একদিন হয়তো এম্পায়ার হয়ে উঠতে পারতো।

তবে কি ঋষি একই সঙ্গে কোল ইণ্ডিয়ার দৃষ্টিতে—অ্যাডভেঞ্চারের নায়ক—আবার এসট্যাবলিশমেণ্টের—প্রতিষ্ঠানের নয়নের দুলাল হয়ে থাকতে চায়? আঁখিতে রহো গো নন্দদুলাল! অ্যাডভেঞ্চারের নকল হিরো হলেই কি আরেক জায়গার নয়নের নন্দন হতে সুবিধে হয়?

আমি বোধহয় ভুল ভাবছি। তাই যেন হয়। তাই যেন হয়। ঋষি কখনোই

তেমন হতে পারে না। আমারই ভুল। আমারই নিচু মনের ভাবনা এসব। আমি ঋষির প্রতি ইনজাসটিস করছিলাম।

বরেন দত্তর বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নেমেই মনে পড়লো, ফিয়াট বেল্লিলা। নাইন্টিন থার্টিগ্গি। টু সিটার স্পোর্টস্ কার।

বরেনের ছেলে রুনু বেরিয়ে এলো হাঁসফাঁস করতে করতে। বয়স আন্দাজে বেদম মোটা। চলতে ফিরতে হাঁফায়। গাড়ির মেকানিজম্ নখদর্পণে। বরেন দত্তর ওয়ার্কশপ চালায়। দিলীপকে পাশে বসিয়ে একদিন কলকাতার রাস্তায় নাইনটি কিলোমিটারে গাড়ি চালিয়েছিল। স্টিয়ারিং ঘোরায় জলের মত। একদম ঘুড়ির লাটাই ঘোরায় যেন। নির্ভুল। দিলীপকে দেখে হাসলো। ভালো আছেন?

তোমার বাবা কোথায়?

বেরিয়েছেন। বসবেন?

না। ফিয়াট বেলিলা এসেছে একটা শুনলাম। তাই এসেছিলাম।

বাবা না এলে তো বলতে পারবো না। বসুন না আপনি। আমি একটু ওয়ার্কশপ যাবো। রুনু চলে গেল। দিলীপ চলে আসছিল। এক ছোকরা তাকে থামালো। ঠিক ছোকরা নয়। ছাব্বিশ-সাতাশের মেকানিক মার্কা চেহারা। গাড়ি নেবেন?

দিলীপ থেমে দাঁড়ালো। গায়ে লাল গেঞ্জি। ভালো করে কামানো গাল। আমার নাম গোপাল ঘোষ। আমি গাড়ি কেনা-বেচা করি স্যার। আপনি যে গাড়ি চান আমি দেখাবো। ইংলিশ কার। আমেরিকান কার। ফ্রেঞ্চ, জার্মান, রাশিয়ান—

দিশী পুরনো গাড়ি কি আছে?

সবরকম স্যার। আমিই তো বরেন দত্তকে গাড়ির খবর এনে দি স্যার।

বেশ তো। আমার এই কার্ড রাখো।

আপনাকে ব্রিটিশ দিতে পারি। পিজো, ফ্রেঞ্চ গাড়ি, চার সিলিণ্ডারের। ছবির মত গাড়ি।

কত দাম?

আপনার জন্য পঁচিশে করে দেব।

তার চেয়ে অনেক কমে অ্যামবাসাডার পাবো। কি দরকার আমার পিজো দিয়ে।

শো বলে একটা কথা। কোথায় অ্যামবাসাডার। আর কোথায় পিজো।

আমায় একটা কম দামের গাড়ি যোগাড় করে দাও।

কতর ভেতর? মানে আপনার বাজেট কত?

একদিন সকাল সকাল আমার বাড়ি এসো। তখন কথা হবে। এখন তো অফিস যাচ্ছি।

পার্ক স্ট্রীটে এইচ এম টি-র বাড়ি ছাড়িয়ে ডান হাতে পার্কিং লট। সেখানে দাঁড়ালে উল্টো দিকে পার্ক হোটেল। বেলা তিনটে। রোড সাইড ইন্-এর দরজায় মাতাসিকি কোঠারি দাঁড়িয়ে। তার একটু পরেই বার-বি-কিউ। মূলা রুজ। মাতাসিকি নাল আকাশ ছুঁয়ে পাখিদের মিলিয়ে দেখছিল। জানুয়ারি যাই যাই। চারদিকে রঙীন পোশাকে মানুষের মেলা—সাজানো সব দোকান-পশারের আশেপাশে। এই মাত্র মাতাসিকি কোঠারি রোড সাইডের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। লাঞ্চ-আওয়ার শেষ। এখন সব রেস্তোরাঁতেই ভাঙা হাট। হৃষ্টপুষ্ট, সুখী সুখী চেহারার আত্মবিশ্বাসী অথচ টেনশনে ভুগে ভুগে কান মোচড়ানো টান টান সেতারের তার—ছুঁলেই টং করে বেজে উঠবে—এমন সব কোম্পানি একজিকিউটিভ, অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির মিডিয়া ম্যানেজার, সাঁওতাল-ডিহির সাবকনট্রাক্টর—রেস্তরাঁগুলো খালি করে দিয়ে এইমাত্র যে-যার কাজে চলে গেছে, দু-একজন অবশ্য টুথপিক দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছিল তখনো।

বাইরে একটা অ্যামবাসাডারের রেডিও থেকে বিবিধ ভারতীর হিন্দী গান। গাড়ির মালিক বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ানো। গুজরাটি কি পার্সি বোঝা যায় না। হিন্দি ছবির অল ইণ্ডিয়া হিরোর হেয়ার কাট, টাই, কোট—সব কিছু. দাঁতের মাজনের চিন্তামণি হাসি দিয়ে স্বাতীকে ওয়েলকাম করলো।

স্বাতী আর দিলীপ রাস্তার জেব্রা ক্রস দিয়ে এদিকেই হেঁটে আসছিল। স্বাতী চাপা গলায় দিলীপকে বললো, আমার পার্টি।

বলা মাত্র দিলীপের মাথায় খচ করে লাগলো। পার্টি?

হুঁ। তুমিও তো এতক্ষণ তাই বোঝাচ্ছিলে, দিলীপদা। তোমার পার্টি, ইনভেস্টমেণ্ট, শেয়ার, খাদান না কি সব বললে। ভুলে গেলে এর ভেতর?

না। ভুলিনি। একথাটা দিলীপ নিজেই নিজের মনের ভেতরে বললো। স্বাতী ততক্ষণে লোকটার সঙ্গে কথা শুরু করেছে। কাঁচ লাগানো গাড়ির ভেতর থেকে মুকেশ গাইছিল। কথাগুলো পরিষ্কার। বাংলা ঘেঁষা যে কেউ বুঝতে পারবে।

সব কুছ শিখে হামনে
না শিখে হুঁশিয়ারী
...হাম হ্যায় আনাড়ি—

গাড়ির গায়ে হেলে দাঁড়ানো লোকটা পারলে তখনই স্বাতীকে পাশে বসিয়ে স্টার্ট দেয়। শুধু দিলীপের কেটে পড়ার অপেক্ষা।

স্বাতী পরিষ্কার বললো, নেহি। নেহি। আভি নেহি। তো থার্টিসিক্স ট্রিপস ক্রম কে জি ডক টু হলদিয়া।

পেপার্স নিয়ে অফিসে চলে আসুন। সেখানেই পাক্কা বাত হয়ে যাবে। তো ঘুরে আসি চলুন। দিলীপকে দেখিয়ে লোকটা বললো, ওকে কোথায় ছেড়ে দেবো বলুন।

নেহি। আভি নেহি। আভি তো ম্যায় ডগদর সাহেব কো পাশ যাউঙ্গি—

কিউ? কেয়া বেমারি?

কোঈ খাস বেমারি নেহি। ইউহি—

লোকটা গান শুনতে শুনতে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। হাত নাড়তে নাড়তে।

দেখলে তো? তোমার জন্যে কেমন কাটিয়ে দিলাম লোকটাকে।

আমি ভাগ্যবান।

ওভাবে কথা বোলা না লক্ষ্মীটি। কেমন পর পর শোনাচ্ছে।

এসো, গাড়িতে বসি।

তুমি অফিসে যাবে না দিলীপদা?

আজ আর যাবো না।

শেষে বউদি শুনলে আমায় দুষবে। আমার জন্যেই তোমার অফিস যাওয়া হলো না।

মোটেই নয়। আমি এরকম প্রায়ই যাই না।

যাও না কেন?

গিয়ে কি হবে! তার চেয়ে এই যে ঘুরছি—তাতে কি কম কাজ হচ্ছে?

সে তো তোমাদের সেই খাদানের কাজ। এ কথা স্বাতী বলতে না বলতে গাড়ি ময়দানের দিকে। শীতের পড়ন্ত বেলায় মেঘলা হয়ে গেল সারা আকাশ।

দিলীপ বসু একদম অন্য জায়গা থেকে শুরু করলো। আমি আজ ভাগ্যবান। এই লোকটাকে চলে যেতে হলো। আবার আরেকদিন আমি অভাগা হয়ে যাবো। সেদিন তুমি অন্য কারও সঙ্গে গিয়ে গাড়িতে বসে জানলা থেকে আমায় হাত নাড়বে।

তার কি দরকার। এসো না আমরা একসঙ্গে থাকি। এখন আর আমাকে-পাওয়ার ইচ্ছে নেই তোমার?

দিলীপ কোন কথা বললো না। সরাসরি স্বাতীর শরীরটা ধরে বুকে নিল। তারপর প্রায় বিশ-বাইশ বছর লেটে সেদিনকার একটা পুরনো চুমো খেলো। তখনকার ভেবে রাখা। পরে বেমালুম ভুলে যাওয়া। আবার এই কিছুদিনে ফিরে জেগে ওঠা একটা ভারি চুমু।

স্বাতী চোখ বুজে ফেললো। দিলীপের ঠোঁট স্বাতীর ঠোঁটে পড়ে পিছলে গেল। কি মেখেছো? কিছুতেই ঠোঁট রাখতে পারছি না।

স্বাতী চোখ সোজা অবস্থাতেই বললো, ও কিছু নয়। ট্রাই এগেইন্। ঠিক পারবে।

পিছলে যাচ্ছে যে—। কি মেখেছো বলো তো? খুব সুন্দর গন্ধ।

স্বাতী ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো দিলীপকে। তারপর সোজা হয়ে বসলো। বোকা কোথাকার। মেয়েরা কত জিনিস মাখে। তাছাড়া আমাকে বাইরে বেরোতে হয় রোজ। আমি তো কিছু মাখবোই।

জিনিসটার নাম কি?

নামটা খুব জরুরী তোমার এখন? প্রায় রেগে উঠেছে স্বাতী। ভুলে যেও না—আমি একজন প্র্যাকটিসিং কোয়ালিফায়েড বিউটিশিয়ান।

একথায় হো হো করে হেসে উঠলো দিলীপ। এতক্ষণ চাপা, তেজী নিঃশ্বাসে কথা বলছিল দুজনে। গঙ্গা এসে যাওয়ায় দিলীপ ড্রাইভারকে এমন একটা সিগারেট আনতে পাঠালো—যা কিনা আকাশবাণীর বাড়িটা পেরোলে তবে পাওয়া যাবে।

বৃষ্টির কোন চান্স নেই। কিন্তু গঙ্গার বুক জুড়ে—সারাটা এলাকা আকাশের সঙ্গে সঙ্গে মেখলা হয়ে পড়েছে। এখন আইসক্রিম বা ভেলপুরির কোন ভিড় নেই।

সেই হাসির তোড়েই দিলীপ বসু বললো, তুমি একজন প্র্যাকটিসিং কোয়ালি-ফায়েড বিউটি। সুন্দরী রমণী। তুমিও কমিশনে কাজ করো। আমিও করি। আমাদের দুজনের কোন ফারাক নেই।

আমাকে টাকা জমিয়ে চেম্বার খুলতেই হবে। ভালো রাস্তার বাড়ি না নিলে ভালো বাড়ির মেয়েরা, বউয়েরা আসবে কেন?

অত খুঁটিনাটিতে না গিয়ে দিলীপ হাসতে হাসতে বলল, আমরা দুটি ব্রোকার! সাদা বাংলায়—আমরা দুটি দালাল। কমিশনের দালাল!!!

স্বাতী কি বলতে গিয়ে থমকে গেল। একদম চুপ করে দিলীপ বসুর মুখে তাকালো।

দিলীপ এখনো গলা ফাটিয়ে হাসছিল। একসময় গলা চিরে গেল তার। সেই ফাটা হাসির ভেতরেই বললো, আমি শেয়ারের দালাল। তুমি লরির ট্রিপের দালাল!!

দিলীপের সেই চিরে যাওয়া হাসিগুলোর ভেতরেই স্বাতী শান্ত গলায় জানতে চাইলো, আমার জন্যে তোমার আর কোন ইচ্ছে নেই দিলীপদা ?

ইচ্ছে ? অনেক ইচ্ছে আছে। অনেক। কত ইচ্ছে তা কি বলবো তোমায়।

থামো। অত হাসির কি হলো ?

ধমক দিচ্ছো কেন ? আমি সব ভুলে গেলাম।

তখনই রোড সাইডে খেতে বসে বলেছিলাম—দুপুরে অতটা জিন খেয়ো না। পরেপর খেয়ে গেলে। জিনের নেশা বড় সাংঘাতিক। যখন ধরবে—তখন আর ছাড়বে না। তোমার নেশা হয়ে গেছে দিলীপদা।

না। আমার নেশা হয়নি। তুমিই আমার নেশা স্বাতী। কতদিনকার নেশা!

কি দেখছো অমন করে ?

দেখছি আর ভাবছি। এমন সুন্দরী বউকে ঘরে রাখতে পারলো না সুধীরবাবু।

সাত

হয়তো রবি ফিরল।

বেলা আড়াইটে-তিনটে। আদিগঙ্গার গা ঘেঁষে বনস্পতি কারখানার চিমনি এবারে রঙীন ধোঁয়া ওগরাবে। অসময়ে ডোরবেলের আওয়াজে রানী ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। এই সময়টা বাড়ি ফাঁকা থাকে। এরকম সময়েই রবি হঠাৎ হঠাৎ আসে। কিংবা রবি কাউকে দিয়ে খবর পাঠায়। টিকটিকির নজর এড়িয়ে। আজ দু মাসে পুলিস এসে রবির খোঁজে তিনবার এ-বাড়ি সার্চ করেছে।

শেষবার সার্চের সময় পুলিসের সঙ্গে দিলীপের দেখা হয়। সে এক হুজ্জোৎ। পুলিস যত কোশ্চেন করে দিলীপ তত বেয়াড়া জবাব দেয়। কারণ কিছুই নয়। দিলীপ রোজকার মতই মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরে দেখে—খাকির শার্ট গায়ে কতকগুলো লোক সারা বাড়ির কাগজপত্র এলোমেলো ঘাঁটকাচ্ছে। দিলীপ তাদের ওপর চড়াও হয় তখন। তাতে পুলিস দিলীপকে ব্যালকনিতে নিয়ে গিয়ে খানিকক্ষণ দুরমুস করে। তাতে দিলীপ আরও ক্ষেপে যায়।

এমন ছেলেকে জন্ম দিয়েছেন কেন?

আপনার সঙ্গে তখন কনসাল্ট করার সময় পাইনি স্যার। দিলীপের এই

জবাবের সময় রানী দেখতে পায়—তার স্বামীর বাঁ কানের নীচে রক্ত। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে কিছু করতে পারেনি। কারণ, ওদের বেডরুমে তখন ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের সঙ্গে তিনজন সি আর পি। এই তিন সি আর পি রবিরই বয়সী হবে। গাড়োয়াল কিংবা পাহাড়ী এলাকার তিনজন ভারতীয় যুবক। কোমরে বেল্ট। বেল্টে কুকরি ঝুলছিল তিনজনেরই।

রোজই এমন মাতাল হয়ে ফেরে আপনার স্বামী ?

রানী কোন জবাব দেয়নি। চুপ করে থেকেছে।

জবাব দিয়েছে দিলীপ। এটাও আপনাকে কনসাল্ট করে করা হয়নি স্যার। কাল সন্ধ্যের ঝোঁকে যদি কিছু উপদেশ দেন স্যার—তাহলে হয়ত আর নাও খেতে পারি। এই সন্ধ্যেবেলাতেই যত মন খারাপ হয় স্যার।

সাট আপ! এ জন্যেই আপনার ছেলে এমন হয়েছে। ছোটবেলা থেকে সঙ্গ দেননি—এখন গুণধর অ্যাকশন স্কোয়াডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। আমরা ওকে খুঁজে বের করবই।

পেলে স্যার আমায় একটু দেখিয়ে যাবেন। অনেক দিন ছেলেটাকে দেখিনি।

বিছানা থেকে নেমে রানী দরজায় গেল। এখন নিশ্চয় পুলিস আসেনি।

দরজা খুলতেই চমকে উঠল। এ কি ? তুমি ? ঠিকানা পেলে কোথায় ?

ভেতরে আসব ?

হ্যা—না—কিছুই বলল না রানী। শুধুই পিছিয়ে এল ঘরের ভেতর। তুমি আবার এলে কেন ?

আমি কিছু চাইতে আসিনি। একবার শুধু তোমাকে দেখে চলে যাব।

এত বছর বাদে! দরজাটা আটকে দাও।

আসবার ইচ্ছে অনেক দিনের রানী। সাহসে কুলোয়নি।

তুমি যে কাওয়ার্ড সে তো সবাই জানে। কি মনে করে ?

আমার তো কোন কিছু চাওয়ার নেই রাণু।

রাণু রাণু কোরো না প্রবোধ। এখন বয়স হয়েছে। ছেলেমেয়ে বড় হয়েছে। স্বামীর শরীর খারাপ। আমারও ভাল নেই। এখন আর পুরনো কাসুন্দি ঝালাবার মত মন নেই।

তুমি আর গান কর না ? আমি ওই চেয়ারটায় বসবো ?

হ্যাঁ। বোসো। আমি ভুলিনি—তুমি আমায় তিনশো গান শিখিয়েছিলে। সে সব গানের খাতা, হারমোনিয়ামটা—ওই সাইড কাবার্ডে আছে। খালি শিশি-বোতলের সঙ্গে।

তোমার মেয়ে গান শেখে না ?

আমার মেয়ে আছে জানলে কি করে ?

দিলীপবাবু বললেন। একদিন সন্ধ্যেবেলা অলিম্পিয়ায় তোমার স্বামীর সঙ্গে আলাপ। তখন কথায় কথায় তোমার কথা বললেন। ছেলের কথা। মেয়ের কথা। বলতে বলতে আবার ভুলেও যাচ্ছিলেন।

তুমি কিছু বলনি ? তুমি কে ?

না। নিজেই নিজের কার্ড দিলেন। তোমার নাম বললেন।

তাতেই চিনে ফেললে ! আশ্চর্য !

এভাবেই তো দেখা হয় মানুষের। অনেক কাল পরে তাই না রানী ?

রানী মনে করার চেষ্টা করল। সারা শহরে তখন শুধু আমাদের বাড়িতেই হ্যারিকেন জ্বলত। আর সব বাড়িতে ইলেকট্রিক। রাতে রান্না হতো না আমাদের এক-একদিন। জলে ছাতু ভিজিয়ে গুড় দিয়ে খেয়ে নিতাম। জ্যোৎস্নায় বসে।

আমি তখন হারমোনিয়াম বেলো করে তোমায় গান শেখাতাম। এক কাপ চা খাওয়াবে রানী ?

যে কোন সময় রবির খোঁজে পুলিস আসতে পারে। ওর বাবা ফিরে আসতে পারে। এসব কথা মনে হতেই রানী বলল, গ্যাস ফুরিয়ে গেছে।

তোমাদের বাড়ি হিটার নেই ?

আছে। কিন্তু প্লাগটা লুজ—

দাও না আমায়। আমি কাজ জানি। সারিয়ে দিচ্ছি।

উঁহু। দরকার নেই। শক খাবে। তুমি না একটা বিয়ে করেছিলে পরে ?

হুঁ। বউ নেই।

কি অসুখ করেছিল ? বাচ্চা হতে গিয়ে ?

উঁহু। এমনি চলে গেছে। বাচ্চা হবার আগেই—

তাই বল ! তুমি তো দেখছি একজন গুণধর। শিয়াখালা লাইনে ছোট রেলের কি একটা চাকরি করতে না ?

সে চাকরি আর নেই।

চাকরি গেল কি করে ?

কাগজে পড়োনি রানী ? সে লাইন উঠে গেছে। বড় রেল বসবে বলে। সবই আমার ভাগ্য রানী। বড় রেল আজও বসেনি। তখন যদি সাহস করে তোমায় বিয়ে করতাম। বড় পয়া তুমি। ছাখ না—দিলীপবাবু কিসের থেকে কি হয়েছেন। তোমার বাড়িও রাজি ছিল।

ওসব কথা থাক। এখন বরং এসো। সকালবেলায় ও বাড়ি থাকে। তখন বরং একদিন ফোন করে ঘুরে যেও।

আরেকটু বসি রানী।

না। আমি এখন একটু ঘুমোব।

তোমার একখানা ফটো দাও। কাছে রাখব।

এখন আর তো কোন ফটো তুলি না।

তখনকার যদি থাকে—দাও না একখানা।

খাবার খুঁজতে হবে। এখন আমি পারব না। বরং ঠিকানা রেখে যাও। আমি খুঁজে-পেতে পোস্ট করে দেব।

সেই বাড়িতেই আছি রানী।

ঠিকানাটা লেখে যাও।

ন্যাকামি করো না, ও ঠিকানা তুমি ভুলতে পার না রানী। বিয়ের আগে একটা ঠিকানা প্রথম প্রেমের মতই সবাই মনে করে রাখে। তোমারও মনে আছে আমি জানি।

খুব যে আত্মবিশ্বাস দেখছি।

হ্যাঁ রানী।

তখন নিজের ওপর এ কনফিডেন্স ছিল না কেন?

প্রবোধ এবার আর কোন কথা খুঁজে পেল না।

মার্চের বিকেল। ভোর রাতে শীত-শীত ভাব থাকে। সন্ধ্যেরাতে জ্যোৎস্নায় ফুলসুদ্ধ লতাপাতা ছায়া ফেলে হাওয়ায় দোলে।

এ বাড়িটা স্যার লেজলি উডের ফ্যামিলি ভিলা। কলকাতার ভেতর এত বড় লন বড় একটা দেখা যায় না। ওল্ড সার্কাস রোডে উঁচু দেওয়াল ঘেরা এ-বাড়ির বয়স একশো বছরের ওপর। স্যার লেজলির ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা বানিয়েছিলেন। সপ্তম এডোয়ার্ড এ মাঠে পা দিয়ে গেছেন। তার স্মরণে স্যার লেজলির ঠাকুর্দা মহামান্য সম্রাটের পদচিহ্নের জায়গাটায় তখনকার নতুন আমদানী একটা জিনিস—যাকে এখন সিমেন্ট বলা হয়—তাই দিয়ে বেদী বানান। পাশেই বসিয়েছিলেন একটা রেইনট্রি চারা। সেই রেইনট্রি এখন মহীরুহ। খানিক দূরেই একটা ক্যাসিয়া গাছ। তার গা দিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হলুদ ফুল অবিরল ঝরে পড়ছে। পাশাপাশি এই দুটো গাছেরই গুঁড়ি গম্ভীর, কালচে আর ফাটা ফাটা। দু হাত দিয়েও বেড়ে পাওয়া যাবে না।

সারাটা লনে এমনি নানান সব রং ফেটে গিয়ে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার। ঘাসগুলো তোলা জল খেয়ে সবুজ। গাছপাতার চেহারা কালচে। উঁচু কম্পাউণ্ড ওয়ালের গা থেকে ঝুলে-পড়া লতানো সব পাতার মাঝে মাঝে বেগুনি ফুলের কুচি।

এরকম একটা জায়গায় বাসন্তী রঙের বিশাল ছাতার নীচে তিনজন লোক বসে। সাদা বেতের চেয়ারে। সামনেই চিল্ড বিয়ার। কাজ করা কাঁচের টাবে বরফঠাণ্ডা আঙুর। দু রকমের। কালো আর সবুজ। স্যার লেজলি সরল ইংরিজিতে জানালো, কালচে আঙুরগুলোর জন্মস্থান—নাসিক। ওখানেই স্যারের কোম্পানির ডিয়ার ব্রাণ্ডির প্ল্যাণ্ট বসানো হয়েছে। আর সবুজ আঙুরগুলো আজকাল নর্থ ইণ্ডিয়ার অনেক জায়গাতেই হচ্ছে। আসলে এ আঙুরের চাষ আগে ছিল শুধু রত্নগিরি ডিস্ট্রিক্টে।

স্বাতীর পাশেই বসেছে স্যার লেজলি। গায়ে একটা সুইমিং ট্রাংক। তার বাইরে সাদা শরীরটার যেটুকু বেরিয়ে—তার কোথাও কোন মেদ নেই। নতুন সাদা ফ্রিজের রঙের দুখানা উরু। লাল ঠোঁট। এই লোকটাই খানিক আগে স্বাতী আর দিলীপকে বাড়ির ভেতর ফ্যামিলি কালেকশন দেখাচ্ছিল। ঠাকুর্দার বাবার ঘোড়ায় চড়ার স্যাডেল। হীরা বসানো। বুয়র যুদ্ধের তরোয়াল। কুইন ভিক্টোরিয়ার দেওয়া পকেট ওয়াচ। ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার অয়েল পেন্টিং। তামার পাত দিয়ে মোড়া কাঠের সিঁড়ি। বৈঠকখানা থেকে আশী ধাপ উঠে গেছে দোতলায়। সিঁড়ির মাথায় কিশোর লেজলির ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট স্টাডি। একজন বাঙালী আর্টিস্টের পেনসিলের কাজ। লেজলির মা ছবি আঁকতেন। বাবা পর পর এগার বছর চেম্বার অব কমার্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ভাইসরয়ের কাউন্সিলে একবার হোম মেম্বার হন।

লেজলি কথা বলছিল—আর ঘামছিল। স্বাতী তার চেয়ারে বসেই ওর গা থেকে উঠে আসা দামী বাথসল্টের সুগন্ধ পাচ্ছিল। গভীর নীল চোখ। হাতের মুঠো থেকে গ্লাস নামিয়ে লেজলি অনেকগুলো আঙুর খেয়ে ফেলল এক সঙ্গে। চেঞ্জ করে নাও—

এ কথায় দিলীপ বলল, আমি এখন আর জলে নামব না।

গ্লাস রেখে দেবার সময় লেজলির হাতের রেখাগুলো স্বাতী দেখতে পেয়েছিল। লালচে ফ্যাকাশে চামড়ার ভেতর সামান্য কয়েকটি লাইন। উর্ধ্বরেখা আয়ুরেখা। হাতের তালুতে রক্ত জমানো। নীল চোখে স্বাতীর জন্যে অনেকখানি প্রশংসা স্থির হয়ে আছে অনেকক্ষণ। স্বাতী বলল, আমি সাঁতরাব।

পাশেই স্যার লেজলির প্রাইভেট পুল। তাতে চোখের সামনে পাম্প করে জল

ভরে দেওয়া হল। পাঁচ-ছ কাঠায় গলা অব্দি জল টলটল করছিল। চাতাল অব্দি পরিষ্কার দেখা যায়।

লেজলি বলল, তাহলে চেঞ্জ করে নাও। একটা ঘেরা ঘর দেখিয়ে বলল, ওখানে সব গোছানো আছে। হাত বাড়ালেই পেয়ে যাবে।

স্বাতী গিয়ে সে-ঘরে ঢুকল। বেরিয়ে এল—কলম্বিয়া পিকচার্সের হিরোইন একদম। সরু কোমর। ভারী উরু। বুক আর পেছনটা মানানসই উঁচু। কোন জড়তা নেই। চল। নামবে—

দিলীপ ভেতরে ভেতরে কেঁপে গেল। না। আমি এখন নামছি না। মনে মনে বলল, স্বাতী। তোমাকে আমি আরেকবার হারাতে যাচ্ছি। চোখের সামনে স্বাতী দাঁড়িয়ে। ব্যাকগ্রাউণ্ডে হোয়াইট সিমেণ্ট বাঁধানো প্রাইভেট পুল। জলের ভেতর একটা আকাশী রঙের সিঁড়ি নেমে গেছে। সুইমিং ট্রাংকটা স্বাতীর কোমর, বুক, পেছন—সব কামড়ে ধরেছে। তার বাইরে হলুদ আভা ছড়ানো টান-টান স্কিন। একই সঙ্গে দুজন পুরুষকে মনোযোগী হতে দেখে—স্বাতী হেসে ফেলল—তারপর, নিজের আনন্দেই জলে ঝাঁপ দিল।

দিলীপের মনে পড়ল, এসব দৃশ্যের বর্ণনাতেই ইংরেজিতে একটা কথা লেখা হয়। সপ্লস। দূরে বসার ঘরে প্লাগ লাগানো সবুজ রংয়ের টেলিফোনটা বেতের চেয়ারের পাশেই ঘাসের ওপর। সাবধানে সেটা টপকে স্যার লেজলিও জলে পড়ল। তখনও স্বাতী মুখ দিয়ে জলের ফোয়ারা তুলে মাথাটা জলের ওপর রাখতে চাইছে। পরিষ্কার জলের ভেতর দুখানা ভারী সমর্থ উরু দিয়ে জল কাটছিল আর ব্যালান্স রাখছিল। এমন পা দেখতে কোন পুরুষের না ভাল লাগে।

স্যার লেজলি জল কেটে এগিয়ে গিয়ে স্বাতীর ভার নিল। নীল চোখ। সাদা বুক। লালচে ভিজে চুল মাথায়। দু হাতে ছাল ছাড়ানো মুরগি হয়ে স্বাতী হাত-পা ছুঁড়ছে। হাসছে। স্যার লেজলি ওর শরীরটা একদম শূন্যে তুলে ধরল। চারদিকে লতায় ঢাকা উঁচু দেওয়াল। ঘাসের ওপর টেলিফোনটা বেজে উঠতেই স্যার লেজলি স্বাতীকে জলে ফেলে দিল। তাতে খানিক জল ছিটকে এসে দিলীপের গায়েও লাগল।

একজন বেয়ারা ছুটে এসে টেলিফোনটা পুলের কিনারায় নিয়ে এল। স্যার লেজলি বুক জলে দাঁড়িয়ে ভিজে হাতে ফোনটা কানে লাগাল। হ্যালো—

টারজান ইন টাউনের পোজে লেজলি দাঁড়ান। কাঁচের চেয়েও স্বচ্ছ জলে ওর সরু কোমর। চওড়া বুক। কয়েক হাত দূরেই স্বাতী এখন প্রায় জলপরী হয়ে ভাসছে। নিস্তব্ধ বিশাল বাড়ি। আর ঘণ্টা দুয়েকের ভেতর সন্ধ্যের ঘোর লেগে

জ্যোৎস্না বেরিয়ে পড়তে পারে।

দিলীপ স্বাতীর দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, উঠে এস। জলে তো অভ্যেস নেই তোমার—

কে বলল? আমি তো চিরকাল জল ভালবাসি।

উঠে এস।

স্যার লেজলি ফোন হাতে চেপে দিলীপের দিকে তাকাল। নো নট নাউ। তারপর কি মনে হলো লেজলির—হেসে বলল, হোয়াই সো আর্লি?

দিলীপ বুঝল, পুরো ব্যাপারটাই এখন তার হাতের বাইরে। সে অনধিকারী। তবু হাসি হাসি মুখ করে বেতের চেয়ারে বসে থাকল। বেয়ারা আর এক প্রস্থ দিয়ে গেল। দিলীপের কোন না নেই। সে খেতে থাকল। দেখতে থাকল। স্যার লেজলির প্রাইভেট পুল মানুষের ডানার ঝাপটায় তোলপাড় হচ্ছে। বেয়ারা এক সময় ফ্লাড লাইট জেলে দিল। তখনই সারা মাঠে আবার দিন। একটা নীলডাউন মূর্তির মত পা-গোটানো আগাগোড়া ভিজে স্বাতীকে লেজলি দু হাতে বুকের ওপর তুলে ধরেছে। সে অবস্থাতেই স্বাতী আবার পিছলে জলে পড়িয়ে গেল। ভেসেও উঠলো তিন হাত দূরে গিয়ে। হাসতে হাসতে। এখন লেজলি ওকে ধরে ফেলবে বলেই ছুটলো। কিন্তু জল অত তাড়াতাড়ি কাটা যায় না। বরং টুপ করে ডুবে যেতে অনেক কম সময় লাগে জলে। দুই চওড়া কাঁধে স্যার লেজলি উড তখনো জল ভাঙছিল।

ঋষিকে একদা দিলীপ মনে মনে বলতো: অরণ্যদেব! ডিয়ার অরণ্যদেব! তোমার লিভার নিশ্চয় টাংস্টেন দিয়ে তৈরি।

একদিন বলেই ফেলেছিল ঋষিকে। তুই নিট রাম সাবাড় করলি আধ বোতল। মাছ ভাজা খেলি এক কেজি। তারপর সাঁতরে পুকুর এপার ওপার করলি তিন-বার। আবার এখন মাংস ভাত খেতে বসবি!

কথা হচ্ছিল—কলকাতার বাইরে—পিকনিকে গিয়ে। একটা পোড়ো বাড়ির ভাঙা ঘাটলায় বসে।

তা নয়তো কি? অত সুন্দর রাঁধছে বানী। সেই থেকে গন্ধ পাচ্ছি। কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না এখানে দিলীপ। তুই সঙ্গে থাকলে চাঁদের আলো আমার খুব ভালো লাগে।

তখন দিলীপ অনায়াসে ঋষির মনের ভেতর দিয়ে শর্টকাট করতে পারতো। ঋষি হাসলে দিলীপ মানে বুঝতে পারতো সে হাসির।

দিলীপ বলেছিল—প্রিয় অরণ্যদেব। প্রিয় বনভৈরব। কি দিয়ে তোর লিভার তৈরি ?

কেন ? খিদে পেলে খাবো না ? বাঃ।

আমাদের তো বয়স হচ্ছে ঋষি।

তা হচ্ছে। শীগগিরি হয়তো একটা ওয়ার্নিং পাবো কোন দিন। তখন থেকেই সাবধান হয়ে গেলে চলবে।

সেই সাবধান হয়ে যাবার দিন যে এত তাড়াতাড়ি আসবে—কেউ তা ভাবেনি। দিলীপ, অনন্ত, অনাথ চক্কোত্তি, ঋষি, গোকুল দত্ত—সবাই নিজের নিজের চিকিৎসা একটু-আধটু করে থাকে। যেমন অ্যাণ্টাসিড ট্যাবলেট সবাই পকেটে রাখে। দিলীপ তো বুকে চাপ ব্যথা বুঝলে বাতাতিসের আশংকায় ব্রিসগালিন খেয়ে নেয়। দিনে তিনটে করে। সাইনাসের ব্যথায় শাদা রংয়ের লিমোনেট ট্যাবলেট।

এরকমের কোন এক কারণে নিজের বুদ্ধিমত চিকিৎসা করতে গিয়ে ঋষি ডিপেণ্ডল ক্যাপসুল খাচ্ছিল। পেটের জন্যে। সেই সঙ্গে সোডা ছাড়াই খানিকটা হুইস্কি পেটে পড়ে। অনাথ ছিল সঙ্গে। সে নিয়েছিল জিন

খানিক বাদে ঋষির দম আটকে আসে। নিশ্বাস বন্ধ হবার যোগাড়। পরে অবশ্য সুস্থ হয়ে যায় ঋষি। খবর পেয়ে দিলীপ গিয়ে হাজির। ডিপেণ্ডলের মোড়কেই চোখ আটকে গেল তার। তুই পড়ে দেখেছিলি কি—কি লেখা রয়েছে।

না তো।

এই ত্যাখ্। এ ওষুধ খাবার সময় যে কোন মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ।

তাই নাকি ? হুইস্কিটা আবার কবে থেকে মাদক দ্রব্য।

• চল তোকে এক ডাক্তার দেখিয়ে আনি। আমার চেনাশুনো। একদম বসিয়ে রাখবে না।

লাবণ্য বললো, তাই করুন তো। ভেতরটা কি হয়ে আছে কে জানে। এক বার তো দেখানো উচিত।

দিলীপের চেনা ডাক্তার ই. সি. জি. করে বললো, সব ঠিক আছে এবার রক্তের রিপোর্ট চাই। এই ঠিকানা লিখে দিলাম। ওখানে গিয়ে খালি পেটে রক্ত দেবেন। ডক্টর ঘোষাল ভালো ডাক্তার।

পরদিন সকালে দুজনে ডক্টর ঘোষালের চেম্বারে ওঠার দোতলার সিঁড়ির মাঝামাঝি থেমে গেল। প্রায় একই সঙ্গে। ঋষি বললো, হরিদার চেম্বারে যাবি ?

হ্যাঁ। হরিদা তো ডাক্তার। ঠিকানা মনে নেই।

চেম্বার চিনি। এই সকালবেলাতেই আসে হরি বাঁড়ুজ্যে। চল্ তো দেখি।

হরি ডাক্তার চেম্বারেই ছিল। হাতে এক বিকার পেচ্ছাপ। ওদের দেখে বললো, দাঁড়া, আসছি। এক কাবলিওয়ালার ডায়েবেটিস হয়েছে। বস্।

পাশের ঘরেই হরি ডাক্তারের ল্যাব। কালো কালো তিন কিশোর মন দিয়ে কি সব পরীক্ষা করছে।

হরি ডাক্তার চেম্বারে ফিরে এসে বললো, কি মনে করে? সব খুলে বল। অনেক দিন পরে দেখলাম তোমাদের।

তুমি তো কোন খোঁজ নাও না হরিদা। এদিকে কী বাধিয়ে বসেছি ভাখো।

রাম খাচ্ছিস?

হুঁ।

পাল্স দেখি। ঋষির কব্জি চেপে ধরে হাত ছেড়ে দিল হরি ডাক্তার। কিচ্ছু হয়নি তোর। সুস্থ শরীর। কোন ডাক্তারকে দেখিয়েছিস?

বড় ডাক্তার। ব্লাড রিপোর্ট চাইলেন।

রক্ত দিবি দে। সন্ধ্যেবেলা আসিস। রিপোর্ট পেয়ে যাবি। তোর খবর কি দিলীপ? ভ্রূ মুছে গেছে দেখছি তোর!

হ্যাঁ হরিদা। আমার হাইপোথায়রয়েড--

ভাগ্! সন্ধ্যেবেলা আসিস। সব বলে দেব।

ওরা কথা বলছিল আর কালো মত ছেলেটি এসে ঋষির হাত রবারে বেঁধে ভেইন খুঁজছিল। কিছু খাননি তো সকাল থেকে?

ঋষি বললো, খাইনি।

ধমকে উঠলো হরি ডাক্তার। তোকে অত কথা বলতে বলেছে কে বিজু? রক্ত নিয়ে করে রাখবি।

দিলীপ বললো, কি বলছো হরিদা—ও ব্লাড অ্যানালিসিস করে রাখবে?

কেন? দোষ কিসের? বিজু—বিজুর ভাই বীরু—ওদের দুজনকেই ব্লাড ইউরিন—সব টেস্ট শিখিয়ে দিয়েছি।

ওরা পড়াশুনো করেছে?

না। নাম সই করতে পারে না। কি দরকার? বাঁদর দিয়ে যদি আর্মি ফ্রন্ট লাইনে মাইন তোলাতে পারে—তাহলে পিস এরিয়ায় মানুষ দিয়ে ব্লাড অ্যানালিসিস করানো যাবে না?

ঋষি হেসে ফেললো, একাট্য যুক্তি! তাহলে সন্ধ্যেবেলা আসছি আমরা হরিদা।

ওয়েট করবো আমি। কথার যেন নড়চড় না হয়।

অনেক দিন পরে ঋষি আর দিলীপ। একসঙ্গে, কলকাতার রাস্তায়। সকাল-বেলা। জীবন কোথাও বদলায়নি। বদলালেও টের পাওয়ার উপায় নেই। সামনের গাছটা তার নিজের নিয়মে মাটির ভেতর শিকড় চালান করে দিয়েও ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। বাঁ হাতের ফুটপাথে অনেকটা খোঁদল। খানিকটা এগিয়ে ওরা দুজনে ময়দান পেয়ে গেল।

ঋষির মুখ, চোখ সব মিলিয়ে দিলীপের বড় বিষন্ন লাগলো। চিন্তিত অথচ ছেলেমানুষ মুখখানা। এক জায়গায় গিয়ে দুজনে দাঁড়িয়ে পড়লো। কি করবি দিলীপ? এখন বাড়ি যাওয়া যায়?

হো হো করে দুজনেই হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে দিলীপ বুঝলো, দুজন পুরুষ লোক কখনো মিটমাট করে না। বরং আলাদা করে যে-যার মত যন্ত্রণা পাওয়ার রাস্তা খুঁজে নেয়। দিলীপ জানে, সে এখুনি ঋষিকে বলতে পারে—ভাই ঋষি। এমন তো কথা ছিল না।

দিলীপ নিজের কথা অনেকটা এভাবে সাজাতে পারে। খাদান করতে নামালি—অথচ খাদান এক্সপ্যাণ্ড করতে দিবি না কেন? এক্সপ্যানসন ছাড়া—গ্রোথ ছাড়া—কোন গ্রোইং জিনিস বেঁচে থাকে? ইণ্ডিভিজুয়াল এক্সপ্রেসনের পথই তো বন্ধ হয়ে যায়। রহস্যটা কি ঋষি? আমার মাথায় আসছে না। তুই কেন কোল ইণ্ডিয়ার চোখে গুড বয় হতে যাবি? গুড বয় হওয়ার তো কোন দরকার নেই। আমরা নিজেরাই তো বড জিনিস গড়ে তুলতে পারি। বড় জিনিস গড়ে তোলায় তোর আপত্তি কিসের? যদি না-ই গড়বি তবে আমায় খাদানে নামালি কেন? তুই গুড বয় হয়েই থাকতিস। আমি যেমন ব্যাড বয় ছিলাম—তাই-ই থাকতাম। অনাথ চক্কোত্তিকে আমি জানি। সে শুধু নিজেকে ভালবাসে। সে জন্যে সে যে কোন কাজ করতে পারে। অনাথদা খানিক দূর গিয়ে তোর আর বন্ধু হতে পারে না। তুই আমার কথা মিলিয়ে নিস।

কিন্তু এর কোন কথাই দিলীপ ঋষিকে বলতে পারলো না।

চল্ তোকে বাড়ি দিয়ে আসি ঋষি। সন্ধ্যেবেলা তো দেখা হচ্ছে হরিদার ওখানে।

ঋষি বললো, তুই এখন কোথায় যাবি?

ডালহৌসি।

অত খাটবার কি আছে দিলীপ। কমিয়ে দে সব কাজকর্ম।

না করে উপায় নেই। গোকুলদা বলছিল—ব্যাঙ্ক নাইনটি ডেজ ও ডি. দিতে চাইছে না।

পাদ্রী যেমন কনফেশন শুনবার জন্যে তৈরি হয়ে চুপচাপ বসে থাকে—হরি ডাক্তারও তেমনি তৈরি হয়ে বসেছিল। সন্ধ্যেবেলা। টেবিলের ওপর শাদা খামের ভেতর টাইপ করা ব্লাড রিপোর্ট। তার পাশেই কালচে লাল রামের বোতল। প্লেন ওয়াটার বোঝাই কাঁচের টাম্বলার।

দুজনে ঢুকতেই ঋষির হাতে রিপোর্ট তুলে দিয়ে হরি ডাক্তার বললো, তোর কিচ্ছু হয়নি। বস্ তোরা। বিজুকে কাবাব আনতে পাঠিয়েছি।

কোন রোগ নেই হরিদা ?

নাথিং। যে ডাক্তার দেখেছে—সে একটি পাঠা।

বড ডাক্তার হরিদা।

বড ডাক্তার কিসের আবার ! আমি উপসলাতে কাজ করেছি। সারা ইউরোপ ঘুরেছি। পিকিং অব্দি ট্রেনে গেছি। সাঙ্গাইতে হাসপাতালের আউটডোর পেসেন্ট দেখেছি। মাসের পর মাস। তাতে বলতে পারি—ডাক্তারের বড ছোট বলে কিছু নেই ঋষি। ডাক্তার দু রকমের। একজন রোগ ধরতে পারে। আরেক-জন পারে না। পারে না বলেই সে ভোগা দেয়। তখন বলে ব্লাড রিপোর্ট চাই না হ্যানো চাই। ত্যানো চাই। নে, খা। বরফ দেবো ?

দরকার নেই। আমি একদম নরমাল হরিদা ?

তা না তো কি ? আস্তে আস্তে খা। কোন তাড়াহুড়ো নেই তো ?

একদম না।

দিলীপ বললো, আমার কি হবে হরিদা ? আমার ভ্রূ নেই। মোটা হয়ে যাচ্ছি। হাবা হয়ে যাবো না তো ?

হো হো করে হেসে উঠলো হরিদা। বছর পঞ্চাশের ছেটা শরীর। কোথাও একটু টসকায়নি। রীতিমত বক্সারের চেহারা। হাতের থাবা একটি ছোটখাটো কচ্ছপ। ভাবি। বড়—আর দলা পাকানো। হাসতে হাসতেই হরি ডাক্তার বললো, হরমোনের গোলমাল—যে কোন কাণ্ড ঘটাতে পারে। যদি হাবা হয়ে যাস—তাতেই বা অসুবিধে কিসের ? পার্মানেন্ট চাকরি তোর।

অফিস তাহলে মেডিকেল বোর্ড বসাবে। বাড়িতে চিঠি দিয়ে রিটায়ার করিয়ে দেবে। আমি আজকাল সব ভুলে যাচ্ছি হরিদা। অনেক সময় আধঘণ্টা আগের ব্যাপারও ভুলে যাই।

ভালো তো। তোর মেমারি ব্যাংকের ওপর কখনোই চাপ পড়বে না দিলীপ।

আমার হরিদা আজকাল ভয়ংকর অভিমান হয়।

বেশ তো।

অপমান থেকে আমার মনে যে যন্ত্রণা হয়—তার দরুন গা চুলকোয়। একদিন দেখি বাঁ হাতের কব্জিতে লাল অ্যালারজি মত বেরিয়েছে।

হতে পারে, কিছু আশ্চর্য নয়।

আমি কি মেখে হয়ে যাবো হরিদ্রা ?

কেন ? সেরকম কি লক্ষণ দেখলি ?

আমার অভিমানের ধরনটা অন্য রকম।

এই তো মানিক। সবই বুঝতে পারছো—তখন আর তোমার মেয়ে হয়ে যাবার ভয় নেই। খুব তাড়াতাড়ি বেশ কিছুটা খেয়ে ফেলায় দিলীপ বসুর চোখে জল এসে গেল। অভিমান তো আরেকটা মদ। ঋষি এতক্ষণ কিছু বলেনি। এবারে খুব আস্তে বললো, চণ্ডীতে আছে।

কলকাতায় যত গরম পড়ে—ততই জলের টান পড়ে। আগে শহরটাকে ভিস্তির জলে দু বেলা ভেজানো হতো। সে সব পাট কবে উঠে গেছে।

এরকম একটা শহরে দুপুরে গাড়ি করে ঘুরতেও পাপ লাগে।

ঋষিকে দেখতে এসেছিল সবাই। যেমন—মীরা, অনন্ত, রানী, দিলীপ, স্বাতী। লাবণ্য সবাইকে চা দিয়েছে একবার। ঋষি বললো, আমার কিছুই হয়নি। ভালো আছি আমি।

এখন এখানে যারা মেয়েরা—তারা দুপুরে খাবার পর ঘুমোয়। শুধু স্বাতী দুপুরের কাজকর্মের লোক। তার পোশাকও আলাদা। সিঁথির ভাঁজে সিঁদুর খুঁজতে মাইক্রোসকোপ দরকার।

মীরা ভৌমিক ট্রাস্টের সর্বময়ী। অনন্ত হাসিখুশী। রানী তার স্বামীর বন্ধুর জন্য এক বাটি ক্ষীর এনেছিল। সেটা টেবিলের ওপর রেখে রানী চুপ করে বসেছিল। ওর ভেতরেই মীরা উ আ করছিল।

স্বাতী এই দলের সঙ্গে অল্পদিন হলো পরিচিত। বাকিরা সবাই যে যার সঙ্গে যেমন পরিচিত—স্বাতী ওদের সঙ্গে ততটা পরিচিত নয়। তাই সে শুধু একবার ঋষিকে বলেছে—কেমন আছেন ?

ঋষি ঘাড় নেড়েছে।

এরপর আর কথা এগোয় না। এখন কলকাতা তাকে ডাকছে। এই এত বছর সে দুপুরবেলা কাজ করে এসেছে। কোনদিন ভাত খেয়ে ঘুমোয়নি। বাইরের পৃথিবীতেই সে চলাফেরায় অভ্যস্ত। দিলীপকে বললো, যাবে নাকি ?

দিলীপ বললো, চলো।

ঠিক এই সময় রানীর দিকে তাকিয়ে স্বাতী বললো, চলি বৌদি।

ঋষিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্বাতী আর দিলীপ—দুজনেরই দু রকমের খারাপ লাগছিল। কলকাতায় সবে পিচ গলছে। গরম বাতাসের সঙ্গে রাস্তার বালি। স্বাতী কালো রংয়ের রোদ-চশমা চোখে দিয়ে নিল। এখন স্বাতীর মুখে তাকালে ওর মন বোঝা যাবে না। মন থাকে চোখে।

গাড়ি যাচ্ছিল গুরুসদয় রোড দিয়ে। স্বাতীর পরিষ্কার মনে হলো—আমি রানী বউদির মত নই। আমি ঋষিবাবুর স্ত্রী লাবণ্যের মত নই। আমি মিসেস মীরা ভৌমিকের মত নই। তবে আমি কি? একজন ওয়ার্কিং গার্ল! আমি কি আর গার্ল আছি?

ওই মহিলারা কেমন সুন্দর সংসার জিনিসটার ওপর গা এলিয়ে দিয়ে আছে। একজন করে স্বামী আছে ওদের। কিছুই ভাবতে হয় না। আর আমি? টং টং করে ঘুরে বেড়াচ্ছি সারাদিন। সুনন্দর পড়ার খরচ। মতিলাল নেহরু রোডের বাড়ি ভাড়া। রেশনের টাকা। ইলেকট্রিক বিল। জমাদার। মুদি, ডাক্তার-খানা—সবই চালাতে হয়। আমি ওদের মত হলাম না কেন? আমি কেন ওদের স্বামীদের চোখে দেখবার জিনিস? পুরুষ লোকের আগ্রহের ব্যাপার। ওদের স্বামীদের কমিশনের কর্মচারী।—ভায়া দিলীপদা!! দিলিপ ইজ আনাদার ক্রিয়েচার! ও আমার গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকতে ভালবাসে। যদি এই ভাবে ও নিজের স্মৃতির জগতে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সে তো পেছন দিকে অনেক দূরে। ডবল সায়া পরেছি বলে ভেতরে ঘামে ভিজে যাচ্ছি।

দিলীপ চলন্ত গাড়িতে তার পাশে এই স্বাতীকে দেখতে চাইল। কালো চশমা মুখের ওপর অনেকখানি রহস্য ছড়িয়ে দিয়েছে। একবার মনে হলো—স্বাতী কোন রাতজাগা পাখী নয়তো? দি নাইট বার্ড। হাসি গানে যারা সারা রাত পুরুষের আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়—স্বাতী তাদের কেউ নয়তো? এমন মেয়েরাই কড়া রোদে গগলস্ পরে। তাহলে চোখের নীচের ক্লান্তি চশমায় ঢাকা পড়ে। এমন স্বাতীকে তো আমি চাইনি। চাইলে পাবও না। স্বাতী আমার হাত থেকে পিছলে গেছে। স্যার লেজলি সেদিন তার প্রাইভেট পুলে ফ্লাড লাইটের নিচে স্বাতীর পিঠ মুছে দিচ্ছিল।

আমি বলেছিলাম, স্যার লেজলি—হয়ার ইজ লেডি লেজলি?

সি ইজ ইন—সারে। আমার মেয়েরা সারের পাবলিক স্কুলে পড়ে। মা বাচ্চাদের নিয়ে ইণ্ডিয়ায় ফিরবে আরেকটু গরম পড়লেই। আমরা সবাই তখন উটিতে যাবো। ওখানে আমার একটা গেস্ট হাউস আছে।

ফাঁকা বাড়িতে ভিজে গায়ে স্বাতী হোয়াইট সিমেণ্ট বাঁধানো চত্বরে দাঁড়িয়ে হি হি করে হাসছিল। বছরে একশো আশি কোটি টাকার গ্রস রেভিনিউ—এমন এক কোম্পানির চেয়ারম্যান তার পিঠ মুছে দিচ্ছিল। এমন দৃশ্যের একমাত্র দর্শক—তারই নিজের একদা প্রেমিক—ওরফে দিলীপ বসু। কোন্ মেয়ে না এমন নাটকে হি হি হাসবে? আর স্যার লেজলিও তো বুড়ো হাবড়া নয়! সুইমিং ট্রাংকে ঢাকা ভিজে গায়ে মানুষটার চেহারা ছবিতে একদম পরিণত টারজান।

একদা এই স্বাতীর জন্যে আমি মরীয়া হয়েছিলাম। তারপর স্বাতী একদিন আমার কাছে বাসি হয়ে গিয়েছিল। সুধীর ওর দখল নিল। স্বাতীকে দেখতাম—গোল সিঁদুরের টিপ কপালে দিয়ে অফিস টাইমের ট্রামে উঠছে। একদিন দেখলাম—কাপড়ের দোকানে মিটার মেপে ভয়েল বিক্রি করছে। আরেকদিন দেখি—রাত নটা হবে—শীতকাল—একটা ফিয়াটে বসে আছে—স্টিয়ারিং ফাঁকা—সামনেই পানের দোকানে একজন অবাঙালী মশাই পান কিনছে—আমিও সে-দোকান থেকে সিগারেট নিলাম—স্বাতী তখন মুখের ভেতর আঙুল পাঠিয়ে খুব সম্ভব মাংসর কুচি বের করছিল। মুখে তৃপ্তি। কোথাও ভরপেট খাওয়ার পরেই তো লোকে পান কেনে। সুধীর নেই কেন?

এজন্যেই কি সুধীর স্বাতীকে অশুচি ভাবে? অস্পৃশ্য?

স্বাতীই বলেছিল, জানো দিলীপদা—ও নিজে আমাকে সবার সঙ্গে জোর করে মিশতে পাঠাতো। যখন মিশে গেলাম—তখন শুরু হলো ওর সন্দেহ। সবার সামনে এমন অপমান করতে লাগলো কি বলবো। সেই অপমানের ভেতর সব প্রেম ভালবাসা একদিন পুড়ে খাক্ হয়ে গেল। আমি তখন বাইরে মিশতে শিখেছি দিলীপদা। আমি কেন ফিরবো? ভালবাসা নেই যেখানে—সেখানে ফিরে কি হবে?

দিলীপ বসু নিজের মনে মনে বললো, স্বাতী, তুমি কি কলগার্ল? আবার নিজেই মনে মনে উচ্চারণ করলো, না। আমারই ভুল। স্বাতী কি তা হতে পারে? কখনো না।

অবিশ্যি হলেই বা কি করার আছে। পরিষ্কার গলায় দিলীপ জানতে চাইলো, কত টাকা জমলো? এবার কি নিজের বিউটি পারলার খুলতে পারবে?

না। এখনো সময় হয়নি। গত মাসে তুমি আমায় কমিশন দিয়েছো ষোলোশো টাকা।

স্যার লেজলির দরুন তো আরও শ'তিনেক টাকা পাওনা হয়েছে তোমার। দিয়ে দিও দিলীপদা। তোমার সঙ্গে ব্যবসায় নেমে আমারও খরচ বেড়েছে।

টাকা জমাতে পারছি কোথায় ?

লেজলিকে বলো না—

ওঃ ! পুওর লেজলি ! বলেই আচমকা দিলীপের মুখে তাকালো স্বাতী। চোখের রোদ-চশমাটা খুলে ফেলে দিল। তারপর বললো, ভালো ! এখনো আমি জেলাসি জাগাতে পারি দেখছি ! এবার অন্য কথায় চলে গেল স্বাতী। তোমাকে আমার ভীষণ পেতে ইচ্ছে করে দিলীপদা।

আমি তো তোমার স্টকে আছিই।

উঁহু। সে রকম নয়। কত পুরুষলোক দেখলাম। তোমাকে তেমন করে দেখা হলো না দিলীপদা। তাজাব হোক—আমি জানি—আমি তো এখনো পুরুষের লোভের জিনিস।

তাই বুঝি !

তোমাদের চোখ দেখেই বুঝতে পারি দিলীপদা। তোমাকে সেভাবে পাইনি কোনদিন।

আমিও পাইনি তোমাকে কোনদিন। তবে পেয়েই বা কি হবে। আমি তো এখন কমিশনের দালাল।

তা কেন ? তোমার তো চাকবি বয়েছে একটা। বউ—ছেলেমেয়ে—বাড়ি রয়েছে। পরে পেনশন পাবে। গ্র্যাচুইটি আছে নিশ্চয়ই। ইনসিওরেন্স করেছো নিশ্চয়।

সবই আছে স্বাতী। আবার কোনোটাই নেই। আমি, স্বাতী, এ একটা কবন্ধ কাজে জড়িয়ে পড়েছি।

বেশ তো কমিশন পিটছো।

তুমি বুঝবে না স্বাতী। যে ইঞ্জিনের গভর্নর বাঁধা—তার স্পীড তুলবো কি করে। ওরা যে কেউ এক্সপ্যানসন চায় না। যে কাজের কোন গ্রোথ নেই তার কমিশন পেয়ে কি করে খুশী থাকবো। আমি ভেবেছিলাম—এবার কোল ইণ্ডিয়াকে একটা লেসন্ দেব।

তুমি পাগল ! একটা কোম্পানিকে শিক্ষা দেবে কি করে ? তা হয় নাকি কখনো !

মানুষ দিয়েই তো কোম্পানি। সেই মানুষগুলো যদি অকেজো হয়ে যেত— তাহলেই আমাদের খাদান বাড়তো। আরও বড় হতো। আরও—

কত বড় তুমি চাও দিলীপদা ?

স্কাই ইজ দি লিমিট। তোমার কি মনে হয় না স্বাতী—আমি আর তুমি

দুজনে মিলে কলকাতার এই খোলা খাতার ওপর দিয়ে হেঁটে গেলে ক্যাপিটালের কোন অভাব হতো ?

কোল ইণ্ডিয়ার ওপর এত রাগ কেন তোমার ?

রাগ নয়। একটা অন্ধ কবন্ধ জিনিসকে আমি নাড়া দিতে চেয়েছিলাম। ওরা আমাকে 'ফর গ্রাণ্টেড' ধরে নিয়েছিল। ভেবেছিল—দিলীপ বসুকে একটা টেবিল দিয়ে ডাম্প করে ফেলে রাখলেই চলবে। কিন্তু তা হয়নি। শুধু পাণ্ডবেশ্বর এরিয়াতেই ওদের বিজনেস ফল করেছে বিশ লাখ টাকার। ভালো করে এগোলে ওই অঙ্ক বিশ কোটি টাকায় দাঁড় করানো যেত। তখন টনক নড়তো। কিন্তু বাধা যে আমাদের নিজেদের ভেতরেই।

কে ?

আমরা নিজেরাই। অনন্ত বা ঋষি—কেউ চায় না—খাদান আরও বাড়ুক। ওরা আমাকে কমিশন দিয়ে বাকি ক্যাপিটাল কোথায় যে খাটাচ্ছে—তা বুঝতে পারছি না।

তা বলো ওদেরকে। না বলে পড়ে পড়ে মার খাবার কোন মানে হয় ?

কাকে বলবো ? আমি কাউকে বলতে পারবো না। এদিকে আমি হয়ে গেলাম একটা দালাল !

কার ওপর তোমার এত অভিমান দিলীপদা ?

আমি জানি না স্বাতী। আমি জানি না। আমি তোমার চোখে পুওর লেজলিও নই।

ওঃ! এই কথা! এসো না আমরা একসঙ্গে থাকি। আমার ছেলের এখন কম বয়েস। ও বড় হয়ে হয়তো তোমাকে বাবা ডাকতে পারে। এসো না—

আমার বাড়ি ? আমার ছেলে-মেয়ে-বউ ? তারা ?

ওঃ! তা ঠিক। তা ঠিক দিলীপদা। আমি সেকথা কখনো ভুলি না। লক্ষ্য করে দেখেছো ?

তোমার বাবার কথা মনে পড়ে স্বাতী ?

খুব। বাবা আমায় অন্যভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। ভীষণ সাহসী লোক ছিলেন। একবার জ্যোৎস্না রাতে জুয়ো খেলে ফিরছেন। সাইকেলে। পিচ রাস্তায়। আসামের চা-বাগানে। বুনো হাতির পাল তাড়া করেছিল। বাবা পকেটের সিকি-আধুলি রাস্তায় ফেলতে ফেলতে ছুটলেন। জোরে প্যাডেল করে। পেছনে টুং টাং আওয়াজ। জ্যোৎস্নায় আধুলি চিক চিক করছিল। হাতি থমকে দাঁড়ালো। আমি স্বাতী সেই পয়সাগুলো এখন কুড়োচ্ছি।

আট

দমদম এয়ারপোর্টে ইণ্টারন্যাশনাল আর ডোমেস্টিক ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জাররা এখন একই ট্রানজিট লাউঞ্জে বসে ফ্লাইট অ্যানাউন্সমেণ্ট শুনছিল। ওপথ একদম না মাড়িয়ে স্যার লেজলির জিপ রানওয়ে দিয়ে ছুটলো। স্টিয়ারিংয়ে লেজলি স্বয়ং। হুড গোটানো গাড়ির পেছনের সিটে একা দিলীপ। উইণ্ডস্ক্রীন ভাঁজ করে বনেটে শোয়ানো বলে লেজলির পাশে বসা স্বাতীর মাথার চুল নীলচে স্কার্ফের বাঁধুনির বাইরে বাইরে যতটা পারে উড়ছিল। বেলা আটটাও বাজেনি। প্রথম বর্ষার ভিজে রোদ্দুর।

একটা ছোট মত প্লেন তখন তিন নম্বর হ্যাঙ্গারের বাইরে বেরিয়ে গা গরম করছে। কান ফাটানো আওয়াজ। ককপিটের সাইডস্ক্রীন সরিয়ে হাসিমুখে একটা লোক বুড়ো আঙুল দেখালো।

গ্যাংওয়ে দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে লেজলি জানালো, আমাদের কোম্পানির আরও চারখানা প্লেন এই ইস্টার্ন সার্কেলে রোজ উড়ছে। চা, সার, ডিস্টিলারি—সব জায়গাতেই আমাদের ইনস্পেকশন থাকে। কমুনিকেশন একটা বড ব্যাপার।

ছোট হলে কি হবে—এয়ার লাইন্সের প্লেন থেকে ভেতরটা অনেক বেশি সাজানো। লেডি লেজলি ইণ্ডিয়ায় থাকলে এটা ইউজ করেন বলে ভেতরের ডেকরেশন তাঁরই পছন্দমত হয়েছে।

দশ মিনিটের ভেতর পাইলট সমেত ওরা চারজন এয়ারবোর্ন হয়ে গেল। নিচে যশোর রোডে গরুরগাড়ির লাইন। সামনে দলা পাকানো মেঘের মাথাগুলো বিশাল বিশাল আইসক্রিম। পাইলট কি একটা বোতাম টিপে দিতেই পিয়ানোর সুন্দর সুর।

দিলীপ জানে এবারে লেজলিকে গাঁথতে পারলে—কয়লা সাপ্লাইয়ের কড়ারে বড় করে শেয়ার ধরাতে হবে—তাহলেই তার কাজ শেষ। এ-কাজ আর সে করবে না। এই ডিলটা কমপ্লিট হলেই ছুটি। তারপর দিলীপ তার কমিশনটা ফিক্সডে রাখবে। কিংবা স্মল সেভিং-এ। সাত বছরে দ্বিগুণ করে নিতে পারলে কে আর এই কবন্ধ গলির ভেতর ঘোরাফেরা করে। সে তখন স্বাধীন। পুরোদস্তুর স্বাধীন। নয়তো যে খান্দান আর বড় হতে দেওয়া হবে না—তার জন্যে নেশায় নেশায় ঘুরে মরা কেন?

লেজলি বলছিল, টি ইণ্টারেস্ট গড়ে উঠেছিল—তার বাবার ঠাকুর্দার আমলে।

ডিস্টিলারি ওদের এক সেঞ্চুরির ওপর। ফার্টিলাইজার এই কয়েক বছর হলো ওদের কাছে নতুন আইটেম। একসপ্যানশন চলছে।

এক-একটা মাঠের ভেতর পারফোরেটেড স্টিল পেতে দিয়ে টেম্পোরারি এয়ারস্ট্রিপ গড়ে তোলা হয়েছে। সাতশো আটশো একরের এক-একটা চা-বাগান থেকে খানিক খানিক জায়গা বের করে নিয়ে ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড। তারই একটায় লেজলির প্লেন নেমে পড়লো।

নিচে তখন ছিল দমদম। এখন বড় বড় পাহাড়ি গাছের মাথা। দূরে—যাকে বলে দিগন্ত সেখানে রবার দিয়ে মোছা একটা পাহাড়ের আউটলাইন। পেছনের চাকায় মাটি ছুঁয়ে প্লেনটা দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে থামলো।

বাইরে তাকিয়ে দিলীপ অবাক। এ যে রূপকথার জগৎ। প্লেনটার নাকের কাছে একটা তাঁবুর শুরু। তার পর্দা তুলে একজন নেপালী হাসিমুখে একটা ফ্ল্যাগ নাড়ছে। লেজলি বলে উঠলো, আমাদের কোম্পানির ফ্ল্যাগ। নর্থ ইস্ট ইণ্ডিয়ার অনেক জায়গায় এ ফ্ল্যাগ দেখতে পাবে।

তারকাঁটা দিয়ে ঘেরা এয়ারস্ট্রিপের বাইরেই ঝকঝকে পিচরাস্তার স্লেট। বেলা সাড়ে নটা হবে। বর্ষাকালের রোদ্দুর এখানে কলকাতার চেয়ে নরম। গ্যাংওয়ে দিয়ে নিচে নামতেই ছবির মত অ্যামব্যাসাডর। ড্রাইভারকে সরিয়ে লেজলি স্টিয়ারিংয়ে বসল। নিয়ারেস্ট গার্ডেন অ্যানাদার হাফ অ্যান আওয়ার্স ড্রাইভ। কথা শেষ না হতে হতে লেজলির হাতে গাড়িটা খানিক ব্যাক করে সামনের পিচরাস্তা ধরে ফেললো।

দিলীপ বুঝলো, স্বাতী নামক টোপটি এই পঞ্চাশ-একান্ন বছরের তরুণটি গিলেছে। এখন লেজলি এরোপ্লেনের স্টাইলে গাড়ি চালাবে। এবারও দিলীপ পেছনের সিটে একা। লেজলি এতক্ষণ সরল ইংরিজি, খানিক হিন্দী—দু-একটা বাংলা শব্দ দিয়ে কথা চালাচ্ছিল। বর্ষা শুরুর ভিজে বাতাস। কোথাও রোদ। কোথাও বা ভিজে রাস্তা। আবার খানিকক্ষণ চা-বাগান। এসব সিনিক বিউটি কেন যে বাংলা সিনেমায় তোলা হয় না—দিলীপ তার কারণ খুঁজতে গিয়ে কোন হদিশ পেল না।

কোথায় কোল ইণ্ডিয়ার অফিস? কোথায় পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ায় ভৌমিক খাদান? আর কোথায় এই গার্ডেন এলাকা—তার ভেতর দিয়ে অ্যামব্যাসাডারটা ছুটছে—একদম জজ সাহেবের নাতনী। কোন চিন্তা ভাবনা নেই। স্বাতীর একখানা হাত স্থার লেজলির কাঁধে। দুধারে গাড়ির জানলায় শুধু ছবির পর ছবি। এই ছায়া, এই রোদ—খানিকটা বৃষ্টিছাট—সব মিলিয়ে—দিলীপের মনে হচ্ছিল—

আমাদের নিয়ে কোন সিনেমার শুটিং হচ্ছে।

হঠাৎ কখন গাড়িটা পিচরাস্তা ছেড়ে বাগানের ভেতরকার প্রাইভেট রোড ধরেছে—তা দিলীপ বা স্বাতী টেরও পায়নি।

স্বাতী বললো, কোথায় এলাম ?

ইউ আর অলরেডি ইন এ লেজলি গার্ডেন।

একটা জিনিস দেখে দিলীপ তা এইমাত্র বুঝতে পেরেছে। উল্টোদিক থেকে যে-ই সাইকেলে আসছিল—সে-ই গাড়ি দেখে সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াচ্ছিল।

স্বাতী বললো, চারদিক তো খুব নিট অ্যাণ্ড ক্লিন।

আই বেট এ রূপি ফর এ উইড। বলেই লেজলি হাসতে হাসতে বললো, একটা চা-গাছের নিচেও একটা ঘাস বা আগাছা লতাপাতা দেখতে পাবে না। ওসব থাকলে চা-গাছের ইল্ড পার একার কমে যায়।

দিলীপ বললো, চা-গাছ ? না—চায়ের ঝাড় ?

টি ইজ এ ট্রি টেণ্ডেড ইনটু বুশ। গাছের মত বাড়তে না দিয়ে কেটে ছেঁটে ঝাড় বানিয়ে রাখা হয়। ওই যে মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ দেখছো—ওগুলো রাখা হয়েছে—চায়ের ঝাড়কে ছায়া দিতে, ওসব গাছ বুড়ো হলে কেটেকুটে জ্বালানী বানানো হয়। আমায় কাজ শেখানোর জন্যে প্রথম এরকম একটা গার্ডেনে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার করে পাঠানো হয়েছিল। তিরিশ বছর আগে।

লেজলির মুখে কথাটা শুনে দিলীপ মনে মনে আন্দাজ নিল—লেজলির তাহলে অন্তত পঞ্চাশ। হাড়ে মাসে সাঁতার কাটা কাঠামো। কটা কটা চোখ আর চুল দেখে তো ওদের বয়স ধরা যায় না।

গাড়ি এসে থামলো একটা বিরাট বাংলোর সামনে। জনা তিরিশেক অধস্তন কর্মচারী লাইন দিয়ে দাঁড়ানো। তাতে নেপালী, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালীবাবু—সবরকমই আছে। ' প্রায় এদের গার্ড অব অনার নিয়েই স্বাতী লাফাতে লাফাতে বারান্দায় উঠলো। অন্তত এক বিঘের বারান্দা। বিরাট থামের গেট। ভেতরে বসার ঘর মানে—হলঘর। যা কিছু—সবই বড় বড়।

ওই বারান্দাতেই ব্রেকফাস্টের টেবিল পড়লো। মধুতে ভিজিয়ে শুকনো জ্যাম। আনারসের ঘন রস। কত কি। খেতে খেতে স্বাতী বললো, বাড়িটা ঘিরে ও কিসের খাল ?

বুনো হাতি বেরোয় রাত্রে। তাদের আটকাতে খুঁড়ে রাখা হয়েছে। বারান্দায় উঠতে লোহার পুল পেয়েছো ?

লক্ষ্য করিনি তো।

লেজলি বললো, ডিনারের পর দেখো। দিনে ওই লোহার পুলটা গরু ছাগল আটকায়। পার হতে গেলে লোহার জালে পা আটকে যাবে। তাই ও পুলের নাম কাউ ক্যাচার। রাতে কিন্তু পুলটা আমরা তুলে নিই। তখন বুনো হাতিও এদিকে আসতে পারবে না। আমরাও কেউ ওপারে যেতে পারবো না।

অতবড় পুল? তোলা যায়?

ইলেকট্রিক্যালি অপারেটেড। দরকার হলে লোক দিয়েও তোলা যায়। এই বাড়িতে সিকিউরিটির জন্যে অন্তত তিরিশজন গার্ড আছে।

ব্রেকফাস্টের টেবিলেও শেয়ার নিয়ে কথা বলা গেল না। মানে—দিলীপ তুলতে পারলো না। এত এলাহী কাণ্ড। এ গার্ডেনটা বোধহয় বারোশো একর। ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে যতদূর দেখা যায়—শুধু ওয়েলট্রিমড চায়ের ঝাড়। তার ভেতরে কোথাও ট্রাকটর দিয়ে লোহার চেন বেঁধে ষাট বছরের বেশী বয়সী চা-গাছ উপড়ে ফেলা হচ্ছে। সেখানে নতুন চারা বসবে।

লেজলি বললো, চাগাছের জীবন মানুষেরই মত। কৈশোর, যৌবন, ওল্ড এজ—সবই আছে। একদিকে গাছ বুড়ো হচ্ছে। অন্যদিকে নারসারিতে চারা বড় হচ্ছে। জায়গা খালি হলেই চারা গাছ তুলে নিয়ে সেখানে বসানো হচ্ছে। যাকে বলে চায়ের সংসার।

ঘুরে ঘুরে এই সংসার দেখতে বেলা এগারোটা বেজে গেল। মেয়েরা চায়ের পাতা তুলে ঝুড়িতে রাখছে। একদল পুরুষ ট্রাক্টরে চষা মাটিতে চারা বসাচ্ছিল। নারসারির জায়গাটা ছায়াঘেরা। সেখানে দশ লক্ষ চারার আয়োজন। চা-বাগান মানে একটা রাজত্ব। স্যার লেজলির কথা শুনছিল—আর স্বাতীর মনে হচ্ছিল—এ কোথায় এলাম! দূরে ড্রায়ার মেসিনে চা শুকোনো হচ্ছে। একদিকে সারি সারি কোয়ার্টার। জাঁদরেল এমপ্লয়ারের ভঙ্গীতে স্যার জানালো, ফুয়েল, ইলেকটিসিটি, মেডিকাল এডুকেশন, থাকবার জায়গা ফ্রি। সেই সঙ্গে সস্তায় রেশন। সাবসিডাইজড প্রাইসে।

দিলীপ বুঝলো, এটা একটা এম্পায়ার। সেই সকাল থেকে স্বাতী একবারও লেজলির কাছছাড়া হয়নি। লেজলিও হাঁটছিল, বসছিলো একটা হাত স্বাতীর কোমরে দিয়ে।

আবার পেল্লায় বাড়িটায় ফিরে ওরা যে যার ওয়াশ থেকে যখন বেরুলো—তখন কয়েক মিনিটের জন্যে স্বাতীকে একা পেল দিলীপ। কোথায় আছো?

স্বাতী বললো, বুঝতে পারছি না—কোন্ ঘরে রেখেছে। তুমি কোন্ ঘরে?

দিলীপ বললো, আমিও বুঝতে পারছি না—কোন্ ঘরে আছি। এ বাড়ির

ঠিক কোন্ জায়গাটায় আছি। শেষ পর্যন্ত প্রাণ হাতে নিয়ে এ বাড়ি থেকে বেরোতে পারলে হয়!

আমাকে শুতে দিয়েছে একদম মহারানীর খাটে। বলতে বলতে স্বাতী হল-ঘরের আয়নায় গিয়ে নিজের মাথার অগোছালো চুলগুলো ঠিক করে নিল। ওর গা দিয়ে অসম্ভব সুগন্ধী ছড়িয়ে পড়ছিল।

দিলীপ বলে ফেললো, স্বাতী তুমি খুব দামী।

কি বাজে বকছো! বলেও স্বাতী তার মুখে খুশীর ভাবটা ঢেকে রাখতে পারলো না। সেখানে বিউটিসিয়ানের পাকা হাতের প্রলেপ।

তোমার জন্যেই স্যার লেজলি উড এত কাণ্ড করছে। নয়তো একজন কোম্পানির চেয়ারম্যান শহর ছেড়ে গার্ডেনে এতটা সময় দিতে পারে?

আমাকে দেখলেই তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়? তাই না?

আমি তোমাকে আবার হারাবো স্বাতী। আমি সিওর। তুমি দেখে নিও।

তা যখন জানো—তবে তুমি এলে কেন? আমাকে আনলে কেন? এখানকার ভিজে বাতাসে আমার স্কিন খারাপ হয়ে যাবে। আগে জানলে আমিও আসতুম না। হিউমিডিটি বেশি।

স্যার লেজলির প্রাইভেট পুলে তোমাকে দেখে আমার কিন্তু ওসব মনে আসেনি স্বাতী।

সেখানেও তো তুমিই নিয়ে গিয়েছিলে—আমি তো এদের কাউকে কোনদিনই চিনতাম না। তোমার শেয়ার। তোমার খাদান। তোমার বন্ধু—ঋষিবাবু।

দিলীপ চুপ করে গেল। সে এখন জানে না—তার যোগাড় করা শেয়ারে সত্যি সত্যিই খাদান বাড়ানো হচ্ছে কিনা। একদিন সে যা ঠাট্টা করে বলেছিল—এই দেড় দু বছরে তা সত্যি হয়ে দাঁড়ালো। এখন দিলীপ জানেও না—ভৌমিক ট্রাস্টের খাদানের ভেতরকার ডিসিশনগুলো কেমন। সেসব ঠিক করে ঋষি, অনন্ত, গোকুল দত্ত মিলে। তার বেলায় থাকে শেয়ার প্রিমিয়ামের কমিশন। সে এখন কমিশনের একজন পাকা দালাল। কোল ইণ্ডিয়ার অফিসে তার একটা চাকরি আছে। সেখানে তার জন্যে টেবিল, চেয়ার, টেলিফোন আছে।

তুমিই তো স্যার লেজলির সামনে আমায় তুলে ধরলে। কো-অপারেট করতে বললে। আর সত্যিই তো লেজলি কত ফ্রেণ্ডলি। বেচারার বউ ফি বছর সাত-আট মাস দেশে কাটায়। বেচারা!

লোকালয়ের বাইরে দিলীপ এখন চারিদিকে আরামের আয়োজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছিল তার ফেরার রাস্তা বন্ধ। সে এখন এখানে সম্পূর্ণ লেজলির

দয়ায় আছে। কারণ, বেরোতে গেলেও স্তার লেজলির দরকার হবে। কাছাকাছি বিশ মাইলের ভেতর কোন শহর নেই।

দিলীপ একবার শুধু মনে মনে বললো, আমি মিশতে বলেছি বলেই—অতটা মিশবে? আমি তো বলিনি, সাঁতারে নেমে তুমি ওর পাঁজাকোলে ওঠো। তোমার তো কোথাও বেঁকে দাঁড়িয়ে আপত্তি করা উচিত ছিল। নো লেজলি। দিস ফার অ্যাণ্ড দাস ফার। তুমি ভীষণ নটি—বলেও তো মেয়েরা সরে আসে। কঠিন কথা বলতে হলো না—অথচ মধুরে মধুরে কাজও হলো। এমন তো করার পথ ছিল। ছিল না কি স্বাতী?

কিন্তু এর কোন কথাই দিলীপ মুখে আনতে পারলো না।

সিঁড়ি ভেঙে একজন উর্দি আঁটা বেয়ারা ছুটে ওপরে এলো। সাহাব সেলাম দিয়া—

তোমাদের সাহেব কোথায় এখন?

সাংকোচ নদীতে বসে আছেন। মাছ ধরবেন। আপনাদের জন্যে গাড়ি পাঠিয়েছেন।

দিলীপ স্বাতীকে বললো, তুমি ঘুরে এসো।

তা হয় না।

আমি বলছি—তুমি ঘুরে এসো, খানিক বাদে আমিও যাবো। বেয়ারাকে বললো, জায়গাটা এখান থেকে কতটা দূর হবে?

তা তিন মাইল। মেমসাহেবকে পৌঁছে দিয়েই ফের আসবো। ওখানেই তো রান্না হবে—নদীর পাড়ে। আপনারা গাছতলায় বসে লাঞ্চ করবেন। ফিরে এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।

আবার সেই বনেটে ভাঁজ করে শোয়ানো উইণ্ডস্ক্রীন। হুড গোটানো জিপ। স্কার্ফ জড়ানো স্বাতীর মাথাটা সবুজ চা-বাগানের ভেতর মুহূর্তে হারিয়ে গেল।

চোখের সামনের আকাশে সেই পাহাড়টার ফিকে আউটলাইন। মেঘে মিশে আছে। জায়গাটা নাকি ভুটানে। ভুটান পাহাড়। সেখানকার বরফগলা জল নেমে এসে এখানে সব নদী হয়েছে। ভরা বর্ষায় পাহাড় গুঁড়িয়ে ধ্বসিয়ে নিয়ে নদীগুলো নামে। গাছ ভেসে আসে। খাবারের অভাবে তখন বুনো হাতির পাল বেরিয়ে পড়ে। কখনো দল বেঁধে ওরা হাইওয়ে ক্রস করে। ব্রেকফাস্টে বসে স্তার লেজলি উড এসব বলেছিল—আজই—খানিক আগে।

সেই প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দিলীপের মনে হচ্ছিল—এই নির্দোষ দৃশ্যে সবুজ চা-বাগান—পাটকিলে রঙের মেঘ মাখানো পাহাড়—নীলচে রঙের নদী—এর

ভেতরে এত ভাঞ্চুর—এত ব্যবসা—হাতিদের এত খিদে !

আর আমি শুধু শেয়ারের পেছনে ছুটে চলেছি। কলকাতার একটা অফিসে আমার জন্যে একটা টেবিল আছে। সেখানে আমাকে বাড়তে দেওয়া হবে না। আমি ফাঁকি দিলে দেখার কেউ নেই। সেই অবস্থায়—আমাকে নিয়ে আমায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে। লয়ালটি! ডিসিপ্লিন!! বাঞ্চোৎ!!! খাদানে শেয়ার আসবে—আমি দালালি পাবো—কিন্তু খাদান বড় হবে না। চমৎকার। পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ায় কোল ইণ্ডিয়াকে জব্দ করার রাস্তা পেয়েও সে সুযোগ ইউটিলাইজ করা যাবে না। কেন? কেন? এমন হয় কেন সব? আমি বুঝি না। ঋষি, তুই মাতাল হলে একই গান গাইবি। তবু তুই কোল ইণ্ডিয়ায় গুড বয় হয়ে থাকতে চাস? হোয়াই? এ আমার কাছে এক রহস্য ঋষি। তুই বেশ ফাইন বলিস। দিলীপ। আমাদের এখন ঝুঁকি নেবার মত বয়স নেই। আমাদের বয়স হচ্ছে। হতো দশ বছর আগে—তাহলে খাদান বড় করা যেত। এখন আর হয় না দিলীপ।

যত বাজে কথা। আসলে ঋষি তুই কোল ইণ্ডিয়াকে বে-ইজ্জৎ করতে চাস না। শুধু পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ায় কোল ইণ্ডিয়ার সেল পড়ে গেলে বাছাধনেরা ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়তো। সে সুযোগ হাতে পেয়েও ছেড়ে দিচ্ছিস। কারণ? আমরা নাকি বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। ঝুঁকি নেবার আর বয়স নেই। অদ্ভুত যুক্তি। দৌড়ে ছুটে গিয়েও আমরা লং জাম্প দেব না।

দিলীপের চোখের সামনে সবুজ চা-বাগানে একটা বড় শাদা রঙের পাহাড়ি পাখি এসে বসলো।

সাংকোচ নদীর পাড়ে পৌঁছে দিলীপ দেখলো, জনা ছয়েক বেয়ারা মিলে তিন-জনের লাঞ্চ সাজাচ্ছে। ডজনখানেক ট্রাউট মাছ বড় তাওয়ায় ভাজা হচ্ছে। মাথার ওপর রূপোলি মেটাল খুঁটিতে টানানো সামিয়ানা। বাতাসে টাটকা মাছ ভাজার সুগন্ধ।

দিলীপকে দেখে স্যার লেজলি উড, বাঁ হাত তুলে বললো, হাই—

দিলীপও সেরকম একটা উষ্ণ আওয়াজ বের করলো নিজের গলা থেকে।

স্যার লেজলির ডান হাতে তখন বেলজিয়ান ফাইবার ছিপ। সামনে নীল-গেরুয়া রঙের সাংকোচ নদী। পাশে স্বাতী। বড় একটা পাথরের চাঁইয়ের ওপর স্কার্ফ পেতে বসেছে। দুজনেরই সামনে কয়েকটা আধোখোলা বিয়ার।

দিলীপ এগিয়ে যেতেই একজন বেয়ারা একটা বিয়ার খুলে দিল। কোন গ্লাস নেই। বোতল—বোতল সই। উপুড় করে তাই মুখে লাগালো দিলীপ। স্যার

লেজলি তখন সোনালী রঙের ধাতব টোপটা ডান হাতে নিয়ে আবার নদীতে, ছুঁড়ে দিল। বড় বড় বোল্ডারের চারদিকে চক্কর দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছিল। স্বাতী একবারের জন্যেও দিলীপের দিকে তাকালো না।

রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের এই নির্মেদ নাইট প্রচণ্ড শক্তি রাখে শরীরে। দুপুরে ভরপেট খাওয়ার পরেই ওদের নিয়ে স্যার লেজলি আবার এয়ারস্ট্রিপে ছুটলো। মুখে বললো, ডিলিপ—উই উইল হ্যাভ্ অ্যানাদার হপ্। আমরা কয়েকটা গার্ডেন মিলে জায়গা ছেড়ে দিয়ে গলফ্ কোর্স করেছি। সবুজ ঘাসে ঢাকা টোয়েন্টি সেভেন হোল কোর্স। পাশেই প্লান্টার্স ক্লাব। ইচ্ছে হলে টেনিস খেলতে পারো।

আমি খেলতে জানি না স্যার লেজলি।

বি স্পোর্ট। ও আবার জানা লাগে নাকি। আমি তো কোনদিন শিখিনি। অথচ খেলে থাকি।

তোমার ভেতরে কত শক্তি স্যার লেজলি। তুমি ইচ্ছে করলে সব পারো।

মনে হচ্ছে ডিলিপ—তোমাদের কয়লা আমাকে কিনতেই হবে!

না। না। তেমন কোন কথা নেই তো। আমি তোমার ভেতরকার ভাইটালিটির কথা বলছিলাম।

সত্যি! স্বাতী কি তা স্বীকার করে?

দুজন পুরুষ এবার একসঙ্গে একজন মেয়েলোকের দিকে তাকালো। স্বাতী তখনো বেশি বিয়ারের ঝোঁকে খানিকটা আলুথালু। সেই অবস্থাতেই স্যার লেজলির পিঠে একটা চড় দিল।

দিলীপ বুঝলো, কাজ হয়েছে। স্যার লেজলি সারা বছরের কয়লা নেবেই। মুখে বললো, জায়গাটা এখান থেকে কতদূর?

গলফ্ কোর্স? একশো মাইলের কিছু বেশি। লেস দ্যান হাফ অ্যান আওয়ার্স ফ্লাইট।

আবার পাইলট। আবার আকাশে। ল্যাণ্ডিংয়ের সময় পেছনের টায়ার মাটিতে পাতা লোহার প্যারাপেটে শব্দ তুললো। যাকে বলে হপিং অ্যারাউণ্ড। চারদিকে চা-বাগান। মাঠের পর মাঠ জুড়ে গলফ্ কোর্স। পাশেই প্লান্টার্স ক্লাবের হার্ড কোর্টে টেনিস চলছিল। যারা খেলছিল—তারা কেউই তিরিশ মাইলের ভেতর থাকে না। এক-একজন এক একটি গার্ডেনের সর্বময়। তাই এ-ক্লাবে খাবার জলের কাচের গ্লাসও অন্য কায়দার।

তাই এখানে দিলীপ ভিজিটর কিংবা অনলুকার থেকেই গেল। টাটকা চেহারার ম্যানেজাররা ভারি র‍্যাকেট দিয়ে টেনিস্ খেলছিল। পাশেই ক্লাব ঘরে অচেল

লিংকস। লাগোয়া গলফ্ কোর্সে সাদা জুঁই রঙের গলফ্ বল পিটিয়ে স্যার লেজলি মনোযোগ দিয়ে স্বাতীকে খেলাটা শেখাতে লাগলো। বল-কুড়োনি বালকরা মাঠময় ছুটে ছুটে সারা।

আবার ফ্লাইট। আবার হুডখোলা জিপ। লেজলি গার্ডেনে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। তখন বাগানের গাছপালায় মেঘভাঙা জ্যোৎস্না। ভিজে বাতাসে ঠাণ্ডা ছিল বলে বসবার ঘরে ফায়ার-প্লেসে আগুন।

সে-আগুনকে পেছনে রেখে স্যার লেজলি বললো, ডিলিপ—টেক রেস্ট টু-নাইট। কাল দুপুরে আমরা এখান থেকে আড়াইশো মাইল দূরে আমাদেরই আরেকটা গার্ডেনে যাবো। সবটাই অলীক লাগছিল দিলীপের। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাসে মাইলের পর মাইল চা-গাছ অল্পস্বল্প দুলছে। ভেতরে ফায়ার-প্লেসের সামনে একজন কোম্পানি চেয়ারম্যান গ্লাস হাতে। স্বাতী অফুরন্ত হাসছিল। কথা বলছিল। বোধহয় নেশা হয়ে গেল এইমাত্র। একদম অজানা বাড়ি। কোথায় কোন্ ঘর কে জানে। তারই একটায় মহারানীমার্কা খাটে স্বাতী আজ রাতটা ঘুমোবে।

কলকাতার টেলিফোন ধরতে স্যার লেজলি পাশের ঘরে যেতেই দিলীপ নিজের গ্লাসটা কাচের টেবিলে রাখলো শব্দ করে। তারপর আলুথালু স্বাতীর দিকে সোজা তাকিয়ে এগিয়ে গেল। হাতের গ্লাসটা কেড়ে নিয়ে সেটাও দিলীপ শব্দ করে কাঁচের টেবিলে রাখলো।

কি হলো? অমন করছো কেন?

দিলীপ কোন জবাব না দিয়ে সোজাসুজি স্বাতীকে ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলো।

পরিণাম দাঁড়ালো বিপরীত। স্বাতী হেসে জানতে চাইলো, কেন? টোপ তো দিয়েছো। এখনো গেঁথে তুলতে পারোনি? এ বড় শক্ত মাছ। টোপ গিলেই তলিয়ে যায়। তাই না?

দিলীপ বুঝতে পারছিল না, স্বাতী ভান করছে? না—সত্যিই ওর নেশা হয়েছে?

হাতে সময় বড় কম। টেলিফোন সেরে স্যার লেজলি এখুনি ফিরে আসবে। আর একবার স্বাতীকে ঝাঁকুনি দিলো। এ বাড়ির ঠিক কোন্ ঘরটায় তুমি আছো? ঠিক করে বলো।

আমি কি ছাই জানি। কত ঘর এখানে। আমিও তো তোমারই মত নতুন।

মনে করার চেষ্টা করো স্বাতী।

কেন ? এরই ভেতর জেলাসি।

ও ঘরে রিসিভার রাখার শব্দ। ফায়ার-প্লেসে ফাঁপা কয়লা শব্দ করে ফাটলো। চারদিকে নিশুতি রাতের ফাঁকা ফাঁকা ভাব। স্বাতীকে ছেড়ে দিয়ে দিলীপ নিজের জায়গায় ফিরে এলো।

ডিনারের পর সবারই চোখ জড়িয়ে আসছিল। আজই শেষরাতে কলকাতায় বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়েছে।

দিলীপের ঘুম ভাঙলো বেশি রাতে। হাতি বা বুনো শুয়োরের চিৎকারে নয়। কিংবা কোন পাহাড়ি ময়ূরও ডেকে ওঠেনি।

মানুষের হাসিতে—কথায়—ঘুম ভেঙে গেল দিলীপের। উঁচু প্লিন্থের ওপর গেঁথে তোলা বাড়ি। জানলাটা খুলতেই ফিনকি দিয়ে জ্যোৎস্না ঢুকে গেল দিলীপের চোখে। তখনো যাকে বলে মানুষের কলহাস ভেসে আসছিল।

জানলাটা আরেকটু খুলতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল দিলীপের। এখন নিশুতি রাত। লম্বা টানা সিঁড়ির ধাপে দুটি স্বর্গখেলনা প্রায়।

স্বাতী লেজলি—দুজনেরই গায়ে কিছু নেই। স্বাতীর সে স্কিন এ আলোয় বোঝা যায় না। এক একটা ধাপ উঠছে। তার পেছন পেছন হাড়েমাসে কাঠামোয় স্যার লেজলি। বাইশ হাজার স্টাফের চেয়ারম্যান। গলায় নিশুতি রাতের ঠাণ্ডা বাতাস।

এক অদৃশ্য সুইমিং পুলেই যেন বুকজলে দাঁড়িয়ে ছিল লেজলি। গার্ডেনের সরু এক চিলতে রাস্তায় জলের বদলে জ্যোৎস্না। তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে লেজলি দু হাতে স্বর্গখেলনা পাঁজাকোলে তুলে নিল। শূন্যে ওঠা অবস্থায় বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের নখে স্বাতী খানিকটা তরল জ্যোৎস্না চারদিকে ছিটিয়ে দিল। তারপরই ওরা দুজন গাছপালার অনেকখানি ছায়ার ভেতর পড়ে গেল। অন্ধকার কুরে কুরেও আর কিছু দেখতে পেল না দিলীপ। শুধু একবার চাপা কলহাসি ভেসে এসেছিল বোধহয়। অনেকদূর থেকে। ততক্ষণে জানলা টেনে দিয়ে দিলীপ বন্ধ শুয়ে পড়েছে।

ঘুম ভাঙলো কিন্তু খুব ভোরে। জানলা খুলেই দেখলো, মুগার সুতো বসানো একখানা তাঁতের শাড়ি পরে স্বাতী লনে পড়ে থাকা শিউলি কুড়োচ্ছে। দূরে বীর-পাড়ার বাস যাচ্ছিল। স্বাতী ঝুঁকে পড়ে কুড়োচ্ছে। আঁট করে বাঁধা চুল। শাড়ির নিচের দিককার পাড় ভোরের শিশিরে ভিজে উঠেছে।

লেজলি নিশ্চয় এখনো বিছানায়। দিলীপ ঠিক করলো, এখুনি গিয়ে পেছন থেকে স্বাতীকে জড়িয়ে ধরবে। শার্ট ভেতরে গুঁজে ট্রাউজার পরে নিল। পায়ে

'ও। দরজায় একদম শব্দ না করে পা টিপে টিপে সিঁড়ির ধাপগুলো পার হলো।

আর কয়েক পা এগোলেই স্বাতী। বাগানের লোকজন তখনো আসেনি। নির্জন লন।

দিলীপ থমকে দাঁড়ালো। স্বাতী নিচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে জুঁই সাদা যা কুড়োচ্ছিল তা গাছতলায় শিউলি নয়। আনকোরা পাঁচ-ছটা গলফের বল। এতক্ষণ যা দেখতে পায় দিলীপ—তা হলো স্বাতীর হাতের স্টিকখানা। ভোরবেলা বল মারবার কসরৎ কষে দেখছে।

আগেকার রবার ভেঁপু বাজিয়ে বীরপাড়া থেকে বাস আসছিল। যাবে শিলিগুড়ি। দিলীপ একটু একটু করে পিছোতে লাগলো। স্বাতী যাতে দেখতে না পায় এমনভাবেই কম্পাউণ্ডের তারকাঁটা পেরোলো দিলীপ। তারপরেই পিচ-রাস্তা। এদিকটায় চোখ যাবে না। দিলীপ এখন দৌড়োচ্ছে। বাসটা এসে রেনট্রি গাছের ওখানে থামবার আগেই সে পৌছুতে চায়। তখনো ভালো করে রোদ ওঠেনি।

শিলিগুড়িতে এখন আর্মির লোকজন যায় আসে। দোকানে দোকানে স্মাগলিং করা স্ট্রেচলন। ক্যাসেট। টেপরেকর্ডার। সব স্মাগল্ করা জিনিসপত্তর। এখানকার বেলএয়ার হোটেলে তিন মাসের চুক্তি হয়েছে বিশ্বনাথের। হোটেল কাম বার। বিকেল থেকে সন্ধ্যে অব্দি গাইতে হবে বিশ্বনাথকে। থাকা খাওয়া ছাড়াও মাসে সাতশো টাকা।

কিছু আগাম পেয়ে মায়ের জন্য শাড়ি কিনেছে বিশ্বনাথ। দুখানা। তাছাড়া বাবার চটি আর একটা হাফশার্ট।

বাবা চটি পায়ে দিয়ে বললো, ফাইন কিনেছিস। অনেকদিন টিঁকবে।

বিশ্বনাথ দেখছিল আর তার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। সস্তার স্যাণ্ডেলের বাইরে তার বাবার ফাটা গোড়ালি বেরিয়ে। হাফশার্টটা গায়ে দিয়েছে বাবা। একটু ঢোলা হয়েছে। হাতার বাইরে কালো কনুই। মা রান্না করছিল। এক-সঙ্গে একজোড়া শাড়ি পেয়ে দোতলার বাড়িওয়ালাকে দেখাতে চলে গেল। এই বাড়িওয়ালার বউ একদিন বলেছিল বিশু একটা বিশ্ববখাটে। লম্বা চুল রেখে রকে বসে গায়। দেখো ও জীবনে কিছু করতে পারবে না। সেই বিশুর গানের টাকায় কেনা শাড়ি না দেখিয়ে কি পারে মা!

বিশ্বনাথ পুরনো রকে এসে বসলো। বাচ্চু, বাবুলাল, টাপু ওরা কেউ নেই এখন। কোথায় বেরিয়েছে। এই রকের গা দিয়ে সরু গলিটার মাথায় পৌছলে

শ্যাওলাপড়া দেওয়ালঘেরা ওই অন্ধকার এঁদো বাড়িটায় তার জন্ম হয়েছে।
এখানেই সে বড় হয়েছে। আমি আজকাল কনুইতে এ. ডি ভিটামিন তেল মাখি।
ভাইবোনের মধ্যে আমিই ফরসা। আমি হোটেলে খাই। সঙ্গে অ্যাপেটাইজার।
আমার কনুইতে দাগ নেই কোন। গায়ে আমার ভাল শার্ট। এ ট্রাউজারটা অবশ্য
দিলীপদা বানিয়ে দিয়েছিল। সেই গত বর্ষায়। ভালো কাপড়। আজও ছেঁড়েনি।
যাই একবার ওদিকে। অনেকদিন দিলীপদার সঙ্গে দেখা নেই। দেখা নেই
কুটুর সঙ্গেও। বাচ্চু ওরা বোধহয় এখন দিলীপদাদের ফ্ল্যাটবাড়ির বেসমেণ্টে।
নিশ্চয় পার্কিং লটে খবরের কাগজ পেতে বসে তাস পেটাচ্ছে।

বিশ্বনাথের পেছনে এখন আদি গঙ্গার ওপর সি. এম. ডি, এ.-র নতুন ব্রিজ।
শ্মশান। চেতলা বেকারির চিমনি। সামনে সিধে বর্ধমান রোড। সে-রাস্তার
গা দিয়ে সুন্দর সুন্দর সব বাড়ির দিকে নানা পথ।

ওদিকটায় পর পর কয়েকটা মালটিস্টোরিড বাড়ি। এদিকটায় হাঁটলে বিশ্ব-
নাথের অনেক কথা মনে পড়ে যায়। বাবার চিঁড়ে-গুড়ের দোকান একসময় খুব
ভালো চলতো। বাজারের ভেতর ওটাই ছিল এ-লাইনের সবচেয়ে চালু দোকান।
বাবা আমায় ক্যাশে বসাতো। আমি ক্যাশ ভেঙে বাচ্চু বাবুলালদের সিনেমা
দেখিয়েছি—দিনের পর দিন। তারপর রেস্টুরেন্ট। দীঘা বেড়াতে গেছি সাত-
জন মিলে। খাওয়াদাওয়া। সবই এই ক্যাশ ভেঙে। আমার জন্যেই দোকানের
আজ এই হাল।

হাঁটতে হাঁটতে বিশ্বনাথ দিলীপদের ফ্ল্যাটবাড়ির বেসমেণ্টে এসে হাজির।
কোথায় বাচ্চু? কোথায় বাবুলাল? সব ভোঁ ভাঁ।

বিশ্বনাথ ফিরে আসছিল। লিফট থেকে কুটু বেরিয়ে এলো। অটোমেটিক
লিফটে আর কেউ নেই।

কুটু থমকে দাঁড়ালো। তারপর এগিয়ে এসে বললো, কান টেনে ছিঁড়ে দেব।

এতদিন পরে দেখা। একটা ভালো কথা শোনা যায়। তুমি বারণ করার
পর আমি তো আর চিঠি লিখিনি তোমাকে।

সুবোধ বালক। আমার সব কথা যেন শুনে চলো কতো!

কোথায় যাচ্ছো কুটু? কলেজে? দিলীপদা কোথায়?

কলেজের খবর দিয়ে কি হবে তোর? স্কুল-ফাইন্যালে তো ধেড়িয়েছিলি।
কলেজের মানে জানিস তুই?

না। জানবো কি করে? কোনদিন তো পড়িনি ওখানে। তুমি পড়ছো—
তাতেই আমার আনন্দ।

আহা! কত বিনয়। নে, একটা কাজ করে দে।

কি কাজ বলো কুটু।

অতি ভক্তি ভালো নয় কিন্তু। চিণ্টুর একটা ছবি রিলিজ হয়েছে আজই। রেখা আছে। আমজাদ আছে। একখানা টিকিট কেটে আনতে পারবি? ব্ল্যাকে নয় কিন্তু। আমার বেশি পয়সা নেই।

বেশি পয়সা নেই শুনে একটু অবাক হলো বিশ্বনাথ। মুখে বললো, আমি কি পারবো!

ওমা! তুই তো আগে কেটে এনে দিয়েছিস কতো।

আজকাল তো আমি এখানে থাকি না। কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই। টিকিট কি রিলিজের দিনে পাবো!

কোথায় থাকিস আজকাল? তাই দেখিনে!

তুমি তো একটা খবর নাওনি কুটু। আসানসোলে ছিলাম এক মাস। কালই শিলিগুড়ি চলে যাবো।

চাকরি পেয়েছিস?

তা বলতে পারো। হোটেলে গান গাই।

তোর গলায়! সে গান কারা শোনে রে?

যত্ত মাতাল। জুয়াড়ি। রেস্থুড়ে আর দালাল। সত্যি কুটু।

এত খারাপ লোক কোথায় একসঙ্গে জড়ো হয়?

কেন? মদ খেতে। বারে। হোটেলে।

তোর তো খুব কষ্ট বিশু। ওরা তো গান বোঝে না।

খুব সত্যি বলেছো কুটু।

এবার কুটু একটু নরম হলো। যা—তোকে দিয়ে হবে না। এদিকে এসেছিলি কেন? আমায় দেখতে?

না। বাচ্চু—বাবুলাল ওরা যদি থাকে। তাই এসেছিলাম। আর—

আর?

যদি তোমার বাবা—দিলীপদার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। প্রায় বছরখানেক দেখা নেই ওঁর সঙ্গে। এই ট্রাউজারটা দিলীপদাই আমায় বানিয়ে দিয়েছিল। তখন আমার খুব খারাপ অবস্থা। পার্ক স্ট্রীটে 'রোড্ সাইড্ ইনে' প্রথম গাইবো। তখন কাপড় কিনে দিলীপদা সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বানিয়ে দিয়েছিল। তা এক বছর তো হয়ে গেল। দিলীপদার জন্যে একটা জিনিস এনে রেখেছি আসানসোল থেকে। দিয়ে যাবো কাল সকালে।

কি জিনিস ?

এক বোতল ব্যানানা রাম। ক্যারিবিয়ানের আসল জিনিস।

মদ তো ? বাবাকে দিস নে।

কুটুর গলায় ছায়া এসে দাঁড়ালো। স্বর তাই খানিকটা নেমে গেল। কুটু বলছিলো, বাবা আজকাল কত রাতে ফেরে আমরা জানি না। জানে মা। বেহুঁশ হয়ে ফিরে জুতো জামা সুদ্ধ বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। তখন অজ্ঞান লোকটার পা থেকে জুতো মোজা খোলে মা।

রবিদা ?

দাদা! দাদা তো আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। পুলিস খুঁজে গেছে কবার। মা কাঁদে। বাবা খোঁজও নেয় না। বাবা পাল্টে গিয়েই তো আমাদের আজ এই হাল।

বিশ্বনাথ এবার ভালো করে দেখলো কুটুকে। সাধারণ ছাপা শাড়ি। হাতে দুগাছা চুড়ি। কানে মাকড়ি। গলায় সেই হারটা নেই। আগেকার গরজাস রঙের শাড়ি ব্লাউজের বদলে ঐ আটপৌরে ভাবটাতেই কুটুকে বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। কুটু তা জানেও না। আগের চেয়ে ওকে একটু রোগা লাগলো বিশ্বনাথের।

দিলীপদার কি হয়েছে কুটু ?

আমি জানি না। তবে অফিসে বিশেষ যায় না। কলকাতার বাইরে ছুটো-ছুটি। শেয়ার না কি সব—আমি বুঝিও না।

রবিদা কিছু করতে পারে না ?

সে নিজেই তো পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তার খোঁজ কে নেয়!

তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি কুটু ?

নাঃ। শুনেছি—তোদের পাড়ার দিকে মালা না মালবিকা নামে একটা গেছো মেয়ের সঙ্গে তাকে দেখা যায় মাঝে মাঝে। মেয়েটা আগে খুব ভোরে আমাদের এ রাস্তায় দৌড় প্র্যাকটিস করতো। আজকাল আর দেখি না।

বিশ্বনাথ মনে মনে বললো, বাচ্চুর বোন মালবিকা। আমাদের খুকী। বেঙ্গল টিমের অ্যাথলেট।

নয়

বন্ডেল ব্যালার্ড এসটেটে ভৌমিক ট্রাস্টের অফিস ওপেন করতে গিয়েছিল দিলীপ বসু। ওখানে এখন বর্ষা। গোবিন্দ স্টিল ছাড়াও এখন ওদিকে অনেক খদ্দের।

এখনো রাজস্থান, গুজরাটের অনেকেই কয়লা দেখেনি। অবশ্য রুরাল এরিয়ায়।

সান্তাক্রুজ থেকে প্রায় শেষ রাতে এয়ার বাস ছাড়লো। শহর ছাড়ার সময় পথে পথে ভোর রাতের আলো। টেক অফের তিন মিনিটের ভেতর প্লেন মেঘ পেরিয়ে গেল। নিচে মেঘলা আকাশ। সেদিকে তাকালে সূর্যের দিকে মেঘের এ পিঠটা উজ্জ্বল। জানলার পাশে বসতে পেরে দিলীপ বুঝলো, ভয়ঙ্কর স্পীডের ভেতর স্পীড্ বোঝা যায় না। প্লেনটা এখন যেন শূন্যে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা যেন আমার গত দেড় দু বছরের জীবন। আমি ছুটেই চলেছি। কিন্তু বাইরে থেকে মনে হবে একই জায়গায় আছি। সেই তো ভৌমিক ট্রাস্টের কয়লা বিক্রি। শেয়ারের টোপ ফেলা—তারপর সুতো গুটিয়ে গেঁথে তোলা। এর নাম কমিশন। এর নাম দালালি। মাঝে মধ্যে কোল ইণ্ডিয়ার অফিসে নিজের মুখখানা দেখানো।

দমদমে নেমে ট্যাক্সি নিল দিলীপ। বেশ ছুটছে গাড়িটা। ভি. আই. পি রোডের মাঝখানে তারের জালে ঘেরা ফুলবাগান। তোমার ট্যাক্সিটা কত দিনকার ভাই?

দশ বছর হয়ে গেল বাবু।

তেল খাচ্ছে কেমন?

তা লিটারে দশ এগারো কিলোমিটার পাই। তা না হলে ট্যাক্সি চলে!

ইঞ্জিন নষ্ট হয়ে যাবে তো!

ছ' মাস অন্তর ইঞ্জিনের ভ্যলভ পালটে দিই।

তোমারই নিজের ট্যাক্সি?

হ্যাঁ বাবু। চার হাজারে ভাঙা গাড়ি কিনে নিয়ে সারিয়ে নিয়েছি। ঝেড়ে কাজ করানোর পর জানি—আমার গাড়ির কোথায় কি আছে।

কত পড়লো?

আমরা তো ট্যাক্সিওয়ালা বাবু। হাজার তিনেক পড়লো কাজ করাতে। মোট সাত হাজারে রাস্তায় গাড়ি ছুটছে।

সত্যি?

হ্যাঁ বাবু। আমার মত অনেকেই তা করে। নতুন গাড়ি তো তিরিশ হাজারের ওপর।

আমি ওরকম করতে পারি তো?

নিশ্চয় পারেন। গাড়ির কোথায় কি আছে—তা আপনার জানা থাকবে।

ওরকম গাড়ির খবর পেলেই জানাবে আমাকে। আমার ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি।

চলুন না। এখুনি আপনাকে দেখাচ্ছি। কিন্তু উল্টো দিকে যেতে হবে।

কোথায় ?

বারাসতে।

চলো।

ভোর রাতে সান্টাক্রুজ। বেলা ন'টায় বারাসাত। ভালোই লাগছিল দিলীপের। বসতি এলাকায় একজনের বেগুন, লঙ্কা লাগানো মাঠে—পাশেই বাড়ির কুয়োতলা—সেখানে অ্যামব্যাসাডরের একটা মড়া পড়ে আছে। রিং অব্দি টায়ার বসে গেছে মাটিতে। স্টিয়ারিংয়ে মাকড়সার জাল। আপহোলস্ট্রির লুণ্ঠপুণ্ঠ অবস্থা। সামনের গ্রিলের নিকেল নেই।

ড্রাইভার বললো, বাইরেটা খারাপ। কিন্তু—ইঞ্জিন, গিয়ার বক্স, ডিফারেন-সিয়াল—নিখুঁত। আমি জানি বাবু চারটে টায়ার পাল্টে নিতে হবে, স্টেপনিটা ভালো। ঘরে তোলা আছে। আপনি রং করে সার্ভিস করে নিন। পরে আস্তে আস্তে নিকেল করাবেন।

বডির কাজ আছে।

তাতো থাকবেই বাবু। কতদিন পড়ে আছে গাড়িটা।

কত চাইছে ?

তিন হাজার। বলে কয়ে শ' পাঁচেক কমানো যাবে। আপনার অন রোড করতে পাক্কা তিন হাজার পড়বে। সব মিলিয়ে ধরে নিতে পারেন ছ হাজার।

চলবে গাড়ি ?

পক্ষীরাজের মত ছুটবে। ওভারহেড ইঞ্জিন। রিং টিং সব ভালো আছে।

ইঞ্জিন ?

স্ট্যাণ্ডার্ড বোর। চল্লিশ নম্বর মবিল দিয়ে চালাবেন।

চলবে তো ?

আলবৎ চলবে। স্টিয়ারিং সাসপেনসন দেখিয়ে নেবেন। বুশ পালটে দিলেই চলবে। লক মিস্ত্রি দিয়ে দরজা অ্যাডজাস্ট করালেই কোন আওয়াজ থাকবে না, ফেল্ট পাল্টাতে বড়জোর বিশ টাকা।

ডায়নামো, সেল্ফ, ব্যাটারি ?

ব্যাটারি তোলা আছে ঘরে। চার্জে বসাতে হবে। ডায়নামো, সেল্ফ—অয়েল করিয়ে নেবেন। কারবন—বুশ—যা পাল্টাবার পাল্টাবেন। বড়জোর তিরিশ চল্লিশ যাবে। ওই সঙ্গে ওয়াইপারের মোটর আর ইলেকট্রিক লাইন চেক করাবেন।

তাহলে আর বাকি থাকলো কি ভাই ?

তা বিড়লাজীর কোম্পানির একটা গাড়ির বাবু দু' হাজার আইটেম আছে। সে তুলনায় তো আপনাকে কম বললাম। যদি নেন্ তো কথা বলি।

বাড়ি ফিরে কথা বলবো। আগে ভেবে দেখি।

ফেরার পথে কলকাতা ফুঁড়ে ছুটতে হচ্ছিল। পৃথিবীর গায়ে এই জায়গাটা এভাবে সাজানো বলে এর নাম কলকাতা। সে-জায়গাটা ওভাবে সাজানো বলে তার নাম বোম্বে। এই সব চেনা জায়গার নিরিখটা ধরতে পারলে তবে জীবনে স্বাদ আসে। আর স্বাদ আসে এক একটা জয়ের পর। দু' বছর আগে ভৌমিক ট্রাস্টের খাদানের অল্প কয়েক মাসের জীবনে গোবিন্দ স্টিলের সঙ্গে চুক্তিটাই ছিল সবচেয়ে বড়। ছত্রিশ লক্ষ টাকার সাপ্লাই শেয়ার কন্ট্রাক্ট। তখন সেটা মনে হয়েছিল—একটা নয়। এই জয়গুলো পার হবার মধ্যে দিলীপ শরীরের ভেতর কী একটা আনন্দ পেতো। সে হিমালয়ে চড়ে নি। একুশ ফুট হাইজাম্প দেয়নি কোনদিন। কিন্তু এরকম এক একটা শেয়ার বিক্রি—বা, সাপ্লাইয়ের কড়ার গেঁথে তোলার পর এক রকমের কনফিডেন্স তার ভেতর কাজ করতো। এই সেদিনও করেছে। কিন্তু এখন আর তা হয় না দিলীপের।

এয়ারবাস থেকে নেমেই বারাসাত। আবার কলকাতা। আমার জীবনে আগেকার দৌড়োদৌড়ি আছে। কিন্তু সেই দৌড়োদৌড়ি থেকে সে-স্বাদ আর পাই না আমি। কিছু বানানো—বা কিছু গড়ে তোলার ভেতরে ভেতরে আমার শরীর দিয়ে, সিক্রিশন হয়। মনের যদি শরীর থাকতো—তাহলে তারও তাই হোত। এমন কাজ না হলে আমি আরাম পাই না। কাজে আমার কোন স্বাদ থাকে না।

এখন স্বাদ পাই শুধু খাবারে। মাংসের নরম কাবাব। পসিন্দা কাবাব। হাতে গড়া রুটি দিয়ে। অল্প দুধ দিয়ে লাউ শাক। কিংবা ঢেঁকি শাক। কচি গুড়ের। টাটকা ইলিশ ভাপানো। খাবার শেষে মিঠে পান। অল্প সুপুরির।

দিলীপ ঠিক করতে পারছিল না—সামনে তার কি প্রোগ্রাম? সে কি অনাদি কাল ধরে শেয়ারের পর শেয়ার বেচে যাবে? না, নানা জিনিসের রান্না খেয়ে যাবে? ডাক্তারবাবু বলছিলেন, আপনি প্রোটিন খাবেন না। দুধ খাবেন না। সিগারেট খাবেন না। চিনি নয়। বাঁধা কপি নয়। আলু নয়।

তাহলে কি খাবো ডাক্তারবাবু?

[illegible] না [illegible] থাকবেন।

তা [illegible] [illegible] না।

তাহলে শাক পাতা খেয়ে থাকুন। আপনার [illegible] কোন [illegible] নেই। যা খাবেন তাই ফ্যাট হবে। [illegible] আমাদের শরীরের ভেতরে একটা অর্কেস্ট্রা। এর সঙ্গে কিডনি হার্ট লিভার—সবাই জড়িয়ে আছে। তারাও একটু একটু করে জখম হচ্ছে। ফাস্টিং হোল গিয়ে আপনার চিকিৎসা।

তাহলে তো আমি কোন কাজ করতে পারবো না।

অসাবধানে খেলে আপনার ওজন বাড়বে আরও। আপনার হার্ট অতটা রক্ত পাম্প করতে পারবে না মিস্টার বোস। আপনার ভ্রূ মুছে যাচ্ছে।

যাক না। তাতেই বা কি। আমি এখনো খেতে পারি। খাবার জন্যে খাটতে পারি। ভাবতে পারি। ডাক্তারবাবু—আমার সব সময়—কিছু না কিছু বানাতে ইচ্ছে করে।

যেমন ?

এই ধরুন—মোটর গাড়ি জিনিসটা এখন সাত পুরনো। কিন্তু ইচ্ অ্যাণ্ড এভরি বাতিল মোটরকারের ইঞ্জিনের জন্যে আমার দুঃখ হয়। আহা! ওরা আরও অনেক দিন কাজ করতে পারতো। কিন্তু বডি ব্যাটারি—বিট্রে করেছে। তাই এ অবস্থা। স্ক্র্যাপ হয়ে মল্লিকবাজারে চলে যাবে। আহা রে!

আপনি ওদের নিয়ে কি করতে চান ?

আবার চালু করতে চাই। আবার ওরা চলুক। পৃথিবীর গায়ের ওপর দিয়ে ঘুরে ফিরে বেড়াক। হর্নের বদলে জয়কলের ঘণ্টা বাজুক। স্টিয়ারিংয়ের পাশে বসুক—চিড়িয়াখানায় হরিণের একটা বাচ্চা। তার গায়ে রোদ পড়ে পিছলে যাবে।

ডাক্তারবাবু একজন এম. ডি.। তিনি খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন দিলীপের মুখে। তারপর ওঠার সময় বলেছিলেন, যা ভালো বুঝবেন করবেন। তবে একখানা বিস্কুট খেলেও আপনার শরীরে ফ্যাট হবে। আর সে ফ্যাট মারাত্মক।

ট্যাক্সিকে পার্ক সার্কাসের পুরনো কবরখানার পাশের গলিতে দাঁড়াতে বলে দিলীপ বসু নেমে পড়লো। ওয়েটিং ডবল দেব ভাই। একটু দাঁড়াতে হবে।

কতক্ষণ বাবু ? আমায় ছেড়ে দিন না।

তাহলে অ্যাটাচি কেসটা দাও।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে বেলা সওয়া দশটায় অ্যাটাচি কেস হাতে দিলীপ বসু, [illegible] কবরখানায় ঢুকে পড়লো। আর মনে মনে বললো, মারাত্মক। আমার আর মারাত্মকের কি বাকি আছে!

ডেমলার সাহেব নিকারবকার পরে কলাই থালা ধুচ্ছিল। দিলীপকে দেখে উইশ করলো। এত সকালে কি মনে করে?

অনেকদিন দেখা হয় না তোমার সঙ্গে। ভাবলুম যাই দেখা করে যাই। দুটো বিয়ার আনাও। দু প্লেট মাংস ভাজা। সঙ্গে শশা আর টমেটো দেবে কিন্তু।

তাখো দিলীপ—এই তোমার মত লোকের জন্যে কবরখানায় আমার এই কেয়ারটেকারের কাজটি যাবে। আমরা বুড়োবুড়ি থাকি। একটু আধটু ম্যাণ্ডোলিন বাজাই। মিসেস সামান্য যা রান্না করে—তার খানিকটা তোমরা কিনে খাও। এ দিয়েই আমাদের চলে যায়। কিন্তু কবরখানায় দিনের বেলায় বোতল খুলে বসলে মোরনাররা যদি প্রোটেস্ট করে—আমার কি বলার থাকবে?

ডেমলার! কোনদিন এমন সময় আসিনি আমি। মানসেটার পর তোমার ম্যাণ্ডোলিনের সঙ্গে মিসেসের রান্না কাবাব কবরখানায় খানিকক্ষণের জন্যে বসন্ত নিয়ে আসে।

তাহলে চলো—আমরা দুজনে রান্নাঘরের পেছনে ওই গন্ধরাজ গাছের পাশে বসি। বুড়ি বোতল বের করে দেবার সময় একটু খ্যাচ্ খ্যাচ্ করবে ঠিকই—

দিলীপ তিনটে দশ টাকার নোট এগিয়ে দিল। জাতে জার্মান। এদেশে ডেমলার অনেককাল। দু-দুটো ওয়ার্ল্ড ওয়ারে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে রেখে দিয়েছে। আবার যুদ্ধের পর ছাড়া পেয়েছে। বালক বয়সে কলকাতায় এসেছিল। আর ফেরা হয়নি ওর দেশে। বছর চল্লিশেক আগে শিলংয়ে এক খাসিয়াকে বিয়ে করে। সে-ও এখন বুড়ি। তবে তার রান্নাটি বড় চমৎকার।

গন্ধরাজ গাছের পাশে বুড়িও খানিক বাদে একটা বেতের চেয়ার নিয়ে বসলো। কবরখানার কম্পাউণ্ড ওয়ালের গায়ে বুনো ফুল, শেয়াল-কাঁটা, পিঁপড়ের বাসা। ঘন শহরের মাঝখানে এক চিলতে সাইলেন্স। ফুলের গন্ধ। দেওয়ালের মাথায় বর্ষাকালের শ্যাওলা এখন শুকিয়ে ঘন নীল রংয়ের চট। ডেমলার আর ডেমলার গিন্নির গালের মাংস কুঁকড়ে-মুকড়ে একাকার। কোল ইণ্ডিয়ার কাজে ঢুকে ঋষির সঙ্গে প্রথম প্রথম এখানে আসতো দিলীপ। সেই থেকে আলাপ।

দিলীপ নিজে উঠে ঘর থেকে একটা গ্লাস নিয়ে এলো বুড়ির জন্যে। তাতে গলায় গলায় ঠাণ্ডা বিয়ার ঢাললো। জানো। শীগগিরি আমার হার্ট অ্যাটাক হবে।

সত্যি! কবে?

ঠাট্টা নয়। ওভার ওয়েট ইজ মাই প্রবলেম।

লাইফে প্রবলেম বলে কিছু আছে নাকি দিলীপ? মিস্টার ডেমলারকে তাখো তো। কোথায় জারমানি! কোথায় ইণ্ডিয়া! এক স্কটিশ কবরখানায় আছি,

আমরা ফর্টি ইয়ার্স। আমাদের কোন সিকিউরিটি নেই। প্রোগ্রাম নেই। ছোটা ছুটি নেই।—তাই কোন টেনশনও নেই। এই কবরখানাতেও এত সুন্দর সকাল হয়।

আমি কোথাও তিষ্ঠোতে পারি না। সব সময় জায়গা বদলাচ্ছি—

ডেমলার বললো, এক কাজ করো দিলীপ—তুমি সারা দিনে কয়েক মিনিটের জন্যে মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকো। তাহলেই কনসেণ্ট্রেশন ফিরে পাবে। সুন্দর দৃশ্য ছাখো। ভালো ক্যালেণ্ডার থাকলে তার ছবি ছাখো। তা হলেই শান্তি ফিরে পাবে মনে। সারাদিনে বোধহয় তোমাকে অনেকের সঙ্গে কথা বলতে হয়?

অনেকের সঙ্গে।

লোকগুলো কেমন দিলীপ?

ভালো। তারপর কি ভেবে দিলীপ বললো, ভালো মন্দ মেশানো।

রিচ্?

ভীষণ বড়লোক। বেশির ভাগ মিলিয়নস্ নিয়ে নাড়াচাড়া করে। তাদের প্রাইমারি মোটিফ—প্রফিট মোটিফ।

এদের কাছ থেকে দূরে থাকা যায় না দিলীপ?

তা কি করে হয়! এদের নিয়েই তো—

তুমি একটা চাকরি করতে না? আছে সে চাকরি?

হ্যাঁ। সে চাকরিই আমি করছি।

তবে আর এত ঘোরাঘুরি কেন দিলীপ?

একটা জিনিস বানাতে গিয়েছিলাম ডেমলার। সবাই মিলে। বড় করে। উইথ এ সার্টেন গ্রোথ রেট। আমি বাডতে চাই। কিন্তু বাড়বার সব রাস্তা বন্ধ। ডেমলার—ইট ইজ ইনার কণ্ট্রাডিকশন।

আমার নাম থেকেই বুঝছো—আমার পূর্বপুরুষেরা জার্মানিতে ডেমলার বলে একটা গাডি বের করেছিল। আমি চোখে দেখিনি। কিন্তু শুনেছি। এক একজন এক এক ভাবে বাডতে চায় দিলীপ। আমার কোন খেদ নেই। নো রিগ্রেটস্।

ঘড়িতে প্রায় পৌনে বারোটা। ঠিক এখুনি কলকাতার আরেক জায়গায় অন্য কিছু হচ্ছিল। যেমন—

কোঠারি বাড়িতে বিড়লারা মেয়ে দিয়েছে। কোন এক কোঠারির বাড়ির একতলায়—বাঁধানো চাতালে চোখের আরাম—কয়েকটি গাড়ি পড়ে ছিল। রঙীন। বিশাল। চেহারা খুব ঝাঁঝালো। অ্যান্টিমনির গ্রিল, ভেতরে প্রচুর লেগস্পেস।

গোপাল তার বন্ধু ও পার্টনার দ্বিজুকে বললো, বনেটটা তোলো তো।

দ্বিজু তুলে ধরলো। এর আগের বার বনেট তোলার সময় কয়েকটা গাছের পাতা ইঞ্জিনে, ডিস্ট্রিবিউটরে পড়ে ছিল। চারদিকেই ছায়া মেলা গাছ। গাড়িটা জার্মান ওপেল। এবার দ্বিজু বনেট তুলেই খুব জোরে ফুঁ দিলো। কয়েকটা পাতা উড়ে গেল। সব সরানো গেল না।

এ গাড়িটা আমরা তুলবোই। বরেন দত্তকে না দিয়ে নিজেরাই বিজনেস করবো।

গোপাল দ্বিজুকে থামালো। আগে দাম জেনে এসো বড় কোঠারির কাছ থেকে।

কোঠারি তো নিজে কথা বলবে না। তার ম্যানেজারের সঙ্গে কথা চলতে পারে।

ওপেল গাড়ি অনেকে চায়। চার সিলিণ্ডারের জার্মান গাড়ি। ছোট্ট ইঞ্জিন দেড় বছরের খোকার মত। স্ট্যাণ্ডার্ড হেরাল্ডের টায়ার থেকে বিয়ারিং—সবই লাগে।

দ্বিজু অল্প দিন হোল গোপালের পার্টনার। কোথায় ভালো গাড়ি আছে। কারা বিক্রি করবে। এসব খবর পেতে দ্বিজুর দেরি হয় না। কিন্তু দ্বিজু স্টার্টিংয়ের আওয়াজ শুনে ইঞ্জিনের শরীর কেমন তা বলতে পারবে না।

সেদিকে গোপাল ওস্তাদ। তার কান খুব পরিষ্কার। ষাট নম্বর মবিল দিয়ে জখম ইঞ্জিনের আওয়াজ মেরে দিলে গোপালের হাতে ঠিক ধরা পড়তে হবে। রেস বাড়িয়ে ইঞ্জিন অ্যাড্‌ভান্স করা থাকলে পিক আপ তো ভালো নেবেই। একটা গাড়ি চেক করার সময় গোপাল উল্টোদিক থেকে করে। কি মনে পড়ায় গোপাল লাফিয়ে উঠলো, এ-গাড়ির একটা খদ্দের হাতে আছে আমার—

দ্বিজু বললো, কে ?

সে বিকেল বেলা দেখো—বলে গোপাল মনের আনন্দে গাইতে লাগলো। কোঠারি বাড়ির একতলাটাই গ্যারেজ। গোপাল গাইছিল—চাপা গলায়—আর দেখছিল। দিশী সব গাড়ি তো আছেই। আছে এমন সব গাড়ি—যাদের নাম শোনেনি গোপাল। চেহারাও দেখেনি কোনদিন।

জার্মান ওপেলটার শুধু সেল্‌ফের গোলমাল আছে। সামান্য মেটাল ধরাতে হবে। তারপর কিছু লেদের কাজ। গোড়ায় দু' ফোঁটা তেল কারবোরেটরে দিয়ে নিতে হবে। এক সেল্‌ফেই গাড়ি স্টার্ট নেবে তখন।

ভালো খদ্দেরের কথা মনে পড়তেই গোপালের নাকের কাছে চিরকালের অর্ডি-নারি বাতাসও সুগন্ধী লাগতে লাগলো। কোঠারি বাড়ির কত ভেতরে যে মানুষ-

জন থাকে, তা বোঝার উপায় নেই। একতলা জুড়ে গাড়ি, ড্রাইভার, ফুলগাছ, লন, দোলনা আর আলিপুরের এই নির্জন রাস্তার বড় বড় গাছের ঝরাপাতা। ফাল্গুনের বাতাস এই গাছগুলোর ভেতর দিয়ে বয়ে থাকে বলে সারা পাড়ায় সর্বক্ষণ শুধু অদৃশ্য জলভাঙার শব্দ। খানিকক্ষণ অন্তর একজন ঝাড়ুনি এসে ঝরাপাতা ঝাঁট দিয়ে কোণে ঢিপি করে দিয়ে যাচ্ছে।

গোপাল গৌহাটিতে বসে এ-গানটা শিখেছিল। হিন্দি ছবির। তখন বালির লরি চালিয়ে নিয়ে যেত গৌহাটিতে।

দ্বিজু গলা শুনে বললো, খানিকটা মুকেশ। খানিকটা আত্মারাম। সি এইচ আত্মারাম। এই দু'জনের মাঝামাঝি।

গোপাল গান বন্ধ করে এক সেকেণ্ডের জন্যে থামলো। না। আমি মুকেশ স্কুলের গাইয়ে—

দ্বিজুর চোখ কপালে ওঠার যোগাড়। গাইয়ে? নিজেকে গাইয়ে বলে ক্লেম করছে গোপাল! সে ঠিক করলো—সে আর কিছু বলবে না।

গোপাল তখনো গাইছিল। আসিক ছবির গান। রাজকাপুর, নন্দা, পদ্মিনী। অনেক পুরনো ছবি। তখন সারারাত লরি চালিয়ে বালি নিয়ে মালিগাঁও পৌঁছাতো শেষ রাতে। সারাদিন ঘুমিয়ে সন্ধ্যে সন্ধ্যে একখানা ছবি। আবার রাতে রাতে লরি চালিয়ে বালি আনতে চলে যাওয়া।

গোপালের গলায় কী আছে কে জানে! দ্বিজুর তাই মনে হচ্ছিল—হয়তো জাদু আছে। নয়তো ড্রাইভার, ঝাড়ুদারনী, দারোয়ান—সব জমা হয়ে গেল কি করে! গানের এক জায়গায় রাজকাপুর থেমে গিয়ে কাত হয়ে গাইতো। সেখানে নন্দা চোখ তুলে তাকিয়ে লজ্জায় নামিয়ে নিত। সে জায়গাটা মনে পড়তেই গোপালেরও গান থেমে গেল। দারোয়ানকে বললো, দারোয়ানজী। সন্ধ্যেবেলা এক খদ্দের আনবো। গাড়িটা দেখাবার ব্যবস্থা করতে পারবে?

জরুর।

কোঠারি সাহেবকে বলতে হবে না?

তাঁকে কুথায় পাবেন! হামরাই জানি না—তিনি এখন কুথায়! কলকত্তা? দিল্লি? বুম্বাই? না, আমদাবাদ? ম্যানেজারসাহেবকে সব বলা আছে।

ঠিক সন্ধ্যেবেলা দিলীপকে নিয়ে গোপাল কোঠারি বাড়ি এলো। মার্কারি ল্যাম্পের পরিষ্কার আলোয় রঙীন গাড়িগুলোকে একদম পরী লাগছিল। তাদের অরিজিন্যাল রং আলোয় অন্যরকম হয়ে গেছে। ওপেলটাকে দেখে দিলীপ বললো,

এ-গাড়ি আমি কি করবো ?

কেন স্যার ? আপনি তো চকচকে নতুন গাড়ি—ইমপোর্টেড গাড়ি চাই-ছিলেন।

না। তার দরকার নেই। আমি একটা ভাঙা গাড়ি চাই গোপাল। ট্যাক্সি ক্যানসেল। কিংবা বাতিল প্রাইভেট। বডি ভালো হওয়া চাই। মাস দুই ধরে ভালো করে ঝেড়ে কাজ করিয়ে নেব। তখন তো নতুন গাড়ি।

তেমন গাড়িও আছে। দেখবেন ?

হাজার চারেকের ভেতর চাই।

পাবেন।

কবে দেখাবে ?

আজই। এখুনি।

চলো।

দিলীপকে নিয়ে গোপাল মেডিক্যাল কলেজের উল্টোদিকে যে-বাড়িতে হাজির হলো—তার দেওয়ালে দেওয়ালে ভারতপ্রসিদ্ধ গায়ক-গায়িকা—বাজিয়েদের ছবি। একটা সিক্সটিথি্র অ্যামবাসাডর।

ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। নিজেই চালালেন। সামনে পাশে বসলো দিলীপ। পেছনে গোপাল। ফাঁকা জায়গা কোথায় পান ? শেষে মেডিক্যাল কলেজের ভেতরের রাস্তা দিয়ে চালালেন। গাড়ি থামাতে বলে দিলীপ নামলো। সামনেই ব্লাড,ব্যাংক লেখা বিরাট বাড়ির সিঁড়ি! বনেট খুলে ইঞ্জিনে হাত দিয়ে দিলীপ বললো, এত গরম কেন ?

অ্যাডভান্স করা আছে। চার হাজারে গাড়ি নেবেন—আপনাকে তো সারাতে হবেই।

গাড়িটায় দিলীপের পছন্দ মিটার দুটো। আগেকার। এখনকার মত অনেক-গুলো মিটার নয়। দিলীপ বললো, বডিতে তো অনেক কাজ আছে।

তা আছে। তবে মোটা চাদরের কাজ করাবেন। স্টার্ডি গাড়ি হবে। চলুন ঘরে বসে কথা হবে।

বাড়ির ভেতর গিয়ে দিলীপ দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে যাঁদের ছবি দেখলো, তাঁরা সবাই নমস্য সঙ্গীতসাধক। মোস্তারিবাঈ। দেড়শো বছর আগে নেপাল দরবারে সারা মহাদেশের শ্রেষ্ঠ গাইয়েদের ছবি। বাড়ির উঠোনটা দেখিয়ে ভদ্র-লোক বললেন, এখানে ফৈয়াজ খাঁ গেয়েছেন। বড়ে খাঁ গেয়েছেন ওই বারান্দায়।

ভদ্রলোকের বসার ঘরে দেওয়াল জুড়ে আয়না। সে-ঘরে ঢুকে তিনি বললেন,

কাকাকে দেখেছি—ওখানটায় বসে কানন দেবীকে গান শেখাচ্ছেন। সুর তুলে দিচ্ছেন গলায়। আমি তখন কলেজে পড়ি।

কাকা? কি নাম?

নাম বললেন ভদ্রলোক। একডাকে সবাই চেনে তাঁকে। ওই তো কাকার বেবি ফোর্ড পড়ে রয়েছে।

চড়েন না?

আজকাল ঘর থেকে বেরোন না একদম।

সারাটা বাড়িতে ধুলো মাখানো ইতিহাস। দুই যুগের দুটি ঘোঁড়া গাড়ি। দেওয়ালে দেওয়ালে গানের মানুষজনের ছবি। এই বাড়িরই এক ঘরে একজন বিখ্যাত কাকা দরজা বন্ধ করে বাস করেন।

দিলীপ গাডির দাম সাড়ে তিনে নামাতে চাইলো।

ভদ্রলোক বললেন, আমি নিরুপায়—তাই আপনি গাড়ির দাম কমাতে চাইছেন। টাকা থাকলে গাড়িটা আমি নিজেই সারিয়ে নিতাম। বডি আর ইঞ্জিনের কাজ আছে।

আপ্‌হোলস্ট্রিও করাতে হবে। রং করা দরকার। নিকেল চটে গেছে। একটা টায়ার এখুনি না বদলালে বিপদ।

আপনার বয়সে এসব করা কি কঠিন দিলীপবাবু?

আমি ভাবছিলাম—মল্লিকবাজারটা একটু ঘুরে দেখবো কাল। যদি আস্ত বডি পেয়ে যাই, তবে আর সারাবার ঝামেলায় যাবো না। আপনার গাড়িটা কিনে নিয়ে—

বডিটা মল্লিকবাজারে দিয়ে কিছু পাবেন। তার সঙ্গে আর কিছু দিয়ে আস্ত বডি কিনে নিন।

তাই ঠিক রইলো।

বাইরে কলকাতায় তখন রাত আটটা। গোপাল সব শুনে বললো, কাল দিনের বেলায় রোদে ঘুরে আপনি ক্লান্ত হয়ে যাবেন। এখুনি চলুন না। রাতে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় দেখবেন।

মল্লিকবাজারে গলিঘুঁজির ভেতরে লোহালক্কড় বেরিয়ে থাকে। হাত-পা কাটবে অন্ধকারে। কালই যাবো ভাই।

মল্লিকবাজারে যাবেন কেন?

তবে?

মল্লিকবাজারে যেখান থেকে মাল কাটাই হয়ে আসে—সেখানে যাবো আমরা।

মাল কাটাই ? জানতে চেয়েও ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলো দিলীপ বসু।
এসব লাইনের কথা। অনেকটা কশাইরা যেমন বলে—হোটেলে একসঙ্গে সাত-আট মণ মাংস সাপ্লাইয়ের সময়—মাল সাপ্লাই, মাল কাটাই—তেমন আর কি।

হ্যাঁ। কাছাকাছি কবরখানার গায়েই তো মাল কাটাইয়ের মাঠ। হ্যাজাক জ্বেলে কাজ হচ্ছে। সারারাতই চলে।

রাতে দেখে কিছু বুঝবো ?

বডি তো আর ছোটখাটো জিনিস নয়। দেখে আসতে দোষ কি। আমরা ডেলিভারি তো নেব দিনের বেলায়।

গোপালের মুখের দিকে তাকালো দিলীপ। প্রায় তিরিশ-বত্রিশ হবে। বরেন দত্তর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আলাপ হয়েছিল। বিলিতি গাড়ির খবর এনে দিয়ে থাকে বরেনকে। পাকা দালাল একটি। পাকা দালালের সাইন হলো—সে সব সময় পার্টিকে জড়িয়ে নিয়ে বলবে—'আমরা'। 'আমরা যাবো।' 'আমরা দেখবো।' 'আমরা কিনবো।' এই বলে পার্টির কনফিডেন্স পাওয়া যায়। আমি তো নিজেই এ-ভাষায় স্যার লেজলি উডের সঙ্গে কথা বলেছি। গোবিন্দ স্টিলকেও আমি এ-ভাষায় কথা বলেছি একসময়।

বেশ, চলো।

ওখানে আপনি নতুন আনকোরা গাড়ির বডি পাবেন।

নতুন ?

হ্যাঁ। চোরাই গাড়ি আসে তো।

মল্লিকবাজার ফেলে এসপ্ল্যানেডের দিকে বাঁ হাতে সরু গলি। কুলির কাঁধে বাঁশের দোলায় তেল-কালি-মাখা লরির ডিফারেনসিয়াল আসছে। আসছে পুরনো গাড়ির ইঞ্জিন। মার্সিডিজের দরজা। ভক্সহলের সাইলেন্সার। অবিরাম। সব যাচ্ছে মল্লিকবাজারে। খানিক বাদেই গোপালের সঙ্গে দিলীপ একদম কশাইখানার মাঝখানে এসে পড়লো। হাম্বর চলছে। চলছে লোহা কাটাইয়ের করাত। হাতুড়ি। পোর্টেব্ল ব্লেদ। তেল-কালি-মাখানো মানুষজন। চিৎকার। আওয়াজ। ভালো বাংলায় মোটরগাড়ির বধ্যভূমি।

গোপালের ঠোঁট ঝুলে পড়েছে। চোখের নিচের গর্তে ছায়া। চোখে হাসি। হ্যাজাকের আলোয় খদ্দের, কুলি, ব্যাপারী—সবারই পায়ের ধুলো উড়ছে। গোপাল বললো, দেখবেন স্যার—হ্যাজাক ঝুলছে। সাবধানে এদিকে এসে দাঁড়ান। শেষে যদি গা পুড়ে যায় !

না। ভয় নেই। এত গাড়ি কোত্থেকে আসে গোপাল ?

নীলাম, বাতিল, স্ক্র্যাপ হিসেবে লট দরেও বিক্রি হয়ে যায় অনেক গাড়ি। তাতে ভালো পার্টস থাকে কিছু। তারপর চোরাই গাড়িও আসে। রাতারাতি কেটেকুটে এমন করে দেবে—কার সাধ্যি খুঁজে বের করে। চব্বিশ ঘণ্টার কোন সময়েই মাল কাটাই বন্ধ নেই স্যার।

সারারাত এ-কাজ চলবে?

তা চলবে স্যার। সিফ্‌টে সিফ্‌টে কুলি বদলায়। খদ্দের আসে কানপুর, ভাইজাগ, গৌহাটি থেকেও। দেখুন না—কত আনকোরা ইঞ্জিন, এ. এস. সি কারবোরেটর, গ্যাব্রিয়েলের সবচেয়ে ভালো শক অ্যাবজরবার। একজোড়া নতুন কিনতে ছ'শো-সাড়ে ছ'শো টাকা। এখানে চাই কি তিরিশ টাকায় পাবেন। ভেতরের তেলটা দিয়ে নিন। নতুনের মত কাজ করবে।

গোপালকে কথা বলতে হচ্ছিল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। চোদ্দ পাউণ্ডের হাম্বর পড়ছিল—একটা মার্সিডিজ লরির চেসিসে। প্রকাণ্ড ছেনির মাথায়। জং-ধরা জায়গাটা কেটে বাদ দেওয়া হচ্ছিল।

হ্যাজাকের আলো সব জায়গায় পৌঁছয়নি। দূরের দেওয়ালে একটা বেওয়ারিশ কুকুর কি করে যেন উঠে পড়েছিল। এখন কিছুতেই নামতে পারছে না। চাদ্দিকে শব্দ। এর ভেতর বেচারার ঘেউ ঘেউ। সেসব পরোয়া না করে গোপাল বললো, কোন্ বডি নেবেন? সিক্সটি ফোরের আগের বডির চাদর মোটা ছিল। তারপর থেকে তো ডালডার টিন।

আরেকটু দেখি ভাই।

ঘুরে ঘুরে দেখুন না স্যার।

খানিক বাদে গোপাল দেখলো, দিলীপ বসু লোকটা হারিয়ে গেছে। কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। একবার যেন দেখেছিল—একটা ইঞ্জিন দর করছেন স্যার। বোধহয় ওভারহেড ইঞ্জিন। দূর থেকে একবার দেখতে পেয়েছিল গোপাল। কেন যে নিজে একটা কারবোরেটর দেখতে উবু হয়ে বসেছিল—সেই সময়টায় দিলীপবাবু হারিয়ে গেল। সারাটা দিনের খাটুনি বরবাদ। গোপাল হ্যাজাকের ছড়ানো আলোয় চারদিক তাকিয়েও দিলীপের টিকি দেখতে পেল না।

দিলীপ তখন ইঞ্জিনের পেছনে। দুজন তেল-কালি-মাখা কুলি ইঞ্জিনটাকে বাঁশের ভারায় দুলিয়ে সরু গলিপথ দিয়ে মল্লিকবাজারে যাচ্ছিল। তারা ইঞ্জিনের ভারে দুলে দুলে হাঁটছিল। গলিতে এই আলো। এই অন্ধকার।

দিলীপ হাঁটছিল—আর অনেকদিন পরে এক অদ্ভুত আনন্দে, উত্তেজনায় ভেবে অবাক হচ্ছিল—খনির লোহাকে ইস্পাত বানিয়ে ঢালাই করে তবে ইঞ্জিন। সারা

পৃথিবীতে খনির লোহা থেকে ইঞ্জিন বানিয়ে এমন কত কোটি কোটি ঘোড়ার পাওয়ার ছুনিয়াময় ছড়ানো। কত ইঞ্জিন এই কশাইখানা থেকে বেরিয়ে মল্লিক-বাজারের কালোয়ারদের হাতফেরতা হয়েছে। কেরোসিনে ধুয়ে ধুয়ে তারা এখন ঝক্‌ঝকে। রাজস্থানের মরুভূমিতে, আফ্রিকার যুদ্ধে, বমডিলার পাহাড়ে এমন কত ইঞ্জিন বাতিল গাড়ির ভেতর অনাদরে জং ধরছে। আগে মানুষ ঘোড়ায় চড়া শিখলো। তারপর ঘোড়ার গায়ের জোর—যার নাম গতি—তাকে বশ করে রাখলো ইঞ্জিনের ভেতর। শুধু স্টার্ট দেওয়ার অপেক্ষা। স্টার্ট দিলেই ভদ্র, বিনয়ী, নম্র ইঞ্জিনের পিসটন গাড়ির চাকাকে চালাতে লাগলো।

ইঞ্জিনটার পেছনে পেছনে গিয়ে দিলীপ বসু মল্লিকবাজারে গিয়ে পড়লো। কালোয়ারদের গদি। সিমেণ্ট-বাঁধানো। বেঞ্চের উপর বিছানা। লাইনোলিয়ম দিয়ে তোশক ঢাকা। এক গদিতে শুধু পেছনের চাকার পাটি, স্প্রিং। আরেক গদিতে শুধু শক অ্যাবজরবার। বিলিতি গাড়ির। দিশী গাড়ির। নাইণ্টিন টোয়েণ্টি-নাইনের ফিয়াটের একটা ইঞ্জিন ছ'শো টাকায় দিলীপের চোখের সামনে বিক্রি হয়ে গেল। তের পয়েণ্ট সিক্স হর্স পাওয়ার। দিলীপের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল—ইস্! মনে মনে সে পরিষ্কার দেখতে পেল—এই ইঞ্জিনটা যে-ফিয়াটে ছিল, তাতে উনিশশো উনত্রিশে নর্থ ক্যালকাটার কোন সম্পন্ন বাঙালী ছেলে-মেয়ে-বউ নিয়ে হুডখোলা গাড়িতে বসে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে। তার চার বছর আগে সি. আর. দাশ, আশুতোষ দেহ রেখেছেন। ভদ্রলোকের বউয়ের নাকছাবিতে মুক্তোর কুঁচির ওপর কলকাতার গ্যাসের আলো পড়ে ঝলকাচ্ছিল সন্ধ্যেবেলার কলকাতায়। সময় আসলে একটা বিশাল পেঁয়াজ। খোসা ছাড়ালে পরতে পরতে ব্যাক গিয়ারে ফেলে আসা সময়ে ফিরে যাওয়া যায়। এক এক খোসায়—বা এক এক পরতে এক-একটা সাল। এক-এক সালে মানুষের বানানো সব ইঞ্জিন বসে আছে। দশ পয়েণ্ট চার হর্স পাওয়ার। তের পয়েণ্ট সিক্স হর্স পাওয়ার। ইঞ্জিনগুলোর সঙ্গে খনির লোহার টান আছে। আছে সেই সব সালের সওয়ারদের।

শক অ্যাবজরবারওয়ালা দিলীপকে বললো, বোতল শক অ্যাবজরবার নেবেন। বঢ়িয়া চিজ।

দিলীপ কিছু না বলায় লোকটা আবার বললো, বিলাইতি গাড়ি বাবুর? তবে মুর্গির ঠ্যাঙ শক অ্যাবজরবার লিয়ে যান। জোড়া লিবো সত্তর টাকা।

দিলীপ ততক্ষণে পিস্টনপাড়ায় চলে এসেছে। ছ'জন খদ্দের ইঞ্জিনের বোর মিলিয়ে কিনছিল।

গোপাল খুঁজতে খুঁজতে সেখানে এসে হাজির। আপনি এখানে স্যার?

আর আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

আচ্ছা গোপাল, আমরা যদি এখান থেকে ইঞ্জিন, বডি—সব কিনে জোড়া দিয়ে গাড়ি বানাই? সে-গাড়ি তো খদ্দের দেখে বেচা যায়।

যায়। তবে, অনেক হ্যাপা স্যার। সব মিললো কিন্তু বডি-লাইন যদি না মেলে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। বডির অ্যালাইনমেণ্ট ঠিক না হলে খদ্দেরের চোখে পড়বেই।

তবু তো বানাবার একটা আনন্দ আছে। বাড়াবার আনন্দ। কত কোটি কোটি হর্স পাওয়ার চারদিকে ছড়ানো গোপাল।

এসবে কি দরকার স্যার। কত গাড়ি চাই আপনার? তিরিশখানা এনে হাজির করছি। সব ছবির মত গাড়ি।

তা বলছি নে। ধরো যদি আমরা রিপেয়ার করি—তারপর খদ্দের দেখে ঝেড়ে দিই।

সে তো ভালো। কিন্তু টাকা দরকার অনেক। গ্যারেজের জায়গা দরকার। মিস্ত্রির মাইনে। অনেকগুলো গাড়ি কিনে টাকা ফেলে রাখতে হবে।

সে আমি পারবো। কত দরকার? দু লাখ টাকা? সে যোগাড় হয়ে যাবে।

না না। অত টাকা নয় স্যার। তিরিশ-চল্লিশ হাজার টাকাই যথেষ্ট।

সে তো গোপাল আমি এখুনি দিতে পারি। কারুর দরজায় যেতে হবে না।

নগদ টাকার কারবারে স্যার অনেক কম টাকায় গাড়ি পাওয়া যায়।

তুমি সব দেখবে গোপাল। চালাবে। কিনবে। সারাবে। কথা বলবে। আমি শুধু খদ্দের নিয়ে আসবো।

সে তো সবচেয়ে ভালো স্যার। আপনাদের কত কানেকশন।

দিলীপ অনেকদিন পরে বানাবার জিনিস, বাড়াবার জিনিস—গ্রোথের ব্যাপার হাতের মুঠোয় পেয়ে গিয়ে মল্লিকবাজারের হর্নের আওয়াজ, চেঁচামেচির ভেতর স্বপ্ন দেখছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

গোপাল তাকে ফিরিয়ে আনতে চাইলো। তাহলে বডি কিনবেন চলুন। ন'শো টাকায় চারখানা আনকোরা দরজাসুদ্ধ নতুন গাড়ির বডি পেয়েছি স্যর। পুরনো বডির জন্যে দু'শো অ্যাডজাস্ট হয়ে দাম পড়বে সাতশো টাকা। এত সস্তায় কোথাও পাবেন না। আমাদের গাড়িও নতুন হয়ে যাবে।

নতুন গাড়ির বডি।

হ্যাঁ স্যার। মার্ক থ্রি।

কোথায় পেলে?

চোরাই গাড়ির স্যার। ডবলু. এম. সি.-র নম্বর প্লেট দেখলাম আলকাতরা দিয়ে মুছে ফেলেছে। এ-বডি অস্টিন ডিস্ট্রিবিউটর থেকে কিনলে আপনার পাকা সাত হাজার পড়তো।

আমি ও-গাড়ি কিনবো না গোপাল।

কেন স্যার? আপনি তো কথা বলে এলেন।

আমি কিনবো না গোপাল।

বুড়ো মানুষ। আশা করে ওয়েট করবেন।

কেনাবেচায় ওরকম হাজার একটা কথা হয়ে থাকে গোপাল। আগে আমরা একটা গাড়ি বানিয়ে দেখি। সেটা বেচে দেখি কি দাঁড়ায়। তারপর যা হয় একটা বানিয়ে নিলেই হবে গোপাল।

বেশ তো স্যার। তাহলে গাড়িটা না বলে দিই এখন।

তা বোলো না। ওই গাড়িটাই হয়তো নেব। ওই বডিটাই হয়তো কিনবো।

তাহলে এখন কিনছেন না কেন? ওসব জিনিস তো আমাদের অপেক্ষায় পড়ে থাকবে না স্যার।

হাতছাড়া হয় হোক। আরও তো পাবো।

খদ্দেরের মতই গাড়িও তো সব সময় পাওয়া যায় না স্যার।

খুব পাবে।

তাহলে আমায় দশটা টাকা দিন স্যার।

কেন?

এই যে আপনার সঙ্গে ঘুরলাম স্যার। সারাটা সন্ধ্যে। খাওয়া হয়নি কিছু। দ্বিজুও খায়নি কিছু।

কে দ্বিজু জানতে না চেয়ে দিলীপ একখানা দশ টাকার নোট দিল।

দশ

বোর্ড মিটিংয়ে সাধন গুপ্ত প্রোমোশনের জন্যে ঋষির নাম তুললো। আগাগোড়া সমান কাজ করে এসেছে ঋষি। ব্যালান্সড্। সায় দিল অনাথ চক্কোত্তি। ভারি পর্দায় ঘেরা বোর্ড রুম। পার্সোনেল ফাইল থেকে চোখ তুলে চেয়ারম্যান অনাথের দিকে তাকালো। সাধনের দিকে।

বাইরে প্রচণ্ড শীত। সেই সঙ্গে অকালে বৃষ্টি। দিলীপ সেদিন অফিসে ছিল না। সে, রাণী আর কুটু তখন ঝরঝরে রোদ্দুরে চিল্কার ওপর ভাড়া করা নৌকোয়। মাঝিদের সঙ্গে। সামনেই চন্দ্রাকুট পাহাড়।

পৃথিবীর নানা জায়গায় তখন নানা রকমের আবহাওয়া। কলকাতা থেকে একশো সত্তর মাইল সাউথ-সাউথ-ইস্টে বঙ্গোপসাগরে হেভি ডিপ্রেসন। ঝড়ের এপিসেণ্টার থেকে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি গাঙ্গেয় জেলার উপর দিয়ে বৃষ্টিভেজা ঝোড়ো বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। চিল্কা, রম্ভা, বালুগাঁও—আর উল্টোদিকে ওয়াল-টেয়ার যাবার রাস্তা অব্দি তখন ঝকঝকে রোদ্দুর।

কুটু অনেক দিন ধরে বলছিল, চলো না বাবা—কোথাও ঘুরে আসি আমরা।

রাণী বলেছিল, আমার ধারণা রবি ওড়িশায় পালিয়ে আছে।

জবাবে দিলীপ বলেছিল, যারা পেছন দিক থেকে মানুষকে আচমকা ছুরি মারে—তারা জাহান্নমে যাক। কোথায় পালিয়ে আছে—তা জানার ইচ্ছে নেই আমার।

রবিও অনেক দিন ধরে একটা নির্জন জায়গা খুঁজছিল। রানী জানে—কাছাকাছি বালুগাঁও নামে একটা জায়গা আছে। সেখান থেকে একজন ওড়িয়া কবি—তার পদবী হবে পাটসাহানী—প্রায়ই ইংরিজিতে চিঠি লিখতো রবিকে। তাঁর কাছে নেই তো?

চিল্কায় পৌছবার আগে বালুগাঁও বাজার পড়লো। তারপর ফাঁকা ফাঁকা নারকেল গাছ। রাণীর চাপে পড়ে গাড়ি থামাতে হলো। দিলীপ খোঁজাখুঁজি করে বাড়িটা বের করলো। কবির নাম নিরাপদ পাটসাহানী। কবির বাবা বাড়িতে ছিলেন। ওড়িয়া ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে যা বললেন, তা হলো—আমার ছেলে কবি বটে। কিন্তু উপস্থিত পুলিস তাকে বাড়িছাড়া করেছে। এখন কবিরা মেঘ দেখে কবিতা লেখে না আর।

দিলীপ আর কোন কথা না পেয়ে বৃদ্ধ পাটসাহানাকে বলে এলো, আমার ছেলেটা একটা গেছো মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তা তো ভালো। আপনার ছেলের মন সরস হবে। খুনটুন করে না তো?

আমি সঠিক জানি না। এই শুনি কলকাতায় আছে। আবার শুনি—বেমালুম উধাও।

এখন কলকাতায় প্রচণ্ড শীত পড়েছে। সেইসঙ্গে আকাশ অন্ধকার করে জলে ভেজা ঝোড়ো বাতাস। আর এখানে এমন অগভীর চিল্কায় বাঁশের বাড়ি মেরে মিষ্টি মাছগুলোকে টানা জালের ফাঁদে ফেলা হচ্ছে।

নৌকোর পাটাতনে বসে অনেক দিন পরে এই খোলা জগতের ভেতর রাণী হাসছিল। কুটু হাসছিল। নৌকোর বড় মাঝি কোন সওয়ারির কাছ থেকে অনেক দিন এমন দেদার পয়সা পায়নি। নৌকোর জন্যে মোটা ভাড়া। সেই সঙ্গে নৌকোর খোলে ভাত আর ভেটকি মাছের ঝোল রেঁধে দিয়েছে। সেজন্যেও মোটা পয়সা। বড় মাঝি নিজে থেকেই বললো, চলুন নলবন ঘুরে আসবেন।

কুটু জানতে চাইলো, নলবন?

মাঝি বললো, জ্যোৎস্না রাতে অনেকে যায়। সেখানে তখন পাখিরা সারা রাতের জন্যে আস্তানা পাতে। কাছেই কালীমন্দিরে পুজো দেবেন। জলে চিংড়ি বোঝাই। ভীষণ মিষ্টি।

চলো না বাবা—

যাবি? বেশ তো। কিন্তু ফিরবো কখন?

মাঝি বললো, রাত আটটার ভেতর ফিরে আসবো।

আমার গাড়ির কি হবে?

ড্রাইভার সাহেব তো দেখছে। আমরা একটা ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। সে সঙ্গে থাকবে। পাহারা দেবে। ভাতের হোটেলে নিয়ে যাবে ড্রাইভারকে।

বড় মাঝি ঠিকই করে নিয়েছিল মনে মনে—মাছের পেছনে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে এমন সওয়ার নিয়ে চিল্কায় ঘুরে বেড়ানো অনেক লাভের।

চিল্কা মানে—অগভীর জলা—মাইলের পর মাইল। তার ভেতর আগাগোড়া শ্যাওলা। বদ্ধ জায়গায় সমুদ্রের জল ঢুকে পড়ে এই কাণ্ড। দূরে দূরে পালতোলা নৌকো।

রোদে শুকোনো শীতের বাতাসের ভেতর দিয়ে বেলা একটা নাগাদ নৌকো গিয়ে নলবনের সামনে দাঁড়ালো। যতদূর চোখ যায়—জল আর জল। তার ভেতর মানুষ-সমান নলবন। দুপুরে নিষুতি রাতের চেহারা। দূরে একটা ডুবো পাহাড় খানিক জেগে আছে। ওখানটায় বোধহয় কালীমন্দির। এই মাঝিরা এক সময় পদ্মা মেঘনা করেছে। এখন চিল্কায়। প্রায় তিরিশ বছর। চিল্কার অন্ধিসন্ধি নখদর্পণে।

জায়গাটা নির্জন। মাছ মারার নৌকোগুলো দূরে দূরে। একটা ট্রলার সমুদ্রের দিকে চলে গেল। খাড়ি দিয়ে দিয়ে অগাধ সমুদ্রে গিয়ে পড়বে।

নৌকোর চওড়া পাটাতনে অনেক দিন পরে দিলীপ বেশ রিল্যাক্সড্ হয়ে বসে ছিল। আমি এবারে কলকাতায় একটা বাজার দেখেছি রাণী। সেখান থেকে ইঞ্জিন, বডি, গিয়ার বক্স, চেসিস—আলাদা আলাদা কিনে একটা নতুন গাড়ি

বানানো যায়। লেদ মেশিন আর ভালো মিস্ত্রি চাই অবিশ্যি।

কুটু বললো, কি হবে বানিয়ে বাবা? তোমার তো গাড়ি রয়েছে।

বানাবার আনন্দ নেই একটা! কিসের থেকে কি হয়ে গেল—এটা একটা বড় রহস্য নয় কি?

মোটরগাড়ির আবার রহস্য কি! ও তো এখন একটা পুরনো আবিষ্কার।

কোন আবিষ্কারই পুরনো হয় না কুটু।

খোলা, লাগানো, জোড়া দেবার জন্যে তো মোটর মিস্ত্রি আছে বাবা।

তার ওপরেও তো আরও কিছু আছে মা?

কি? গাড়ির মন! গাড়ির আত্মা!!

হ্যাঁ। ঠাট্টা করছো না জেনে। গাড়ির নিজের একটা রূপ আছে। চাল আছে। আমি ভাবছিলাম রাণী—হর্স পাওয়ার দেখে দেখে ওপেলের শরীরে যদি ভক্সঅলের ইঞ্জিন বসাই—কেমন হয় বল তো?

তার আগে আরেক কাজ করো। পার্টাপার্টি করে একটা মানুষ বানাও তো। জগতে নাম থেকে যাবে।

তা কি আর ভাবিনি রাণী। কিন্তু মানুষের পার্টসের জন্যে তো কোন মল্লিকবাজার নেই। নয়তো—

নয়তো কি?

হয় না জানি। তবু ভেবেছি—ধরো, আমার হার্ট, ঋষির লিভার, অনাথদার ইনিসিয়েটিভ দিয়ে যদি একটা মানুষ বানানো যায়—

সে মানুষ কোন কাজ করতে পারবে না।

এ কথা বলছো কেন রাণী?

তোমার হার্ট নিয়ে সেই মানুষটা ঋষির লিভারে হুইস্কি খাবে তো। তারপর অনাথদার লেভেলে কাজকর্ম করতে যাবে। তাহলেই হয়েছে! ক্যাটাস্ট্রফি হয়ে যাবে।

কিন্তু আমি যে সেরকম একটা মানুষ খুঁজছি রাণী। মানে—সেরকম মানুষই আমার আইডিয়াল।

মাঝিকে ওই পাহাড়ে নৌকো নিতে বলো। আমি পুজো দেব। আর বলতেও পারলো না রাণী। মনে মনে সে রবির জন্যে মানসিক করবে ঠিক করেছে।

দিলীপ মাঝিকে কি বলতে যাচ্ছিল। বলা হলো না। এক সঙ্গে তিনখানা ছিপ-নৌকো নলবনের ভেতর থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এলো। গুলির শব্দ। পর পর পাঁচবার। কুটু পড়ে যাচ্ছিল নৌকো থেকে। দিলীপ ধরে ফেললো।

গুলির আওয়াজে এক ঝাঁক সামুদ্রিক পাখি ছত্র-রা হয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়লো। এতগুলো যে এতক্ষণ এই নলবনে ছিল—তা বোঝা যায়নি। ছুটন্ত ছিপগুলোর মুখ আরেকটা ডুবো পাহাড়ের গায়ে বাঁক নেবার পর রাণী দেখতে পেল—রাইফেল হাতে তিনজন পুলিস দাঁড়ানো। নল একদম তাগ্ করে। মাঝিরা ঠিকমত লগি ঠেলতে পারছে না। পুলিসের একজন লোক এগিয়ে এসে দাঁড়িদের ধমকালো হিন্দিতে।

ছিপ তিনখানা চোখের নিমেষে উধাও হতে রাণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তখনো ওদের নৌকোর চারপাশের জলে বড় বড় ঢেউ। পুলিসের নৌকোটা এলেবেলে এগোচ্ছিল। পাখিগুলো এবার ঝাঁক বেঁধে নামতে লাগলো।

ক্রিমিনালস্—

দিলীপের এ কথায় ফুটে উঠলো রাণী। কে বললো ক্রিমিনাল? প্রথম ছিপ-খানায় তো ভদ্র চেহাবার দুটি ছেলে বসে ছিল। আরেকজনের হাতে একটা বন্দুক।

কুটু খুব আস্তে বললো, মা, দাদাকে দেখেছো?

হুঁ। চুপ করে থাক।

আমি তো দেখতে পেয়েই চমকে পড়ে যাচ্ছিলাম।

চুপ কর। বলে মাঝিকে রাণী বললো, চলো। মন্দিরে যাবো।

চোখের সামনে এমন নির্জন জায়গায় এতটা শব্দ, জল তোলপাড় দেখে বোবা হয়ে গিয়েছিল দিলীপ। সে স্থির করেছিল—স্বাতীতে আর মন দেবে না। বীর-পাড়া-শিলিগুড়ির বাস ধরে একদম শহরে। তারপর ট্রেন। কলকাতা। আমি কি আমার ফ্যামিলি নিয়ে সুখী থাকতে পারি না! পারা তো উচিত। যদি না পারি—সে আমার হ্যাংলামি। আসলে তাহলে আমি একজন ভিখারী। পাছে ধরা পড়ি বলে রাণীতে মন দিতে পারি না। মন দেওয়ার জন্যেই এই বেরিয়ে পড়া। এই চিল্কা। বালুগাঁও। রম্ভা-ওয়ালটেয়ারের পথে চুনোপাথরের পরিষ্কার স্নান-সারা পাহাড। ঝকঝকে তকতকে।

মাঝি বললো, বছরখানেক এই বাবুদের আনাগোনা বেড়েছে। আমরাই দু'-এক সময় ওদের তেল, নুন, মাছ দিয়েছি। নয়তো চিল্কা তো শান্তই বাবু।

রাণী বললো, পুলিস ওদের ধরে ফেলবে?

না মা। পারবে না। আমাদেরই নৌকা তো ভাড়া নিয়েছে পুলিস। আমাদেরই দাঁড়ি। জেনেশুনে কি আর ওরা জোরে দাঁড় বাইবে!

তোমরা চিল্কার বাইরে যাও না?

না মা। দেশ ছাড়ার পর এই চিল্কাতেই আমরা অনেকে মিলে আছি। আরও

দক্ষিণে আমাদের পাবেন। মাদ্রাজেও।

ঠিক এই সময় কলকাতায় কোল ইণ্ডিয়ার বোর্ড রুমে গরম কফি বোঝাই ট্রলি চালিয়ে ক্যান্টিন বয় ঢুকলো। সঙ্গে ক্যান্টিন ম্যানেজার। মাথায় পেখম তোলা পাগড়ি বসানো দুজন বুড়ো বেয়ারা।

এই দুই বুড়ো বেয়ারা—সতীশ আর আশু—সেই প্রাইভেট আমল থেকে চেয়ারম্যানকে চেনে। চেয়ারম্যান তখন চেয়ারম্যান ছিলেন না। আশুর হাতে চার আনা পয়সা দিয়ে কাঁচি সিগারেট আনাতো। তখন কোল কোম্পানির আমল। বছরে দুবার বোনাস। পুজো আর বড়দিনে।

কফি দিয়ে ট্রলি ফিরে যেতেই পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ায় রিজিওন অডিটের কর্তার পোস্টে সাধন গুপ্ত ঋষির নাম করলো।

এই এরিয়ায় কেন কোল ইণ্ডিয়া পেরে উঠছে না সে-কথাও তুললো চেয়ারম্যান। পিটসাইড থেকে কয়লার ডেলিভারি কমে গেছে কেন—তাও জানে চেয়ারম্যান। প্রাইভেট মাইনিং কতটা ডিটারমিণ্ড হলে তবে একটা সরকারী উদ্যোগকেও ঘায়েল করতে পাবে—তার প্রমাণ ভৌমিক খাদান। সেই খাদান নিয়েও কথা হলো। রেইলওয়ে হেডে যদি ওদের ওয়াগন চেপে দেওয়া যায়—তাহলেই ভৌমিক খাদানের দম ফুরিয়ে আসবে। চেয়ারম্যান চারদিক আলোচনা করে বললেন, উই উইল ক্রাশ দেম। রাজমহল, আসাম, এম. পি.—নানা জায়গায় প্রাইভেট মাইনিং সারকেল থেকে পাতালে ঢুকেছে। বড হচ্ছে। দিল্লি চায়—ফেয়ার কম্পিটিশান।

দিল্লির কোল পলিসি, ওয়াগন মুভমেণ্ট ইত্যাদি বিষয়ে একটা ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে চেয়ারম্যান বললো, পাণ্ডবেশ্বর নিশ্চয় আমাদের ট্রাফালগার নয়। তবে জানা দরকার—একটা প্রাইভেট খাদান মাত্র দু বছরে এতটা বিজনেস করলো কি করে।

দু বছরের কিছু বেশি স্যার।

হ্যাঁ। পিট ওপেন করেই—এত তাড়াতাড়ি মাইনিং? তারপর রেল ইয়ার্ড-এর সুযোগ? ক্যাপিটাল? সবচেয়ে বড় কথা—কয়লার মুভমেণ্ট। কি করে সম্ভব? নিশ্চয় ঘাৎঘোৎ জানে এমন কেউ ভেতরে আছে।

এ জায়গায় অনাথ চক্কোত্তি চুপ করে গেল। চুপ করে গেল সাধন। এরা দুজনই প্রাইভেট আমলের লোক।

সাধন গুপ্ত এখন চৌষট্টি-পঁয়ষট্টি। সকালে মর্নিং ওয়াক করে। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে কলকাতায় মেস করে থাকতো। আর কোল কোম্পানিতে

চাকরি। অনাথ চক্কোত্তি কিছু পরে কোল কোম্পানিতে ঢোকে। এখন ষাটের দিকে বয়েস। দুজনই জগৎজোড়া ডিপ্রেসনের আমলের যুবক। তখন ওরা বয়সকালে বিয়ের কনে পায়নি। মেয়ের বাপ মেয়ে দিতো না। তাই বেশি বয়সে বিয়ে দুজনেরই। তখন বাড়িওলা এদের বাড়ি ভাড়া দিতো না। কারণ মাস মাইনে তিন ক্ষেপে হতো। চাকা যে একদিন উল্টে যাবে—একদিন আরামের মুখ দেখতে পাবে—সেদিন সে স্বপ্ন দুজনেরই দেখার কোন চান্স ছিলো না। কিন্তু এখন তা সত্যি। বেশ অনেককাল ধরে।

অনাথ একসময় সাধনের বাড়ি তিন তাস খেলতে যেতো। সে অনেকদিন আগে। তখনো স্বাধীনতা আসেনি। সে সময় ওরা মাসের শেষদিকে অফিসের পুরনো বেয়ারাদের কাছে দু দশ' টাকা ধার নিতো। অভাবে, যুদ্ধের ব্ল্যাক আউটের রাতে ওরা খুব কাছাকাছির মানুষ হয়ে উঠেছিল।

আবার এই যুদ্ধই ওদের দুজনকে আলাদা করে দিতে থাকে। সাধন গুপ্তর ছত্রিশগড়ী খাদান স্টাফ যুদ্ধের বোম বাজিতে দেশে পালায়নি। অনাথ চক্কোত্তি কয়লার সঙ্গে সেল মিলিয়ে ছাইয়ের ভাগ বাড়িয়ে দিয়েও যুদ্ধের মালগাড়ির ইঞ্জিনে কয়লার বরাত বাড়িয়ে দিতে পেরেছিল।

দুজনের এই দুই কৃতিত্ব দুজনকে তখনকার কোল কোম্পানিতে দু দিকের দুটো মইয়ের ধাপ ধরে ওপরে ঠেলতে থাকে—আর, সেই থেকে ওরা আলাদা হতে থাকে। সেদিনকার বেসরকারী কোল কোম্পানির গায়ে অনেকগুলো কয়লার প্রতিষ্ঠান জুড়ে দিয়ে ন্যাশালাইজেশন—তারপর থেকেই এই কোল ইণ্ডিয়া। কোল ইণ্ডিয়াতেও এই দুই দোসরের রেষারেষি গল্পকথার বিষয়। কার টেবিল কার চেয়ে বড়—কিংবা কার ঘরে রিলাক্স করার ডেকচেয়ার দেওয়া হয়নি—এ নিয়েও দুজনে একদা মাতামাতি করেছে।

এখন বয়সের গুণে ওরা দুজনই জানে—ভালো জাতের ইয়েসম্যান তৈরি করতে না পারলে পরে কারো পক্ষেই টিকে থাকা সম্ভব হবে না। নিজের সাজানো আসরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একদিন দোয়ারকিও গাইয়ে হয়ে ওঠে। সেদিনের কথা ভেবে বুদ্ধিমান গাইয়ে দোয়ারকির সুরে সায় দেয়। আসর বুঝে।

এই বোর্ড মিটিং সেরকমই একটা আসর। সেখানে গুপী গায়েন আর বাঘা বায়েন—সাধন গুপ্ত আর অনাথ চক্কোত্তি। সাধন বলে বসলো, কোল ইণ্ডিয়ার ব্রেইন যে এর ভেতর নেই—তা বলতে পারবো না।

অনাথ চক্কোত্তি বললো, খেলাচ্ছলে স্যার। সবই খেলাচ্ছলে। এইভাবেই তো শুরু হয়। বড় হয়। বুড়ো হয়। আমাদের মাদার কনসার্ন কোল

কোম্পানিও কি এভাবে শুরু হয়নি ? অবিশ্যি লাস্ট সেনচুরিতে।

চেয়ারম্যান জানতে চাইলো, খেলাচ্ছলে ?

সাধন গুপ্ত এগিয়ে এলো। বেফাঁস বলে ফেলে অনাথ চক্কোত্তি তখন নিজের কথা গিলছিল। কোল ইণ্ডিয়ায় এখন একদম কুটোটি না নেড়ে—এক সময়কার কুটো নাড়ার ফসল যে সবচেয়ে বেশি তোলে—তার নাম অনাথ চক্কোত্তি। সে এখন ছড়ি ঘুরিয়ে মাসের গোড়ায় মোটা প্যাকেট বাড়ি নিয়ে যায়। চেয়ারম্যানের চোখের সামনে চোখ খুলে তাকাতে পারলো না অনাথ। কি দরকার ছিল 'খেলাচ্ছলে' কথাটা বলার ? এটাও যেন খেলা হয়ে গেল একটা।

সাধন এগিয়ে এসে বললো, চেয়ারম্যান স্যার। তার বলার ভঙ্গীতে স্বয়ং চেয়ারম্যান হেসে ফেলেছিল।

সাধন গুপ্ত বললো, ঋষি অ্যাণ্ড দিলীপ গোড়ায় একসঙ্গে মাথা দিয়েছিল। সবই একটা পিকনিকে ডিসাইড করে ওরা।

আপনি জানলেন কি করে ?

আমরাও—আমি, অনাথবাবু—দুজনেই যে ছিলাম সেখানে। তবে ঋষি নিজেকে কোল ইণ্ডিয়ার কম্পিটিটর ভাবতে রাজি নয়। স্ট্রং কনসেন্সের লোক সে।

দেন হু ইজ দি গাইডিং ফোর্স ? ক্যাপিটাল আসছে কোত্থেকে ?

তা বলতে গেলে স্যার দিলীপের কথা বলতে হয়।

অনাথ এখানে বললেন, দিলীপ একাই প্রায় ময়দানবের মত ক্যাপিটাল এনেছে। মার্কেটিং করেছে।

অ্যাকাউণ্টসের দিলীপ বাসু ? সে তাহলে কোল ইণ্ডিয়ার কাজ করে কখন ?

অনাথ, সাধন—দুজনই চুপ। নির্বিকার। বোর্ডের আরেকজন মেম্বার (পার্সোনেল) বললো, বাসুকে তো অনেকদিন চোখেই দেখিনি।

এ কথায় চেয়ারম্যান বোর্ড মেম্বারদের মুখে একে একে তাকালো। তারপর গাঢ় গলায় ইংরাজিতে যা বললো—তার বাংলা হলো—তাহলে বাসুর পাখনা জোড়া কেটে দাও। স্পাইক হিম টু হিজ ওল্ড চেয়ার। পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ায় কোল ইণ্ডিয়ার লজ্জার কোন সীমা নেই। আমরা এত বড—অথচ একটা প্রাইভেট খাদানের পেছনে পড়ে যাচ্ছি। এ কিন্তু ভালো নয়।

অনাথ চক্কোত্তি এক সময় নিজের অফিস ঘরে দরবার বসাতো। তখন সে হাতে মাথা কাটতো। বিপ্লবের কথা বলতো। বলতে বলতে পকেট থেকে চিরুনি বের করে মাথা আঁচড়ে নিত। ইদানীং বেশি জিনের পর তার মুখে কথা একটাই—কেউ আমায় বুঝলো না। সেই অনাথও চেয়ারম্যানের একথায় অস্বস্তিতে পড়লো।

ইদানীং দিলীপ তাকে বলে, আপনি তো অনাথদা গৌরবের কাঁধে হাত দিয়ে হাঁটতে ভালবাসেন!

তার মানে দিলীপ?

কেন! যারাই কোল ইণ্ডিয়ার ম্যানেজমেন্টের নয়নের মণি—তাদেরই সঙ্গে তো আপনি গ্লাস নিয়ে বসেন। ঘোরাফেরা করেন তাদেরই সঙ্গে। এমনকি তাদেরই সঙ্গে কলামন্দিরে রবিশংকর শুনতে যান।

একটা নাম বলো।

নাম বলে কোন লাভ নেই অনাথদা। আপনিও জানেন—আমিও জানি। আর যে-কথা সেদিন দিলীপ মুখে আনতে পারেনি—তা হলো—প্রিয় অনাথ, তোমার বিদ্রোহ, তোমার র‍্যাডিকালইজম মুখেই—তুমি চাও অন্যে তোমার খর্ব অধিকার উদ্ধারের জন্যে ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে লড়াই করুক—অন্যে তোমার ঘরের কার্পেট বড করার জন্যে মেম্বার এসটাব্লিশমেণ্টকে ঘাঁটাক—আর তুমি বসে বসে ফলভোগ করো। তুমি গুডবয়টি হয়ে থাকতে চাও। আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো—আমরা যখন কাজে ঢুকেছিলাম—তখন ইমোলিউমেণ্টস কত কম ছিল—তবু অত কাজ করতাম কেন আমরা? আর এখন। আমরা কিছু নিষ্কর্মা, যে-যার কিউবিক্লে ঘুরন্ত চেয়ারে বসে শুধু হিসেব কষি—মাসের শেষে মাইনে বাদে কে কতটা টুর বিল পাবো।

দিলীপের এই তেরিয়া ভাবটা কোন দিনই ভালো লাগে না অনাথের। বিশেষ করে ভৌমিক খাদানের শেয়ার কমিশন দিলীপকে যেন উদ্ধত, অহঙ্কারী করে তুলেছে। ওরে বাঞ্চোৎ। আমি রাস্তা থেকে সেদিন ধরে এনে চেয়ারে বসিয়ে না দিলে আজ তুই কোথায় থাকতিস!

আগে তবু দিলীপের মেশামিশির ভেতর সমীহ থাকতো। এখন যা ফুটে বেরোয়—তার নাম ডোণ্ট পরোয়া। অনাথ গোড়ায় যখন দিলীপকে কোল কোম্পানিতে এনেছিল—তখন ছোকরার বয়স কি। চব্বিশ-পঁচিশ। অনাথ এই দিলীপকেই কত ধমকেছে! অনেকদিন আগে দিলীপ একবার অনাথের ঘরে ঢোকার মুখে বলেছিল, মে আই কাম ইন—

আর ন্যাকামো কোরো না। চলে এসো। ওসব কোত্থেকে শিখেছো?

আমাদের স্কুলে মে আই কাম ইন বলে ক্লাসে ঢুকতে হতো।

এটা স্কুল নয়। অফিস।

আবার এমনও হয়েছে—অনাথের ঘরভর্তি লোক। পুরো দরবার বসেছে। অনাথ চক্কোত্তি তখন বেয়ারা দিয়ে দিলীপকে ডেকে পাঠিয়েছেন। দিলীপ ঘরে

ঢোকা মাত্র অনাথের অর্ডার—আচ্ছা দিলীপ—সেই যে তুমি বলেছিলে—জীবনে প্রথম কিভাবে ইনসাল্টেড হয়েছিলে—সেই গল্পটা বলো।

গল্প নয়। ঘটনা।

ওই একই। বল না। শুনি।

দিলীপ বলে গেছে। অনাথ ঘরভর্তি লোক নিয়ে হাসতে হাসতে চেয়ারের এক পাশে কাত হয়ে পড়েছে। দিলীপের কথা বলার নির্বিকার ভাব—যেন অন্য কোন লোকের অপমানিত হওয়ার কথা বলে যাচ্ছে এমন ভঙ্গী—ঘরের সবার হাসির মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এর পর অন্যদিন যদি ডাকি—তাহলে কোন্ গল্পটা বলবে দিলীপ ?

গল্প নয়। ঘটনা। আজকের এই এপিসোডটা বলবো তখন।

অনাথ চক্কোত্তি হাসতে হাসতে থেমে পড়ে গম্ভীর হয়েছে।

অনাথের একটা ফেবারিট প্যাসটাইম ছিল আগে। নিজের কিউবিকলে ছক হিসেব কষতো কোন কোম্পানি তাকে সব মিলিয়ে মাসে কত দেয়। এই হিসেবের যোগগুলো দিলীপকে কষতে হতো। বেসিক+ডি. এ +পেট্রল+কার মেনটেনান্স +এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট+টেলিফোন বিল+টুবে গড়ে মাসে সব খরচ করে হাতে কত থাকে। অনাথ বলে যেত। দিলীপ যোগ কষতো। কষে মোট অঙ্কটা অনাথকে শোনাতে হতো। শুনে অনাথ আত্মতৃপ্তির একটা হাসি হাসতো। সেই হাসিতে যোগ দিয়ে দিলীপকে স্বস্থির ভাব ফুটিয়ে তুলতে হতো! চোখে মুখে। যোগ করে বের করা মোট অঙ্কের সমান সমান। অনাথ দিলীপের মুখের এ-ভাবটা একটু একটু করে এনজয় করতো।

সাধন গুপ্ত, অনাথ চক্কোত্তি—দুজন দুই মেরুর লোক। দিলীপের চোখে। ওরা সবাই মিলে গোকুল দত্তর ভাড়া করা বাড়ির বাগানে পিকনিকেও গেছে। সেখানে গিয়েও অনাথ আর সাধন দুই রকমের মানুষ। অনাথ—খোলামেলা, অগোছালো। সবচেয়ে যাকে ভালবাসে সে—তার নামও অনাথ চক্রবর্তী। সেই তুলনায় সাধন গুপ্ত গোছালো, সতর্ক, সাধারণ টাইপের।

এরকমই একটা পিকনিকে যাওয়ার পথে ঋষি আর দিলীপ সাধন গুপ্তকে আনতে গিয়েছিল। আনতে মানে পথে তুলে আনতে। মাইনে পত্তর বেড়ে যাওয়ায় অনাথ যেমন তার বসার ঘরের দেওয়াল ভেঙে পর্দা টাঙিয়ে লিভিং রুম বানিয়েছে—সাধন গুপ্ত কিন্তু তা করেনি। মেস থেকে কোন্ সেই আদিকালে সস্তার ভাড়া বাড়িতে উঠে এসেছিল সাধন। অন্ধকার সিঁড়ি, জল উপচে পড়া প্যাসেজ, দিনের বেলায় ল্যাণ্ডিংয়ে আলো জ্বেলে রাখতে হয়—সে বাড়িতেই একশো

টাকার ভেতর ভাড়ায় থেকে গেছে সাধন। উপস্থিত সে ফোটানো জল খায়। পিকনিকে যাওয়ার পথে ঋষি যেমন ভক্তিভরে সাধন গুপ্তর জলের বোতল কোলে নিয়ে গাড়িতে বসেছিল—তাতে দিলীপের হাসি এসে যাচ্ছিল। কিন্তু এইভাবেই তো মানুষ ভক্তি শ্রদ্ধা জানায়। কেউ জানালে তাতে আপত্তির কি আছে। জিনিসটা তো ভালোই।

বোর্ড মিটিং শেষ হলো পৌনে পাঁচটায়। তখন চিল্কায় কুটুদের নৌকো নলবন থেকে তীরে ফিরে এলো। সন্ধ্যেবেলায় অন্ধকার চন্দ্রাকূট পাহাড়কে মুছে দিল। বড জলের কাছাকাছি শীত কম থাকে। মিঠে ভেটকি, চিংড়ি এখন চিল্কার বুকে শ্যাওলার ভেতর। বালুগাঁও বাজার মুহূর্তে পার। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে রাত আটটার ভেতর ভুবনেশ্বর। রাস্তায় গিয়ার ঠিক করতে গাড়ি যেখানে দাঁড়ালো—তার সামনেই ওড়িয়া ডেইলি সমাজের অফিস।

রাত এগারোটায় বালেশ্বর। একটায় জলেশ্বর। ভোর রাতে গাড়ি যখন হাওড়া ব্রিজ পার হলো—তখন পেছনের সিটে কুটু আর রাণী দুলতে দুলতে ঘুমোচ্ছিল।

অফিস না গিয়ে ঘুমোচ্ছিল দিলীপ। অনেকদিন পরে। অঘোরে। এক'দিন চিল্কা, রম্ভা, বালুগাঁও করে মাথাটা সাফ। শেয়ারের টোপ গাঁথার টেনশনও ছিল না। দিলীপ বসু ঘুমের ভেতর আসল ঘুমের পাতালে পৌঁছে মরে পড়ে ছিল। টেলিফোনে ঘুম ভেঙে গেল। ওপাশ থেকে গোকুল দত্তর গলা। আসছিস তো দিলু? আজ?

দিলীপ সময় নিল বুঝতে। কোথায়?

আমার বাগানে।

বাগান মানে জানে দিলীপ। শহরতলীর বাগানওয়ালা ভাড়া বাড়ি।

গোকুল দত্ত আবার বললো, আজ থিয়েটার হবে। গান হবে। সবাই আসছে। রাণীকে নিয়ে আসবি। কুটুকেও আনবি। ওবেলা সবাই খাবি আমাদের সঙ্গে। ঋষি, লাবণ্য, অনন্ত, মীরা—সবাই আসছে, সবাই—

কি ব্যাপার?

এসে শুনবি। তুই না থাকলে জমবে না। তোর আসা চাই-ই দিলীপ।

ব্যাপার কি গোকুলদা? আমি আজই শেষ রাতে কলকাতায় ফিরেছি।

চিল্কা কেমন লাগলো?

চমৎকার।

এরকম বেরোবি মাঝে মাঝে। রাণীকে নিয়ে বেরোবি। মার্কেটিং করবি। যা হয়। নিদেন পক্ষে একটা পুঁতির মালা। এতে বউদের মন ভালো থাকে।

ব্যাপারটা তো বললে না।

তুই বাইরে ছিলিস। অফিসে গেলেই জানতে পারবি।

কোন্ অফিস? ভৌমিক ট্রাস্টের?

না। না। তোদের অফিস! কোল ইণ্ডিয়ায়। ঋষির প্রোমোশন হয়েছে। এখনো অর্ডার বেরোয়নি। সাধনদা বোর্ডের ডিসিসন জানিয়েছে।

গুড নিউজ! তাহলে তো যাবোই। বলে টেলিফোন রেখে দিল দিলীপ।

পাশের ঘরে গিয়ে দেখলো, কুটু আর রাণী অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দিলীপ দেখলো, কলকাতা আগের মতোই আছে। নিচে ষাঁড়, চলন্ত ফিয়াটের ছাদ, ডবলডেকার, মানুষের মাথা, হাত-রিক্সা। চিল্কার সে ছিপ নৌকোয় রবি ছিলো না তো কাল তুপুরে!

দিলীপ আর ঘুম আনতে পারলো না। বৃথাই বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে তাকে শেষ অব্দি খোলা দরজা দিয়ে শীতকালের পরিষ্কার আকাশে তাকিয়ে থাকতে হলো। কোলবালিশে মাথা দিয়ে। পরিষ্কার রোদ্দুরে পরিষ্কার আকাশ। শাদা। শূন্য। তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে চোখ ব্যথা করে জল এসে গেছে—আপনা-আপনি গাল দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল—তা টেরও পায়নি দিলীপ। যখন পেল—তখন দেখলো, যাঃ—ঘরে অন্য কেউ নেই। সে একা। রবির ঘরের দরজা খোলা। টেবিলে ধুলো। বইগুলো হাঁটকানো, মাঝে মাঝেই ও ঘরে পুলিস এসে সব নেড়েচেড়ে দেখে। রবি অনেক দিন আসে না। এলেও আমি জানি না। পুলিস জানে না। রাণী নিশ্চয় জানে। একদিন খাবার টেবিলে বসে একদম মুখোমুখি রবিকে ধমকে উঠেছিল দিলীপ। তাতে রবির মুখে—আমার নিজের ছেলের মুখে বাঘ এসে থানা গেড়েছিল। কঠিন মুখখানা, চোখ তুটো আমার দিকে তাকিয়ে ঘেন্নায় গলে যাচ্ছিল।

রবি পরিষ্কার বললো, তুমি একটি পাকা দালাল। মরালিটি নিয়ে তোমার কথা বলার অধিকার নেই বাবা।

রবি ভাত ফেলে উঠে গিয়েছিল। তারপর থেকে তুজনে আর কথা নেই। কদিন মুখোমুখি হলো না। শেষে পুলিস আসতে লাগলো। তখন রবি কোথায়। আমার ছেলে আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেনি। আর তিন-চার বছরের ভেতর আমি পঞ্চাশ হয়ে যাবো।

তু হাতে তুটো চোখ মুছে ফেললো দিলীপ। তবু আবার চোখ ভরে জল এসে গেল। আমি কেন কাঁদছি আমি জানি না। একবার চিৎকার করে কাঁদতে গেল দিলীপ। গলা দিয়ে বৃষ্টি-ভেজা চ্যাপ্টা আওয়াজ বেরিয়ে এলো। তার

ভেতর দিয়েই দিলীপ শব্দ করে বলতে লাগলো, ঋষি এটা কি হলো? এটা কি হলো তুই বল্? এরকম কি কথা ছিল? ভৌমিক খাদান বড় করবো বলেই তো আমরা শুরু করেছিলাম। তার বদলে কী হচ্ছে আজ দু বছর? আমি ঘুরছি। টোপে গাঁথছি। আর তুই? সেই কোল ইণ্ডিয়ার নয়নের মণি হয়েই থাকবি, যেখানে আমি আসলে কেউ না। কোল ইণ্ডিয়ায় একজন হতে গেলে তুই কি করে ভৌমিক খাদানে আরেকজন হবি? ভৌমিক খাদানে তাহলে কি তোর শুধ মাথা নেড়ে সায় জানানোই সব? আর আমি রোজ আস্তে আস্তে এই শাদা আকাশ হয়ে যাচ্ছি। স্বাতী যে ছিল তা মনে ছিল না বহুদিন। স্বাতী যে এলো —তা দেখলাম অনেকদিন পরে। স্বাতী যে চলে গেল—তাও দেখলাম—এই তো সেদিন—জ্যোৎস্না রাতে—চা-বাগানের আলোতে—ছায়ায়—স্যার লেজলি উডের সঙ্গে। রাণীকে কি করে ভালোবাসতে হয়—তা আমি জানি না। কাল রাতে বালেশ্বর থেকে জলেশ্বরে ফেরার পথে গাড়ির দুলুনিতে ঘুমন্ত রাণীর মাথাটা কাটা-মুণ্ডুর মত লাফাচ্ছিল। তাতে দুটো টানা টানা চোখ বসানো। একটা টিকালো নাক। আমি তোমায় সময়মত ভালবাসিনি রাণী। বেশি বয়সে নির্ভর করতে হয় বলে মানুস তার বউকে ভালোবাসে।

এবার দিলীপের দুই খোলা চোখ দিয়ে বড বড ফোঁটায় জল বেরিয়ে এলো।

গোকুল দত্তর বাগানে বেলা চারটের আগে পৌঁছনো গেল না। বাই রোডে সারারাত ধরে বালুগাঁও থেকে কলকাতা আসা মানে সারা শরীরে গাড়ির ঝাঁকুনিতে হাডমুডমুডে ব্যথা। দিলীপকে দেখেই জডিয়ে ধরলো গোকুল। এসেছিস? আয়।

গোকুল দত্তর নেশা হলেই গলায় ত্যাগ, আত্মবিসর্জনের স্বর বাজে। তবে যাত্রা থিয়েটারের স্টাইলে। পাড়ার ছেলেরা আমার জীবন নিয়ে একটা পালা বেঁধেছে। নিজেরাই স্টেজ খাটিয়েছে। ওই ভ্যাখ্—কেমন জরিপাড় ড্রপসিন। সন্ধ্যে হলেই অভিনয় শুরু হবে। অডিয়েন্স শুধু আমরাই। বাইরের কেউ নেই।

ঋষিকে দেখে দিলীপ এগিয়ে গেল। রাণীও। স্টেজের সামনে ফরাসে বসে লাবণ্য মীরার চুল বেঁধে দিচ্ছিল। গুছি খোঁপা। পাশেই রেখা বউদি। হাতে হারমোনিয়ম। সে পরিষ্কার বললো, একটা পল্লীগীতি গাই। এখন আমি পল্লীগীতি শিখছি মাস্টার রেখে।

গোকুল দত্ত নেশার ঘোরে বললেন, তুই এখন চুপ যা—

আহা! মাস্টার রেখে গান শেখাচ্ছো। গান গাইবো না! আমি গাইবোই।

শহরতলীর এই বাগানওয়ালা বাড়ি বলে সব মানিয়ে যাচ্ছিল। উঁচু পাঁচিল।

গেটের কাছে কামিনী ফুলের গাছ। রেখা বউদি একা থাকে বলে মনের সুখে দোপাটি, বেল ফুলের চারা বসিয়েছিল। তাতে এখন শুধু ফুল। সন্ধ্যের দিকে বেলের কুঁড়িগুলো ফুটে যাবে। লাবণ্যর কোন্ কথায় মীরা আর রাণী হেসে উঠলো। ড্রপসিনের ওপারে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের লোকজন এসরাজ আর ক্লারিওনেটে মহলা দিচ্ছিল। ঋষির হাতে গ্লাস। অনন্ত এগিয়ে এসে দিলীপ-এর হাতে একটা গ্লাস দিল। কি নেবে দিলীপদা?

তোরা কি খাচ্ছিস?

আমরা তো হুইস্কি।

তাই দে।

রেখা বউদির পল্লীগীতি চড়ায় উঠতেই আধো মাতাল অনন্ত বলে বসলো, হচ্ছে না। হচ্ছে না।

গোকুল দত্ত কী বলতে যাচ্ছিল। রেখার দিকে তাকিয়ে বললো, চুপ যা বলছি।

পাশে ঋষি বললো, কেন গোকুলদা! আপনি তো শনি-রবিবার আসেন এখানে। বউদি গান শিখেছেন হপ্তাভোর। এখন শোনাবেন না? গান বউদি। গেয়ে যান।

এত শব্দের ভেতরেও দিলীপ ঋষিকে বললো, কংগ্রাচুলেসন্স।

ওঃ! কি জন্যে?

তোর প্রোমোশন।

ও কিছু না। চাকরি করলেই প্রমোশন হয়। বালুগাঁও কেমন লাগলো? মাছ কিনেছিলি?

নাঃ। ওখানে তো টাটকা থাকে না। কিনেছিলাম—চিল্কার বুকে বসে। নৌকোয়। তোর পোস্টিং কোথায় হবে ঋষি?

শুনে আশ্চর্য হবি—পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ায় সেলস্ দেখতে হবে।

তাহলে তো ভৌমিক বাংলোতে গিয়ে উঠবি।

না। কোল ইণ্ডিয়ার গেস্ট হাউসেই উঠতে হবে। এরিয়া সেলস্ ম্যানেজার।

ঠিক এই সময় থিয়েটারের লোকজন একটা বড় মার্কারি ল্যাম্প জ্বেলে দিল। দিন ফুরিয়ে সবে সন্ধ্যে হচ্ছিল। মার্কারি ল্যাম্পের আলোয় দিন যেন আবার ফিরে এলো। ঋষি বললো, এ নাটকে গোকুলদার বেশ খসেছে বোঝা যাচ্ছে।

অনন্ত বললো, খসবেই। গোকুল দত্তর আত্মজীবনী না বেরোতেই নাটক। দত্তজ্ ঘি, বাটার অ্যাণ্ড পনীরের বদলে গোকুলের স্ট্রাগল অ্যাণ্ড রাইজ! লাভ

অ্যাণ্ড ফাইট! কটি নারী চরিত্র আছে গোকুলদা?

গোকুল দত্ত অনন্তর গলার স্বরে জড়ানো জড়ানো প্রশংসা শুনেও বুঝলো না। খুব লজ্জিত ভঙ্গীতে বললো, আমারই জীবনের বলে যাওয়া গল্প নিয়ে লেখা নাটক। ওরাই লিখেছে। আমি একটু-আধটু দেখে দিয়েছি।

অনন্ত থামবার পাত্র নয়। ব্রাভো। নারী ভূমিকায় পুরুষ? না, আসল নারী?

আসল। তিনশো টাকা করে নিচ্ছে তিনজন অ্যাকট্রেস। তাছাড়া রিহার্সালের সময় কিছু দিতে হয়েছে ওদের তিনজনকে। ওরা তিনজনই প্রোফেসনাল স্টেজের অ্যাকট্রেস।

ঋষি বললো, কোন্ তিন নারীর রোলে ওরা পার্ট করছে গোকুলদা? এ তো নিশ্চয় আপনার রিয়েল লাইফ স্টোরি।

আলবৎ। গোকুল দত্ত কাউকে ভয় পায় নাকি? ওরা তো রিয়েল লাইফ স্টোরিই চাইছিল। তাই দিয়ে দিলাম।

দিলীপ বললো, সেই প্রিন্সের মায়ের এপিসোড্‌টা পেয়েছো তো?

নিশ্চয়। সে আমার ফার্স্ট লাভ ছিল দিলীপ। কতকাল আগের কথা।

এখন কাঁদতে বসো না গোকুলদা।

কাঁদবো কেন? পুরুষলোক হয়ে জন্মেছি কেন দিলীপ? যাকে একদিন হৃদয়ের রাণী ভেবেছিলাম —যে আর নেই দিলীপ—তার জন্যে নাটকে একটু জায়গা হবে না? আমি কি পাগও? ওখানেই হবে গোকুলস্ থিয়েটার সেণ্টার। পাকা স্টেজ হবে।

রাণী রাণী কোরো না গোকুলদা। এখানে রাণী নামে একজন বৌদি আছে।

রেখা বৌদি হারমোনিয়াম থামিয়ে বললো—আর উল্টোদিকে ওই বেদী বানিয়েছি—ওখানে আপনাদের দাদার স্ট্যাচু বসবে।

কার?

অনন্তর এ প্রশ্নে থতমত খেয়ে রেখা ঢোক গিললো, আপনাদের দাদার—

অনন্ত প্রায় ভেংচে উঠলো, মর্মরমূর্তি? ব্রোঞ্জ? না, গোল্ড?

অর্ডিনারি সিমেণ্টের। ভালো ঢালাই মিস্ত্রি পেয়েছি। আপনাদের গোকুলদা রোজ দিনে একবার করে মিস্ত্রি মশাইয়ের সামনে সিটিং দিচ্ছে।

গোকুল আবার বললো, তুই চুপ যা তো এখন। গান গাইছিলি গা। ওসব কথা তোলা কেন আবার?

আমি কি তোমার কলের পুতুল গো! মন যা চাইবে তাই বলবো।

রোজ অতটা পথ গাড়ি দাবড়ে আসছো গোকুলদা ?

খুব লজ্জায় গোকুল দত্ত মাথা নিচু করে বললো, আসি। আসবো না কেন ? মোটে তো তিন বস্তা সিমেন্ট লাগবে। মিস্ত্রিমশাই আমার প্রোফাইল গাড়ি করছেন।

অনন্ত হেসে বললো, কর্নিক হাতে নিয়ে তো। মশলা মাখার কড়াই সামনে রেখে। বালির ভাগটা মনে মনে মাপতে মাপতে। কি বলো ?

এগারো

গোকুল দত্ত বললো, না রে অনন্ত। শুধু হাতে। মাঝে মাঝে আমার চোয়াল-দুটো দু হাতের আঁজলায় ধরে দেখছেন মিস্ত্রিমশায়।

তা তো দেখবেনই। তাঁকেই তো ঢালাই করতে হবে। তাঁর একটা আন্দাজ না নিলে কি চলে। লোহা কতটা লাগবে ?

তা হাফ হন্দর। চার সুতোর রড্ লাগবে বারো পিস।

স্টোন চিপস্ ?

চার ঝুড়ি। সে আমার কিনতে হবে না। সি. এম.ডি.এ.র কাজ হচ্ছে ওই মোড়ে। পয়সা লাগবে না। মিস্ত্রিমশাই ব্যবস্থা করবেন।

মিস্ত্রিমশাই কি এ নাটকে আছে গোকুলদা ?

কি করে বুঝলি ? আমার বাবার পার্ট করছেন।

তাহলে যে শুনেছিলাম—ছেলে-ছোকরারা অভিনয় করছে !

খুব ছেলেছোকরা নয়। ওদের একটা অপেরা পার্টি ছিল। সেটার নাম দিয়ে দিলাম—গোকুলস্ থিয়েটার সেণ্টার।

কত খসলো মোট ?

তিন হাজার ছাড়িয়ে গেছে। প্রায় তেত্রিশশো টাকা। তবে এরা আমায় খুব ভালোবাসে। এই বাড়িওয়ালা আমায় তুলতে চেয়েছিল। ওরাই বাধা দিল। ছেলেরা বললো, আপনি একটা পাকাপাকি মঞ্চ বানিয়ে দিন। আপনার নামেই মঞ্চ হোক। একবার হয়ে গেলে বাড়িওয়ালা আর তুলতে পারবে না। গোকুলস্ থিয়েটার সেণ্টারে নবনাট্য আন্দোলনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হবে। তারপর দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়বে গোকুল দত্তর নাম—ওরাই বলাবলি করছিল। আমার আর ক্ষতি কিসের। বাড়িটাও পাহারা দিল। আবার রেখাও হপ্তাভোর একা থাকে। তারও সঙ্গীসাথী জুটলো। মন্দ কি অনন্ত !

ভালোই তো। আমি বলি কি—তুমি আগে আত্মজীবনীটা লিখে ফেলো। ওখান থেকেই নাটক করা সোজা।

লিখতে শুরু করেছি। যখনই সময় পাই—তখনই লিখি। টুকটুক করে। ভালো করছি না?

খুব ভালো গোকুলদা। তিন খণ্ডে বড় করে লিখো। চাই কি সস্তায় দিতে পাবলিশার পেপারব্যাক বের করতে পারে—

খুব গাঢ় গলায় গোকুল বললো, বিচিত্র নয় অনন্ত। এ পৃথিবীতে কিছুই বিচিত্র নয়। শুরু করেছিলাম—একটা দিশী গাই নিয়ে। এ-বেলা তিনপো। ওবেলা তিনপো। দুধ না বটের আঠা ছিল!

ওদের এই কথাবার্তার ভেতর গীরা ঋষির ট্রাউজার-ঢাকা বাম উরুতে মুখ রেখে, গাল রেখে অবুঝের মত ঘষছিলো। ঋষি যেন কোন পোষ-মানানো মানিনীর পিঠে হাত রেখে বোলাচ্ছে—সান্ত্বনার পোজে রাণী একদম উল্টো দিকের দেওয়ালে তাকিয়ে—দেওয়ালটা এ বাড়ির বৈঠকখানার বাইরের দিককার। গোকুল আরেক গ্লাস নিট খেল। লাবণ্য তখন খুব মন দিয়ে রেখার হারমোনিয়মের ডালা তুলে রিড্ ঠিক করছিল।

ঠিক এই সময় তিনজন রোগাভোগা চেহারার লোক ড্রপসিন তুলে মেকআপ লাগানো অবস্থায় অডিয়েন্সে চলো এলো। আর আধ ঘণ্টা গোকুলদা।

ওরা বেরিয়ে এসে ফুটলাইট পরীক্ষা করতে বসে গেল। একজন টাক-পড়া লোক ফোকাসম্যানকে ডেকে কয়েকখানা লাল নীল কাগজ হাতে গছিয়ে দিল।

অনন্ত বললো, কাদের তুমি ছেলেছোকরা বলছো? ওরা তো আমাদেরই বয়সী।

ওই টাক-পড়া ছেলেটি—

অনন্ত গোকুলকে থামালো। বলো লোকটি।

যা বলিস। ও খুব ট্যালেন্টেড নাট্যকার। আমার জীবনের দুঃখের সুর ঠিক তুলে এনেছে নাটকে।

পাকা নাট্যকার তো!

দিলীপ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। রেখা বউদির জন্যে গোকুলদা বাড়িটাকে ভালোভাবেই সাজিয়েছে। গেটে কামিনী ফুলগাছটা ঝাঁকড়া হয়ে উঠেছে। যেখানে গোকুল দত্তর স্ট্যাচু বসবে—সে জায়গাটায় বেদী তৈরি শেষ। কমপাউণ্ড-ওয়ালা এমন বাড়ি পেয়েছে বলেই গোকুলস থিয়েটার সেণ্টার সম্ভব হয়েছে। অল্প কজনের জন্যে থিয়েটার। যতজন অ্যাক্টর—প্রায় ততজনের অডিয়েন্স।

মাথা-পিছু ড্রিংকস আর ভাজাভুজির ছড়াছড়ি। গোকুল দত্তর মনটা তার চওড়া বুকের মতই দরাজ। দিলীপ জানে—গোকুলদা চায়—সবাই এসো, আনন্দ করো, খাও-দাও—ছাখো, একটা দিশী গাই নিয়ে শুরু করে আমি কি করেছি। এর ভেতর কোন প্যাচ নেই। কোন চালাকি নেই। দু নম্বর বউ বা সঙ্গিনাব জন্যে এই নিজনে বাড়িতে পল্লীগীতি শেখাবার মাস্টারও নিয়োগ করেছে গোকুল দত্ত।

রেখা বউদি বায়না ধরলো, সে পল্লীগীতি গাইবেই। বায়না ধরেই সে আবার গানও ধরে ফেললো। রিডের গোলমালে হারমোনিয়মটা অন্য সুরে বাজছিল। তাতে কোন পরোয়া নেই। ঋষির কোলে মাথা রেখে মারা খিলখিল করে হেসে উঠলো। মারার চোখ তখন ঘোলাটে। লাবণ্য এই এত গোলমালে চুপচাপ কামিনী গাছটার মাথার দিকে তাকিয়ে। ঋষি মারার কানের উপর হাত রেখে বললো, তোমার গা গরম। আর বিয়ার খেও না।

না। আরেকটা খাবো।

এখানে এখন কেউ কাউকে এগিয়ে দেবার নেই। যে যাকে নিয়ে ব্যস্ত। এরই ভেতর দিলীপ ঋষিকে বললো, আমাদের খাদানের কি হবে ?

কেন ? চলবে। যেমন চলছে—তেমন চলবে। বলতে বলতে ঋষি একবার মাথা নিচু করে তার উরুর উপর নেশালু মারার পড়ে থাকা মুখখানার পাশে কানে, চুলে নাক ছোয়ালো। গন্ধ নিল। কাজের কথায় ঋষির এই উপেক্ষা দিলীপের ভালো লাগলো না।

ক্রেডিটে কয়লা যাচ্ছে। টাকা আসতে দেরি হবে। এই সময়টার খরচ চলবে কি করে ? আমাদের তো রিজার্ভ ক্যাপিটাল নেই। ব্যাংক ও. ডি. অত টাকার পাওয়া যাবে না—মানে এখন দেবে না।

মারার দিক থেকে চোখ সরিয়ে ঋষি বললো, সেও তো একটা কথা।

অনন্ত ঋষির কথায় চলে। চলে গোকুল দত্ত। তাই তো লাগে দিলীপের। এখন অনন্ত বা গোকুলের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। দুজনেই একটু বেশি খেয়ে ফেলেছে।

দিলীপ বললো, সব খরচ চালু রাখতে হলে একটা পথ আছে। কিন্তু ঝুঁকি নিতে হবে।

ঋষি তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে দিলীপ বললো, আমি একটা জিনিস জানতে পেরেছি। ট্রেডিং লাইনে অনেকেই জানে। লোন অরগানাইজেশন বসে আছে ডালহৌসিতে। তারা আমাদের টাকা ধার নিয়ে থার্টিসিক্স পারসেণ্ট সুদ দেবে।

তা দেবে কি করে ?

দেবে। রিজার্ভ ব্যাংকের রেজিস্টার্ড ফার্ম। বারো পারসেণ্ট খোলাখুলি দেবে। বাকি চব্বিশ পারসেণ্টের কোন হিসেব থাকবে না। কিন্তু ঘরে বসে হাতে পাওয়া যাবে।

তাহলে তো অনেকেই টাকা রাখছে।

রাখবেই তো। ভৌমিক খাদান যদি টাকা রাখে—তাহলে অসময়ে টাকা পাবে। এখানে অন্তত পঁচিশ কোটি টাকা খাটছে।

ক্যাপিটাল যদি মেরে দেয় !

উপায় নেই। ওর তো রসিদ দিচ্ছে। সেজন্যে প্রকাশ্যে বারো পারসেণ্ট দিচ্ছে।

যা ভালো বোঝো করো।

তোকে জিজ্ঞাসা না করে কি করে করি ? পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ার তুই কোল-ইণ্ডিয়ার ইণ্টারেস্ট দেখবি। আর ওখানেই আমাদের খাদান। সে খাদানে তুইও একজন। এখন যেখানে তুই মন দিবি---সেখানকার ইণ্টারেস্ট দেখবি বেশি করে—সেখানটাতেই নয় !

কোল ইণ্ডিয়ার সঙ্গে তো আমরা কম্পিটিশনে নামিনি। বেশ খিঁচিয়েই কথা বলে উঠলো ঋষি। থামলো না। আমরা যদি আর দশ বছর আগেও খাদান করতাম—তাহলে অন্য কথা ছিল। একবার ঝাঁপ দিয়ে দেখা যেত। কিন্তু এখন তো আমরা সংসার করে ফেলেছি। বয়স হয়ে যাচ্ছে। আগে হলে দেখা যেতো।

ওরা কথা বলছিলো। স্টেজের গ্রীনরুম থেকে ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের মহলা চলছিল। এদিকে রেখা বউদির পল্লীগীতি। আলুথালু মীরা আর একটা বীয়ারে মুখ দিল।

তাহলে ঋষি আমরা খাদান করছি কেন ?

করছি। এই যে সবাই দেখা হচ্ছে।

শুধু তাই ? এর একটা টেনশন নেই ? টাকার টেনশন ?

আছেই তো। সেজন্যে আমরা সবাই তোমাকে ধন্য ধন্য বলেছি।

ঋষির একথা দিলীপের কানে রসিকতা লাগলো। শুধু ধন্য ধন্য পাবো বলে তো আমি আসিনি। ভেবেছিলাম—একটা বিরাট কিছু গড়ে উঠবে। সে সুযোগও ছিল ঋষি।

কিন্তু ভেবে ছাখ দিলীপ—সে বয়স কি আর আছে আমাদের ?

কে বললো নেই ? ইচ্ছেটাই তো বড। না দিলীপ—আর হয় না।

দিলীপের মনে আরেকজন দিলীপ কথা বলছিলো। সে মনে মনে বললো, তুই নিশ্চিন্ত। সুবিধের বাইরে কিছুতেই যাবি নে আমি জানি। কিন্তু একথা তো স্পষ্ট বলা যায় না। কোথায় কোল-ইণ্ডিয়া!—আর কোথায় ভৌমিক খাদান।

ঋষি নিজে নিজেই বললো, ভৌমিক খাদান কোনদিন একটা জায়গান্টিক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠুক—এমন ভাবনা আমার মাথায় ছিল না কোনদিনই। লেবার আনরেস্ট, বোনাস, ওয়েজবোর্ড, ওয়াগন মুভমেন্ট—যেসব নিয়ে আমরা কোল-ইণ্ডিয়ায় মাথা ঘামাই—সেসব কি আবার ভৌমিক খাদানে ভালো লাগবে ? তুইই বল্ দিলীপ।

কিন্তু একটা জিনিস বড করে গডে তোলার আনন্দ কি নেই ?

আমাদেরই ইনিসিয়েটিভে কোল-ইণ্ডিয়া কি আগের চেয়ে বড হয়ে ওঠেনি ?

ঋষি—এটা একটা কবন্ধ প্রতিষ্ঠান। সব জায়গায় কি ইনিসিয়েটিভের রেকগনিশন আছে।

হয়তো নেই। সব আমি বলতে পারবো•।।

তুই বলতে চাস নে।

না কেন দিলীপ ?

অনেক কথা বলতে হবে ভাই। আমি যদি ভৌমিক খাদানকে অরগানাইজ করে তুলতে পারি—তাহলে আমার মত লোকেরই তো কোল-ইণ্ডিয়ায় সবচেয়ে বেশি চাহিদা হওয়ার কথা ছিল। কতকগুলো এরিয়ায় কোল-ইণ্ডিয়ার ব্যবসা বাডছে না। সেখানে কি আমার মত ইমাজিনেটিভ লোক পাঠানোর কথা না হবে ?

ঋষি মাথা একটু নিচু করে একবার দিলীপের চোখে চোখ রাখলো।

নিজের মুখে নিজের প্রশংসা সবচেয়ে বাজে জিনিস জানি। কিন্তু আমার উপায় ছিল না ঋষি। তাই নিজেকে ইমাজিনেটিভ বলেছি।

মিথ্যে বলিসনি তো। কিন্তু সব ব্যাপারে তুই এতো টেন্স কেন ? কি হয়েছে তোর দিলীপ ? কিছুই কি সহজভাবে—অ্যাট ইজ নিতে পারিস নে ?

নেবো না কেন ? কিন্তু খাদান করতে নেমে যা আমরা করছি—তার মানে আমার মাথায় ঢুকছে না ঋষি।

এটাও একটা খেলা ভেবে নে না—এত সিরিয়াস হবার কিছু নেই কিন্তু।

অনেক কথাই একসঙ্গে মনে আসছিল দিলীপের। কিন্তু কোনটাই বলতে পারলো না। মীরা অ্যাঁ, ম্না ধরনের কয়েকটা শব্দ করে ঘুমিয়ে পডলো।

অনন্ত এগিয়ে এসে বললো, ঘুমোক। একটু ঘুমোনো ভালো।

এই সময় লাবণ্যকে রাণী ঢেকিশাক রান্নার রেসিপি বলে দিচ্ছিল। লাবণ্যকে রাণীর ভীষণ ভালো লাগে। এখানে রাণীর মতই লাবণ্যও যেন আরেকজন আগন্তুক। অল্প দুধ, কালো জিরে, কাঁচালংকা, চিংড়ি মাছ আর নারকোল। এসব কথা বলতে বলতে রাণী দেখলো, গোকুল দত্ত এলোমেলো পা ফেলে গেটের কাছে কামিনী ফুলগাছটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আর তার পেছন পেছন—গোকুলস থিয়েটার সেণ্টারের পুরো অর্কেস্ট্রা। ঘন ঘন নিট খেয়ে গোকুল দত্ত ঘন ঘাসের ওপর খালি পায়ে দুলে দুলে হাঁটছিল। তার পেছনে মিউজিক হ্যাণ্ডগুলো সেই তালেই বাজিয়ে চলেছে।

বেহালা, ফ্লুট, ক্ল্যারিওনেট, ঢোল। চারজন মৌজসে বাজাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে গোকুল থামলে—ওরা থামে। গোকুল এগোলে ওরা এগোয়। যে যার বাজনা বাজাতে বাজাতে। এসব দেখে রেখা বৌদি হারমোনিয়ম থামিয়ে হাততালি দিয়ে উঠল।

গোকুল দত্ত কামিনী গাছটার দিকে এগোতে এগোতে বললো, মেয়েরা সবাই আজ সন্ধ্যেবেলা খোঁপায় কামিনী গুঁজবে। আমি দেখতে চাই—সবাই গুঁজেছে। অন্তত দুটো করে কামিনী ফুল।

গোকুলের এই কথার তালে বেহালায় ছড় পড়লো। ঢোলে গুম্ গুমা গুম্। মারকারি ল্যাম্পের ঝাঁঝালো আলো তখনো সন্ধ্যা রাতকে ঠেকিয়ে রেখেছে—কম্পাউণ্ড ওয়ালের বাইরে।

দিলীপ হাসতে গিয়ে হাসতে পারলো না। মীরা বেভুল ঘুমোচ্ছে। অনন্ত চশমার কাঁচের বাইরে চোখের চামড়া আনন্দে খানিকটা কুঁচকে ফেলেছে। রেখা বৌদির ভারি হাতে হাততালি বোমার মত ফাটছিল। ঋষি নিরুদ্বেগে তার গ্লাসে মুখ দিল।

গোকুল দত্তর কর্মক্ষমতায় দিলীপ সব সময় মনে মনে হ্যাটস্ অফ বলে আসছে। আজ সে এখানে এসে আরও অবাক হয়েছে। বাড়িওয়ালার বাগান নিয়ে বাড়িওয়ালা যাতে কিছু না করতে পারে—সেজন্যেই থিয়েটার সেণ্টার। একথা সে বুঝতে পেরেছে। কে নিজের বাগানে অন্যের স্ট্যাচু বসাতে দেবে। সবই একটা দিশী গাই থেকে শুরু। গোকুল দত্ত বেশ বলে—সবই যদি চলে যায়—তবু তো আবার একটা দিশী কিনে ফিরে শুরু করতে পারবো।

দিলীপ পরিষ্কার বুঝতে পারছিলো সে কোন্ এক দিগ্‌ভ্রান্ত জায়গায় এসে পড়েছে। এরা সবাই আমার ঘনিষ্ঠ। নিজের মানুষ। লাবণ্য নিজের জগতে বসে ঢেকিশাকের ডিটেলস নিচ্ছিল রাণীর কাছ থেকে। মীরা ঘুমে। রেখা বৌদি

হাততালি দিচ্ছিল। ঋষি নিরুদ্বেগ, নিরুত্তেজ। ব্যাংকের অ্যাডভান্স ডিপার্ট-মেণ্টের কনট্রোলার অনন্ত একটা চিকচিকে হাসি ঠোঁটে তুলে চশমার কাচের বাইরে চোখ কুঁচকে আছে। আর গোকুল দত্ত দাপাতে দাপাতে কামিনী ফুলগাছটার দিকে যাচ্ছে। পেছনে অর্কেস্ট্রা। আমার জামায় মার্কারি ল্যাম্পের আলো পড়ে মনে হচ্ছে, পাটভাঙা পাঞ্জাবি পরে এলেই ভালো করতাম।

এমন সময় আচমকা অর্কেস্ট্রা থেমে গেল। আর বেহালার ছড়টা ছিটকে পড়লো মাঠে।

সাপ। সাপ। গোকুলের গলা।

কোথায় গোকুলদা? বলে ঋষি ছুটে গেল।

তখন নেশা ছুটে যাওয়া হতভম্ব গোকুল শান্ত গলায় বললো, ওই কামিনী গাছের গোড়ায় গর্তে ঢুকে গেল।

মিউজিক হ্যাণ্ড চারজনই চারদিকে ছিটকে পড়েছিল। তারা একসঙ্গে এগিয়ে এলো।

দিলীপ ঠাণ্ডা গলায় বললো, আজ আর ফুলে কাজ নেই গোকুলদা।

গোকুল দত্ত বললো, তা না হয় হলো। কিন্তু বাছাধনকে আমি টেনে বের করছি।

বসা অবস্থাতেই অনন্ত বললো, চলে এসো গোকুলদা। তোমার জন্যে কি নাটক ওয়েট করবে!

নিজের চেম্বারে অনেকক্ষণ একা বসেছিল হরি ডাক্তার। আজ ঋষি, দিলীপ, অনন্তর আসার কথা ছিলো। কথা ছিলো—একটা বড় বোতল নিয়ে বসা হবে। টেলিফোন লাইন কেটে দিয়ে গেছে। বাড়িওয়ালা হুমকি দিয়েছে—এটা মদ খেয়ে গান গাইবার জায়গা নয়। বিহেব্ লাইক এ ডক্টর। ঋষির গান এত ভালো লাগে হরি ডাক্তারের। ভালো করে না খেলে আবার গান আসে না ঋষির গলায়। এমন বেরসিক বাড়িওয়ালাও ভাগ্যে জুটেছে!

হরি ডাক্তার একবার নিজের হাতের গুলি দেখলো। তারপর নিজের মুখে হাসি নিয়ে এলো। চেম্বারে এখন কেউ নেই। পঞ্চাশ পেরিয়েও বেশ তো আছি। একটা হাফ-সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছি। আরেকটা যদি কোনক্রমে পার করে দিতে পারি—তবে তো আরেক সভ্যতায় চলে যাবো। রামমোহনের সব কারবার রেড়ির তেলে। অত লেখালেখি, অত বক্তৃতা—সবই রেড়ির তেলের আলোয়।

বঙ্কিমের কেটে গেল কেরোসিনে। আমাদের যাচ্ছে ইলেকট্রিকে। আরেক হাফ-সেঞ্চুরি বাদে যে কোন্ আলোয় গিয়ে পৌছবো—তা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে নিশ্চয় কোন নতুন আলো।

হরি ডাক্তার ব্লাড রিপোর্টগুলো পেপারওয়েট দিয়ে চাপা দিলো। এখনো আমি এক কিলো মাংস, একটা ছোট বোতল রাম হামেশা খেতে পারি। শরীরের চামড়া কোথাও ঢিলে হয়নি।

টেবিলে কাঁচের নিচে রামকৃষ্ণদেবের সেই বিখ্যাত ছবি। বুকসেলফে টকসি-লজির বইয়ের পাশেই বিদ্যাসাগর রচনাবলী। দেওয়াল-ঘড়িতে পৌনে বারোটা। বাইরের রাস্তায় এক-একখানা গাড়ি হাওয়া দিয়ে চলে যাচ্ছিল।

ঋষি আসেনি। আসেনি দিলীপ। অনন্ত বা মীরা—কেউ আসেনি। ফলে আমাকে একাই খেতে হলো।

চেম্বারের পাশেই ল্যাব্। বারনারে ভাত সেদ্ধ করে করে সারা ঘরটায় মাড়ের আর ফেনের গন্ধ সব সময়। খুদে ফ্রিজটায় কিছু ডিম থাকে সব-সময়।

হরি ডাক্তার একবার ভাবলো, এখানে ডিমসিদ্ধ ভাত করে খেয়ে নিয়ে শুয়ে থাকি। আবার তো কাল সকালেই চেম্বার খুলতে হবে। কে এখন শেয়ারের ট্যাক্সি নয়তো লরি ধরে বাড়ি যায়। বাড়িতে সেই একটা বউ। কয়েকটা বাচ্চা। সাতপুরনো সাংসারিক অনুযোগ। দুঃখ। বোরিং।

ফোনের লাইনটা কাটা না থাকলে দুটো ফোন করতো হরি ডাক্তার। একটা ঋষিকে। একটা দিলীপকে। কি হয়েছে রে তোদের? আগের মত আর হাসিস না! গান করিস না! কথা কমে গেছে! আগে আমার চেম্বারে ঢুকে তোরা কেমন হাসিতে, গানে, কাজের কথায়, রসিকতায় টগবগ করে ফুটতিস। কি হলো তোদের?

একদিন দিলীপ এসে বলছিল, জানো হরিদা—আমার থায়রয়েড গ্ল্যাণ্ডে কোন সিক্রিসন নেই।

তোমার যেখানে সিক্রিসন দরকার—সেখানে ঠিকই আছে।

তুমি কিছু জানো না হরিদা—আমি হয়তো মেয়েলোক হয়ে যেতে পারি।

তুমি যেমন বদমায়েস আছো—তেমনই থাকবে।

হরিদা তুমি ঠাট্টা করছো। আমি আস্তে আস্তে হাবা হয়ে যাচ্ছি।

তুমি হাবা হলে ডাক্তারি শাস্ত্র মিথ্যে হয়ে যাবে।

হরি ডাক্তার চেম্বার থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এলো। বাইরে বাড়িওলার উঠোনের পাশেই হরি ডাক্তারের বিকল অস্টিনটা পড়ে আছে। ইঞ্জিন করতে গিয়ে

গাড়ি বসিয়েছিল। ইঞ্জিন আর আনা হয়নি। সেই ফাঁকা খোলের ভেতর কদিন হলো একটি কুকুর এসে ছানাপোনা নিয়ে সংসার পেতেছে।

চেম্বারের দরজা খোলা। আলো জ্বলছে। জ্বলুক। চোর এলে কি আর নেবে। হরি ডাক্তার রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে সাড়ে বারোটা নাগাদ শিয়ালদা এলো। এখন কুমড়োর লরিই ভরসা। ডিজেল লরি হলে এক ঘণ্টার ভিতর যশোর রোড দিয়ে বাড়ি পৌঁছনো যাবে।

বনগাঁ লাইনের লরিওয়ালা টেরও পেল না—ফুলপ্যাণ্ট পরা যে-বাবুটি তার লরির কুমড়োর টিবিতে উঠেছিল—সে ঠাণ্ডা বাতাস পেয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। রাস্তার দু ধারে যারা দোকান খুলে সারা রাত বিড়ি বাঁধে তারা লরির ওপর কুমড়োর টিবিতে অমন কাপড় মেলে দেওয়া ভঙ্গীতে একটা মানুষকে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখে চমকে চমকে উঠছিল। কিছু বলে ওঠার আগেই লরি অনেক দূর চলে যায়। লরিওয়ালাও একসময় বাবুটির কথা ভুলে গেল। সামনে ফাঁকা রাস্তা।

ঠিক এই সময় কিরীটী পালিত মাঠ ভেঙে এসে বাঘা যতীন স্টেশনে দাঁড়ালো। কোন ট্রেন নেই। একদিকে যাদবপুর। আরেকদিকে গড়িয়া। ভয়ংকর শীতে চাঁদ পর্যন্ত খানিক মেঘ চাপালো গায়ে।

কিরীটির পেছনে এখন বাঘা যতীনের মাঠ।

আজই দুপুরে সে এই মাঠে নেমেছিল। একটা উড়ো খবর শুনে। বৃন্দাবন পালিতের খোঁজে। সেই যে কিরীটীর বাবা টপ্পা গেয়ে উঠে মর্নিং-ওয়াকে বেরিয়ে যান—তারপর আর ফেরেননি।—তা প্রায় দু বছর হতে চললো। শীত-কালের শেষ রাতে সদর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে টপ্পা ধরলো বৃন্দাবন। হাঁটতে হাঁটতে গাইছিল। রাস্তায় তখনো করপোরেশনের আলো জ্বলছিলো।

বাবা আর ফেরেনি।

কিরীটী যুগান্তরে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। বাবা, ফিরিয়া আসুন। সংসারে আপনার কোন অভিমান থাকিলে তাহার আপনারই মনোমত ব্যবস্থা হইবে।

মিসিং স্কোয়াড প্রথমে কিরীটীর ডাইরি নিতে চায়নি।

কে হারিয়েছে বললেন?

আমার বাবা।

ও:! তাহলে দেখুন গে উনি এতক্ষণে বাড়ি ফিরে এসেছেন। বুড়ো মানুষদের সংসারে অমন অভিমান হয়।

না। উনি দেড় বছর হলো নিরুদ্দেশ। ডাইরি লিখুন।

এত দেরিতে আর লিখে লাভ কি? ফেরার হলে এতদিনে ফিরতেন। হয়তো দেখুন গে সাধু হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। বাড়িতে কোন ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল?

একদম না।

হিন্দু সৎকার সমিতি, গোবরার আনক্লেইমড বডির আড়ৎ—সব জায়গায় ঘুরেছে কিরীটী। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে তার বউ-মরা ছেলেটা। কোন খবর পাওয়া যায়নি। মৃত বলে ধরে নিয়ে শ্রাদ্ধও করা যাচ্ছে না। সব কাজে বাবার কথা কিরীটীকে ভেতরে ভেতরে কুরে খায়।

কাল সন্ধ্যেবেলা একটা চায়ের দোকানে দু'জন লোক কথা বলছিল। কাছাকাছি বসে কিরীটী যা শুনেছে, তা হলো—বিদেশে কঙ্কালের বড় অভাব! ডাক্তারি পড়াশুনোর জন্যে নিখুঁত কঙ্কাল চাই। সে জন্যে বেওয়ারিশ বডি দরকার। খুব চড়া দরে সাহেবরা কঙ্কাল কিনছে। আর রক্ত বেশি দামে কিনছে হাসপাতালগুলো।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল। লোডশেডিং। লোক দুটো মোমের আলোয় চা খেতে খেতে আরও অনেক কথা বলছিল। যেমন—বাঘা যতীনের মাঠ পেরিয়ে হোগলা বনে মানুষ কাটা হয়। চাকিরর লোভ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর ভুলিয়ে ভালিয়ে হোগলার মাঠে। সেখানে অজ্ঞান করে নিয়ে মানুষ বলি দেওয়া হচ্ছে। এরকম দু'জন লোক নাকি হাতেনাতে ধরা পড়েছে। তারা এখন যাদবপুর থানার লকআপে।

আজই দুপুরে কিরীটী পালিত একা হাঁটতে হাঁটতে সেই হোগলার মাঠে গিয়ে হাজির। লম্বা রাস্তা। মাঠের ভেতরে শুকনো ঘাসের মাথা গুঁড়ো হয়ে বাতাসে উড়ছে। কাশ ফুলের মত কি একটা ফুল হোগলা মাঠের গায়ে জলা জমিতে ফুটে উঠে দুলছিল। সারা মাঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও একটা খুলি পেল না কিরীটী, মানুষজন নেই। চাদ্দিক খাঁ খাঁ করছে। আরও অনেক দূরে চাষীরা মাঠ থেকে তেউড়ে কলাই তুলছিল। কাছাকাছি দু-একটা অভুক্ত সাদা বক। পোকা না কেঁচো—কী যেন মাঠ থেকে ঠুকরে তুলে খাচ্ছিল। জনমানবহীন জায়গা। দেখতে দেখতে অন্ধকার করে সন্ধ্যে এসে গেল। একটা দুটো করে তারা ফুটে উঠলো আকাশে। কিরীটী অনেকক্ষণ বসে ছিল সেই মাঠে। যারা মানুষ বলি দেয়—তাদের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়। হাত-পা ধরে তাদের রিকোয়েস্ট করতো—এমন দেখতে এক বুড়োকে কি তোমরা বলি দিয়েছো? সত্যি করে বলো। আমার বাবা হতেন তিনি। বলি দিয়ে থাকলে সে কঙ্কাল কোন্ দেশে পাঠিয়েছো ভাই? আমি একবার সে দেশে যাবো। আমার বাবা অবুঝ ছিলেন। বাইরের কিছু বুঝতেন না।

কোথায়! একটাও লোক নেই কাছাকাছি! চাদ্দিকে ভোঁ ভোঁ।

মাঠ থেকে যখন উঠলো কিরীটী—তখন ভয়ঙ্কর শীত আর ধোঁয়া মাখানো চাঁদের আলো। কোথাও কোন আড়াল নেই। বকগুলো চলে গেছে। জলা জায়গার গায়ে হোগলাগুলো ফিনফিনে ভিজে বাতাসে দুলছিলো।

পথ হারিয়ে সে এক কীর্তি কিরীটীর। সব দিক সমান লাগে। যেদিকেই হাঁটে—সেদিকটাই মনে হয়—হ্যাঁ! এই পথ দিয়েই তো এসেছিলাম! শেষে মালগাড়ি আর লোকাল ট্রেনের আওয়াজ ধরে ধরে এই নিষুতি রাতে সে প্ল্যাটফর্মে এসে উঠলো।

এর ভেতর খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে দু-একবার বুক ফাটিয়ে ডেকেছে কিরীটী। বাবাগো! বাবা আমার! আমি তোমার কিরীটী—ফিরে এসো এবারে—

প্ল্যাটফর্ম পাহারার সি. আর. পি.-দের চোখ এড়িয়ে কিরীটী পালিত রেল লাইনে নেমে পড়লো। লাইনের গায়ে গেরস্তবাড়ি থেকে দু-একটা কুকুর তাকে দেখে সন্দেহের ডাক ডাকলো। আস্তে। ভুগ্। ভুগ্। ভুগ্ ভুগ্। শীতের চোটে তারাও বেরোতে চায় না।

যাদবপুর থানার মেজোবাবু সবে সামনের সপ্তাহের ডিউটি রোস্টার লিখছিলেন। এমন সময় চাদর মোড়া একটা লোক এসে তার সামনে দাঁড়ালো। নাকের ডগা লাল।

কি চাই?

বসতে পারি?

বসুন।

একটা কেস নিয়ে এসেছি আপনার কাছে। মানুষ ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে বলি দেয়—এমন ক্রিমিনাল নাকি ধরা পড়েছে আপনাদের এখানে? লক-আপে আছে?

মেজোবাবু লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকালো। ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে। তবে বায়ুর প্রকোপ আছে। নইলে—এত রাতে—

কাপালিক?

ঠিক কাপালিক নয়। কঙ্কাল চালান দেয় বিদেশে। নিখুঁত কঙ্কাল। চাকরির লোভ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে খাঁ-খাঁ মাঠের ভেতর অজ্ঞান করে ফেলে। তারপর বলি দিয়ে ছাল ছাড়িয়ে নেয়। রক্ত বিক্রি করে চড়া দামে। কঙ্কাল চালান যায় ডলারে। মার্কে। ইয়েনে।

মেজোবাবু খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো ভদ্দরলোকের মুখে। আপনার

কেউ হারিয়েছে ?

হ্যাঁ স্যার। আমার বাবা। বৃন্দাবন পালিত। বুড়োমানুষ। একা একা টপ্পা গাইতেন। কারও সাতেপাঁচে থাকতেন না। প্রায় দু'বছর হতে চললো—কোন খোঁজ নেই।

ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল ?

একদম না। তারপর থেমে কিরীটী বললো, বাবা একা একা টপ্পা গাইতেন। হাজার হোক জন্মদাতা পিতা। সিওর না হয়ে শ্রাদ্ধশান্তিও করতে পারছি না।

মা বেঁচে আছেন ?

না।

মেজোবাবু বললো, সেরকম কোন ক্রিমিনাল তো আমাদের লকআপে নেই।

আমি নিজের কানে শুনেছি স্যার চায়ের দোকানে বসে। দু'জন লোক চা খেতে খেতে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলো।

উইক ক্যারেক্টারের লোক অমন গুজব ছড়ায় পাবলিক প্লেসে।

তাদের লাভ ?

ছড়িয়ে এরকমভাবে আনন্দ পায়। এটা আমাদের পুলিসী এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি মিস্টার পালিত। কিন্তু আপনি এখন বাড়ি ফিরবেন কি করে ?

সে একরকম করে চলে যাবো।

হাতে ঘড়ি রয়েছে। এভাবে হেঁটে আসা উচিত হয়নি আপনার। আমাদের ভ্যান যাচ্ছে আনোয়ার শা রোড দিয়ে। আপনাকে ট্রামলাইনে নামিয়ে দেবে। ওখান থেকে রিকশা পাবেন। ভেতর দিয়ে চলে যাবেন টুকটুক করে।

কিরীটী যখন বাড়ি পৌঁছলো—তখন সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু মালবিকা বাড়ি ছিল না। তার বিছানায় মশারি টানানো। ভেতরে পাশ-বালিশটাকে লেপ চাপা দিয়ে মালবিকা বেরিয়ে পড়েছে রাত এগারোটা নাগাদ। সন্ধ্যে থেকে মাথা ধরেছে বলে শুয়েছিল বিছানায়। মা ডেকেছে দু'বার। মালবিকা বলেছে, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। কিছু খাবো না মা।

টাপু খেতে বসে ডেকেছে। আয়, খেয়ে নে। তারপর একটা সেরিডন খেয়ে নিস।

তবু ওঠেনি মালবিকা। সবাই শুয়েছে। বাবা তখনো ফেরেনি। সেই ফাঁকে মালবিকা পা টিপে বেরিয়ে পড়েছে।

কিরীটী এত রাতে সদরে সামান্য ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। বৃন্দাবনের কথা ভাবতে ভাবতে আসছিল। বাবা কি শেষে সাধু হয়ে গেল ? হয়তো আমরা

মরে হেজে যাবো। কোন চিহ্নই থাকবে না আমাদের। তখন—আজ থেকে চাই কি আরও পরে—অনেক পরে—আড়াইশো বছরের মাথায় বাবা মহাযোগী হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন। তখন হয়তো সাধক চরিতমালায় লেখা হবে—যোগীবর বৃন্দাবনের পূর্বাশ্রমে একটি পুত্রসন্তান ছিল। তার নাম কিরীটী পালিত। তার নিবাস ছিল আদিগঙ্গার তীরে। গৃহী কিরীটী সম্পর্কে এর বেশি কিছু আর জানা যায়নি।

এসব ভাবতে ভাবতেই কিরীটী দোতলায় উঠলো বলে খেয়ালই হলো না—সদরের দরজাটা এত রাতেও আধো-ভেজানো ছিলো কেন?

ঠিক এই সময় দুই প্রাণী নিউ রোডে মাল্টিস্টোরিড্ বিল্ডিংয়ের বারোতলার ছাদে—বিশাল জলের ট্যাঙ্কের নিচে অন্ধকারে বসে। রবি আর মালবিকা।

আমি আর এভাবে আসতে পারবো না রবি। পুলিস আজকাল আমার ওপর নজর রাখছে।

আমি কিন্তু রাত দশটা থেকে এই অন্ধকারে লুকিয়ে আছি তোমার জন্যে—

লুকিয়ে থাকো কেন? ধরা দাও। যদি না ধরে থাকো—নিশ্চয় ছাড়া পাবে একদিন।

অন্ধকারে যে হাসিটা রবি নিঃশব্দে হাসলো—তার নাম উপন্যাসে থাকে—দুঃখের হাসি। রবি আস্তে বললো, এখন কোন বিচার আছে নাকি!

আইন নিজের হাতে নিলে তো এমন অবস্থাই হবে রবি।

তুমি আমাদের অবস্থাটা কোনদিন বুঝতে চাওনি।

কি করে বুঝবো বলো। চোখের সামনে দেখছি—অর্ডিনারি মানুষ তোমাদের ছুরিতে, বোমায় মারা যাচ্ছে। পুলিসও অন্যায়ভাবে বদলা নিচ্ছে। এই খেয়ো-খেয়ি-খুনোখুনির পলিটিকসের শেষ কোথায় আমি তা জানি না। আমার দম আটকে আসে রবি। আমার দৌড়োনো বন্ধ। বেঙ্গল টিমে এবার নামই দিইনি।

বড় কাজে কিছু সাধারণ লোক সব সময়েই বলি হয়।

এটা কোন যুক্তি নয়। তোমরা সাধারণ মানুষকে তোমাদের মুভমেণ্টের সঙ্গী করতে পারোনি। তোমাদের দেখে সাধারণ মানুষ ভয় পায়।

আমাদের লিডারশিপ সেজন্যে হয়তো তৈরি ছিলো না। সোস্যাল কণ্ডিশন এখনো আমাদের চিন্তাধারার উপযোগী হয়নি।

অন্যের দোষ ধরা ভালো নয় রবি। আমি মেয়ে হতে পারি—কিন্তু দুর্বল নই। তোমাকে স্পষ্ট কথাই বলবো আমি।

তা বলো। কিন্তু আমাদের অ্যাটেম্প্টকে ছোট কোরো না। কত হাজার

হাজার ছেলে গাঁয়ে পড়ে আছে।

থাকতে পারে। কিন্তু গাঁয়ের সঙ্গে তাদের কোন যোগ নেই। শহরের সঙ্গেও কোন যোগ নেই। তোমরা একজন পুলিসকে খুন করলে—সেখানে পাঁচ-জন পুলিস এসে হাজির হলো। তোমরা যা ভেবেছিলে—ঠিক তার উল্টো ঘটেছে। এ শুধু শক্তিক্ষয়। এ শুধু অপচয়। সেমসাইড্ খেলা চলছে। যাদের ওয়াক ওভার পাওয়ার তারা পেয়ে যাচ্ছে। অনবরত গোল করছে।

বাঃ! সুন্দর বলেছো তো মালবিকা।

কোন্ সোসাইটিতে খুন করে বলা যায়—বুঝতে পারিনি। তারপর খুনের শাস্তি থেকে রেহাই পাওয়া যায়?

ওভাবে বলছো কেন মালবিকা?

খুন তো দূরের কথা—স্বাভাবিক মৃত্যুই আমরা ভুলতে পারি না। খোকনদার বউ মারা গেল হাসপাতালে। তাঁর স্মৃতি তো আমরা ভুলতে পারিনি। খুন করে সব কিছু থেকে পার পাওয়া যায়—কিন্তু খুন করার স্মৃতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় রবি?

রবি কোন জবাব না দিয়ে দু হাতে মালবিকার গলা টিপে ধরলো।

মালবিকা কোন বাধা দিলো না। রবির হাতে এক সময় দু ফোঁটা গরম চোখের জল পড়লো। রবি হাত আলগা দিয়ে সরিয়ে নিলো। ঠাট্টা করছিলাম মালবিকা। তুমি কাঁদছো?

তখুনি কোন কথা বললো না মালবিকা। একটু পরে বললো। ধরা গলায়। আমি আজকাল আর কাঁদি না রবি। কেঁদে কোন লাভ নেই। আমার এতদিন-কার অ্যাথেলেটের জীবন শেষ হয়ে গেল। তবু আমি কাঁদিনি।

একটু আগে কাঁদছিলে তুমি।

কাঁদিনি। গলায় ব্যথা লাগছিল বলে—দম বন্ধ হয়ে গিয়ে চোখে জল এসে গিয়েছিলো। ওকে কান্না বলে না। আমার শরীরও তো রক্ত-মাংসের।

তুমি এত কঠিন কেন? আমি বুঝতে পারি না মালবিকা—

আমার পেটে এখন তোমার বাচ্চা—

কি?

হ্যাঁ। আমি মা হবো।

ডাক্তার দেখিয়েছিলে?

হ্যাঁ। বললেন—দেরি হয়ে গেছে। অ্যাবরশনের আর টাইম নেই। এখন যা করবার তা তুমি করো। আমায় মেরে ফেল। কিংবা বিয়ে করো।

বিয়ে করে থাকবো কোথায় আমরা ? পুলিস খুঁজে বেড়াচ্ছে আমায়—

তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবো। এ চেহারা নিয়ে আর কদিন পরে আমি কারও সামনে চোখ তুলে তাকাতে পারবো না। এমন ঘোরালো চোখে কদিন ধরে আমায় দেখছে—কি বলবো। পরশু সন্ধ্যেবেলা কলতলায় বমি করে ফেলেছি। মাথা ঘোরে সব সময়—

একটু সামলে নিয়ে থাকো না কোথাও।

কোথায় যাবো আমি ? এ মুখ কাকে দেখাবো ? তোমাদের মুক্তাঞ্চলে আমায় নিয়ে চলো রবি। সেখানে নতুন সমাজ—

রাত দুটো আড়াইটে হবে। ভীষণ শীত আর কুয়াশা। কিছু গ্রাহ্য না করে জলের ট্যাঙ্কের নিচে অন্ধকারে রবি একদম পাগলের হাসি হেসে উঠলো হো হো করে। মুক্তাঞ্চল ! সে জায়গার কথা আমিও শুনেছি মালবিকা। কিন্তু আজও তার সন্ধান পাইনি। বুলেটিনে পড়েছি। কিন্তু আমার চেনাজানা কেউ আজও মুক্তাঞ্চল দেখেনি। তারা শুধু শুনেই এসেছে। কোথায় যে মুক্তাঞ্চল তা কেউ জানে না মালবিকা—

তাহলে ? তাহলে আমি যাবো কোথায় ? আমি আজ থেকে—এখন থেকে —তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবো। আমি তোমার স্ত্রী।

কি পাগলের মত বলছো ? শরীরের এ অবস্থায় তুমি আমার সঙ্গে জায়গা বদলে বদলে থাকবে কি করে ? তার চেয়ে চলো—আমি তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি। আজকের রাতটা নিজেদের বাড়িতেই থাকো।

পৌঁছে দেবার কোন দরকার নেই রবি। বলেই টকাস করে উঠে দাঁড়ালো মালবিকা। এখনো তেমন শরীর খারাপ হয়নি। আমি একাই যেতে পারবো।

বারো

এই কোল ইণ্ডিয়ার অফিসেই দিলীপ এক সময় বিনা লিফ্‌টে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠেছে। তখন তার বয়স কম ছিল। যেবারে দুই ইউনিয়নে রেষা-রেষি স্ট্রাইক নিয়ে তুললো উনষাট দিনে—সেবারও দিলীপ, ঋষি অফিসের মেঝেতে বিছানা পেতে বেশি রাত অব্দি কাজ করেছে। শুয়েছে সেখানেই। তখনকার টিম-লিডার ছিলো অনাথ চক্কোত্তি।

অফিসের বাইরে এত গোলমাল—স্লোগান—ভেতরে বসে অ্যাকাউণ্টসের সামান্য ক'জনের টিম হিসেবপত্র পুরোদস্তুর আপটুডেট রেখেছিল। রেখেছিল

ট্রেনের সঙ্গে যোগাযোগ। কয়লা চলাচলের বড় কথা ওয়াগন। সেসব দিনে অনাথ চক্কোত্তি ওরই ভেতরে সারাদিন কাজকর্মের পর ফাঁকা ফাঁকা অফিস ঘরে সবাইকে নিয়ে বসতো। তখন অনাথের একটি ফেভারিট খেলা ছিল। সে-খেলায় কোশ্চেন অনাথের একটিই।

সবাইকে সামনাসামনি বসিয়ে তখনকার প্রায়-চল্লিশের অনাথ সরল মুখে জানতে চাইতো, বলতো—এখন আমি কাকে সব চেয়ে ভালোবাসি?

সেটা ছিলো অফিসে অনাথের হাতে মাথা-কাটার পিরিয়ড। দিলীপ নিজে বা তখনকার ঋষি সরল আশ্রম বালকের পোজে অনাথের মুখে তাকিয়ে থেকে অনাথকে বিস্মিত, আনন্দিত, জয়ী বোধ করার সুযোগ দিতো।

অনাথ চক্কোত্তি এই খেলায় তন্ময় হয়ে পকেট থেকে হাত-চিরুনি বের করে সিঁথি থেকে সাবধানে মাথার চুল দু'ভাগ করে দু'দিকে টেনে দিতো। তার নাকের নিচে যুদ্ধের সমবয়সী যুবকদের যৌবনের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সর্বদাই ডান-কাটা একটি গোঁফের চিহ্ন থাকতো। না বাটারফ্লাই, না ভোজপুরী।

এই ভালোবাসাবাসির খেলায় কোথায় রক্তের একটা চোরা ফিনিক ছিলো। কখনো কুচকুচ করে তা বুকের ভেতর খুঁচিয়ে দিতো খানিক। দুদিন পরে দিলীপ নিজেই দেখেছে—সেখানে পুরনো ক্ষতের কালো রক্ত গড়িয়ে নেমে এসে কালচে রং নিয়ে থমকে থেমে আছে।

কে না নিজেকে ভালোবাসে। কিন্তু অনাথ চক্কোত্তির এই ভালোবাসার বাড়াবাড়ি সবারই চোখে পড়তো। নিজের টেবিলের কাঁচে ছায়া দেখে অনাথ তার বুকের বোতাম আটকাতো। মাথা আঁচড়াতো। একবার একটি দাঁত তুলে কী মনোকষ্ট অনাথের। কষের দাঁত। নেহরু তখনো বেঁচে। যেবারে চল্লিশ টপকে অনাথ রিডিং গ্লাস পড়তে বাধ্য হলো—সেবার গোড়ায় গোড়ায় অনাথ চশমাকে মুখশ্রীর সহযোগী অলংকার হিসেবেই ট্রিট করছিলো। কদিন পরে নাকের দুধারে চশমার চাপের কালো দাগ আবিষ্কার করে অনাথ তো নিজের অফিস-ঘরে শোক-সভা বসিয়ে দিলো। চশমা কয় প্রকারের তা নিয়ে অনাথ প্রায় ঘণ্টা তিনেকের সেমিনার করেছিলো। অনাথের শরীরে অন্য কোথাও আরেকটা এক্সট্রা জিহ্বা থাকলে সে অনায়াসে তার নিজের গা চাটতে পারতো। তার ডিকসেনারিতে শরীরের আরেক নাম ছিলো—ভালোবাসা। ছিলো ভাবছি কেন! এখনো তো তাই।

ঋষির গাড়ির পেছনের সিটে বসে দিলীপ কলকাতার একটা দামী রাস্তা পার হচ্ছিলো। পাশে লাবণ্য। স্টিয়ারিংয়ে ঋষির ড্রাইভার। একটু আগে জমাট

আড্ডা থেকে ওঠার আগে ঋষিই বলেছিলো—তুই তো গাড়ি আনিসনি দিলীপ। তোকে নামিয়ে দিয়ে লাবণ্য বাড়ি ফিরে যাক।

আজ অর্ডিনান্স ক্লাবের মাঠে জমাট আড্ডা ছিলো। সন্ধ্যেরাতে গঙ্গার হাওয়া। সেই সঙ্গে শুকনো খাবার। হালকা চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে নরম ১১৯—না কী একটা নম্বরের। গলা দিয়ে নামছে—টেরই পাওয়া যায় না। মীরা আজ চুল কার্ল করিয়ে এসেছিলো। কলকাতার কোন্ ক্লাবে অনন্তর ক্লায়েণ্ট নেই!

গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকানো অবস্থায় লাবণ্য বললো, অনন্ত আমার কাছে এক রহস্য।

দিলীপ সঙ্গে সঙ্গে এ-কথার মানে বুঝলো। বুঝেও চুপ করে থাকলো। তার চোখের সামনে সব আড্ডার সেই একটা ছবিই ঝুলতে থাকলো। অনন্ত মীরার দিকে তাকিয়ে বলছে—বেচারা! আর মীরা ম্না—উ—আ—বলতে বলতে ঋষির গা ঘেঁষে বসলো। হাতে ছিপি-খোলা বিয়ার। ঋষি পাঁচ পেগের পর তার নিজের লালচে হয়ে ওঠা নাকটা মীরার কানচুলে ঘষলো। হাসতে হাসতে অনন্তর দু'চোখের কোণ দুটো কুঁচকে গেছে। হাসিতে প্রশ্রয়। স্নেহ। আহা রে! আহা রে। ভাব—

তোমার মনে আছে লাবণ্য—ঋষি একদিন তোমায় চুমু খাওয়ার পারমিশন দিয়েছিলো।

ওর কথা বাদ দিন। আর আমি তো হ্যাঁ না—কিছুই বলিনি।

লাবণ্যর হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে দিলীপ বললো, বাদ দেব কেন?

ও ওরকমই বলে।

তুমিও তো একদিন একটা অদ্ভুত কথা বলেছিলে ঋষিকে—

কি কথা দিলীপ?

অনেকদিন আগে ঋষির মুখে শুনেছিলাম।

কি কথা?

তুমি নাকি ঋষিকে বলেছিলে—ত্মাখো, তুমি যে মেয়ের কাছেই যাও আমার আপত্তি নেই কোন। কিন্তু একবারের বেশি একজনের কাছে যাবে না।

ওঃ! হ্যাঁ। বলেছিলাম। আপনাকে ও বলেছে?

একবারের বেশি নয় কেন লাবণ্য?

একবারের বেশি গেলে ও আর আমার কাছে ফিরতে পারবে না। সেখানেই মন পড়ে যাবে!

ঠিক এই মুহূর্তে দিলীপের একটা জিনিস মনে পড়ে গেল। বেশ ক'বছর

আগের কথা। তখন একটি পাতলা মত মেয়ে প্রায়ই ঋষির টেবিলে—দিলীপের টেবিলে আসতো। প্রাইভেট ফাইনান্স কোম্পানির এজেন্ট। অনেকদিন ধরে আসতে আসতে মেয়েটি আশি পয়সার মত ঋষির প্রেমে পড়েছিলো। তার দশ পয়সা প্রেম ছিলো দিলীপের জন্য। বাকি দশ পয়সা ব্ল্যাঙ্ক যাচ্ছিলো। ঋষির খোঁজে এসে ঋষিকে না পেলে মেয়েটি এসে দিলীপের টেবিলে বসতো। দিলীপ ক্যান্টিন থেকে ভালো চা আনাতো। সঙ্গে মাছের চপ। টেবিলের তলায় পা দিয়ে মেয়েটির পায়ের আঙুলে পা ঘষতো। মেয়েটি আলতো করে হেসে বলতো, কি হচ্ছে ? এই বুঝি করেন আপনারা অফিসে বসে !

তখন দিলীপের স্টক গিয়ে দাঁড়াতো প্রায় তিরিশ পয়সা। অবিশ্যি ঋষির অ্যাবসেন্সে। ঋষি ফিরে এলেই আবার তা দশ পয়সায় নেমে যেতো। ব্ল্যাঙ্ক থাকতো দশ। আর ঋষির জন্যে আশি। মোটামুটি এই ছিলো হিসেব।

তখন একদিন ময়দানের কাছে একটা বারে ওরা তিনজন সন্ধ্যেবেলা বসেছিলো। ওপেন এয়ার বার। বেতের চেয়ার, ঘাসের লন। মাথায় পেখম তোলা ওয়েটার। মাত্র তিন পেগের পর মেয়েটি উতলা হয়ে উঠলো। তাকে শ্যামবাজারে পৌঁছে দিতে গিয়ে ট্যাক্সি নিল ঋষি আর দিলীপ।

তারপর—সেই ট্যাক্সি একটি চলন্ত নিভৃতি।

ময়দানের গা দিয়ে ট্যাক্সিটা শ্যামবাজার রওনা হয়। এয়ারলাইনস্ অফিস অব্দি গিয়ে আবার ফিরে আসে। আবার রওনা হয়। এরকম এলোপাথাড়ি প্যাসেঞ্জার অনেকদিন পায়নি ট্যাক্সিওয়ালা। তারও মজা লাগছিল।

তখন ব্যাকসিটে মেয়েটি মাঝখানে বসে একবার ঋষির চুমু খাচ্ছিলো। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দিলীপের। সে নিজেও এই দুই পুরুষের সঙ্গে যোগ দিচ্ছিল।

শেষমেশ ওকে পৌঁছে দিয়ে দুজনে যখন এসপ্ল্যানেডে নামলো, তখন ঋষি বলেছিলো, এমন বন্ধু পাবি তুই ! প্রেমিকা পর্যন্ত তোর সঙ্গে ভাগ করে নিলাম।

দিলীপের এখন মনে হচ্ছিলো, আমি তো সেই বিশ্বাসেই ঋষি খাদান করতে নেমেছিলাম।

মুখে যে-কথা বলতে—ঘটনায় ঘটতে যা সময় লাগে—মনে তা কয়েক সেকেণ্ডেই হয়ে যায়। দিলীপ অন্যমনস্ক লাবণ্যকে বললো, আমার কাছেও অনন্ত এক রহস্য।

এ কথাতেও লাবণ্য চুপ করে থাকলো। কী যেন ভাবছিলো।

দিলীপ বললো, সেদিন কেন, তোমায় চুমু খাইনি বল তো ?

কোন্‌দিন ?

সামনের সিটে ঋষি আর ড্রাইভার। পেছনে আমি আর তুমি। রাত একটা

হবে। কোত্থেকে যেন ফিরছিলাম আমরা—অনেকটা খাওয়ার পর—

আমার তো মনে পড়ছে না। বলেই লাবণ্য হেসে ফেললো। দোহাই! এখন যেন চুমুটুমু খেতে চাইবেন না। যে পারমিশন দিয়েছিলো—সে তো এখন নেই এখানে।

না না। সেরকম ইচ্ছেও নেই আমার লাবণ্য।

লাবণ্যর মুখটা যতই উজ্জ্বল হয়েছিলো—ততটাই ম্লান হয়ে গেল।

সেদিন চুমু খাইনি—কারণ গোড়াতেই যদি ব্যাড আইডিয়া হয়ে যায়—

কী ভুল বকছেন আপনি!

একদম ভুল নয় লাবণ্য।

যা একদম ঘটেইনি—তার আবার শুরুই বা কিসের—শেষই বা কিসের! বলুন দিলীপ—

আমি বলতে চাইছিলাম লাবণ্য—একদম অর্ডিনারি একটা কথা।

লাবণ্য অবাক হয়ে তাকালো। থেমে থাকা রাস্তার আলো মাঝে মাঝে সে মুখে ফোকাস ফেলছিলো। গাড়ির ভেতরে অন্ধকার। কি কথা দিলীপ?

আমি সেদিন অনেকটা খেয়েছিলাম। মুখে হয়তো খারাপ গন্ধ ছিলো। একদম গোড়াতেই যদি তোমার মনে ব্যাড আইডিয়া হয়ে যায়—

আপনি কি পাগল দিলীপ! রাণীর বেলায় এসব মনে থাকে আপনার?

কোন জবাব দিলো না দিলীপ। এইতো এসে গেছি। এই মোড়ে নামিয়ে দিলেই চলবে।

না। তা কেন? আপনার বাড়ির সামনেই নামবেন। রাণীর বেলায় এসব মনে থাকে আপনার?

হয়তো থাকতো আগে। কোন এক সময়। তোমাকে লাবণ্য এক-একদিন এত অন্যরকম লাগে।

খবরদার। প্রেমে পড়ার পারমিশন দিইনি কিন্তু।

তবু এক-একদিন এত অন্যরকম লাগে—

আমি খুব অর্ডিনারি দিলীপ।

ড্রাইভার গাড়ি থামালো।

বাড়ি ফিরে ভালো লাগলো না দিলীপের। রবির ঘরটা আবার তছনছ। কুটু বেরিয়ে এসে বললো, আজ বিকেলে আবার পুলিস এসেছিলো। দাদা নাকি কোন্ সুদখোরকে খুন করেছে—

করে থাকলে তার ফল ও ভোগ করুক।

রাণী একমনে হাত-কলে সেলাই করছিল। কোন কথা বললো না।

তোমরা এখনো খাওনি ?

তুমি এলে একসঙ্গে বসবো ভেবেছিলাম।

খিদে ছিলো না কোন। তবু দিলীপ টেবিলে গিয়ে বসলো।

কুটু আগে উঠে গেল। ওর খেতে বিশেষ সময় লাগে না। তখন দিলীপের মুখোমুখি রাণী ঠাণ্ডা গলায় বললো, আজ বিকেলে পুলিস এসে চলে যাওয়ার পর একটি মেয়ে এসেছিলো।

পুলিস আসে। আসবে। কিন্তু মেয়ে ? আমার তো কোন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় নেই। এসব কথা ভেবে নিয়ে দিলীপ বললো আমি তো কোন মেয়েকে চিনি না। আর এ-বয়সে নিশ্চয় কোন মহিলা খোঁজ করতে পারেন। তাও তো কোন মহিলার মুখ মনে পড়ছে না রাণী।

মহিলা নয়। মেয়ে—

আমি তো কাউকে চিনি না। বলেও একবার ভয় হলো দিলীপের। সেই যে বীরপাড়া-শিলিগুড়ির বাসে উঠে পড়েছিলাম—তারপর আর দেখা হয়নি স্বাতীর সঙ্গে। ইদানীং সব ব্যাপারে কেন জানি মনে হয়—আমার মুখের ওপর হেরে যাওয়ার একটা সর পড়েছে। অন্যে দেখতে পায় না। আমি হাত দিয়ে মুখ ডললেই ক্রিমের মত উঠে আসে হাতে। এ যেন অনেকটা স্বাতীর গাদ। খাদানের গাদ। কোল ইণ্ডিয়ার গাদ। স্বাতী খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হয়নি তো। কিন্তু তারও তো আসার কথা নয়।

তোমার চেনার কথা নয়। তোমার ছেলে চেনে।

সোজা হয়ে বসলো দিলীপ। কি ব্যাপার ?

মেয়েটি থাকতে এসেছিলো।

থাকতে ?

হ্যাঁ। সে রবির বউ।

বউ ? বিয়েটা করলো কবে ? একুশ হয়েছে রবির ? বয়স তো মনে নেই আমার—

বিয়ে হয়নি। রবির বাচ্চা মেয়েটির পেটে।

রবির ? হতেই পারে না রাণী। ছাখো হয়তো চাপ দিয়ে আদায় করতে চায় কিছু। কিংবা পুলিসের কোন নতুন ফন্দি। পুলিসের গুণের কোন শেষ নেই।

না। কিচ্ছু চায়নি মেয়েটি। শুধু থাকতে চায়। ও চেহারা নিয়ে সে তার বাপ-মা-ভাইয়ের সামনে আর কিছুদিন পরে বেরোতে পারবে না। একথা কোন্

অবস্থা হলে মেয়েরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে বলতে আসে জানো? তার ওপর পুলিস তার পেছনে ঘুরছে। রবির লোভে লোভে। কোন্‌দিন না থানায় ধরে নিয়ে যায় জেরা করতে।

সেই গেছো মেয়েটা! ও সব পারে রাণী। রবিকে ও-ই এমন করেছিলো।

চাপা গলায় রাণী ধমকে উঠলো, বাজে বোকো না। অত্যন্ত ভালো মেয়ে। তোমার ছেলেই তো দায়ী।

দু'জনের পাতেই তখনো অনেক কিছু পড়ে। কেউ কাউকে খেতে বলতে পারলো না।

আমাদের প্রথম ছেলে রাণী। প্রথম সন্তান। রবি এভাবে আমার জীবনটা নষ্ট করে দিলো!

রাণী পরিষ্কার গলায় বললো, আমি রবির বউকে নিয়ে আসবো।

বউ! আর বলতে পারলো না দিলীপ। তার মুখ প্রায় ভেংচে উঠেছিলো। রাণী সেদিকে তাকাতে পারছিলো না। সে সোজা বেসিনে উঠে গেল।

কুটু নিশ্চয় বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্টার ডাস্ট পড়ছে এখন। মোজাইক-করা তিনটে ঘর। বড় লিভিং রুম। জোড়া বাথরুম। দক্ষিণমুখো ব্যালকনি। বড় কিচেন। নিচে বেসমেণ্টে গ্যারেজ। বাড়িটা তৈরি হওয়ার সময় রবি স্কুলে পড়তো। রবি, কুটুকে সঙ্গে নিয়ে রাণী আর দিলীপ বাড়ি দেখতে আসতো। এখন সে-বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে।

রবিকে পুলিস মেরে ফেলেনি তো! ফেলতেও পারে। বারাসত কিংবা চন্দন-নগরের ডেডবডিগুলোর নাম ছাপা হয়নি কাগজে। দিলীপও কোথাও আইডেন্টি-ফাই করতে যায়নি। কি দরকার! শেষে যদি রবির মরা মুখ দেখতে হয়। তার চেয়ে এই যে দেখা হচ্ছে না—দূরে দূরে থাকে—সেও অনেক ভালো। চিরকাল কি দেশের এ-অবস্থা থাকতে পারে। নিশ্চয় পাল্টাবে। তখন আবার রবির সঙ্গে আমার দেখা হবে। কুটু একবার বলেছিলো, জানো বাবা—দাদা দাড়ি রাখছে—পুরো গজালে একদম সৌমিত্র লাগবে। কোন্ ছবিতে যেন দাড়ি রেখেছিলো সৌমিত্র।

বেসিনে মুখ ধুয়ে এসে ঝুলবারান্দায় দাঁড়ালো দিলীপ। একটা জিনিস মনে পড়তেই এ-অবস্থাতেও একা একা হেসে ফেললো। কয়েক বছর আগে কুটু ইতিহাস বইখানা হাতে নিয়ে বলেছিলো, বিপিন পাল, লালা লাজপৎ রায়—ওদের খুব পছন্দ তার।

কারণ খুব সাধারণ। ফেল্ট্ পেন দিয়ে দাগা বুলিয়ে কুটু ওদের মহারাণী

ভিক্টোরিয়া বানায়। টিপ পরায়। ওয়ারেন হেস্টিংসের কপালটা ফাঁকা বলে ওখানে টিকলি আঁকতে সুবিধে।

সাধন গুপ্তর মেয়ের বিয়ে গেল সেদিন। বেশ কফি দিয়ে। সফ্‌ট্ ড্রিংকস্ দিয়ে। কুটুরও বিয়ের সময় এসে যাচ্ছে। রবি, এ তুই কি করলি? নিজের পায়ে দাঁড়াবি তো আগে। তারপর তো সব আপনা-আপনিই হতো। কোথায় আছিস এখন?

বিড় বিড় করে নিজেই বলে যাচ্ছিলো দিলীপ। যদি একটা টেলিফোনও করতিস। মুখোমুখি হওয়ার দরকার ছিলো না দু'জনের। স্রেফ টেলিফোনে।

কল্পনায় সব শুনতে পাচ্ছিলো দিলীপ।

হ্যালো। বাবা? আমি। আমি রবি—

রবি মরে গেছে। আমি কারও বাবা নই।

আঃ! এই সময় ছেলেমানুষি করছো কেন? আমি শেয়ালদার পাবলিক বুথ থেকে ফোন করছি। চারদিকে পুলিস ঘুরছে। আমাকে দেখা মাত্র গুলি করবে—

আপনি ফোন রেখে দিন। রবি নামে আমি কাউকে চিনি না।

আপনি দিলীপ বসু নন?

হ্যাঁ। আমিই দিলীপ বসু।

কোল ইণ্ডিয়ায় কাজ করেন তো?

হ্যাঁ। আপনার কি দরকার? আপনি ধমকে কথা বলছেন কেন? আপনি কি ইনকাম্‌-ট্যাক্সের লোক?

আঃ! বাবা! আর জ্বালিয়ো না। আজও ড্রিংক করেছো? এখনো ছাড়লে না—সেই দালালি নিয়েই পড়ে আছো? সুখে-শান্তিতে দিন কেটে যাচ্ছে। ড্রিংক্স। পয়সা। পার্টি। গান। রেকর্ডপ্লেয়ার—ফোনেই হু-হু করে কেঁদে উঠলো দিলীপ। তুই ঠিক বলেছিলি রবি। আমি আসলে একটা দালাল। কমিশন এজেন্ট।

রবির গলা পাল্টে গেল। তা কেন বাবা? তুমি কত ইমাজিনেটিভ লোক। মা বলছিলো, তুমি নাকি আজকাল আর খাদানের ক্যাপিটাল যোগাড়ে মাথা ঘামাও না। সত্যি হলে খুবই সুখের কথা।

ফোনের ভেতরে ক্র ক্র আওয়াজ হলো। পুলিস ট্যাপ করছে না তো? একবার ভয় হলো দিলীপের। আবার আনন্দও হলো। আমার রবি এত বুঝদার! গলায় আমার জন্যে কতখানি চিন্তা! ফোনে শুধু বললো, তোর মায়ের

সঙ্গে দেখা হয় তাহলে! তোর মাকে একটু দেখিস।

এরকম সময় চিরকাল থাকতে পারে না বাবা।

সে তো নিশ্চয়। একদিন ভালো দিন আসবেই। কি বলিস রবি?

নাম বোলো না বাবা। নিশ্চয় ভালো দিন আসবে। পুলিস অ্যালার্ট হয়ে যাবে নাম শুনলে।

তোদের মুক্তাঞ্চলের খবর কি রে? কতটা হলো।

হচ্ছে বাবা। অনেকটা হয়েছে।

সেখানে নিশ্চয় রেশনিং নেই! সেদ্ধ চাল পাবো? আজ তিন সপ্তাহ ধরে আতপ চাল দিচ্ছে আমাদের। সব সময় পেটটা ভার হয়ে থাকে রবি।

ভালো দিন আসুক। তখন সব দেখবো বাবা। তখন কড়ায়-ক্রান্তিতে সব জিনিসের হিসেব হবে।

সব জিনিসের? সে তো খুব ভালো কথা। ধর্ রবি—আমরা ভালো-বাসাবাসি—মেশামিশির ভেতর একটা জিনিস করতে এগোলাম। পেছনে না তাকিয়ে পুরোদমে নেমে পড়লাম। তখন পেছনের কথা ভেবে একজন যদি পিছোতে থাকে? আমাকে এক সময় এগোতে বলেও যদি আর এগোতে না দেয়? অথচ তখন আমি তীবে ভেড়াব, নোঙর কেটে দিয়েছি। সে তখন আর এগোতে চায় না। এগোবার ভান করে সে বারগেইনে পেছনে ভালো জায়গা পেলো। সে আসলে গোড়া থেকেই মনে মনে—ভেতরে ভেতরে পেছনে হটছিলো।

আমাদের মুক্তাঞ্চলে সব বিশ্বাসঘাতকতার বিচার হবে বাবা। দেখে নিও তুমি।

সেই লোকটা যে কাউকে শত্রু ভাবতে পারছে না। অথচ তার নোঙর কাটা।

কি হেঁয়ালি করছো বাবা। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

এই নোঙর-কাটা লোকটার এত অভিমান যে—মাথায় সাইনাস হয়ে গেল।

মুক্তাঞ্চলে বড় বড় ডাক্তার থাকবে। ফ্রি চিকিৎসা। সাইনাস তো সেরে যাচ্ছে আজকাল বাবা।

অভিমান?

আমি সিমুরালিতে পালিয়ে আছি। সেখান থেকে এসে তোমায় ফোন করছি বাবা। এখন রসিকতা রাখো। পাবলিক বুথ থেকে লাইন পাওয়া কি কঠিন তুমি জানো না। বাবা! তুমি একজন খাঁটি প্যারানোইয়াক।

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে দিলীপ বললো, ধর্ রবি—আমি কোন বন্ধুকে ভুল পথ থেকে ফেরাতে চাই—সবাইকে নোঙর কেটে নেমে পড়তে পাঠিয়ে দিয়ে

ভেতরে ভেতরে পেছনের টানে সুর বাঁধা যদি কোন বন্ধুর হ্যাবিট হয়—সে বন্ধুর কি চিকিৎসা হবে মুক্তাঞ্চলে ?

এ তো বাবা ক্লিন বিট্রেয়াল। আমরা সব রকমের বিশ্বাসঘাতকতার বদ্‌লা নেব।

তার আগে মালবিকাকে মুক্তাঞ্চলে নিয়ে যা।

রবি একটু তোতলাতে লাগলো। তারপর ধরা গলায় বললো, এখনকার মত তোমরা ম্যানেজ করে দাও বাবা।

তোর বউ যে ছেলের মা হবে। আমরা কি করবো ?

তোমরা একটু ম্যানেজ করে নাও না বাবা। আমি এখন কোথায় সঙ্গে নিয়ে ঘুরবো। কোথায় থাকবো ? কি খাবো ? চালচুলো নেই আমার—

রবি, তুমি আমার জীবনটা একদম নষ্ট করে দিলে। একদম নষ্ট।

স্বপ্ন মিলছে না তো !

আমি অন্য রকম ভেবেছিলাম তোকে নিয়ে।

একটা ভালো খবর দিচ্ছি তোমায়, আমি চাকদহ কলেজ থেকে গোপনে কেমিস্ট্রি অনার্স ফাইনালে বসেছিলাম।

সত্যি ? কখন বসলি ?

সিক্রেটলি। আমি এবার ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছি।

উঃ ! রাণীকে বলি ? সত্যি তো ? কী অসাধ্য সাধন করেছিস তুই—তা তুই নিজেই জানিস নে। পুলিসের তাড়া খেয়ে পালিয়ে থাকতে থাকতে এ রেজাল্ট ভাবাই যায় না।

ঠিক এই সময় দিলীপের মনে কয়েক বছর আগের বাংলা ছবির একজন হিরোর চেহারা ভেসে উঠলো। সে সিনেমায় প্রায়ই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হোত।

তখন রাণী পান দিতে এসে দেখতে পেলো, দিলীপ দশ তলার ব্যালকনির পলকা গ্রিল টপকে ও-পাশে চলে যাচ্ছে। ও-পাশে—মানে, আকাশের ভেতর। একদম ফাঁকা বাতাসে।

করছো কি ? ওগো !—এইটুকু বলেই রাণী ছুটে গিয়ে দু' হাতে দিলীপের কোমর জড়িয়ে ধরলো। তারপর একটানে পুরো মানুষটাকে মেঝেতে পেড়ে ফেললো। কোনদিন রাণী নিজেই জানতো না তার গায়ে এত জোর।

কুটু ততক্ষণে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেছে।

অফিসে বড় সুন্দর সময় যাচ্ছিল দিলীপের। কোল ইণ্ডিয়ায় এক বড়বাবু তো পরিষ্কার কমেণ্ট করেছে—দিলীপ বসুর সোনার বাট আছে। নয়তো অ্যাতো পয়সা

আসে কোত্থেকে ?

এ-সব কথা দিলীপেরও কানে এসেছে। ঋষি তো জানে—শেয়ারের টোপ গেঁথে তুলে যা কমিশন আসে তার একটা বড় ভাগ পি. আর. করতেই চলে যায়। পেট্রল। ড্রিংকস্। ভদ্রতা। আপ্যায়ন। এট্ সেট্রা। এসব না করে গেলে টোপ তো কেউ গাঁথবে না। সারা ব্যাপারটায় এক নম্বর ক্যাজুয়ালটির নাম—দিলীপ বসুর শরীর।

বেশি রাত অব্দি আড্ডা। সেই সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া। ছুতোনাতায় পার্টি। পার্টি মানেই জানাশুনো সেই ক'টি ব্র্যাণ্ডের তরল। সঙ্গে বরফ। জল। সোডা। একই ধরনের শুকনো ভাজাভুজি। তিনটে গলা দিয়ে শরীরে চলে যাওয়ার পর অনিচ্ছাতেও দিলীপের চিবুক অটোমেটিক কাঁপে—থরথর করে। তখন শরীরের ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়।

সেই সঙ্গে টেনশান। হবে—কি হবে না। যদি হয়? যদি না হয়? তাহলে? এ মাসে কি হবে? সেই তুলনায় ঋষি তো ফ্রি। এস্‌ট্যাব্‌লিশমেণ্টের চোখে সুবোধ। অনন্ত ফ্রি। তার জন্যে মক্কেলরা সব জায়গায় আসর সাজিয়ে বসে আছে। সে লোককে যাচাই করে ধার দেয়। সুদ নেয়। ব্যাংকে এই তার কাজ। গোকুলদা ফ্রি, দুধের দাম বেড়েই চলেছে।

টেনশান তো শুধু আমার। শরীর তো শুধু আমার। তাই কমিশানও আমার। কিন্তু প্লাস মাইনাস করলে পড়ে থাকে শুধু শরীরটা। এ শরীরের কোন দাম নেই। নতুন পোল দিয়ে আদিগঙ্গা পাস করার সময় বাতাসে শরীর পোড়ার গন্ধ। কোন কোনদিন বাতাসের সঙ্গে জানলা দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে।

আমার নাকি শরীরে আয়োডিন কম। তাই মোটা হয়ে যাচ্ছি। একবার হরিদা—আমাদের হরি ডাক্তার বলেছিলো—সমুদ্রের কাছাকাছি কিছুদিন গিয়ে থেকে আয়। আয়োডিন যাবে শরীরে। টাটকা মাছ খাবি সমুদ্রের। খুব আয়োডিন থাকে সমুদ্রের মাছে। ওখানকার বাতাসেও তাই।

তার চেয়ে আয়োডিন ইঞ্জেকশন দাও না হরিদা।

সে আয়োডিন শরীর নেবে না। যাও না কিছুদিন গোপালপুর অন সি-তে থেকে এসো।

সব কাজ ফেলে দিয়ে সমুদ্রের পাড়ে গিয়ে বসে থাকবো—এমন অবস্থা আমার নয় হরিদা—

কেন। বেশ তো দু' পয়সা কামাচ্ছো।

শেষে তুমিও বললে হরিদা!

কামালে বলবো না? এ তো আনন্দ করে বলার কথা। রাণী, কুটু, ওদের নিয়ে মাসখানেক কাটিয়ে আয়।

খাদান চলবে?

ঋষি বসে ছিলো তখন উল্টো দিকে। এক সিপ মুখে দিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে ঋষি বলেছিলো, তোর আমার জন্যে পৃথিবী বসে থাকবে না। এ জগতে কেউ ইনডিসপেনসিবল্ নয় দিলীপ।

তাই নাকি?—সামান্য এই কথাটুকু বলতে দিলীপের মুখখানা কালি মেরে গিয়েছিলো। আমি না হলে খাদান বন্ধ হয়ে যাবে—এমন ভাবাটাই আমার বোকামি হয়েছিলো। একথা ভাবতে ভাবতে ভীষণ লজ্জা পাচ্ছিল দিলীপ।

সেখানে তখন সবার কমন ফ্রেণ্ড অসিত ছিল। অসিত সাধারণত দাড়ি রাখতে ভালোবাসে। আবার কেটেও ফেলে। চল্লিশ ক্রস করে গিয়েও সব সময় কাঁধে ঝোলা। প্রায় অকারণে। ঝোলায় থাকে নিউজ স্ট্যাণ্ড থেকে কেনা যে কোন গরম কাগজ। অসিতের মুখে সব সময় আত্মসমালোচনা। হাল্কা সংসার। খরচ কম। বাড়ি ভাড়াও কম। তার ওপর বউ কাজ করে। ফলে অসিত প্রায়ই র‍্যাডিকাল ভাবভঙ্গী করে। কোন অসুবিধা নেই তার। সে পরিষ্কার বললো, তোর কি চিন্তা দিলীপ? তুই তো মাস গেলে তিন হাজার টাকার কমিশন পিটবি।

খরচ নেই কোন?

তা একটু-আধটু তো থাকবেই। সব কাজেরই ঝক্কি আছে।

টেনশান?

কোন্ কাজে নেই? আমার তো সকালে ঘুম ভাঙাটাই একটা টেনশান।

কটায় উঠিস অসিত?

যেদিন যেমন। কেন দিলীপ?

আমার দিন শুরু হয় ভোর সাড়ে চারটেয়। বেলা নটার ভেতর গোটা দশেক টেলিফোন করতে হয়।

তবু তো মোটা কমিশন!

দিলীপ ঋষির দিকে তাকালো। তুই কিছু বলবি না ঋষি?

ঋষি হেসে বললো, না অসিত—তুমি জানো না। এ কাজে যেমন খরচ—তেমনি টেনশান।

এখন দিলীপের মুখে হুইস্কি জে বি ডি-র কালি মনে হতে লাগলো। ডিফারেন্স—এ কালির রং অনেকক্ষণ চেপে রাখা পেচ্ছাবের মত। অম্বল হতে পারে বলে

দিলীপ যতটা সোডা ঢেলেছিল—ততটাই জল মিশিয়ে নিল। বুকপকেটে অ্যান্টা-সিডের পাতা গজ গজ করছিল।

অনাথ চক্কোত্তি একদিন বললো, তুমি এবারে দিলীপ অ্যামব্যাসাডর ফিয়েট ফেলে দিয়ে ইমপোর্টেড গাড়ি চড়ো।

কোথায় পাবো অনাথদা।

ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড। খাদান তো তোমার এনে দেওয়া শেয়ার-ক্যাপিটালেই চলছে।

না না। সবার চেষ্টাতেই চলছে। ও সব বলবেন না দয়া করে।

পয়সা হলে যে বিনয় দরকার—তাও হয়েছে তোমার। এবার চেয়ারম্যানের মত তুমিও এস. টি. সি. থেকে গাড়ি কিনে নাও।

তিনি তো কিনেছেন—কোল ইণ্ডিয়ার অ্যাকাউণ্টে।

তুমি কিনবে নিজের পয়সায়। সেটা তো আরও ভালো ব্যাপার।

আমার বেশ পয়সা—এটা তো ভালো রকম রটেছে দেখছি।

এমন সব নানা তেতো ছবি—টক কথায় মেশানো স্মৃতির ঢিবি ক্রস করে অনেক দিন পরে কাঁটায় কাঁটায় বেলা দশটায় অফিসে এসে ঢুকলো দিলীপ। লিফটম্যান নড্ করে বললো, ভালো আছেন?

ভালো। তুমি?

ভালো। অনেক দিন দেখিনি আপনাকে।

আমি যখন আসি—তখন তোমার সিফ্ট বদলে যায়—

তা হবে স্যার—

টানা চোদ্দ বছর ধরে শেখা এই কাজকর্ম থেকে সে প্রায় দু' বছর হলো গোঁজা-মিল দিয়ে—ঠেকা দিয়ে—দূরে দূরে সরে ছিলো।

অনেকদিন পরে টেবিলে বসে ঋষির কথাটা মনে পড়লো। ঋষি একজন দার্শনিক। এ জগতে কেউ ইনডিসপেনসিবল্ নয়। কারও জন্যে দুনিয়া থেমে থাকে না। আমি এসব কথার মানে জানি ঋষি। আমি অবুঝ নই। শেয়ারের টোপ গেঁথে তোলার চেয়েও আমার কাছে অন্য একটা জিনিস অনেক বড় ছিলো। সন্ধ্যেবেলা—তুই বলবি—দিলীপ একজন মিরাক্যাল ম্যান। দেখেছেন গোকুলদা—স্যার লেজলি উডকে ঠিক গেঁথে তুলেছে। বিশ্বাস কর্ ঋষি—শুধু এই কথাটা তোর মুখ থেকে শুনবার জন্যে—সন্ধ্যেবেলা এই ছুতোয় কয়েকটা ঠকাঠক মেরে দিয়ে—বেচাল হতে এত ভালো লাগে—কি বলবো তোকে। আচমকা ব্লাড প্রেসার বেড়ে যাবে। এক চক্কর নেচে নেব। নাচ তো জানি না আমি। ড্রিংক্স্

তো আমার স্বভাবের জিনিস নয়। তবু খাই। খেলে—বেচাল হওয়া যায়—তাই। সত্যি তাই।

ইণ্টারকমে দিলীপকে ডাকলো অনাথ। তোমায় তো ভাই দিল্লীতে যেতে হচ্ছে ক'দিনের জন্যে—

কি অ্যাসাইনমেণ্ট বলুন না।

পার্লামেণ্টারি কমিটির সামনে কোল ইণ্ডিয়ার হয়ে সাক্ষী দেবে।

কি ব্যাপারে?

ইস্পাত কারখানাগুলো নালিশ করেছে। কয়লার কোন ঝাড়াই বাছাই হচ্ছে না। সেভেনটিন পারসেণ্টের বেশি অ্যাশ কনটেণ্ট থাকছে। ব্লাস্ট ফারনেস এ কয়লা নেবে না। স্টিল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া কমপ্লেন করেছে।

তা আমাকে কেন? ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।

ভালো বলেছো দিলীপ। সবই তো বোঝো। কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম।

আমার তো অ্যাতো বোঝার কথা নয় অনাথদা। আমি এই টেবিলেই রিটায়ার করতে চাই। কাজ দেবেন—করে দেবো সাধ্যমত। কিন্তু আগ বাড়িয়ে কিছু করবো না আর—

তুমি ছাড়া আর কে যাবে? ভৌমিক খাদানের হয়ে তুমিই তো ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়ার গোবিন্দ স্টিলের সঙ্গে কয়লার ডিল করেছো। যুক্তিগুলো তো সবই তোমার ঠোঁটাগ্রে।

এসব কে বললো? চেয়ারম্যান?

না। চেয়ারম্যান জানবে কোত্থেকে? আমরা—আমি জানি—সাধনবাবুও বলছিলেন।

তা সাধনবাবুই যান না দিল্লি। রাজধানীও ঘুরে দেখে আসবেন।

সাধন গুপ্ত অনেকবার দিল্লি গেছে।

তখনকার দিল্লি তো আর নেই এখন। এখন তুঁদে এম. পি.দের সামনে দাঁড়িয়ে অ্যাশ কনটেণ্টের আপওয়ার্ড ট্রেণ্ড কনভিনসিং করে বোঝাতে হবে। বলতে বলতে কোশ্চেনে কোশ্চেনে গা দিয়ে ঘাম ঝরবে। চাই কি জেরায় পড়ে খানিক কবুল করে—খানিক টোটালি ডিনাই করে—কেসটা তো উদ্ধার করতে হবে।

এই তো। সবই তো তুমি জানো দেখছি। তুমিই ঘুরে এসো।

আমি যাবো না।

তোমাকে যেতেই হবে দিলীপ। তোমাকেই আমরা পাঠাবো। তোমার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। কোল ইণ্ডিয়ার সবচেয়ে বড় মক্কেল রেল।

তার পরেই স্টিল। সে অর্ডার ক্যানসেল হয়ে গেলে দরকারে গভর্মেন্ট কোল্ ইমপোর্ট করবে। আমাদের তিন বছরের চুক্তিও বাতিল হয়ে যাবে।

তাতে আমার কি? আমি তো চুনোপুঁটি।

তোমারও আসে যাবে ভাই। অতটা কোল ইমপোর্ট করতে হলে প্রাইম মিনিস্টারের নজরেও পড়বে খানিকটা।

তাতে আমার কি?

রাঁচিতে হেড কোয়ার্টার তুলে নিয়ে যাওয়া কিছুতেই আটকানো যাবে না।

রাঁচি কেন? জাহান্নামেও হেড কোয়ার্টার গেলে আমার কিছু যায় আসে না।

তোমার ফ্যামিলি? ফ্ল্যাট? এস্টাব্লিসমেণ্ট? মনে রেখো দিলীপ— তুমি হেড কোয়ার্টার স্টাফ। সদর রাঁচিতে গেলে তোমাকেও যেতে হবে।

রাঁচি, জাহান্নাম, দিল্লি, জলন্ধর সবই এখন আমার কাছে সমান।

এই তো গুডবয়ের মত কথা বলছো। তাহলে দিল্লি ঘুরে এসো। ক'দিনের মামলা!

অনাথ চক্কোত্তি যে তার এ কথার এই মানে করার সুযোগ নেবে—তা ভাবতেও পারেনি দিলীপ। সে ঘাড় বেঁকিয়ে বললো, আমি কিছুতেই দিল্লি যাচ্ছি নে—

তোমাকে যেতেই হবে।

এটা কি অর্ডার?

আমি কি তোমায় অর্ডার দিতে পারি নে?

নিশ্চয় পারেন। তবে এটা নিয়ে জেদ করবেন না। আমি দিল্লি যাবো না এখন।

পার্লামেণ্টারি কমিটি সামোন করলে তুমি না করতে পারতে?

তা পারতুম না। কিন্তু—

কোন কিন্তু নেই। তুমি ঘুরে এসো। ভালো কথা দিলীপ—একবার আমার ঘরে ঘুরে যাও। এক কাপ কফি খেয়ে যেও।

অনাথের ঘরে ঢুকে, দিলীপ দেখলো, প্রবল আলোচনা চলছে। বিষয়: কোল এবং ওয়াগান। সেই সঙ্গে আইডেল ওয়াগান ইণ্ডাস্ট্রি।

ঋষি আছে। আছে আরও দু-তিনজন। একদম বড় ইঞ্জিনেয়ারটায় সাধন গুপ্ত শুয়ে। কোল ইণ্ডিয়ার পয়সায়—এয়ারকুলার ঘর ঠাণ্ডা রেখেছে।

এসব হাই লেভেল ডিসকাসনে দিলীপ সাধারণত থাকে না। থেকে কোন লাভ নেই। এসব তার কাছে স্রেফ কাইট ফ্লাইং। কি হবে আলোচনা করে।

সাধন গুপ্ত এক্সপার্টের গলায় কথা বলে যাচ্ছিল। অল্প কিছুদিন হলো—কোল ইণ্ডিয়ায় অনেকগুলো জিনিস চালু হয়েছে। যেমন—যার যা অর্ডার—তা সময় মত পিটসাইড্ থেকে বের করে দিতে পারলে ট্রান্সপোর্ট এজেন্টরাই এসে ব্যাজ দিয়ে যাবে। ব্যাজ মানে—মোট সাপ্লাইয়ের টাকার একটা পারসেন্টেজ। সেটা খুব কম হবার কথা নয়।

সেই ব্যাজকে অফিসের ভাষায় বলা হয় পাগলা বোনাস। এই আচমকা পাগলা বোনাস সাধনকে আয়েসী করে তুলেছে। এই বয়সে তার পায়ের সোয়েড নিউকাটের হিল উঁচু হয়েছে। ব্যাণ্ড সুদ্ধ হাতঘড়িটা পুরো সোনার। দিলীপকে দেখে সাধন গুপ্ত সামান্য উঠে হেসে বললো, কী দিলীপ, কেমন আ-আ-আছো!

আছি। সাধনদা।

আবার একটা হইচই লাগাও সবাই মিলে। সেবারে খুব আনন্দ হয়েছিলো।

কোন্‌বার?

কেন? যেবারে আমরা সবাই মিলে পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ায় ভৌমিক ট্রাস্টের বাংলোয় গেলাম। কত খাওয়াদাওয়া। ফুর্তি। অনন্ত। গোকুল। তুমি-- ঋষি—সবাই—

সে তো দু'বছর হতে চললো।

দেখতে দেখতে কেটে গেল। খাদান চলছে কেমন?

ঋষিকে জিজ্ঞাসা করুন।

ঋষি বললো, চলছে। ভালোই চলছে। আমরা তো আর বিরাট ইন্সটি-টিউশন হতে চাইনি। একটা ছোটমোটো খাদান যেমন চলে—তেমন চলছে।

দাঁড়িয়ে গেছে বলো।

ঋষি বললো, হ্যাঁ। তা গেছে। সবই দিলীপের জন্যে—

না না সাধনদা। সবাই মিলে। সবাই—। তবে আরও বড় করার স্কোপ ছিল।

সাধন গুপ্ত বললো, আর বড় করে কি হবে দিলীপ? বেশ তো চলছে। তুমি তো আর বিশাল কোম্পানি বানাতে বসোনি।

কেন নয় সাধনদা?

কত ঝামেলা একবার ভেবে ছাখো তো।

আপনারা কি সাবেক কোল কোম্পানীকে বড়ো করেননি?

তা করেছি। তখন বয়সও অল্প ছিলো। এখনকার মত সব কিছু তখনো কঠিন হয়ে যায়নি। কী হবে বড় করে? কার জন্যে করবে? তার চেয়ে এখানে মন দাও। আরেকটু খাটো, বেশি করে। ধৈর্য ধরে থাকো। তোমার রেকগ-

নিশন কে আটকায়। কি বলো ঋষি—

নিশ্চয় সাধনদা।

ঋষির একথায় দিলীপ ভেতরে ভেতরে খাক হয়ে গেল। সে আস্তে বললো, আমি নিজে এখন একটা কানাগলিতে আছি। বেরোবার কিংবা পিছোবার কোন রাস্তায় নেই।

অনাথ চক্কোত্তি অবাক হয়ে জানতে চাইলো, কেন? একথা বলছো কেন দিলীপ?

আমিও জিনিসপত্র বড করে তুলতে আনন্দ পাই অনাথদা। আপনারা স্বীকার করবেন—কোন কিছু গড়ে তোলায় আলাদা একটা আনন্দ আছে। সে আনন্দ এই কবন্ধ কোল ইণ্ডিয়ায় পাবো? এটা তো একটা সরকারী হেড্‌লেস মনস্টার।

সাধন গুপ্ত মুরুব্বির চালে বললো, এ বয়সে আর অ্যাডভেঞ্চারে যেয়ো না দিলীপ।

ঋষি সঙ্গে সঙ্গে বললো, দেখুন তো সাধনদা—একথা দিলীপ যদি একদম বুঝতে চায়—

দিলীপের মাথার ভেতরে ততক্ষণে লরি কাটাইয়ের বড হাম্বর পড়তে শুরু করেছে।

তেরো

মাল্টিস্টোরিড্ বাড়ির উঁচুতলায় দিন আসে আগে আগে। ভোর না হতেই দিলীপ ফোন পেলো। এত সকালে কে আবার? হ্যালো!

আমি স্বাতী বলছি।

এতদিন পরে? কি মনে করে?

কাল থেকে নন্দনকে—আমার ছেলেকে পাচ্ছি নে—

দিলীপের চোখের ঘুম মুছে গেল। শেষ কোথায় দেখা গেছে তাকে?

স্কুলে। আমিই দিয়ে আসি। আমিই নিয়ে আসি। কাল আনতে যেতে একটু দেরি হয়েছিল। গিয়ে দেখি স্কুল গেটে নন্দন নেই। দারোয়ান বললো, কার সঙ্গে চলে গেছে।

স্কুলে তো বলা ছিলো তোমার—কে নিয়ে যেতে পারে ওকে। তাই না!

ছিলো। বলে স্বাতী কান্নায় নিজের গলা বুঝিয়ে দিলো। আমি কিছু বুঝতে পারছি নে—

কোত্থেকে কথা বলছো স্বাতী?

আমার ফ্ল্যাট থেকে।

সেটা কোথায় বলবে তো!

ঠিকানা বলবো না দিলীপ। আমি তো নন্দনকে নিয়ে লুকিয়ে আছি এখানে।

তাহলে আমায় ফোন করলে কেন?

ওপাশ থেকে তখুনি স্বাতীর গলা ফুটে উঠলো না। খানিক পজ। তারপর: করে ফেলেছি।

দিলীপের একসঙ্গে অনেক কিছু মনে হচ্ছিল। নারী একটি স্বার্থপর জিনিস। আহা! ওরা বড় নিরুপায়। একই সঙ্গে বোকা, স্বার্থপর ও নিরুপায়।

তোমার ছেলে নিশ্চয় চেনাশোনা কারও সঙ্গে গেছে।

সেটাই তো আমার ভয়।

ওঃ। তাহলে চিন্তার কিছু নেই স্বাতী। খোঁজ নিয়ে ছাখো—ওর বাবা এসে নিয়ে গেছে ওকে—

সেটাই তো আমার আশঙ্কা।

বাঃ! ছেলের ওপর বাবার অধিকার তো থাকবেই।

আমি স্বীকার করি না। নন্দনকে ও পরিবেশে রাখলে ও কিছুতেই মানুষ হবে না। ওকে এবার আমি আসানসোলের হস্টেলে নিয়ে দেব।

তাহলে তো ট্যাঁশ তৈরি হবে। তুমি সেই কোন্ কনভেন্টের কথা বলেছিলে।

ট্যাঁশ কেন? ইংরিজি শিখবে।

হ্যাঁ। যৌবনে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে অফিসার হবে। গলায় টাই। কথাবার্তায় অনর্গল ইংরেজির চচ্চড়ি থাকবে। সে এক ভারি ইণ্টারেস্টিং জিনিস হবে কিন্তু।

ঠিক এই সময় লাইনটা কড় কড় শব্দ তুলে আপনাআপনি কেটে গেল। পৃথিবীর নিজের একটা মজা আছে। এখানে একই সঙ্গে নানা জায়গায় অনবরত নানারকম কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। খোলা চোখে মনে হবে একটার সঙ্গে আরেকটার কোন যোগ নেই। যে এইসব টুকরো মনে মনে জুড়তে পারে—কিংবা এইসব অবিরাম কাণ্ডকারখানার ভেতর একটা যোগ দেখতে পায়—সে-ই শুধু এই পৃথিবীর মজা বোঝে—এই পৃথিবীর মানে বোঝে। বলা যায়—সে-ই শুধু এই পৃথিবীর ভেতর আরেকটা পৃথিবী দেখতে পায়। দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড দেখার চোখ ব্রহ্মার ছিল। তিনি কবি ছিলেন।

সেই তুলনায় দিলীপ বসু একজন পাকা দালাল মাত্র। সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল—লাইন কেটে যাওয়া ফোনে স্বাতী বার বার ডায়াল করে যাচ্ছে। তার

পাশেই এখন রাণী পাতলা মত নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে। গোকুলদার খাটালে, গরু-ঘোষ মন দিয়ে জাবনা খাচ্ছে। তাদের বাঁট টেনে পাকা দোহাল দুধ বের করছে। পৃথিবীর কোন লেভেল ক্রসিংয়ে ঠিক এখুনি হয়তো তিনটে পাখি এসে বসলো। একই সঙ্গে অবিরাম নানা জায়গায় নানা কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে—ছবি হয়ে উঠেই আবার মুছে যাচ্ছে। এইসব ছবি যদি একসঙ্গে সব জুড়ে ফেলা যেতো! তাহলে ঠিক একটা মানে—কিংবা এই পৃথিবী থেকেই আরেকটা পৃথিবী বেরিয়ে আসতো। তার নাম দ্বিতীয় ভুবন। কিন্তু আমি কবি নই। দার্শনিক নই। আমি একজন পাকা দালাল।

পৃথিবীতে এই সময় আরেকজন একটা স্বপ্ন দেখছিল। জায়গার নাম কলকাতা। নিজের চেম্বারে হরি ডাক্তার কাল রাতে কয়েকজন সামান্য জানাশোনা পেশেণ্টের সঙ্গে নানারকমের মদ পর পর খেয়েছিল। একজন পেশেণ্ট মার্চেণ্ট নেভিতে কাজ করে। সে জাহাজ থেকে অনেক ড্রিংক্‌স্ এনেছিলো। সেসব খেয়ে সে যখন নিজের চেয়ারে টলে পড়ে তখন বোধহয় ঘরে আর কেউ ছিল না। সবাই চলে গেছে।

এখন এই ভোরবেলায় হরি ডাক্তার নিজের রিভলভিং চেয়ারে এক কাতে ঝুলে পড়ে ডান হাত ঝুলিয়ে দিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। টেবিলে কয়েকটা খালি বোতল। সোডার ছিপি। মাটির বড় খুরিতে সস্তার মাংসের শুকনো কাবাব। বটলওপেনার। একটা শাদা রংয়ের বড় খাম। তাতে কাল রাতের ঝোলের দাগ।

হরি ডাক্তারের ডায়গনোসিস-কাম-ঘর ঝাড়পোঁছের দুই কিশোর পাশের ল্যাব-এ অঘোরে ঘুমোচ্ছিল মেঝেতে। ওদেরও কাল রাতে অনেকবার সোডা কিনতে যেতে হয়েছে।

হরি ডাক্তার কাল অনেকবার ভেবেছিলো, বাড়ি ফিরবো। বাড়ি ফিরবো। আজ নিশ্চয়ই সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরবো। কিন্তু রাত নটায় মার্চেণ্ট নেভির ছেলেটা এসে সব বানচাল করে দিলো।

নয়তো হরি সারাদিন অন্যরকম ভেবেছিলো।

ক'দিন ধরেই সে হিসেব কষে দেখছিলো। আমি এখন বাহান্ন। আমার শরীরটা ইস্পাতের তৈরি। ডাক্তারি পড়াতে বাবার মোট তেষট্টি হাজার টাকা খরচ হয়। আমি বিয়ে বাবদে যে-বাড়িটা পাই সেটার দাম—কলকাতার বাইরে হলেও এখনকার বাজারে অন্তত দেড় লাখ। সে-বাড়িতেই আমরা আছি। যশোর রোড দিয়ে যেতে হয়।

সেখানে আমি তিন বছর প্র্যাকটিস করে দারুণ পসার করেছিলাম। তখন বাবা বেঁচে। কিন্তু প্র্যাকটিসে কি লাভ!

কলকাতায় এসে এই চেম্বার করলাম। নামমাত্র চিকিৎসা। তার সঙ্গে রিসার্চ চালানো। ব্লাড নিয়ে। ব্লাডের ওপর বাঙালীদের অনেক কাজ আছে। আমি সে-কাজে আমার কিছু কনট্রিবিউশন রেখে যেতে চাই। কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারিনি। এখন দুদিক চালাতে গিয়ে আমার অনেক দেনা। বাইরে গাড়িটা পড়ে আছে। ইঞ্জিন সারিয়ে আর আনা হয়নি। এ গাড়ি এখন শুধু মল্লিক-বাজার স্ক্র্যাপ হিসেবে কিনতে পারে। আমার ছেলেরা আমাকে ক্ষমা করবে না। স্ত্রী ক্ষমা করবে না। তারা জানেও না—আমার এখন কোন প্র্যাকটিস নেই। রিসার্চ ভণ্ডুল। সংসার আর রিসার্চ চালাতে গিয়ে প্রচুর দেনা। ফিরে এখন পসার জমানো কঠিন। আমি এখন সাত পেগ খেয়ে তবে অজ্ঞান হই। এই বাহান্ন বছর বয়সে। পেগের মাপ আর ঠিক নেই। ঢক ঢক করে খাই। নিট। বেশ লাগে নেশা হলে। ব্লাড, ইউরিন—টুকটাক কালচার করে যা দু পয়সা পাওয়া যায়—তাই দিয়ে দুদিক কোনমতে খুঁড়িয়ে চালাচ্ছি। আমার শরীর খারাপ হয়ে যদি মরে যেতাম এখন—তার চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারতো না। কিন্তু শরীর যে কেন এত ভালো! কিচ্ছু হয় না। যাই করি না কেন—পরদিন আমি দারুণ ফ্রেশ।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতেই গতরাতে সে অল্প জানাশুনো লোকজনের সঙ্গে বোতল খুলছিল।

তখন মার্চেণ্ট নেভির ছেলেটা বললো, আপনি নাকি চলে যাচ্ছেন হরিদা?

হ্যাঁরে। আবার ফিরে আসবো দু'বছর পরে।

খুব মিস করবো আপনাকে। কোথায় যাচ্ছেন?

এখনকার মত তেহেরানে। সেখান থেকে অয়েলটাউন বাজারঘানিতে যাবো। সেখানেই হসপিটাল। কোয়ার্টার।

অনেক টাকা পাবেন তো! কবে অ্যাপ্লাই করেছিলেন?

সবাইকে এক মাত্রায় গ্লাসে ঢেলে দিতে দিতে হরি ডাক্তার বললো, যার যার জল বা সোডা নিজে নিজে মিশিয়ে নিন। আমি অ্যাপ্লাই করিনি ভাই। ঋষি কোত্থেকে ফর্ম আনিয়ে আমার সই দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলো।

এখন খোলা দরজা দিয়ে হরি ডাক্তারের পায়ের জুতোয় ভোরের আলো এসে পড়লো। হরি এখন তেহেরানে পৌঁছে গেছে। খোদ ইরানের শাহের বেডরুমে।

শাহেনশা মুক্তোর কাজ করা খাটে আধশোয়া অবস্থায় বাঁ হাতখানা এগিয়ে

দিলো হরি ডাক্তারকে। নাড়ী দেখে হরি বললো, আপনার এখানে তো থানকুনি পাতা পাওয়া যাবে না। লোহা দাগ করে খানিকটা রস সকালে খালি পেটে খেলে ভালো হয়।

পাওয়া যাবে না কেন ? আলবৎ পাওয়া যাবে। বলে শাহেনশা উঠে বসলো বিছানায়। কাস্পিয়ান সাগরের তীরে খানিকটা জায়গায় থানকুনির চাষ হচ্ছে আজ তিন বছর। আমাদের দেশের ওষুধবিষুধ তৈরিতে লাগে।

তাহলে তো ভালো কথা। কোন চিন্তা নেই বাদশা। আপনার পা দেখি।

শাহেনশা পা দেখালেন।

পায়ের পাতা ফুলেছে।

হুঁ। কি করা যায় ?

পেচ্ছাপ হচ্ছে ঠিক মত ?

চাপে। কিন্তু মনে থাকে না। তাই অনেক সময় পা ফুলে যায়—

ফ্লাশ হওয়া দরকার। হরি ডাক্তার কি ভেবে বললো, অ্যালকাসল তো খেলেন এতদিন। এবার কিছুকাল একটা ইণ্ডিয়ান টোটকা করে দেখুন বাদশা।

বলুন।

আতপ চাল ধোয়া জল খেতে পারেন। বালতি বালতি পেচ্ছাপ হবে।

আতপ চাল ? সেটা কি জিনিস ?

হরি ডাক্তার বুঝিয়ে বলতে শাহ বললেন, না। ও জিনিস এখানে পাওয়া যাবে না।

তাহলে খেজুর গাছের জিরেন কাটের রস খান। সামান্য তাড়ি হওয়ার পর। পেচ্ছাপ একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে। রুরাল ইণ্ডিয়ায় এ ওষুধ খুব চালু শাহেনসা।

খেজুর গাছ তো আমাদের মরুভূমিতে অনেক। এ জিনিস পাওয়া যাবে ডক্টর। এখুনি টেলেক্স মেসেজ পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শাহেনশা বেল টিপে যোগাযোগ মন্ত্রীকে ডাকলেন। বাইরের ঘরে পুরো ক্যাবিনেটে ওয়েট করছিল।

যোগাযোগ মন্ত্রী ঘরে ঢুকতেই হরি ডাক্তারের ঘুম ভেঙে গেল। চোখের সামনেই টেবিলের ওপর অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার। আজ থেকেই তাকে ইরান সরকারের খরচায় গ্রেট ইস্টার্নে থাকতে হবে। সেখানে ইণ্ডিয়া থেকে সিলেক্ট করা অন্য সব ডাক্তার এসে জড়ো হবে। তারপর এরিয়ান এয়ার লাইন্সের ফ্লাইটে তেহেরান। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মামলা, জয়শ্রীও আজ ছেলেদের নিয়ে হোটেলে এসে উঠবে। একদিন থেকে যাবে স্বামীর সঙ্গে।

হরির ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে পাশের ল্যাবরেটারিতে দুই কিশোরের ঘুম ভেঙে

গেল। তারা তড়াক করে উঠে পড়েই টেবিল সাফ করে ফেললো। খুরিতে চা এনে দিল হরিকে। এরা রান্না জানে। ব্লাড এগজামিন করতে পারে। ব্লাড রিপোর্ট টাইপ করতে পারে। ইউরিনের সুগার বের করতে পারে। ব্লাড স্যাম্পেল টানতে জানে। বয়স ষোল-সতেরো হবে। ইংরাজি বাংলা কিছুই জানে না। পড়তেও পারে না। গত ছ-সাত বছরে হরি ডাক্তার এদের তৈরি করেছে।

চা খাওয়ার পর হরিকে ওরা দুজন ধরলো। স্যার আমাদের কি হবে ? আপনি তো চলে যাচ্ছেন।

আমি তো আর চেম্বার ছাড়ছি নে। মাসে মাসে ভাড়া পাঠাবো। তোরা ইলেকট্রিক বিল দিবি।

টাকা পাবো কোত্থেকে ?

কেন ? যেমন ব্লাড ইউরিন করছিলি—তেমন করে যাবি। তাতেই তো টাকা পাবি।

আমরা তো ডাক্তার নই স্যার। তা ছাড়া—

বল্ না—

আমরা তো রিপোর্ট সই করতে পারি নে।

কোন অসুবিধে নেই। প্যাড নিয়ে আয়। আমি এক হাজার সই করে দিয়ে যাচ্ছি। চেম্বারের নামে অনেক পেসেণ্ট আসবে। তাদের বলবি—ডাক্তারবাবু এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন। যেদিনকার রিপোর্ট—সেদিনকার ডেট বসিয়ে নিবি। চিন্তা কিসের ! দেখতে দেখতে দু' বছর কেটে যাবে।

প্যাড ফুরিয়ে গেলে ?

চিঠি লিখবি। আমি আবার হাজার সই করে পাঠাবো।

আমরা তো চিঠি লিখতে জানি নে স্যার। আমাদের আপনি শুধু রিপোর্ট টাইপ করতে শিখিয়েছেন—

তাও তো কথা। বেশ। ঋষি কিংবা দিলীপের কাছে চলে যাবি। তারা লিখে দেবে। ব্যাস্। প্রবলেম মিটে গেল। সব জলের মত হয়ে গেল।

এক হাজার সই করতে হরি ডাক্তারের প্রায় দশটা বেজে গেল। কলকাতায় এবার শীত পড়তে শুরু করেছে। দুর্গাপূজো তা দু'মাস হয়ে গেল। সামনের পূজোয় আমি বাজারঘানিতে। হরি পরিষ্কার টের পেল—বেলা দশটার মিঠে রোদের ভেতর একটু খোসা ছাড়ালেই আসল শীতকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এখন কলকাতায় ক্যাথেড্রালের ছায়াঘেরা গাছতলায় শীতকে চেনা যাবে। ধরা যাবে। ছোঁয়া যাবে।

ঠিক এই সময়টায় দিলীপ যাচ্ছিল বেকবাগান দিয়ে। গাড়ির পেছন দিককার একখানা পাটি ভেঙে গেল শব্দ করে। ড্রাইভার বললো, কাছেই মল্লিকবাজার। চলুন নিয়ে নেব।

তাহলে একটা পুরনো ভালো টায়ার নিয়ে নিও সস্তায়।

পেছনের শক-অ্যাবজরবারের দুটো লিংক্ নিয়ে নেবো তাহলে ?

সব নেওয়ার পর দিলীপ টায়ারের দোকানে দাম দিচ্ছিল। এক বুড়ো খাতা নিয়ে এসে তার কাছাকাছি বসলো। টায়ারওয়ালা বললো, ওই দেখুন, মল্লিক-বাবু ভাড়ার জন্য এসে গেছেন। আপনি আর দশটা টাকা বাড়িয়ে দিন। নয়তো আমার খুব নুকসান হয়ে যাবে—

কোন্ মল্লিক ? ঘুরে তাকালো দিলীপ। ভাঙা গাল। পাকা চুল। এরই ভেতর ভালো করে শেভ্-করা চিবুক। টুইলের ফুলশার্ট।

টায়ারওয়ালা বললো, যাদের নামে বাজার বাবু। এখানে পাঁচশো ঘরের ভাড়া পান ওঁরা।

ভদ্রলোক আপত্তি করলেন। বিনয়ের আপত্তি। না না স্যার। আমরা কিচ্ছু না।

এ-বাজার আপনাদের ?

আমার ঠাকুর্দার বাবা এ বাজার বসিয়েছিলেন।

তখন তো মোটরগাড়ি ছিল না।

হয়তো সবজির বাজার ছিল। হয়তো মাছ বসতো। আপনি কি রিপোর্টার স্যার ?

না না। আমি এমনি লোক। টায়ার কিনতে এসেছি।

ওরে, ভালো দেখে টায়ার দে বাবুকে।

নেওয়া হয়ে গেছে।

মল্লিকবাবু জানতে চাইলো, আপনি এখানে মাঝে মাঝে আসেন বুঝি ?

তা আসি। ঘুরে ঘুরে দেখি।

দিলীপের একথায় মল্লিকবাবু একরকমের হাসি হাসলো। যার মানে বের করা কঠিন। তারপর বললো, চাদ্দিকে স্টিয়ারিং ইঞ্জিন, পিস্টন দেখছেন। এসব মুছে গিয়ে হয়তো এখানেই একশো বছর পরে অন্য জিনিসের বাজার বসবে।

একথা বলছেন কেন ?

কেন বলছি! ধরুন মোটর আবিষ্কার হয়নি। আমরা ঘোড়ার গাড়িতেই চড়ছি। তাহলে ঘোড়া সে-গাড়ির ইঞ্জিন। আমরা কি বেল্লিকের মত মরা ঘোড়া,

আধমরা ঘোড়া কেটে—তার ঠ্যাং, দাবনা, শিরদাঁড়া, লেজ, কেশর এমন কেটে কেটে আলাদা করে ঝুলিয়ে রাখতে পারতাম। এটা একটা ইনহিউম্যান—অশ্লীল—অসভ্য কাণ্ড চলছে। এখানে খানিকক্ষণ থাকলে তো আমার শরীর খারাপ লাগে মশাই। কত অহংকারী গাড়ির এখানে স্কন্ধকাটা ভূতের দশা। দেখলেও কষ্ট হয়।

মল্লিকমশাইকে ভালো লাগছিল দিলীপের। হেসে বললো, সবাই তো আপনার মত করে ভাবে না। এখানে এককালের চালু গাড়ির যা অপমান।

মল্লিকমশাই বললো, চলুন পিস্টনপাড়ায়। বালিয়া জেলার মা বসে বসে রাম-চরিতমানস পড়ছে। ছেলে কেরোসিন দিয়ে পুরনো ইঞ্জিনের হার্ট ধুয়ে-মুছে সাফ করছে।

এ জায়গাকে আপনি পুরনো গাড়ির ভাগাড়ও বলতে পারবেন না। চোরাই নতুন গাড়ির টায়ার, দরজা, ক্র্যাংক্‌শ্যাফট্ চলে আসছে এ বাজারে। এখান থেকেই বহু গাড়ির হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট হচ্ছে। কত গাড়ির ইঞ্জিন এক লক্ষ কিলোমিটার রান করার পর এখানে চলে এসেছে। তাদের পিস্টনে, ভাল্‌ভে কত রাস্তার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কত বিকেল। কত সন্ধ্যে।

এদিনই সন্ধ্যেবেলা গোকুলদার খাটালে চারজন মানুষ চারটে চেয়ারে বসে একটি বিচিত্র পানীয় খাচ্ছিল। গরুর দুধ। গরম। এরকম পানীয় ওরা কোনদিন খায়নি। অন্তত কয়েক বছরের মধ্যে নয়। কাছেই চেনে বাঁধা সারি সারি স্বাস্থ্য-বতী গরু-মোষের নিতম্ব দেখা যাচ্ছিল।

দিলীপ অনেকবারই ঘুরে-ফিরে একটা জায়গায় পৌঁছতে চাচ্ছিল। আমাদের খাদানের মূলধন এত। ব্যয় এত। আয় এত। ট্যাক্স এত। ইণ্টারেস্ট এত। তাহলে যোগ-বিয়োগ কষে লাভ কত? কিংবা লোকসান হয়ে থাকলে তা কত?

গোকুল দত্ত এই সরল অঙ্কটার ফলাফল কত তা আদৌ বলতে পারলো না। অনন্ত বললো, দিলীপদা—এ-হিসেবটা তো তুমি এখুনি পাবে না। হিসেবপত্তর অডিট হবে। চার্টার্ড অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট সব দেখবে। তারপর তো।

শীতের সন্ধ্যেবেলা গোকুল দত্তর গরুগুলো অমৃত খাচ্ছিল। ময়রার ময়দার ভাজা অমৃত। গোকুলের বরাদ্দ করা। সেই সঙ্গে শুকনো দুধের একটা গন্ধ বাতাসে। গোকুল দত্ত বললো, আয়-ব্যয় গলায় গলায়। লাভ-লোকসান এখনো বোঝার সময় হয়নি।

দিলীপ দেখলো, অনেক কিছুই জানতে চাওয়া যায়। কিন্তু যেটাই চাইবে—সেটাই খানিক খানিক করে বিশ্বাসের পলেস্তারা তুলে দেবে। সে কথা উচ্চারণের

পর কেউ কারও মুখে তাকাতে পারবো না। সে যে আরো কষ্টের। কেন যে খাদান করতে এসেছিলাম। কোন দরকার ছিলো না আমার। দিব্যি আমরা, বন্ধুরা ছিলাম। আসলে আমাদের এমন শক্তি নেই—যার জোরে এসব পার হয়েও আমরা বন্ধু থাকতে পারি।

আমার খুব স্থবিধে হতো—যদি সত্যি সত্যিই গোকুলদা একজন খারাপ লোক হতো। ঋষি খারাপ। অনন্ত খারাপ। কিন্তু এরা যে কেউ খারাপ নয়। কোথাও না কোথাও এদের ভেতর থেকে আমি ভালবাসার স্থতো পাই।

আমি তো জানি—ঋষি আমায় ভালোবাসে। কিন্তু কিছুতেই ও সাহস করে কোল ইণ্ডিয়ার নিরাপদ, নিশ্চিন্ত ছায়া থেকে বেরিয়ে আসবে না। ও জানে—আমি যা-কিছু করেছি, সবই ঝোঁকের মাথায়। ওর ভাষায় আমি আসলে একজন পাগল। আমার ভাষায়—ও কিছুতেই কোল ইণ্ডিয়াকে চটাতে চায় না। চায় না—আমরা সবাই মিলে রোদ্দুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের একটা জঙ্গল, নিজেদের একটা সমুদ্র খুঁজে পাই—অনেক কষ্টের পর। আসলে আমরা দু'জনে দু'রকম করে ভাবি বলেই তো এই কষ্ট পাই। আমি যদি ঋষির মত করে ভাবতাম—তাহলে তো কোন কথাই ছিলো না।

ঋষি বললো, তুই হিসেব দিয়ে কি করবি? লাভ-লোকসানে তোর দরকার কি?

যে-জন্যে খাটছি, তার নাড়ীনক্ষত্র জানবো না?

জেনে তোর লাভ? তোর যদি টাকার দরকার থাকে—যেমন কাজ দিচ্ছিস—তেমন কমিশন নিয়ে নে—

হয়তো তার চেয়ে বেশিই নিয়ে বসে আছি। কিন্তু আমি কি খাদানের পলিসি-মেকারদের কেউ নই?

গোকুল দত্ত বললো, নিশ্চয় তুমি একজন পলিসি-মেকার। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তো পলিসি হয় না। সময় লাগে। ঋষি তোর চেয়ে ঠাণ্ডা মাথা—তাই ওর কথা শুনি।

দিলীপের মনে অনেক কথা আসছিলো। সব চেপে দিয়ে শুধু একটা কথাই বললো, এসব আপনি বুঝবেন না।

তোকে তো বুঝি। তোর রাগ কেন—তাও বুঝি। একটা কথা বলি দিলীপ পুরনো চাল ভাতে বাড়ে।

তাহলে গোকুলদা আমরা খাদান করতে এসেছিলাম কেন? খাদান খাদান খেলতে?

অনন্ত বললো; তুমি এত ইনভলভড্ হচ্ছ কেন? অনেকে তো অনেক কিছু

করে। তার ভেতর কোনোটা হয়। কোনোটা হয় না। জীবন তো এরকম দিলীপদা—

তোর মত অনন্ত—আমার অনেক অলটারনেটিভ নেই।

ঋষি বললো, এত সিরিয়াস হচ্ছিস কেন দিলীপ। এমন সুন্দর শীতের সন্ধ্যে-বেলা। পরিতৃপ্ত গরুর দল লেজ দিয়ে মশা তাড়াচ্ছে। আমাদের হাতে খাঁটি দুধের গ্লাস।

তার চেয়ে বল না—আমরা এখন এত নিরাপদে আছি—একটু পরে গায়ে শ্যাওলা জমতে শুরু করবে।

মানুষ কি সব সময় তেতে থাকতে পারে! সেটা আমাদের স্বভাব নয় দিলীপ। রবির খবর কি রে? কোথায় আছে? কেমন আছে?

কিচ্ছু জানি না।

ছোট থাকতে আমার কোলে উঠেছে।

তখন আমরা কত কমে সংসার করতাম।

আমি তো সংসার দেখি না দিলীপ—লাবণ্য যেমন চালায় তেমন চলি।

সুন্দর চালায় লাবণ্য।

চালিয়ে ছায় একরকম। সেদিন দর্জিকে বলছিলো মিস্ত্রি মশাই। আরেকদিন মিস্ত্রিকে দর্জি।

দিলীপ এবার হেসে ফেললো। অনেকদিন আগে তোর বাড়িতে লাবণ্য আমায় একদিন তোয়ালে এগিয়ে দিয়ে চান করতে বলেছিলো। আসলে তোকে দেওয়ার কথা।

হাওয়া পাতলা হয়ে এসেছে দেখে অনন্ত বললো, আর নয়। অনেক সাং-সারিক কথা হয়েছে। এবার বলো তো কোথায় যাওয়া যায় আজ সন্ধ্যেবেলা।

ঋষি গম্ভীর গলায় বললো, আমার একটা কথা শেষ হয়নি। মানে শুরুই করিনি। খাদান থেকে দেখলাম—বেআইনী ইন্টারেস্টে টাকা খাটানো হচ্ছে।

অনন্ত বললো, দিলীপদা মোটা সুদ আসবে বলে ইনভেস্ট করতে বলেছে।

জিনিসটা বেআইনী। আমরা কোল ইণ্ডিয়ায় কাজ করি, তুমি আছো ন্যাশ-নালাইজড্ ব্যাংকে। জানাজানি হলে আমরা কোথায় দাঁড়াবো?

গোকুল দত্ত বললো, ইন্টারেস্ট কত দিচ্ছে?

দিলীপ বললো, থার্টিসিক্স পারসেণ্ট।

জোচ্চোর কোম্পানি। তাহলে ক্যাপিটালই মেরে দেবে। থার্টিসিক্স পার-সেণ্ট সুদ হয় কখনো? তাহলে তো তিন বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

না গোকুলদা—ক্যাপিটাল মারতে পারবে না। রিজার্ভ ব্যাংকে রেজিস্টার্ড পার্টি। খোলাখুলি লোন সার্টিফিকেট দিয়েছে—স্ট্যাম্প কাগজে। ওপেনলি টুয়েলভ পারসেন্ট ইণ্টারেস্ট দেবে ট্যাক্স রেটে। বাকিটা—মানে চব্বিশ পারসেণ্ট দেবে লেখাপড়া ছাড়াই।

ঋষি বললো, যদি না দেয়?

সেটাই তো বিশ্বাসের ব্যাপার ঋষি।

এখানে বিশ্বাস অর্থাৎ—বেআইনী।

তা বলতে পারো। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি আমরা কোত্থেকে এত রিটার্ন পাবো! ব্যাংক তো ওভি দিলে সেভেনটিন পারসেণ্ট ইণ্টারেস্ট নেবে।

গোকুল দত্ত বললো, ব্যাংকের চেয়ে সাড়ে তিনগুণ চারগুণ সুদ দেবে। এ যে রূপকথার মত শুনতে লাগছে। কোন্ ব্যবসায় টাকা খাটায় তারা?

বড় বড় ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানিতে লোন ফ্লোট করার পরেও অনেক টাকা লাগে। আচমকা দরকার হয় তাদের। তখন ওখান থেকে চড়া সুদে টাকা নেয়। তাড়াতাড়ি রিটার্ন আসবে—এমন ব্যবসায় টাকা খাটায় ওরা।

তা হলে তো সবাই খাটাতো।

খাটছে তো। তিনশো কোটির ওপর। ব্ল্যাক মানি সাদা হয়ে যাচ্ছে—বারো পারসেণ্ট। বাকি চব্বিশ পারসেণ্টের হিসেব প্রতি মাসে বাড়ি পৌঁছে দেয় ওরা।

এটা তাহলে মারোয়াড়ীদের ব্ল্যাক মানির প্যারালাল ইকোনমি। ভৌমিক খাদান এর ভেতর যাবে না।

কিন্তু ঋষি—আমি কতকাল শেয়ারের টোপ গেঁথে গেঁথে ক্যাপিটাল যোগাবো? আমি টায়ার্ড। আমার কিছু ভালো লাগছে না।

তুই রেস্ট নে।

তাহলে ও পথ ছাড়া কোত্থেকে ক্যাপিটাল আসবে?

তেমন হলে আসবে না।

খাদান চলবে কি করে?

দরকার হলে চলবে না। কিংবা যেমন চলছে—তেমন চলবে। একটু একটু করে।

এই জন্য কি আমরা খাদান করেছিলাম?

প্যারালাল ইকোনমির ব্ল্যাক টাকায় খাদান করতে আসিনি আমরা।

ফেয়ার বিজনেস। বেশ। তুই কি ঋষি সর্বত্র সত্যবাদী? সাধু?

হয়তো নয়। কিন্তু যতটা পারা যায়—তাতে আপত্তি কিসের? কে

আমাদের ডিজঅনেস্ট হবার মাথায় দিব্যি দিয়েছে ? খাদান ও টাকায় যাবে না। বারো পারসেন্ট অব্দি ঠিক আছে। তারপর নয়। দরকার হলে লোন সার্টিফিকেট ভাঙিয়ে টাকা তুলে নিতে হবে।

তুই কিন্তু আমায় ইনভেস্ট করতে বাধা দিসনি।

কবে বললি আমাকে ?

গোকুলদার বাড়িতে। সেদিন থিয়েটার ছিল। সাপ বেরুলো কামিনী ফুল-গাছের গোড়ায়।

আশ্চর্য ! তখন কি বলতে কি বলেছি—মনে আছে আমার ? তুই এমন টেনশনে ভুগিস কেন দিলীপ ? এটা করতেই হবে। না হলেই নয়। যদি ফেল করি তাহলে মরে যাবো। এমন কিছু নয় খাদান আমাদের কাছে। সুস্থ শরীর —চাকরি করছিস। জলে তো পড়ে নেই আমরা।

আমি একটা কবন্ধ গলির মধ্যে পড়ে আছি।

ধৈর্য ধর্।

সাধন গুপ্তও ওই কথাটা বলেছিলো আমায়ে। শুনতে খুব সুন্দর। অনেকটা রাণী রাণী লাগে।

সাধন গুপ্তকে অপমান করে তোর লাভ ?

সাধনদাকে আমি অপমান করিনি। কিন্তু কিছু বললে তোর লাগে কেন ? তুই কি সাধনদার চেয়ে আমার অনেক কাছাকাছি হতে পারতিস না ? সেটাই তো নরমাল হতো ঋষি !

যার্ যা ডিউ তাকে তা দিতে হয়।

সাধনদার কোয়ালিটি—কনট্রিবিউশন—কোল ইণ্ডিয়ার কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। কিন্তু আজ একটা ঘটনা ঘটলো ঋষি।

কি রকম ?

সন্ধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেছে। গোকুল দত্তর সিগারেট ধরিয়ে দিল অনন্ত।

তুই কোন দিন কোন কথায় সাধনদার নাম তুলিস না ঋষি। খুব সাবধানে ও নাম তাকে তুলে রাখিস। ভক্তি। সতর্কতা। গ্রেটফুলনেস। কোন্‌টা ঠিক জানি না। আজ তোকে দিয়ে ও নামটা তাক থেকে নামাতে পেরেছি।

অপমান করার ইচ্ছে থাকলে তেমন কাউকেই যে কোন ভাবে ইনসাল্ট করা যায়।

গোকুল দত্ত বাধা দিল। আঃ ! হচ্ছে কি দিলীপ ! তিনি আমাদের ওয়েল-উইশার।

তুমি থামো গোকুলদা। আমি কাউকে অপমান করিনি। ওভাবে একটা নাম সব আলোচনার বাইরে রাখা কেন?

থাম্ তো এখন। অনেক কচকচি হয়েছে। সন্ধ্যেটাই মাটি করে দিচ্ছিলি।

এর কাছাকাছি সময়ে থাটালের সবুজ ঘাসে ঢাকা চৌকো লন থেকে তিন মাইলের ভেতর গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে প্রায় ঠাকুরমার ঝুলির একটা সিন অভিনয় হচ্ছিল। সাতশো দু নম্বর স্যুইটে।

ওখানে ইরান সরকারের পয়সায় কয়েকদিন থাকতে হবে হরি ডাক্তারকে। তাই সে থাকতে এসেছে দুপুরবেলা। বিকেলে জয়শ্রী এসে দেখা করে গেছে। ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে। সন্ধ্যেবেলা হরির স্কুলজীবনের এক ক্লাসফ্রেণ্ড এসে হাজির। সঙ্গে একটি বছর দশেকের ছেলে। চেম্বারে গিয়ে হরি ডাক্তারকে না পেয়ে একদম এই হোটেলে হানা।

প্রথম অঙ্ক॥ হরি আছিস? -হরি? আমি শৈলজা—

খোলা দরজা দিয়ে কেউ যে এভাবে ডাকতে ডাকতে ঢুকে পড়তে পারে হরি ডাক্তার ভাবতেই পারেনি। কোন্ শৈলজা?

ওঃ! এইতো হরির গলা। বেশ লম্বা চওড়া হয়েছিস দেখছি। বড় বিপদে পড়ে এলাম। তোর সঙ্গে স্কুলে পড়তাম। আমি শৈলজা বিশ্বাস। তোর শৈল—

হরি ডাক্তার অনেক কষ্টে মনে করতে পারলো। বিশেষ করে শৈল কথাটা মনের ভেতর বিদ্যুৎ খেলে দিল।

কি মনে করে?

আমার এই শেষ বয়সের খোকাটি মোহর খেয়ে ফেলেছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক॥ হুঁ। কিন্তু ভালোই তো আছে ছোকরা। দেখি খোকা। কোন কষ্ট হয় তোমার?

না।

শৈল বললো, আমি থাকি সাইটে—ঠিকেদারি নিয়ে। একদিনের জন্যে এসেছিলাম কলকাতায়। এখানে এই বিপর্যয়। বাঁচবে তো?

বাঁচবে। কিন্তু আমি যে তেহেরান চলে যাবো।

একতলার সব জেনেশুনেই এসেছি। তাই তোর পাশের ঘরটা ভাড়া নিলাম।

ভাড়া নিয়েছো? কখন নিলে?

লিফটে ওঠার আগে। কদিন তুই থাকছিস এখানে—জেনে নিলাম। সে কদিনের ভাড়া নিলাম।

ঠিক আছে। তোমার খোকাকে এখন পারগেটিভ খাওয়াতে হবে। তারপর বাথরুমে নজর রাখতে হবে।

শেষাঙ্ক॥

আর একটু মদ খাই হরি।

তোমার খোকার মোহর বেরোয়নি এখনও ?

কেন যে ওর মাকে এক ডজন মোহর দিতে গেলাম! আমারই ভুল হরি। তার থেকে একটা সরিয়ে মজা করে মুখে রেখেছিল। সেটা স্লিপ করে একদম সিধে পেটে। এখন সব কাজ ফেলে কলকাতায় বসে থাকতে হচ্ছে।

কিসের ঠিকেদারি করো ?

ব্রিজ বানাই। খাল কাটি। রিজারভয়ার করছি।

যেমন ?

সেকেণ্ড হাওড়া ব্রিজ করছি। গ্যামন ইণ্ডিয়া পাইলিং করবে। নতুন কায়দার পাইলিং।

বেয়ারা সাজিয়ে দিয়ে গেল।

ও কি শৈল—ওভাবে খাচ্ছো কেন ? সোডা বা জল মেশাও।

কোনদিন মেশাইনি রে হরি।

নেশা হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি।

না রে হরি। আমি এক বোতলের বেশি খাই নে। ছোট এক বোতল।

চলো চলো। বাথরুমটা দেখে আসি একবার।

দুজনেই প্যানে তাকালো। হরি বললো, নাঃ! কোন চিহ্ন নেই। হজম করে ফেলেনি তো!

করলে কোন ভয় আছে ?

নাঃ! কোন খাল কেটেছো ?

কেন ? ডি ভি সি ক্যানাল। সবটা তো কাটালো না গভর্মেণ্ট। তাছাড়া গড়িয়ার খাল। ওদিকে ময়ূরাক্ষীর ক্যানাল। একটা পেমেণ্ট পাবো এ মাসে। সাতচল্লিশ লাখ টাকা। সাইটেও অনেক টাকা দিতে হবে।

সাতচল্লিশ লাখ! এত টাকা দিয়ে কি করো শৈল ?

সবটাই প্রফিট নয়।

এতটা কি করো শৈল ?

খরচ আছে না! পুরুলিয়ায়—রঘুনাথপুরে পাহাড়ের মাথায় একটা সাদা রঙের বাড়ি করেছি। সেখানে তিনশো আম গাছ। ঝরনার জলে চাষ হয়। আটজোড়া

বলদ। লোকজন। তাছাড়া কলকাতার বাড়ির খরচ। বড় ছেলে বি-কম পড়ে।

তাও তো তোমার টাকা ফুরোবে না।

তা ফুরোবে না হরি। চল, বাথরুমটা দেখে আসি। এই মাত্র খোকা ঘুরে এলো।

চলো। চলো।

দুজনেই হতাশ হয়ে ফিরে এলো টেবিলে।

মনে আছে শৈল—টাকার অভাবে তুমি ম্যাট্রিকুলেশন দিতে পারলে না। তোমার মা তখন বাড়ি বাড়ি সেলাই করতেন। মাসিমা এখন কোথায়?

দাদার ওখানে। দুবেলা দুজন নার্স।

কেন? কি হলো?

ছাদে লেপ গরম করতে মেলতে গিয়েছিল। লেপ নিয়ে গড়িয়ে নিচে পড়ে। লেপ থাকাতেই বেঁচে গেছে অবশ্য।

এখন কোন্ সাইটে কাজ হচ্ছে তোমার?

নরঘাটে ব্রিজ বসাচ্ছি। চল চল। খোকা বাথরুম থেকে এলো আবার।

দুজনে সেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলো। যেমন: হজম করে ফেলেছে? কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তো হজম হয় না। তাহলে কি বেরিয়ে গেছে? হয়তো আমরা তখন টেবিলে বসেছিলাম। তাহলে তো জানার উপায় নেই কোন। আচ্ছা আরেক ডোজ পারগেটিভ দিলে কেমন হয়? না না—আর নয়। থাক না একটা মোহর পেটের ভেতরে। অবিশ্যি বড় হয়ে কোনদিন যদি ব্যথা ওঠে পেটে—তাহলে ডাক্তার তো ধরতেই পারবে না। আজ থেকে বিশ বছর বাদে সবাই যদি ভুলে যাই মোহরের কথা। তখন অসম্ভব কষ্ট পাবে ছেলেটা।

ঠিক এরকম একটা সময়ে স্বাতী তার ফ্ল্যাটে বসে নন্দনকে এলোপাথাড়ি চড় মারছিলো। কতদিন বলেছি—ওই লোকটা ডাকলে কখনো ওর সঙ্গে যাবে না।

নন্দন কাঁদতে কাঁদতে বললো, ও তো আমার বাবা হয়। ডাকলে কি করবো?

তোমার স্কুলের ভেতরে চলে যাওয়া উচিত ছিল।

তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম মা—

আমাদের এ বাড়ির কথা বলোনি তো?

বলবো কি করে? আমি কি রাস্তার নাম জানি? নম্বর জানি?

জানতে চেয়েছিলো?

হ্যাঁ। আমি গুছিয়ে বলতে পারিনি। শুধু বলেছি—দেশপ্রিয় পার্কের পাশে।

তা বলতে গেলে কেন? বোকা ছেলে। কতদিন না বারণ করেছি তোমাকে। চলো খেতে বসবে।

খিদে নেই। বাবা খাইয়েছে অনেক।

কাকে বাবা বলছো? ও লোকটাকে? ও তোমার বাবা নয়।

তাহলে কে আমার বাবা?

বেশি কথা বোলো না। খেতে বোসো।

খিদে নেই একদম। মাংস খেয়েছি। আইসক্রিম। তোমার কথা জানতে চাইছিলো বাবা।

কি জানতে চাইছিলো?

তুমি চাকরি কর কিনা? আমাদের বাজার করে কে?

তুমি বলেছো?

না। আমি অত বোকা নই। কিছু বলিনি। দিদিমার ওখানে আমায় রেখে যাবার সময় মাথায় চুমু খেলো বাবা।

বাবা বাবা করছো কেন ও লোকটাকে?

তাহলে আমার বাবা কে?

স্বাতী কোন কথা না বলে ফিরে একটা চড় কষাল নন্দনকে।

চোদ্দ

পার্লামেন্ট হাউসের কমিটি রুমে ফুলস্কেল কনফারেন্স। ইস্পাতমন্ত্রী, খনিমন্ত্রী, পাশাপাশি বসেছেন। হর্সসু টেবিলের দুধারে দুঁদে এম. পি-রা বসে। হিন্দুস্থান স্টিলের চেয়ারম্যান, কোল ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর—সবাই হাজির। কয়লায় ষোল পারসেন্টের বেশি ছাই থাকলে ইস্পাত কারখানার পক্ষে সে কয়লায় কাজ করা কঠিন। তাই কয়লা কাটাইয়ের সময় কয়লার গ্রেড বুঝে কাটার কথা।

বুঝে বুঝে কাটলে বেশি কয়লা কাটা যায় না সারাদিনে। অথচ প্রোডাকশন, ওভারটাইম আছে। তাই আসলে খনিতে বুঝে বুঝে কাটাইয়ের কোন বালাই নেই। এলোপাথারি কেটে প্রোডাকশন বাড়ানো হচ্ছে। ফলে সব কয়লা মিশে গিয়ে একাকার। ছাইয়ের পরিমাণ ঠিক রাখা অসম্ভব।

এই নিয়ে এম. পি-দের ফ্যাক্ট ফাইণ্ডিং বৈঠক। দিলীপ সাক্ষী দিতে এসে যা করলো—তা সে এতদিন শেয়ারের টোপ গাঁথতে বেরিয়ে করেছে। যেমন গোবিন্দ স্টিল। কয়লায় ছাইয়ের মাত্রা নিয়ে কথাবার্তা যখনই দানা বাঁধছে—অমনি দিলীপ

তা গুলিয়ে দিচ্ছিল।

এখানে সাক্ষী দিতে এসে নিজে থেকে কিছু বলা যায় না। কোশ্চেন করলে তবে আনসার দেওয়া যায়। বিহারের দুজন এম. পি. একদম মোক্ষম মোক্ষম কোশ্চেন করছিল।

কোল ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চোখের দিকে তাকিয়ে দিলীপ জবাব দিচ্ছিল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর আগে মিনিস্টার ছিল। ইলেকশনে হেরে গিয়ে কিছুকাল চুপচাপ ছিল। তারপর প্রধানমন্ত্রী এই বুড়ো ভদ্রলোককে ওই পোস্টে বসিয়ে দিয়েছেন। একটু খিটখিটে। তারপর আগেকার মন্ত্রীর মেজাজ থেকে গেছে খানিকটা। কয়লার কোন খবরই ভদ্রলোক রাখেন না। এম. পি-দের এক একটা কোশ্চেনে কেঁপে কেঁপে উঠছিলেন। আর দিলীপ তার তরল সরল কৈফিয়ৎ তৈরি করে যাচ্ছিল।

খেলাটা মন্দ না। এই কোশ্চেন আনসারের সময় কোল ইণ্ডিয়ার এম. ডি. তাকিয়ে থাকতে পারবেন। কিন্তু নিজে থেকে কোন কথা বলতে পারবেন না। তাঁর হয়ে যা কিছু জবাব দেবে—দিলীপ বসু। দিলীপের কথা শোধরাবার অধিকারও তাঁর নেই। পার্লামেণ্টারি কমিটিতে নিয়মটা প্রথমে করলো।

ঠাণ্ডা ঘর। কার্পেট। একজোড়া সেণ্ট্রাল মিনিস্টার। জায়গাটাই অন্য-রকম। জনা তিনেক স্টেনো। যে যা বলছে—তা কপি হয়ে যাচ্ছে।

রাণীগঞ্জের এম. পি. একটি কথাই বার বার জানতে চাইছিলেন। কয়লা হবার আগের অবস্থার নাম সেল। কয়লার সঙ্গে কাটাই হয়ে তা গুঁড়ো অবস্থায় মিশে যায়। এটা বন্ধ হচ্ছে না কেন?

মিশে যাবার কথাটা দিলীপ অস্বীকার করলো।

এম. পি. মশাই লোকসভার তুখোড় বক্তা। তিনি ফুয়েল রিসার্চ ইন্সটিট্যুটের অ্যানালিসিস রিপোর্ট মেলে ধরলেন টেবিলে। কোল ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর দিলীপের মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে।

এম. পি. মশাই আবার জানতে চাইলেন সেলের গুঁড়ো মেশানো কয়লা কিনে ইস্পাত কারখানাগুলো ভুগছে। ব্লাস্ট ফারনেসে গণ্ডগোল দেখা দিচ্ছে। এই একই কারণে থারমাল পাওয়ার স্টেশনের বয়লারগুলো বিগড়ে যাচ্ছে। লোডশেডিং হচ্ছে—

দিলীপ যতবারই এটা ওটা বলে এড়িয়ে যাচ্ছিল—এম. পি. মশাই আরও শক্ত করে দিলীপকে ধরছিলেন।

দিলীপ হয়তো বললেন, সবকিছু নির্ভর করছে—কয়লার ব্যবহারের ওপর।

এম. পি. মশাই আরও শক্ত করে বললেন, না—কয়লার ভেতর ছাই রয়েছে কতটা—তার ওপর সব নির্ভর করে।

বলতে বলতে এম. পি. ভদ্রলোক বলে উঠলেন, আর নির্ভর করে কর্মীদের সার্ভিস কণ্ডিশনের ওপর। চাকরির অবস্থার সিকিউরিটি। নিশ্চয়তা। প্রোমোশনের সুযোগ—

দিলীপ তাঁকে থামিয়ে বললো, সব কিছু নির্ভর করে জব স্যাটিসফ্যাকশনের ওপর। রেকগনিশনের ওপর।

রাণীগঞ্জের এম. পি. মশাই বোধ হয় জন্মে ইস্তক খাদানের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন। হয়তো তাঁর বাড়িতে কেউ খনিতে ছিলেন। কিংবা আছেন। না হয়—নিজেই হয়তো কোন সময় কোল কাটার ছিলেন। দিলীপকে দিয়ে কথা বলিয়ে নিতেই যেন ভদ্রলোক বললেন, জব স্যাটিসফ্যাকশন থাকলে কেউ কি আর কয়লার সঙ্গে সেল কেটে মিশিয়ে দেয়।

দেয়। কারণ—কাজে কোন আনন্দের কারণ নেই। কোন স্বীকৃতি নেই। তখন লক্ষ্য পড়ে—যাহোক করে ওভারটাইম পেতেই হবে। গোঁজামিল দিয়ে প্রোডাকশন বেশি দেখাতেই হবে।

খনি মন্ত্রী সব শুনছিলেন আর নোট নিচ্ছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে কোল ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বুঝলো দিলীপ বসু নামক কর্মচারীটি সাক্ষী দিতে এসে হাটে হাঁড়ি ভাঙলো। এই কমিটি রুম থেকে বেরিয়ে গিয়ে অপোজিশনের ওই এম. পি. নিজেই রিপোর্টারদের ডেকে সব বলে দেবেন। কাল সকালেই ন্যাশনাল ডেইলিগুলো লোড শেডিংয়ের জন্যে—ব্লাস্ট ফারনেসে গণ্ডগোলের জন্যে কোল ইণ্ডিয়াকেই দায়ী করবে। দিলীপ বসুর মুখের কথাগুলোই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে। অর্থাৎ এই বুড়ো বয়সে আবার বেকার হতে হবে। এম. ডি. রাগে নিসপিস করছিলেন। কিন্তু কিছু বলার উপায় নেই। তারই প্রতিনিধি হয়ে কথা বলছে। সাক্ষী দিচ্ছে।

দিলীপ তখন তোড়ের মাথায় বলে যাচ্ছিল। বার বার ওয়েজ বোর্ড বসিয়ে মাইনে বাড়িয়ে দিয়েও এ প্রোবলেমের সলিউসন হবে না।

খনিমন্ত্রী বললেন, কেন হবে না?

দিলীপ আস্তে আস্তে বললেন, মাইনে বাড়ালে একজন কর্মী আরেকজন কর্মীর সঙ্গে মনে মনে তুলনা করে জেলাসি নয়তো আপারহ্যাণ্ডের পেসেণ্ট হয়ে পড়ে।

সেণ্ট্রাল মিনিস্টার ফর মাইনস বললেন, তা তো হতেই পারে। সবাইকে তো সমান জিনিস দেওয়া যায় না। ইচ্ অ্যাকর্ডিং টু হিজ মেরিটস্। এটাই তো রেকগনিশন। এখন কর্মীকে দেখতে হবে—আমি যে মাইনে নিচ্ছি—সেই

অনুপাতে কতটা কাজ দিচ্ছি—

দিলীপ নারভাস হয়ে পড়ছিল। কখনো কোন সেণ্ট্রাল মিনিস্টার সে ফেস করেনি। ধীরে সুস্থে বললো, আপনি ওয়েজ্ এথিকসের কথা বলছেন। ক্ল্যাসি-কাল সেন্সে। কিন্তু ফিল্ডে নামলে অবস্থা অন্যরকম।

কিরকম ?

ইচ্ অ্যাকর্ডিং টু হিজ মেরিটস্ ব্যাপারটা আদৌ কোন রেকগনিশন নয়। বলে দিলীপ বুঝলো, তার ওপর কেউ যেন ভর করেছে। খনিমন্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একজন তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্মী যে এভাবে তাঁর কথা উড়িয়ে দিতে পারে—সে ধারণা দিলীপের নিজের ছিলো না। তার গায়ে জ্বর উঠে এলো। সে একটু একটু কাঁপছিলো। সেই অবস্থাতেই বললো, প্রাইভেট সেক্টরে থাকবার সময় তো কয়লার ছাইয়ের মাত্রা স্পেসিফিকেশন মত থাকতো। কোল কাটাইয়ের নামে সেল কাটাই করে মিশেল দেওয়া হয়নি কখনো। মিশেল হলে সে কয়লার চালান ক্যানসেল হয়ে যেতো। তখন তো এত ওয়েজ বোর্ড ছিলো না। ইন-সেনটিভ ছিলো না।

তাহলে ?

রেকগনিশন মানে সব সময় মাইনে বাড়ানো নয়। রেকগনিশন মানে এপ্রি-সিয়েশন। পার্সোনাল রিলেশন এ-ব্যাপারে এক সময় একটা বড় রোল প্লে করেছে। রেকগনিশন মানে সব সময় ইনসেনটিভ নয়। মাইনে বাড়িয়ে খানিকটা জেলাসি কেনা যায়। পারফরমান্স কেনা যায় না। একটা লোককে একই টেবিল চেয়ারে বছরের পর বছর সেঁটে রাখলে লোকটা বিটার হবেই। সে অকর্মণ্য হয়ে পড়ার পর তাকে লিফট দিয়ে কোন লাভ নেই। সময়ে সময়ে হওয়া দরকার। ওয়েজ বোর্ড আমাদের কিছু ফিগারের আনন্দ দিতে পারে—জন্মদিনের জন্যে। আগে এত পেতাম—এখন এত পাচ্ছি—এই স্যাটিসফ্যাকশন অল্পদিনের। ও অত পায়—আমি এত পাই—এ ব্যাপারটাই পার্সোনাল রিলেশন নষ্ট করে। সবাই তখন আমরা পড়িমড়ি করে ফিগারের হিমালয়ে উঠতে চাই। জব স্যাটিসফ্যাকশন—কাজের আনন্দ বাড়াটাই উবে যায়—

খনিমন্ত্রী প্রায় ধমকে উঠলেন, আপনি আদর্শের কথা বলছেন। বাস্তবের সঙ্গে কোন যোগ নেই। সবটাই ইউটোপিয়ান—

দিলীপ বসু বেঁকে দাঁড়ালো, আমি এরকম বুঝি স্যার।

দিলীপকে আগাগোড়া সাপোর্ট দিলেন রাণীগঞ্জ থেকে ইলেক্টেড অপোজিশনের সেই এম পি।

পরদিন ভোরে কোল ইণ্ডিয়া গেস্ট হাউসে দিলীপের ঘুম ভাঙলো টেলিফোনে।

হ্যালো।

করেছো কি দিলীপ? এভাবে পথে বসালে সবাইকে?

অনাথ চক্কোত্তির গলা চিনতে পারলো দিলীপ। কি ব্যাপার? কোত্থেকে বলছেন?

অশোকায় উঠেছি। আমি আর ঋষি। আজকের সকালের কাগজ দেখেছো?

এখনো দেখিনি। আপনারা দিল্লি এলেন? এখন?

একটা চেক ডেলিগেশন আসবে। মাইনিং মেশিনারি নিয়ে কথা বলতে। তাই চলে এলাম দুজনে। কাগজটা ছাখো আগে। হিন্দুস্থান টাইমস্, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, স্টেটসম্যান—সবাই তোমার মুখের কথা তুলে নিউজ করেছে। কোল ইণ্ডিয়ার ভেতরে যেন নৈরাজ্য চলছে—এমন সব কথাবার্তা তুমি বলেছো। এজন্যে তোমাকে সাক্ষী দিতে পাঠানো হয়েছিলো? একটা ডিনায়াল পাঠাও—

যা ভালো বুঝেছি তাই বলেছি। উইটনেস হিসেবে যা বলেছি—তার কৈফিয়ৎ আপনাকে দেবো না। কাউকেই দেবো না। কিছুই ডিনাই করবো না।

কোল ইণ্ডিয়ায় তোমাকে দিতেই হবে।

ধমকাবেন না। অফিসের কাজের নামে ফুর্তি করতে বেড়াতে এসেছেন। তাই করুন। গৌরবের কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরতে ভালোবাসেন—তাই ঘুরুন।

ইউ আর জেলাস অব ঋষি।

বাজে বকবেন না।

হিন্দুস্থান টাইমসে তোমার মুখের কথা যা কোট করেছে—তাতে এরকম মনে না হওয়ার কোন কারণ নেই দিলীপ। প্রোমোশন। ইনসেনটিভ। এটসেটরা—

আপনার পক্ষে এর চেয়ে ভালো কিছু ভাবার উপায় নেই। আপনি এই পর্যন্তই ভাবতে পারেন। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। আমি জেনারেল পলিসি হিসেবে প্রভাকশন-এর কথা ভেবে ওসব কথা বলেছি।

গৌরবের কাঁধে হাত দিয়ে কথাটা বললে কেন তাহলে?

কারণ খুব সাধারণ। ঋষি এখন কোল ইণ্ডিয়ায় গুড বয়। তার কাঁধে হাত দিয়ে ঘুরতে কার না ভালো লাগে!

ভৌমিক খাদানের কমিশন তোমায় উদ্ধত, দুর্বিনীত করেছে। এথিকসের কথা তোমার মুখে মানায় না দিলীপ। কোল ইণ্ডিয়ার এক্সপিরিয়েন্স তুমি ভৌমিক খাদানে খাটিয়ে দু'পয়সা করেছো।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙিয়ে এসব কথা বলছেন কেন? এসব তো সাধন গুপ্তের কথারই ইকো। ওই-সাধনকে আপনি দু'চোখে দেখতে পারেন না। ওর প্রমিনেন্স আপনার চক্ষুশূল। তার ঘরের কার্পেট আপনার চেয়ে বড় হলে রেগেমেগে তিনদিন অফিসে আসেন না।

কলকাতায় ফিরে চলো—তখন তোমায় দেখছি আমি।

ধমকাবেন না অনাথদা। ব্যথা পাবেন। অনেককাল ছড়ি ঘোরাচ্ছেন—কাজের নামে অষ্টরম্ভা। কোল ইণ্ডিয়া থেকে বেরিয়ে গেলে আমি কাজ পাবো। আপনাকে বের করে দিলে কুকুরে টেনে নিয়ে যাবে।

দু' জায়গায় পয়সা নিতে তোমার লজ্জা করে না?

কিসের লজ্জা। আপনি তো কোন কাজ না করেই মোটা মাসোহারায় আছেন। সে তুলনায় আমি তবু ভৌমিক খাদানের জন্যে খেটেছি। আমার পয়লা নম্বরের এনিমিও একথা ডিনাই করতে পারবে না। এবার ফোনটা নামিয়ে রাখলো দিলীপ। তারপর গেস্ট হাউসের ফাঁকা ঘরে বিড় বিড় করে বললো, বেশ আছিস ঋষি। ভোরবেলায় এই ফোনটা তুই করলে আরো মানাতো।

ডিরেক্টর বোর্ডের যে-মিটিঙে দিলীপের পাখনা কেটে দেওয়ার কথা হয়—যেখানে স্থির হয়েছিলো—দিলীপকে ভৌমিক খাদান থেকে সরিয়ে এনে তার টেবিল চেয়ারে গেঁথে রাখতে হবে—সে মিটিংয়ের মিনিটস্ কনফিডেনসিয়াল ক্লার্ক পরে দিলীপকে দেখিয়েছে। তার সম্পর্কে সাধন গুপ্তর মতামতও দিলীপ জানে। সে এসব খুবই নরমাল মনে করে।

কিন্তু অ্যাবনরমাল লাগে ঋষির ব্যাপারটা। এ তুই কি করলি ঋষি। তোকে তো আমার সঙ্গে দিল্লি এলে মানাতো। আমি এলাম সাক্ষী দিতে। তুই এলি বেড়াতে। অথচ আমরা একসঙ্গে খাদান করতে নেমেছিলাম। যে-খাদান তোর কাছে ছেলেখেলা—সেটা আমার কাছে মরণবাঁচন হয়ে গেল। অথচ, পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ায় কোল ইণ্ডিয়াকে শেষ করে এনেছিলাম প্রায়—

ইচ্ছে করলেই কাগজ এনে দেখতে পারতো দিলীপ। কিন্তু দেখলো না। কি হবে দেখে?

বেলা এগারোটায় লোকসভা থমথম করছে। অপোজিশন থেকে খনিমন্ত্রীকে তুলোধোনা করা শুরু হয়ে গেল। ছাইয়ের মাত্রা। অব সাটিসফ্যাকশন। লোডশেডিং। ওভারটাইম। গভর্নমেণ্ট ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার যোগাড়।

বেলা তিনটেয় প্রাইমমিনিস্টার পয়েণ্ট অব অর্ডারের জবাব দিতে উঠলেন।

সন্ধ্যে নাগাদ সব কাগজের টেলিগ্রাম বেরোলো। কোল ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর চাকরিটি হারিয়েছেন। বেছে বেছে দেখেশুনে কিভাবে কয়লা কাটতে হবে—তার ফতোয়া ঝাড়লেন খনিমন্ত্রী। তাও বেরিয়েছে সন্ধ্যের টেলিগ্রামে। দিলীপ পড়ে দেখলো—আর হেসে উঠলো। ফাঁকা ঘরেই। আজ সারাদিন সে গেস্ট হাউসে। পাছে খনিমন্ত্রী ডেকে পাঠান—তাই দিলীপ ঘরেই থেকেছে।

সন্ধ্যেবেলা এলো ঋষির ফোন। চলে আয়। চেক্ ডেলিগেশনকে কোল হাউসে রিসেপসন দেওয়া হবে।

আমি যাবো না।

কেন শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছিস। যা হবার তো হয়েই গেছে।

দিলীপের অনেক কথাই মনে আসছিলো। কিন্তু কোনোটাই বলতে পারলো না। শুধু বললো, তোর কি কিছু বলার নেই ঋষি?

আমি আর বলে কি করবো। তুই কি আমার কোন কথা শুনবি!

কোন্‌টা শুনিনি?

সেকথা থাক। চলে আয়। সবাই মিলে আনন্দ করবো।

না। আমি যাবো না।

আমার ওপর রাগ করেছিস তো। আমারও ইমোশনস্ আছে। কিন্তু তোর মত আমি তা খুলে মেলে দেখাতে পারি না। আর—

আর কি ঋষি?

তুই যা ঠিক করবি—তা তো তুই করবিই। কারও কথা শুনবি না। বলে কি লাভ দিলীপ।

সবদিকে মার খাবার পর আমি আর কম্প্রোমাইজ করি কি করে।

মার মনে করছিস কেন? তোর মত কাজের লোক কজন আছে?

একথাটা শুধু তুই বুঝলি! পাবলিক বোঝে না কেন বল্ তো? আমার উইটনেস নিয়ে পার্লামেণ্টে হই-চই। অথচ তুই, অনাথদা আনপারটাব্‌ড্! দিব্যি ডেলিগেশন। দিব্যি রিসেপসন।

বাঃ! এ তো পার্ট অব দি গেম। জীবন তো এরকমই হয়। চলে আয়—

না, ঋষি। আমি মনের দিক থেকে কোন যোগ পাচ্ছি না।

অনাথদার কথায় কিছু মনে করিস না। ও তো পাগল লোক।

সেয়ানা পাগল!

ও কথা বলছিস কেন দিলীপ? তোকে খুব ভালবাসে।

নিজেকে ভালবাসার জন্যে ঠিক যতটুকু দরকার—ঠিক ততটুকু ঋষি।

আমরা একই শহরে থাকবো—অথচ দেখা হবে না? এমন সন্ধ্যেবেলায়!

আমরা সভ্য না হয়ে যদি কামড়াকামড়ি করতে পারতাম—তাহলে অনেক টেনশন কমে যেতো।

দিল্লির টেলিফোনের তার বেশির ভাগই মাটির নিচে। যেখানে মাটির ওপরে—সেখানে শীত আর শিশিরে ভিজে গিয়ে ভারি হয়ে উঠছিল।

কলকাতায় এখন আদিগঙ্গার গায়ে সন্ধ্যের মুখে মুখে হাত-রিক্শা থেকে রাণী নামলো। সামনেই পালিত বাড়ি। খোলা দরজা পেয়ে রাণী ভেতরে ঢুকলো। সামনের ঘরে কেউ নেই। পুরনো সিঁড়িটা ধরে দোতলায় উঠে এসে চেতলার পুলের মুখোমুখি বড় ঘরটায় রাণী দেখতে পেল, একজন শক্তসমর্থ মাঝবয়সী মানুষ টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ঝুঁকে পড়ে কি লিখছে। সারা বাড়ি নির্জন। সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংয়ে কয়েকটা কেটেল ড্রাম, রানিং সু আর গিটারের একটা বড় খাপ। বা বাক্স। ভুল বাড়িতে আসিনি তো!

কিরীটী তখন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মামলার কাগজপত্র দেখছিল। আবার হিয়ারিং পড়েছে। এটাই ফাইনাল। ভাগ্যিস সে তার চিন্তাভাবনা চিরকালই পেটেন্ট করে রাখে। নয়তো রেল একশো কোটি টাকার লাভ বেমালুম নিজের বুদ্ধির জোরে বলেই চালাতো। প্যাসেঞ্জার ইনসিওরের আইডিয়াটা কিরীটী তিন বছর আগেই পেটেন্ট করে রেখেছিলো। নয়তো আজ মামলাই চালাতে পারতো না। কিরীটীর দাবি সামান্য। আমারই পরিকল্পনা কাজে লাগিয়ে তোমাদের একশো কোটি টাকা মুনাফা। তার এক পারসেন্ট এক কোটি টাকা। সে টাকাটা আমাকে দাও। খুব বেশি তো আমি চাইনি। এক পারসেন্টের নিচে চাই কি করে?

কদিনই কিরীটীর মনটা উড়ু উড়ু করছিল। কত কাজ বাকি। বাৎসল্য সম্পর্কে একটি নতুন আইডিয়া তার মাথায় এসেছে। যারা স্নেহ করতে পারে—তাদের তালিকা থেকে লটারি করে নামের প্যানেল তৈরি করতে হবে। স্নেহের অভাবে যারা—যে সব শিশু ঠিক মত বাড়তে পারছে না—তাদেরও নাম রেজিস্ট্রি করে রাখা দরকার। তারপর দু তরফকেই আইডেন্টিটি কার্ড দিয়ে দেওয়া হবে। যাদের স্নেহ করার প্রবল বাসনা তারা মাসে এক টাকা করে সাবসক্রিপসন দিলে সারা দেশের বাপে-খেদানো মায়ে-খেদানো শিশুরা ভালবাসাবাসির একটা স্থায়ী প্রবাহের সঙ্গে পাকাপাকি যুক্ত হবে।

ভালবাসা বা স্নেহ যারা পায়নি—তাদের সংখ্যা অনেক। কিন্তু ভালবাসতে চায় এমন মানুষের সংখ্যা আরও বেশি। মাসে এক টাকার চাঁদায় সারা দেশে কয়েক

কোটি টাকা উঠবে বছরে। তাই দিয়ে স্বচ্ছন্দে বহু স্নেহভবন গড়ে তোলা হবে।

চাঁদা তোলার অসুবিধা থাকলে ডাকঘর থেকে, ব্যাংক থেকে, রেল স্টেশন থেকে 'স্নেহ' ছাপ দেওয়া এক টাকার ডাকটিকিট কিনতে পাওয়া যাবে। তা দিয়ে চিঠি পোস্ট করা যাবে না। অনেকটা রেভিনিউ স্ট্যাম্পের মত নিজের কাছে রেখে দিতে হবে। ভালবাসতে হলে স্নেহভবনে গিয়ে জমা দিলেই চলবে। পৃথিবীতে তো বেশির ভাগ লোকই ভালো। মুফতসে একটি শিশুকে কোলে নেওয়া যাবে না। তার হাসি, তার আনন্দের শরিক হতে হলে ওই টিকিট কিনে নিয়ে তবে কোলে নাও। অবশ্য শিশুর নিজের মা বাবার বেলায় আলাদা। তাদের তো কোন টিকিটের বালাই থাকবে না।

স্নেহভবনে বড় হয়ে ওঠা শিশুরা মানুষ হলে পর নিজেদের আয় থেকে সারা দেশের 'স্নেহ' টিকিটের খদ্দেরদের মাসে মাসে সুদে-আসলে ফেরৎ দিয়ে যাবে।

এটা একটা আন্দোলন। এটা একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবসা। উদ্দেশ্য, ভালবাসার নদী যেন জীবন থেকে শুকিয়ে না যায়। নিজের কল্পনাতেই বিভোর অবস্থায় কিরীটী পালিত তার এই আইডিয়াটা বড় নোটবইয়ে টুকে রাখতে লাগলো।

একসময় কলমের কালি নেই দেখে দোয়াত খুঁজে যেই চোখ তুললো অমনি কিরীটী রাণীকে দেখতে পেল। সাক্ষাৎ বিষাদ। একথা মনে হতেই কিরীটী বুঝলো, বিষাদ বিষয়ে তার আইডিয়াটি এখনো পেটেণ্ট করানো হয়নি। হয়নি পথ বিষয়ে আইডিয়ার পেটেণ্ট করা। পথ মানুষের? না, গাড়ির? কে বেশি ট্যাক্স দেয়?

বিষাদ বলতে সে আগে ভাসানের দেবী প্রতিমার মুখ ভাবতো। পরে খুকীর মায়ের মুখখানা সেখানে কখন অজান্তে বসে গেছে। কাকে চাই?

রাণী বললো, আপনি মালবিকার বাবা?

হুঁ। আপনি? রবির মা?

হ্যাঁ। আমি মালবিকাকে নিতে এসেছি।

তা—তা নিয়ে যাবেন। কিন্তু ও তো এখন বাড়ি নেই।

কোথায় গেছে?

ওর মায়ের সঙ্গে নবগ্রহ মন্দিরে নামগান শুনতে গেছে। এই সময়টায় ওসব শুনলে মন ভালো থাকে। সন্তানের মুখশ্রীও ভাল থাকে।

আমি সেখানে যাবো।

কিন্তু যাবেন কি করে? এখন কি কোন খেয়া পাবেন?

শুনে অবাক লাগলো রাণীর। শহর কলকাতার ভেতর খেয়া? আশ্চর্য!

বুঝিয়ে বললো কিরীটী। টালির নৌকো জোয়ার বুঝে ভাসে। পুটিয়ারির কুমোরদের নৌকো। খিদিরপুর অব্দি যায়। ওদিকে গড়িয়া। ঝামেলা নেই কোন। লগি ঠেলে ঠেলে এগোয়। আমাদের বাড়ি তো আদিগঙ্গার ওপর। মাঝিরা ঠাকুর্দার আমল থেকে চেনে আমাদের। যাবেন যদি চলুন।

নদীর পারে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হলো না। দু ধারে শহর। শ্মশানের পোড়া-কাঠ ভেসে যাচ্ছিল। সন্ধ্যেবেলা কে বৃষকাঠে প্রদীপ দিয়েছে। প্রদীপের আলোয় কাঁচা রঙ পুড়ছিল একটু একটু। ক'হাতের ভেতর ইলেকট্রিক। শহর। ট্যাক্সি। টানা রিক্শা। কর্কাচি ডাক সাজিয়ে বসে আছে ব্যাপারী।

নৌকোয় উঠেই রাণী বললো, মালবিকাকে ডাক্তার দেখানো হয়েছে ?

রবিদের দলেরই একটি ছেলে—ডাক্তার—সে দেখে যায় ফি বুধবার।

শহরকে তুচ্ছ করে আলিপুরের নতুন পুলের নিচে নামগান হচ্ছিল। নৌকো থেকে নামতে গিয়ে রাণীর পায়ে পাঁক মাটি লেগে গেল। সেই অবস্থাতেই সে কিরীটী পালিতের সঙ্গে ডাঙায় উঠে এলো। ডাঙা মানে নবগ্রহ মন্দিরের লাগোয়া এক খাটালের সামনের গোবর-চোনায় রসস্থ ঘাসে ঢাকা এক চৌকো। সেখানে রাস্তা থেকে ছিটকে আসা আলোয় কয়েকজন মহিলা। সতরঞ্চির ওপর। তারই কোণে মালবিকা বসে। কপালে সিঁদুর। গায়ে গায়ে এক বৃদ্ধাকে দেখে রাণী বুঝলো, এই সধবা মহিলা রবির কৃপায় তার বেয়ান। যদিও বিয়েই হয়নি এখনো।

জলচৌকির ওপর কথক ভদ্রলোকের সুরেলো কথা আর গান একটু বাদেই শেষ হলো। জনা ত্রিশেক নানা বয়সের মহিলা তখনো বসে। একজন মাঝি আর জনা দুই খাটালের দোহাল বালতি হাতে উঠে দাঁড়ালো।

ভগবানের নাম শুনতে শুনতে মালবিকার মুখখানা একদম শান্ত। রাণীকে দেখে সে মুখে কোন ছায়া পড়লো না। চোখের পলকও পড়লো না।

রাণী হেঁটে গিয়ে পাশে বসলো। কেমন আছো মা ?

ভালো। আপনি আবার এতটা পথ এলেন কেন ?

তোমায় না দেখে থাকতে পারিনি।

ডাকলেই আমি যেতাম।

না। এ শরীরে একা একা তোমার যাওয়া ঠিক হতো না।

মালবিকা চোখ নামালো।

আমি তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি।

এতক্ষণ মালবিকার মা কোন কথা বলেনি। এবারে মহিলা ঘুরে বসে রাণীকে দেখলো। রবির মা তার চেয়ে অনেক ভালো দেখতে—বেশ আরামে থাকে—

দেখলেই বোঝা যায়। এতদিনে মনে পড়লো ?

রাণী একথার কোন জবাব দিল না। মালবিকার মা তো রাগ করতেই পারে। সবই রবির জন্যে। শুধু আস্তে বললো, আমাদেরই দোষ।

মালবিকার মা তবুও সহজ হতে পারলো না। মালবিকার একখানা হাত ধরেই থাকলো। জায়গাটা পুলের ওপর থেকে দেখা যায় না। মহিলারা প্রায় সবাই চলে গেছে। শহরের ভেতর দিয়ে নদী বলতে লিকলিকে এই জলের ধারা। তার ওপর দিয়ে এখন একটা খড়ের নৌকো যাচ্ছিল।

কিরীটী বললো, সবাই চলে যাচ্ছে। এবার ফিরলে হয়—। তার মনে হচ্ছিল মাতৃস্নেহ কথাটার সব সময় নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। এ তুলনায় বাৎসল্য অনেক সহজ জিনিস। বাৎসল্যেরই একটা ভ্যারাইটির নাম মাতৃস্নেহ। বাংলা ডিকসনারিতে এ জিনিসের নাম পাল্টে ফল্গু কথাটা বসানো যায়।

কুমোরদের বড় নৌকো। তাতে ভালো করেই বসলো চারজনে। অনেকদিন পরে রাণী এত কাছাকাছি জল পেয়ে ডান হাতখানা ঝুলিয়ে দিল। তারপর একটা আঙুল জলে ডুবিয়ে রাখলো খানিক। তাতে জল কাটতে লাগলো।

তখন মালবিকার মা কিছুতেই চোখের জল রাখতে পারছিল না। সবার দিকে পেছন ফিরে জেলখানার লাল দেওয়ালটা দেখতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু কিছুই দেখতে পারছিল না। অনেক চেষ্টায় চোখ মুছে, গলা পরিষ্কার করে মালবিকার মা জানতে চাইলো, রবি কোথায় ?

রাণী আস্তে বললো, জানি না।

ভালো আছে ?

কিচ্ছু জানি না।

শীগগিরি এসেছিলো ?

আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। কুটু বলছিলো।

কুটু কে ?

আমার মেয়ে।

মালবিকার মা ধরা গলায় বললো, আমিও অনেকদিন দেখিনি রবিকে। গত বছর শীতকালে একদিন এই আদিগঙ্গা থেকে উঠে এলো। সারা গায়ে গোবর। পুলিস তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। তাই খাটালে লুকিয়ে ছিলো। শীতের সন্ধ্যেবেলায় আমাদের কলঘরে গরম জল—সাবান দিলাম। শেষে খুকীর বাবার ধুতি পাঞ্জাবি পরে-বেরুলো।

রাণী তখন নিজের মনে মনে বলছিলো, মেয়ের মা হয়ে কি করে আপনি

অতটা আসকারা দিলেন ? তা যদি না দিতেন—তাহলে কি আপনার খুকীর আজ এ অবস্থা হয় ?

কিন্তু এসব কথা এখন অবান্তর।

মালবিকার মা রাণীর কানের কাছে গুনগুন করে বলতে লাগলো, এখানে শতেক কৈফিয়ৎ দিতে হয়। চেতলায় আমাদের এখানটা এখনো পাড়া মত। সবাই সবার খবর রাখে। কেউ বলে—হ্যাগো! তোমার জামাই আসছে কবে ? এর ভেতর আবার পুলিসের লোক নাকি ববির জন্য তক্কে তক্কে ঘুরছে। কি করি বলুন তো ? কত দিক সামলাই !

আমাদের দশতলা ফ্ল্যাট বাড়িতে ওসব ঝামেলা নেই। তবে মালবিকা গেলে পুলিস আসবে নিশ্চয়।

পুলিস সেই এলো। তবে তখন নয়। রাত একটায়। ফ্ল্যাটবাড়ির অটো-মেটিক লিফ্‌টে চড়ে। যথারীতি সারা বাড়ি তছনছ করলো। সেই সঙ্গে মুখে ভালো ভালো কথা। যেমন : বউ এসেছে! বর কোথায় ? আমরা ঠিক ধরে ফেলবো কিন্তু বলে দিলাম—

অনেকদিন পরে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছিলো মালবিকা। নিষুতি রাতে বিছানায় উঠে বসলো। পাশে কুটু শুয়ে। সে আস্তে বললো, শুয়ে পড়ো তো। পুলিস অমন করেই থাকে। একটু ভালো করে ঘুমোও।

পুলিস নেমে যেতে আলো নিভলো। আবার শুতে হলো। দশতলায় মশা নেই। মাছি নেই। ধুলো নেই। অনেক নিচুতে লরি যায়—সামান্য শব্দ উঠে আসে। কুটু বললো, আগে আমি আর দাদা অনেক রাত অব্দি শুয়ে শুয়ে গল্প করতাম।

মালবিকা কোন কথা বললো না।

দাদা পাল্টে যাচ্ছিল। কিন্তু তখন আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি।

বুঝলে কি করতে ?

কিছুই করার ছিলো না। বলে অনেকক্ষণ থেমে থাকলো কুটু। তারপর বললো, আমি বিশ্বাস করি না—দাদা কাউকে খুন করতে পারে—

পুলিস বলছে—

পুলিস অমন মিথ্যে মামলা সাজায়।

এত লোক থাকতে তোমার দাদার নামে মিথ্যে মামলা লাগাবে কেন ?

অন্ধকারে কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছিল না।

কুটু অনেকক্ষণ পরে বললো, আমার দাদা ওরকম নয়। ছোটবেলা থেকে জানি।

মালবিকা ঠাট্টা করে বললো, কার ছোটবেলা ? তোমার ? না, তোমার দাদার ?

অন্ধকার বিছানায় হাসতে হাসতে কুটু একা একা কেঁদে ফেললো। নিঃশব্দে। বালিশে চোখ ঘষে দুজনের ছোটবেলার যা কিছু মনে পড়ছিল—তা একদম মুছে ফেলতে চাইলো কুটু।

ঘুম আসছিলো না মালবিকার। তার ওপর রাণী তাকে সন্ধ্যেরাতে বেনারসী পরিয়েছে। সেই সঙ্গে বিয়ের রাতের সাজের গয়নাগাঁটি। মুখের দু পাশে চন্দন মাখানো লবঙ্গর টিপ। এখন বেনারসীর জরি গায়ে কেটে বসছে। তবু রবির মা তাকে শাড়ি পাল্টাতে বারণ করছে। শ্বশুরবাড়িতে প্রথম রাত—এই পোশাকই নাকি ভালো! শ্বশুর দিল্লিতে।

কুটু জানে, ওই গয়নাগাঁটির খানিকটা তার জন্যে বানানো। খানিকটা মায়ের বিয়ের সময়কার। বিছানা জুড়ে ফুলগুলো যদুবাজারের ওখান থেকে কিনে আনা। আজ বিশ্বনাথ মায়ের কথা খুব শুনেছে। ফুল এনেছে। মালা। নিজে দাঁড়িয়ে বিছানা সাজিয়েছে। শেষে আসর সাজিয়ে গানও গেয়েছে। সতীনাথের একখানা গান খুব ভালো তুলেছে গলায়। ও-ই তো সারাটা সন্ধ্যে জমিয়ে রেখেছিলো।

কুটু বললো, আমাদের বাবার বয়স বেশি নয়। একদম ছেলেমানুষ।

একথায় একদম খিল খিল করে হেসে উঠলো মালবিকা। কুটু মালবিকার কাছাকাছি বয়সের। কুটু এই হাসিতে একটু ঘা খেলো। সে বললো, বেশ তো বউদি—আমার কথা সত্যি কিনা—কালই দেখতে পাবে।

কাল?

কালই তো বাবা ফিরবে। তাই তো বলে গেছে। তখন মিলিয়ে নিয়ো। আমার বাবা অল্প বয়সে মাকে বিয়ে করেছে। দাদা তার প্রথম যৌবনের সন্তান—

আবার হাসতে থাকল মালবিকা। একটু পরে থেমে জানতে চাইলো, এ বাংলা তুমি কোথায় পেলে কুটু? নিশ্চয় মুখস্থ করেছো।

বাবা-মা তো এই ভাবেই বলে। শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। কেন? বাংলাটা কি খারাপ?

তা কেন? রীতিমত ভালো। তবে তোমার আমার বয়সী লোক কখনো এ বাংলা বলবে না। খানিকক্ষণ কথা বলে মালবিকা বুঝেছে, কুটু মানুষটি বয়স আন্দাজে সরল আছে এখনো। তাদের বাড়ির মত টানাটানির সংসারে বড় হয়নি কুটু।

কুটু অন্ধকারেই আস্তে আস্তে বললো, দু বছর আগেও বাবা কি ফূর্তিবাজ ছিলো।

এখন নেই?

আগের মত আর নয়।

কেন?

আমরা জানি না। তবে পাণ্ডবেশ্বর না কোথায় খাদান খোলার পর থেকেই বাবা একটু একটু করে পালটে গেল।

সেখানে কি লোকসান খাচ্ছে?

না। তাহলে তো বাবাই বলতো। তবে কিছু একটা হয়েছে—যে জন্যে বাবা আর হাসে না।

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। অন্ধকার। কুটু ভাবছিলো, ভালো বাসর জাগাচ্ছি! দাদা উধাও, পুলিস ঘুরে গেল। বাবা দিল্লিতে। ঠিক এই সময় মালবিকা বললো, তোমার বিয়েতে আমরা খুব হইচই করবো।

দাদা ওরকম না করলে—বাবা ওরকম না হয়ে গেলে—তোমার বিয়েতেও হতো।

আমার বিয়ের কথা তুলো না। বিশ্বনাথকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল—গাইছিলো আর তোমার দিকে তাকাচ্ছিলো।

ধ্যাৎ! ওকে বিয়ে করবে কে? চাল নেই। চুলো নেই।

কি বলছো কুটু! এখন এক রাত গাইবে আর তিনশোটি টাকা গুনে নেবে। ফাংশন করে না বেশি। তার বদলে হোটেলে গাইছে। ওর গানের সঙ্গে আমার দুই দাদা বাজায়।

আচ্ছা! তাই বুঝি!

ন্যাকামি কোরো না। তুমি সব জানো। বিশ্বনাথ এখন মান্থলি কণ্ট্র্যাক্টে গাইছে। আগের চেয়ে একটু মোটাও হয়েছে। এ-মাসে পাটনা তো ও-মাসে শিলিগুড়ি—

ওকে বিয়ে করতে আমার ভয় হয়। ও আর আগের মত নেই।

তা থাকবে কি করে কুটু?

কেন বদলাবে? সব্বাই কেন বদলে যাবে? আমি কি শত্রুতা করেছি!

বাঃ! তুমিও তো বদলে যাচ্ছো। তাছাড়া—

মালবিকাকে থামতে দেখে কুটু বললো, তাছাড়া কি বৌদি?

পুরুষমানুষ আয় করতে শুরু করলে পাল্টাতে থাকে। আমার দাদাদের দেখেই বুঝি। টাপুদা, বাচ্চুদা—দিব্যি এখন গলায় দামী স্কার্ফ বেঁধে ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে বাজাতে ওঠে। ওরা আমার ভাই বলেই আমি জানি।

বিশ্বনাথ আগে আমায় একদিন না দেখলে চিঠি দিতো। পানের দোকানে এসে দাঁড়িয়ে থাকতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

সেরকম কি এখনো ভালো লাগতো তোমার!

না। তা লাগতো না। তবে এখন আর দাঁড়ায় না। চিঠি দেয় কখনো-সখনো। সব সময় ব্যস্তসমস্ত ভাব।

তা তো হবেই। কত হোটেলে সোলো গাইছে বিশ্বনাথ। কখনো শুধু টাপ্পা বাজাচ্ছে। কখনো বাচ্চ্-দা। একজন মিউজিক-হ্যাণ্ড নিয়েই তিন ঘণ্টা গাইছে বিশ্বনাথ। ওর বাবার পড়তি দোকানটাকে আবার অনেকটা ঠেলে তুলে ধরেছে। চেতলা বাজারে এক সময় ওর বাবার চিঁড়ে-গুড়ের দোকান সব চেয়ে বড় ছিল।

চিঁড়ে-গুড়ের দোকান?

হ্যাঁ। কেন? বিশ্বনাথ তোমায় বলেনি?

হয়তো বলার সময় পায়নি। বলতো নিশ্চয়। বলেই চুপ করে গেল কুটু। রাত তখন সওয়া তিনটে হবে। ঘুম এসে ওদের দু'জনকে পাকাপাকি জাপটে ধরলো। একজনের পেটের ভেতর আরেকজন প্রাণী নড়াচড়া করছিল। তার নড়াচড়ায় মালবিকা ঘুমিয়ে পড়লো। ক্লান্তির সঙ্গে যে এতখানি আরাম মিলে থাকে—তা আগে জানতো না মালবিকা।

কুটু চোখ বুজেই পরিষ্কার দেখতে পেলো—সে আর অমিতাভ বচ্চন মোম মাখানো মেঝের ওপর সুন্দর তালের গানের সঙ্গে নাচছে। গানের গলাটি চেনা। কিন্তু পেছন ফিরে তাকাবার উপায় নেই। তাহলে তালে ভুল হয়ে যাবে। তবু কুটু একবার ফিরে দেখতে গেল। খুব চেনা গলা।

উঁহু। বলে অমিতাভ বচ্চন এগিয়ে এলো। খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায় কুটু।

তোমাকেও—। কে গাইছে বল তো?

তোমার চেনা। এখন ফিরে দেখার দরকার নেই কুটু। তাহলে তোমার নাচের তাল কেটে যাবে।

তা কাটুক না অমিত। একবার চেনা গলার মানুষটাকে দেখবো না?

তোমাদের চেতলার বিশ্বনাথ।

আমাদের বিশ্বনাথ! কোথায়?

উঁহু। পেছনে তা[illegible]চ্ছো কেন কুটু? তাহলে কিন্তু আমাকে ভুলে যাবে তুমি।

না না। ভুলবো কেন? একটু তাকাই।

না কুটু।

একবার তাকাই অমিত?

না। বিশ্বনাথের গলা কত সুন্দর। ও গান সামনাসামনি শুনলে তুমি আর ফিরবে না। আমাকে একদম ভুলে যাবে কুটু।

যাই না ভুলে! তোমায় তো জয়া আছে। হেমা আছে। রেখা আছে। হাজার হোক তুমি তো ফিল্ম-স্টার। এক কুটু গেলে আরেক কুটু আসবে তোমার—

আমি তোমায় ছাড়া থাকতে পারবো না কুটু। এ ভুল কোরো না কুটু। কুটু—

কুটু অমিতাভ বচ্চনের কথা রাখতে পারলো না। ঘাড় ঘুরিয়ে যেই দেখলো বিশ্বনাথ গাইছে—হাসতে হাসতে—সে-হাসিতে দুঃখের ছিটে পড়েছে খানিক—অমনি কুটু ছুটে গিয়ে বিশ্বনাথের হাত ধরলো। বিশ্বাস করো। আমি আর অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে যাবো না।

তুমি যেখানে যাও—তোমায় ফিরে আসতে হবে। দেখো কুটু।

ইস! খুব যে নিজের ওপর বিশ্বাস। চলে তো যাচ্ছিলাম—

একটি বছর কুড়ির মেয়ে যে-বিশ্বাসে প্রেমে পড়ে—ভালবাসে—সেই মন নিয়ে ঘুমের ভেতর তলিয়ে গেল কুটু।

পনেরো

কাগজের বিজ্ঞাপনের খসড়াটা লিখে ফেললো কিরীটী। তাতে একটি লাইনই প্রধান হয়ে উঠলো। খালি গলায় ভালো টপ্পা গাহিয়া থাকেন। বিজ্ঞাপনের শুরুটা এরকম।

বাবা ফিরিয়া আসুন।

আজ প্রায় দেড় বৎসর হইল আপনি নিরুদ্দেশ। এই বয়সে আপনার পলায়নের কোন কারণ নাই। পূর্ণাঙ্গ সংসার করিবার পর আপনি পরমানন্দেই ছিলেন। আপনার এই আকস্মিক উধাওয়ের কারণ শুধু আপনিই ব্যাখ্যা করিতে পারেন।

এটা যেন বৃন্দাবন পালিতকে লেখা কিরীটী পালিতের চিঠি হয়ে যাচ্ছে। কেটে কিরীটী লিখলো, দেড় বৎসরের উপর উধাও পরিণত বয়সের শ্রীবৃন্দাবন পালিতের কোন খবর দিতে পারিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। খালি গলায় ভাল টপ্পা গাহিয়া থাকেন।

বয়স ঠিক জানে না বলেই কিরীটী পরিণত ক[illegible]লিখলো। এখনো তার কানে বাবার টপ্পার তান লেগে রয়েছে। সই, ভালো করে বিনোদ বেণী বাঁধিয়া দিস—

কিংবা—

আমার কাঁচা পীরিত পাড়ার লোকে পাকতে দিলো না—

এমন আরো অনেক। বাবা বড় সদানন্দ মানুষ। বেঁচে থাকলে—যেখানেই থাকুন—সেখানটা মাতিয়ে রেখেছেন। কি হতে পারে বাবার?

কেউ মেরে ফেলতে পারে বাবাকে। কিন্তু কারো সঙ্গে তো তাঁর শত্রুতা ছিল না। হয়ত ভুল করে কেউ খুন করে বসতে পারে।

কিংবা—বাবা হয়তো ট্রেনে কাটা পড়তে পারে। রোজই তো কতই অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে।

আরেকটা জিনিস হতে পারে। মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে—বাবার হয়ত স্মৃতি মুছে গিয়েছে। যাকে বলে বিস্মৃতি—স্মৃতিভ্রংশ। তাঁর মনে নেই—তিনি কে? কোত্থেকে এসেছেন? কোথায় যাবেন? সংসার, ছেলে, বাড়ি-ঘর, আদি গ্রাম, নাতি-নাতনী—সবার কথা চিরকালের জন্যে ভুলে গেছেন। তাই ঠিক এখুনি হয়তো তিনি ঘুরতে ঘুরতে নর্মদার তীরে গিয়ে পৌঁছেছেন। কোন শিশুকে আদর করছেন হয়ত। সেই সময় পূর্বস্মৃতি থেকে গলায় টপ্পা উঠে এলো। কি যেন মনে পড়ে। পড়তে পড়তে একটুর জন্যে আর মনে পড়ে না। সবই ধোঁয়াটে। তখন গানের শেষে অকারণে চোখে জল এসে যায়।

কিংবা বৃন্দাবনের একথাও মনে হতে পারে—এ পৃথিবীতে কেউ মরে না। কেউ জন্মায় না। সাময়িকভাবে আমরা কেউ কারও বাবা—কারও ছেলে—ইত্যাদি। নয়ত আমরা তো চিরকালের মুক্ত আত্মা। এ ঘর-সংসার দু দিনের বই তো নয়। হয়ত টান ভালবাসা ঢিলে হয়ে যাওয়ায় বৃন্দাবন পালিত বেরিয়ে পড়েছেন। আর কোনদিন ফিরবেন না। কোন অচেনা জায়গায় শেষ অব্দি দেহ রাখবেন।

কে?

হামি বড়বাবু।

লোকটি এ এলাকার পুরনো মুচি। কিরীটীর স্টুডেণ্ট লাইফ থেকে দেখে আসছে।

কি-ব্যাপার মটরু?

এক সাহাব আপনাকে ঢুঁড়ছেন—

সাহেব! নিয়ে আয় তো ভেতরে।

মটরু যাকে ভেতরে পৌঁছে দিল—তার হাতে ভি. আই. পি. ব্যাগ। পরনে সাধারণ স্যুট। গলায় টা[illegible]লে করে ঝোলানো। আমি—দিলীপ বসু।

তাই বলুন! বসুন। বসুন। আমি ভাবছিলাম—কোন্ না সাহেব এলো। বসুন। ওখানটায় বসুন। আমার নাম—কিরীটী পালিত। আমিই মালবিকার বাবা—

বেলা দশটা হবে। দিলীপ সরাসরি এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ি ফিরছিল। ট্যাক্সিতে। কি মনে হতে ট্যাক্সি ঘুরিয়ে আদিগঙ্গার গায়ে এখানটায় নিয়ে এসেছে।

আপনার ছেলেরা—বাচ্চু, টাপু ওরা আমায় চেনে।

জানি। আপনার প্রশংসা শুনেছি ওদের মুখে। ওরা তো আপনারও ছেলে। অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি পিতৃত্ব জিনিসটাকে রেশন কার্ড করে ফেয়ার প্রাইস শপ থেকে ঠিক মত ডিষ্ট্রিবিউট করতে পারতাম!

খুব অবাক হলো দিলীপ। কি রকম? সেটা কি করে সম্ভব?

খুব সম্ভব। একটুও কঠিন না। কার্ডে টাকা জমা দিতাম। ভালবাসা, শ্রদ্ধা, স্নেহ, পারিবারিক বন্ধন—সবই নিয়মমত কণ্ট্রোল করা যেত। সাংখ্যদর্শনে আছে মন হল অন্নময় কোষ। সেই অন্ন যদি ফেয়ার প্রাইস শপ বিলি করে—তাহলে জেন্থইন পিতৃত্ব—অপত্য স্নেহ—এসব জিনিসের ভাল বিলি-ব্যবস্থা কেন করা যাবে না?

দিলীপ এখানটায় চোয়াল শক্ত করে কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল।

কিরীটী প্রায় ধমকে থামাল তাকে। কোন সন্তান আদরে গোল্লায় যাচ্ছে। কেউ বা অনাদরে অবহেলায়, মেণ্টাল কেস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কোন পিতা ছেলের ঘাড় থেকে নামছে না। নিজের আনপ্ল্যাণ্ড ফ্যামিলি সে সব পিতা ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে যযাতি হয়ে বসে আছে। আবার কোন পিতাকে ছেলে টাকা পাঠিয়ে মানি অর্ডার রসিদ লণ্ড্রির বিলের সঙ্গে গেঁথে রাখছে—এ সবই পিতৃত্বের সঠিক বিলি-ব্যবস্থায় ঠিক হয়ে যাবে। সপ্তাহে সপ্তাহে কার্ডে টাকা জমা দিতে হবে। সেই টাকায় অনাদরের শিশুর জন্যে স্নেহ, হস্টেল, দুধের যোগান—আবার সেই টাকাতেই অবহেলিত পিতার জন্যে ওল্ড এজ হোম, পুরীতে যাবার টিকিট—সব হবে।

যযাতিদের জন্য কি করবেন?

তাদের জন্যেও কার্ড থাকবে। পুরো আইডিয়াটা এখনো ভাবিনি। ভাবা হয়ে গেলেই পেটেণ্ট করাবো।

পেটেণ্ট? কেন?

নয়ত কেউ মেরে দিয়ে বলবে—সে-ই অরিজিনাল। লক্ষ্য করেছেন—এখন আমরা মানুষরা বেশি ট্যাক্স দিয়েও গাড়ির জন্যে পথ[illegible] দিয়েছি। পায়ে হাঁটার ফুটপাথ ফি বছর সরু করে করে প্রায় শেষ করে আনা হয়েছে।

উপায় কি আর বলুন। গাড়ির জন্যে তো জায়গা চাই।

চাই ঠিকই। কিন্তু মানুষের জন্যেও তো চাই।

গাড়ি তো বেড়েই চলেছে কিরীটীবাবু। আরও বাড়বে।

না। আমার পেটেণ্ট অনুযায়ী গাড়ি আরও কমাতে হবে। কমিয়ে একই

গাড়িতে এখনকার চেয়ে বেশি লোক যাবে।

কোন্ গাড়ি কোন্ দিকে যাবে তা রাস্তার লোক জানবেই বা কি করে? তা ছাড়া গাড়ির মেইনটেনান্স?

কোন অসুবিধা নেই। গাড়িগুলো দিকচিহ্ন লাগিয়ে ছুটবে। সবাই মাস-কাবারি টিকিট কাটবে। সেই টাকায় ড্রাইভার, পেট্রোল, রিপেয়ার, ট্যাক্স—সবই চলবে। কারও গায়ে চাপ পড়বে না। আবার কোন গাড়ি ফাঁকাও যাবে না। এইভাবে ট্রান্সপোর্ট সোসালাইজেশন হয়ে যাবে। অল্প পয়সায় সবাই গাড়ি চড়তে পারবে।

তাহলে গাড়ির বিক্রি কমে যাবে কিরীটীবাবু। গাড়ি কম বানানো হবে। মোটর কারখানায় ছাঁটাই হবে।

সমাজের প্রয়োজনেই তো উৎপাদন। মার্কস তো তাই বলেছিলেন। আমি অবশ্য অতশত বুঝি নে। শোনা কথা। দরকারে মোটর কারখানায় প্রোডাকশন অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

দিলীপ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই এয়ারপোর্টে ছুটেছে। সেখান থেকে এয়ারবাসে কলকাতা। তারপর এই কিরীটী পালিতের মুখোমুখি। এ আইডিয়াটা পেটেন্ট করিয়েছেন?

করাব করাব ভাবছি। কাগজপত্র রেডি হয়ে গেলেই দিল্লি যাব। সেখানে পেটেন্ট করিয়ে নম্বর হাতে নিয়ে তবে কলকাতা ফিরব।

দিলীপের মুখের চেহারা আবার শক্ত হয়ে এল। কিরীটীবাবু, আপনাকে আরও একটা জিনিস ভেবে-চিন্তে পেটেন্ট করাতে হবে।

কোন্টা বলুন তো?

সেই সব ছেলেধরা বাপ-মায়ের কথা বলছি।

কিরীটীর মুখখানা একটুও বদলাল না। বরং হাসি এসে ভাসতে লাগল।

দিলীপ বলছিল, যারা মেয়ে লেলিয়ে দেয়—

আমাদের মালবিকার কথা বলছেন তো?

দিলীপ হ্যাঁ না কি[illegible]তে পারল না।

হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি—সে তো বেয়ান এসে নিয়ে গেছেন তাকে।

বেয়ান?

আপনার স্ত্রী। তা আপনার ছেলের বউকে কি আমি বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবো! মালবিকা তো আপনাদের বাড়িতে। বলেই হো হো করে হাসতে লাগল কিরীটী।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আপনি দিল্লি থেকে এই ফিরছেন ? চা খাবেন না ?

কোন জবাব না দিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল দিলীপ। তারপর কয়েক লাফ দিয়ে একদম রাস্তায়। ট্যাক্সিওয়ালা অস্থির হয়ে পড়েছিল।

লিফ্‌ট দিয়ে ওপরে উঠেই বেল টিপল দিলীপ। একটু পরেই দরজা খুলে দিল মালবিকা। ভেতরে ঢুকতেই নতুন শাড়ির গন্ধ ছড়িয়ে মেয়েটি তাকে প্রণাম করল নিচু হয়ে। প্রায় পথ আটকে। দিলীপ সরে দাঁড়াতে পারল না—কিংবা, পিছলে সরে যেতেও পারল না।

একা একাই নিজের ঘরে গিয়ে দিলীপ একটু বাদে ফ্রেশ হয়ে এল। বুঝলো, রাণী আর কুটু কাছাকাছি বেরিয়েছে। মেয়েটি আবার রবির ঘরে গিয়ে সেঁধিয়েছে।

এয়ারবাসে বসে যে কাগজ পড়ে পড়ে শেষ—সেখানাই আবার উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলো দিলীপ। তার বুকের ভেতরটা জ্বলে লাল হয়ে যাচ্ছিল। আমি রবিকে নিয়ে অনেক আশা করেছিলাম। অনেক। অনেক রকমের—আর হয়ে গেল কি। কিছুতেই দিলীপ পেছন ফিরে রবির ঘরে তাকাতে পারছিলেন না।

এবার ডোরবেল বাজতেই দিলীপ উঠে গিয়ে দরজা খুললো। রানী আর কুটু।

কুটু বললো, কখন এলে বাবা ? চা দিয়েছে বৌদি ?

বৌদি ?

দিলীপের খিঁচিয়ে ওঠা চোখ মুখ দেখে রাণী শান্ত গলায় বললো, আমার হাতের চুড়িগুলো ভেঙে মালবিকার জন্যে একজোড়া বালার অর্ডার দিয়ে এলাম।

বালা ?

হ্যাঁ। টেবিলে গিয়ে বোসো। ওই তো মালবিকা চা করে এনেছে।

মাথার ঘোমটা সামলাতে সামলাতে মালবিকা প্লেটসমেত চায়ের কাপ রাখলো টেবিলে। ঠক করে।

আমাদের বাড়িতে এত ঘোমটা দিতে হবে না মা [illegible]রকে প্রণাম করেছো ?

দূর থেকে মালবিকা মাথা নাড়লো। কুটু এগি[illegible]গিয়ে ঘোমটাটা [illegible]য়ে দিল। দিলীপ আগের মতই রাগে রাগে বললো, শ্বশুর ?

রাণী হেসে বললো, হ্যাঁ। ঠিক তাই। যাও। টেবিলে বসে চা খেয়ে নাও।

ঠিক মালবিকার সামনে পারলো না দিলীপ। মেয়েটি সম্ভবত আবার চা করতে ঢুকলো কিচেনে। সেই সময় দিলীপ রাগে ফেটে পড়লো। কী ভেবেছো তোমরা ?

যে মেয়ের বিয়েই হয়নি—তাকে প্রেগনাণ্ট অবস্থায় বাড়িতে এনে উৎসব লাগিয়েছো। গয়না বানাতে দিয়ে এলে? ওকে রবির বউ বলে মানবে সবাই? তোমাদের লজ্জা করে না? আইনের চোখে এভাবে রবি বাবা হতে পারে?

তোমার লজ্জা করে না? একটা বাঙালী বাড়ির মেয়ে এ-অবস্থায় কোথায় যাবে? আমাদের রবি কি সব চেয়ে বেশি দায়ী নয়? অন্যকে দোষী করে কি লাভ হবে। যাও বাজার করে এনে দু-চারজনকে খেতে বলো। আমি ঘরটর সাজিয়ে দিয়ে কাল পাড়ায় ছেলেদের দিয়ে উৎসব করিয়ে দিয়েছি।

কিসের উৎসব? এ বিয়ে আমি মানি না।

আর ছেলেমানুষী কোরো না। এখন বয়স হচ্ছে আমাদের। যাতে আমাদের ছেলে-মেয়েরা খুশী হয়—এখন থেকে আমরা শুধু তাই করব। ওদের সুখেই আমাদের সুখ।

রবি বিয়ের কি বোঝে?

আস্তে কথা বল। বউমা শুনতে পাবে।

বউমা?

হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। ছেলে-মেয়ের বাপ হতে পারে—আর বিয়ের কিছু বুঝবে না রবি! ঠাণ্ডা হয়ে বসো। ভাল কথা—দিল্লিতে কেমন ছিলে?

ভালোই। আমাদের রবিকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে।

তোমার ছেলে পুলিসকে ফাঁদে ফেলে চরকি নাচন নাচাচ্ছে—আর তাকে ফাঁদে ফেলবে একটা সরল মেয়ে! যাও। উঠে গিয়ে বউমাকে দুটো ভাল কথা বল। লোকজনকে খেতে বল।

আমি পারব না রাণী। রবি এভাবে আমার সব নষ্ট করে দিল!

ওভাবে দেখছ কেন? মেয়েটি তো ভাল। বড় সরল। সিধে। তোমার ছেলে যে কোনদিন বেঁচে ফিরে আসবে—তারও তো কোন ঠিক নেই।

এ অবস্থা চিরকাল থাকবে না। সব ঠিক হয়ে যাবে এক সময়।

হলো। তাতে কি হবে?

ফিরে আমি রবির [illegible] দেব।

ছেলেমানুষীর আর শেষ নেই। যাও—বউমা বলে দুটো ভাল কথা বলে এসো। আমাদের কুটুর চেয়ে সামান্য বড় হবে। আমাদেরই মেয়ের মত। মত কেন? মেয়েই তো। হাজার হোক রবির বউ—বলে কান্না এসে যাচ্ছিল রাণীর চোখে। তবু সে কঠিন করে তাকিয়ে থাকল।

আমি পারব না রাণী। এ বিয়ে আমি মানতে পারছি না। আমায় ক্ষমা

কর। রবিকে নিয়ে আমি অন্য রকম ভেবেছিলাম—

তা পারবে কেন। তোমার মেয়ের বয়সী একটা মেয়েকে পথে না ভাসালে নয়! যাও! চান করে এসে বাজার ঘুরে এস। মালবিকার মা-বাবা-ভাইদের নেমন্তন্ন করে এস।

আমি পারব না রাণী। ওর ভাইদের আমি চিনি—তারাও আমায় চেনে। কিন্তু আমি পারছি না।

তা পারবে কেন? থাদান থাদান করে মাতলে কিছুদিন। ছেলেটা কোথায় গেল—কি করল—সে খোঁজ নাওনি। দালালীর পয়সায় নয়-ছয় করে বেড়ালে।

নয়-ছয় করিনি রাণী। তার অনেকটাই গেছে—শেয়ারের টোপ গাঁথতে।

সবটাই নয় তো!

না।

তা দিয়ে গাড়ি দেখে বেড়িয়েছ। কিনছ। বেচছ। এই মাসখানেক ধরে গাড়ি সারালে। আর অমনি কি হল—বেচে দিলে—

আজকাল আমার কিছু ভাল লাগে না রাণী। কিছু না। আমার জীবনটাই কি হয়ে গেল!

আর আমাদের? আমাদের দিকে তুমি ফিরে তাকাও কখনও?

কেন? কোন কাজ তো বাকি রাখিনি। যা দরকার—সবই ব্যবস্থা করেছি।

তুমি নিজে কখনও আমাকে নিয়ে সিনেমায় গেছো? নাটক দেখতে গেছো?

সময় হয়নি।

ইচ্ছে থাকলেই সময় করা যায়। তারপর আবার ফ্ল্যাটের কিস্তি দাওনি ছ' মাস।

ও দিয়ে দেব ঠিকই।

অনেক জমে গেছে কিন্তু।

আমার খেয়াল আছে রাণী।

ভাল—বলে রাণী উঠে গেল। উঠতই সে। মালবিকা চা বানিয়ে আনছিল। রাণী এগিয়ে গিয়ে কাপটা ধরে ফেলল। তুমি সকা[illegible]ল চান সেরে নাও। আজ তোমায় নিয়ে একটু কালীঘাটে পুজো দিতে যাব।

দিলীপ এসব কথায় কান দিচ্ছিল না। কিন্তু সবই তার কানে আসছিল। রবির ফাঁকা খাটের স্ট্যাণ্ডে বাসি বকুল মালা পাখার হাওয়ায় দুলছিল। দিলীপ গিয়ে বারান্দায় দাঁড়াল। সবই আগের মত চলছে। শুধু সে আর আগের মত নেই। বেলা এগারটা সাড়ে এগারটা হবে। শীত চলে যাবে বলে এরই ভেতর

বাতাসে রোদের তাত। এইটুকু তাতে এখন কষ্ট হয়। আর গত দু-বছরে লোড শেডিংয়ের ভেতর সিঁড়ি বেয়ে নেতাজী সুভাষ রোডের কত বাড়িতে উঠেছে দিলীপ। ওপরে উঠে গিয়ে রিসেপশনে বসে থেকে দম ফিরে পেয়েছে। তারপর সুইং ডোর ঠেলে ফার্সিলাইজার, অ্যালামের কোম্পানির বড় কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছে সে। তখন তো গরম লাগেনি। অথচ এই সিঁড়ি ভাঙাভাঙি সে করেছিল প্রচণ্ড গরমের ভেতরই। ভাদ্র মাসের এই গরম—এই বর্ষার ভেতর। সন্ধ্যেবেলা যেই ঋষি বলেছে—দিলীপ তুই একটা মিরাকেল!—অমনি সারা দিনের সেদ্ধ হওয়া সে ভুলে গেছে। গোকুল দত্ত তখন নিজের প্লেট থেকে মাছভাজা এগিয়ে দিয়ে বলেছে—নে, খা—

কুটু এক সময় বলল, চান করে এস বাবা। আমাদের হয়ে গেছে। এক সঙ্গে খাব সবাই।

তোমরা খেয়ে নাও।

মা কালীঘাট ঘুরে আসুক বৌদিকে নিয়ে। তারপর তো সবাই খেতে বসব। তুমি চান করে এস সেই ফাঁকে।

কোন জবাব দিল না দিলীপ।

অফিস যাবে না আজ?

না।

মালবিকাকে নিয়ে রাণী বেশ বেলায় ফিরল কালীঘাট থেকে। তখন কুটু ঘুমোচ্ছিল এক ঘরে। দিলীপ আরেক ঘরে।

রাণী এসে ঘুমন্ত দিলীপের সামনে দাঁড়াল। নিজের মনে মনে বলল—ভয়ংকর ক্লান্ত। মুখে বলল, মালবিকা—ওঁর গায়ে একটা চাদর দিয়ে দাও—

বাইরে তখন আকাশ মেঘলা হয়ে এসেছে। মালবিকা বলল, যদি জেগে যান—

যাবে। তাতে কি?

রেগে যেতে পারেন—

না না। বলেও নিজের মনের ভেতর রাণী পরিষ্কার দেখতে পেল—মালবিকাও কষ্ট পাচ্ছে। ভীষণ ক[illegible]ই ঘটছে নিজেদের ভেতর। অথচ তার কিছু করার নেই।

দিলীপ জাগতে জাগতে পেল—তার গায়ে একখানা পাতলা সুতীর চাদর বিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চাদরের ওপাশে একখানা ভীতু মুখ। খুব সুন্দর সরল। মালবিকার মুখ। দিলীপ আবার চোখ বুজল।

তখন বাইরে অকালে বৃষ্টি হচ্ছিল।

সেই বৃষ্টির ভেতর টাপু আর বাচ্চু—দুই ছেলেকে নিয়ে—তাদের বাজনাপত্তর গুছিয়েগাছিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল কিরীটী পালিত। আজ পি. এম. জি.র সামনে ফাংশন। অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের। বাচ্চু বাজাবে ড্রাম। টাপু স্প্যানিশ গিটার। বিশ্বনাথ আগে চলে গেছে। সে গাইবে গান। পি. এন. টি.র সেণ্ট্রাল হলে।

ট্যাক্সিতে বসে কিরীটী বলল, আমরা হলাম গিয়ে মিউজিসিয়ানের ফ্যামিলি। বাবা খালি গলায় গাইতেন। আমি কেরামতুল্লার সঙ্গে তবলায় লহরা করেছি বয়সকালে। তোরা বাজাস বাজনা।

টাপু বলল, কিন্তু বাবা—আমরা তো ওয়েস্টার্ন বাজাই। তোমার পি এম. জি.র ভাল লাগবে ?

লাগবে রে লাগবে। চাই কি তোর একটা চাকরি হয়ে যেতে পারে। পি. এম. জি. সব পারে।

পারে বাবা। কিন্তু যে জিনিস বোঝেন না—তা তাঁর ভাল লাগবে ?

ওয়েস্টার্ন তো রবীন্দ্রনাথ কথা বসিয়ে গান বেঁধেছেন। তেমন একটা বাজাবি ! বিশ্বনাথ গাইবে।

বিশ্বনাথ তো হিন্দি ছবির গান গায়। আমরা বাজাই পিওর ক্ল্যাসিকাল।

দু-একটা ফোক-টোক—

তা জানি অবশ্য।

তাই বাজিয়ে দিবি। তাতেই চলবে।

তোমাদের হলের অ্যাকাউস্টিকস্ কেমন ?

সেটা কি ?

সাউণ্ড এফেক্ট কেমন ?

ভালই। অ্যান্যুয়াল প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হয়। পি. এম. জি. লেকচার দেন। একবার সেণ্ট্রাল কম্যুনিকেশন মিনিস্টার স্পিচ দিয়েছিল। ভালই তো। পরিষ্কার শোনা গিয়েছিল। তবে হ্যাঁ, একটু গমগম করে।

বাচ্চু হেসে ফেললো। ওই তো মুশকিল বাবা। ওই গমগমটাই—

তোরা কি চিরকাল বাজনা বাজিয়ে যাবি ? আমি রিহার্সাল দিবি একতলায় বসে ? আমি তো বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।

টাপু বললো, আমি—দেখো তুমি—বড় সুরকার হবো। মিউজিক ডাইরেক্টর। পার পিকচার তিন লাখ। বম্বেতে—

তা দেখতে ততদিন আর আমি বেঁচে থাকবো না। আমি বেঁচে থাকতে থাকতে

কিছু একটা কর। মালবিকা তো শ্বশুরবাড়ি চলে গেল।

বাচ্চুর চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। রবিকে পেলে আমি তলপেটটা ফাঁসিয়ে দেব।

ছিঃ! তোমাদের ভগ্নীপতি হয়।

টাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, ভগ্নীপতি! আমাদের বোনের মত অ্যাথলেট সারা কলকাতায় কটা আছে? মালবিকা কিছু ফেলনা মেয়ে নয়। হাতে পেলে ভগ্নীপতির খোমা পালটে দিতাম।

খোমা মানে কি রে?

ও তুমি বুঝবে না। মুখের চেহারার নাম খোমা। মেরে উল্টো করে দিতাম। বড় বিপ্লবী আমার! রবির বাবা তো আমাদের চেনে। সে জানে না—আমরা কি জিনিস?

তোমাদের গুরুজন এখন।

ওরকম অনেক গুরুজন দেখা আছে আমাদের—। তবে লোকটা খারাপ না বাবা। দিলদরিয়া আছে। আমরা বললে টু পাইস খসায়।

লোকটা লোকটা করছিস কেন? তোদের বোনের শ্বশুর হন।

হ্যাঁ। আমায় একবার ব্লাফ দিয়েছিল। আমাদের জন্যে একটা অ্যামপ্লিফায়ার কিনে দেবে। ঠিক ছিল—আমরা মাসে মাসে ফাংশন করে দাম শোধ করে দেব। তা সে আর কেনার নাম নেই।

হয়তো কোন কারণে পারেননি

না বাবা। এমনিতে অবস্থা ভালো। প্রায়ই গাড়ি বদলায়। বিলিতি দিশী—

তা একজন বদলাতেই পারে। পুরনো গাড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া—বদলানো সারানো অনেকেরই নেশা। এ তো বেশি পয়সার ব্যাপার নয়।

বাচ্চু বললো, নারে দাদা—একটা বেচে আবার একটা কেনে দেখেছি। তিন মাস ধরে সারায়, রং করায়—কিছুকাল চড়ে আবার বেচে দেয়। ওই এক নেশা লোকটার। এদিকে যে ছেলেটা ভেসে বেড়াচ্ছে—সেদিকে খেয়াল নেই—

মনে মনে হাসলো কিরীটী। বাবাদের কেমন হওয়া উচিত তাই নিয়ে ছেলেদের সমালোচনা। হয়তো [illegible]াকে নিয়েও ওরা এমন ক্রিটিসাইজ করে থাকে। আমার মেজো ছেলেটা—[illegible] যে কেন গান-বাজনায় ভিড়লো না জানি না। ভিড়লে বোধহয় ভালই হতো। বউ মারা যেতে আবার বিয়ের বাই উঠেছে। অথচ এদিকে ওর ছেলে সবে হামাগুড়ি ছেড়ে টলে টলে হাঁটতে শিখেছে।

হ্যাঁরে টাপু—খোকনকে তোদের দলে নিস না কেন?

ও এলে তো। অফিস থেকে ফিরেই তো জুয়ো খেলতে বসে।

কেমন খেলে ?

সেদিকে সেয়ানা। যা নিয়ে খেলতে বসে—তার চেয়ে বেশি নিয়ে ওঠে রোজই।

তোদের কিছু বলে টলে ?

কি বলবে বাবা ?

এই আর কি—ফিরে বিয়ে-থার কথা।

টাপু গম্ভীর হয়ে গেল। বাবা, ও যখন আবার বিয়ে করতে চায়—তাহলে দিয়ে দাও। বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। আপত্তি করলে আবার আগের বারের মত লুকিয়ে বিয়ে করে আসবে।

তুই তো আমার বড ছেলে। তুই বিয়ে-থা করবি না ?

এখন বিয়ের কোন কোশ্চেন ওঠেই না। ওয়েস্টার্ন ক্ল্যাসিক শিখতে আমাকে এখনো অনেকদিন খাটতে হবে বাবা।

খাটতে গিয়ে যদি বিয়ের বয়স চলে যায়—

যাবে।

ধর্ যদি আমি মরে যাই আচমকা—সংসার চলবে কি করে ?

চালিয়ে নেব কোনরকম করে। বাড়ি ভাড়া তো আর লাগছে না। অনেকের তো ও অবস্থায় বাড়িও থাকে না।

তোর কি টাপু বিয়েরও ইচ্ছে করে না ?

না বাবা। ওকথা মাথায় আসেনি। বরং একটা যদি অ্যামপ্লিফায়ার করে দাও আমাদের—

দাঁড়া, রেলের কমিশনটা পাই আগে।

সন্ধ্যেবেলা পি. এন. টি.র সেন্ট্রাল হল থেকে বাচ্চু আর টাপু ফিরলো। বাজনা, গান—দুই-ই খুব জমেছিল। অনেকবার হাততালি পড়েছে। ফিরে ফিরে বাজাতে হয়েছে। কিরীটী ফিরতে পারেনি। ওদের হাতে ট্যাক্সি ভাড়া ছাড়াও তিরিশটা টাকা দিয়ে বলেছে—তোরা এগো। আমি আজ চাকরির কথাটা পি. এম. জি.র কাছে পাড়বো।

কেন শুধু শুধু চেষ্টা করছো। আমাদের কোন চাকরি হবে না বাবা। বরং আরও কুড়িটা টাকা দাও।

যা ছিল তাই দিলাম। এখন যা। কথা পাড়ার এমন সুযোগ আর আসবে না, পি. এম. জি. দেখছি ভালো মুডেই আছেন—

বিশ্বনাথকে নিয়ে বাচ্চু বাজনাপত্তর সুদ্ধ ট্যাক্সিতে বাড়ি চলে গেল। টাপু

নেমে পড়লো মোমিনপুরের মোড়ে। ময়ূরভঞ্জ রোডের একটা চেনা ঠেক ছিল তার। হাঁটতে হাঁটতে সেখানে গিয়ে হাজির। সামনের দিকে সাইকেল সারানোর দোকান। পেছনে রীতিমত গুলতানি। আবগারি ডিপার্টমেন্টের এক ঘুঘু ড্রাইভারের প্রাইভেট বার। সবই পাওয়া যায়। এক নম্বর জিনিস। দাম সস্তা। শৈলেশ দাশ মিউজিক ডাইরেক্টর জায়গাটা চিনিয়েছিল তাকে। শৈলেশবাবু একটা ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক করিয়ে নিয়েছে টাপুকে দিয়ে। আজও তিনশো টাকা পায় টাপু। শুধু ঘোরাচ্ছে। দেবার নাম নেই।

একটু নীরেস রাম—এক টাকা পেগ। কলকাতার শুধু আমর্ড কনেস্টবলদের মেসে এ দরে পাওয়া যায়। দুটো খাওয়ার পর টাপুর ভালোই লাগতে লাগলো। রাস্তার সামান্য ছিট ছিট বৃষ্টি। ইন্সট্রুমেন্টস থাকলে আজ যে কোন জায়গায় বাজাতে পারে টাপু। সে একা নয়—তার দল। যা কিছু বাজনাপত্তর একটু একটু করে কিনেছে টাপু। নীলামে। চেনাশোনার ভেতর। এই খিদিরপুর, মোমিনপুর, হেস্টিংসের ওখানকার ব্রীজ, গার্ডেনরিচের তোলা ব্রীজ—এ জায়গাগুলো তার এক এক সময় আশ্চর্য লাগে। বৃষ্টির দিন এক চেহারা। সন্ধ্যে রাতে আরেক। মুন্সীগঞ্জে ডক্টর হকের চেম্বারে রুগীদের লাইন—শিককাবাবের দোকানের চুলো থেকে আগুনের শিখার লাফালাফি—রাস্তা জুড়ে অনেক রকমের মানুষ, হাতটানা রিকশা—সব মিলিয়ে টাপুর চোখে রং ধরে যায়। এইসব চলন্ত মানুষ, চলন্ত জিনিসপত্তরের ভেতর থেকে তার চোখে একরকমের রং উঠে আসে। তখনই তার মনে গুনগুন করে সুর আসে। এই চলন্ত পৃথিবীর সুখ। সারা শরীর কাঁপতে থাকে। তখন জ্বর এসে যায় শরীরে। ঠোঁট ফেটে যায় টাপুর। যদি একটা নির্জন স্টুডিও থাকতো! তাহলে টাপু সেখানে ছুটে গিয়ে সুরটাকে ধরে রাখতো—বাজনায়—পারলে কথা বসিয়ে। এ খেলায় টাপুর বড় স্বাদ।

অল্প জলে নীরেস রাম, বরফের টুকরো, আদার কুচি, ছোলা ভিজে, নুন—ব্যাস। দিব্যি লাগছিলো খেতে। পি. এন. টি.র সেণ্ট্রাল হল। একটু আগে টাপুর সুরে বাজনা শুনে হাততালি দিয়ে হলের ছাদ ফাটিয়ে দিয়েছে।

অল্প আলোয় [illegible]শ-বারো খদ্দের নিরিবিলিতে খাচ্ছিলো। তাদের ভেতর থেকে রোগা মত একজন উঠে দাঁড়াতেই টাপু চিনতে পারলো। তার বউ-মরা ভাই। তুই এখানে কেন?

টাপুর এ কথায় খোকন ক্ষেপে দাঁড়ালো। হকের পয়সায় খাই। তোর মত বেকার নাকি আমি। সারাদিন পিড়িং পিড়িং।

টাপু হাসলো। তা তো বলবিই। তারপর তিন তাসের খেলাতেও তো তোর

হাত খোলে ভালো। সে-পয়সাগুলো করিস কি ?

গুড়াই।

বাবাকে দিস কিছু ?

সে-খবরে তোর দরকার কি ?

না। ব্যাংকে জমাতে হচ্ছে তো তোকে।

খোকন বেরিয়ে যাবার মুখে রুখে দাঁড়ালো। সে-খবর তোকে দিলো কে বড়দা ?

চেতলায় অনেকেই তো ব্যাংকে কাজ করে। এ আর জানতে অসুবিধা কিসের। তা ভালো। জমিয়ে যা। আবার যখন বিয়ের ইচ্ছে হয়েছে—তাহলে তো টাকা লাগবেই।

অন্য খদ্দেরদের অসুবিধে হচ্ছে দেখে দু ভাই রাস্তায় বেরিয়ে এলো। এখন বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বেশ বড় আর ভারি। সঙ্গে বাতাস। সে বাতাসে সাইকেল মেরামতির দোকানের ঝোলানো ড্রুম দুলছে।

খোকন বললো, আলবৎ জমাবো। তোর মত লম্বা চুল রেখে বাজনা বাজিয়ে বেড়াই না আমি। পার্মানেন্ট বেকার নই। আমি এদেশের একজন রেসপেক্টেবল সিটিজেন।

টাপুর মায়া হচ্ছিলো ছোট ভাইয়ের জন্যে। একা একা ফিরতে পারবি ?

কেন পারবো না। আমি তো মাতাল হয়ে যাওয়ার জন্যে নেশা করি না।

বেশি বকাসনি। টেনে একটা চড় কষাবো। মাতাল হওয়ার জন্যে নেশা করে না! বলে টানতে টানতে টাবু একটা দাঁড়ানো ট্যাক্সিতে তুললো খোকনকে। ড্রাইভারকে বললো, চেতলা। নতুন পুল।—তারপর ঝুঁকে পড়া খোকনকে বললো, ফিরে বিয়ে করলে তোর বাচ্চাকে কে দেখবে ভেবেছিস একবারও ?

সবাই দেখবে।

না। তখন তোর ওপর কারও সিমপ্যাথি থাকবে না।

না-ই থাকলো বড়দা। ওর মা এসে দেখবে ওকে—

কোথেকে আসবে! সে তো আর নেই।

দিব্যি দেখবে ওকে। স্বর্গ থেকে নেমে এসে—। সেসব নিয়ে তোমাদের কোন চিন্তা নেই বড়দা—

তুই তো প্রেম করেই লাভ ম্যারেজ করেছিলি। বাবার ইচ্ছে ছিলো না। মায়ের ছিলো না। তাও তো জেদ করে বিয়ে করলি। আর এখুনি—মারা যেতে আবার বিয়েয় বসার ইচ্ছে হলো ?

আঃ! সেই থেকে বকবক। প্রেম ভালোবাসার তুমি কি বোঝো বড়দা? নেশাটাই নষ্ট করে দিলে। কখনো কোন মেয়ের সঙ্গে মিশেছো?

টাপু কোন জবাব দিলো না। একা একাই অন্ধকার ট্যাক্সিতে হাসলো। চাকার নিচে জজকোর্টের সামনেকার রাস্তার ট্রামলাইন।

খোকন জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, সংসারে টাকা দিতে পারলে আমার বাচ্চাকে সবাই ভালোবাসবে। আদর করবে। না দিতে পারলে—কেউ ফিরেও তাকাবে না—

এই বুঝি তুই জেনেছিস!

তোমার মুখে বড় কথা মানায় না বড়দা। এখনো তুমি সংসারে একটা পয়সা দিতে পারলে না—

তা পারিনি—

মালবিকার মত ট্যালেনটেড মেয়েকে রবির মত একটা লোফার সুযোগ নিয়ে ইনসাল্ট করলো। আমাদের সারা ফ্যামিলির অপমান। আমরা রবিকে ছেড়ে দিলাম। কিচ্ছু বলিনি। স্রেফ চাঁদির জুতো মেরে রবির মা মালুকে নিয়ে গেল। আমরা একটা কথাও বললাম না বড়দা। এর চেয়ে অপমান আর কি হতে পারে। আমাদের টাকা থাকলে মালুর জীবনটা এরকম হতো?

টাকা তো তোর আছে। তুই তো কিছু করলি না।

আমার একার টাকায় হবে কেন? সবাই মিলে দিয়ে মামলা তোলা যেত কোর্টে।

তাতে আমাদের বোন কষ্ট পেতো।

কেন?

এটুকুও বুঝিস না। হাজার হোক মালবিকা তো রবিকে ভালোবাসে।

উঃ! চুপ করো বড়দা। আবার সেই ভালোবাসা! ভালোবাসা এত সস্তা নয়। তাতে বুকের ভেতরে একা একা রক্ত পড়ে। সে তুমি বুঝবে না।

ট্যাক্সি এসে পালিত বাড়ির সামনে থামলো। নিজের ছোট ভাইকে এর আগে কোনদিন টাপুর ট্যাক্সি থেকে টেনে নামাতে হয়নি। একতলাতেই ওর বিছানা। এ-বিছানায় বছর দুই আগেও ওর পাশে দাদু শুতো। ভোর রাতে গান গাইতো দাদু। টাপুর নেশা একদম হয়নি। সব কেটে গেছে।

খোকনকে শুইয়ে দিয়ে টাপু সারা বাড়ি ঘুরলো। একজন লোকও বাড়ি নেই। বাচ্চু এসে বাজনাপত্র গুছিয়ে রেখে চলে গেছে। বাবা তো ফেরেনি। মা নিশ্চয় নবগ্রহ মন্দিরের ওখানে কথকতার আসরে। মালবিকা চলে গিয়ে বাড়িটা একদম খালি।

একা একাই সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংয়ে বসে পড়লো টাপু। নীলাম থেকে কেনা ছোট গিটারটা হাতে নিলো। লণ্ডন স্কুল অব মিউজিকের পরীক্ষায় বসছে সামনের মাসে। এখানে সব কোশ্চেন পেপার আসবে। সেগুলো ফি নিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করবে পার্ক সার্কাসের একটা মিউজিক স্কুল। সে পরীক্ষায় পাস দিলেই টাপু একটা চাকরি পাবে। কথাই হয়ে আছে। ব্যারাকপুর পুলিস ট্রেনিং স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত বাজানোর কাজ। সম্মানের চাকরি। ইনক্রিমেণ্ট আছে। বড় বড় অনুষ্ঠানে পুলিস ব্যাণ্ড কণ্ডাক্ট করতে হবে তাকে।

আনমনেই গিটারে ছায়ানটে তার দোলাতে লাগলো টাপু। সঙ্গে স্ট্রোক। তারের ওপর হাতের লোহাটা ঘষে ঘষে।

অল্প লইয়া—

ধ্যাৎ! বাকি কথাগুলো মনে নেই। ছায়ানটের ওপর রবীন্দ্রনাথের কথা বসানো।

নজরুল বসিয়েছিলো অন্যভাবে। একই সুরের ওপর—

শূন্য এ বুকে—

ভালো কথা। খোকনের ছেলেটা কোথায় গেল? গিটার রেখে ফাঁকা বাড়িতে টাপু ডেকে উঠলো। জ্যেঠু। ও জ্যেঠু। নিশ্চয় ঠাকমার সঙ্গে কথকতায় গেছে। নয়তো বাচ্চুর কোলে চড়ে পাড়ার দোকানে। মহা পাড়াবেড়ানী।

বাপ হয়ে ছেলের খোঁজ নেওয়ার সময় নেই। উল্লুকটা বিছানায় পড়েই ভোস্ ভোস্ করে নাক ডাকছে। কাল সকালে জেগে উঠে বেকারির চাকরি। ফাঁক পেলে—তিন তাস! ফাইন!

ষোল

সন্ধ্যের দিকে একা একা ঘুরতে ঘুরতে দিলীপ বসু হাজরার মোড়ে চলে এলো। হাঁটতে ভারি সুন্দর লাগে। হাত পায়ে যেন জং ধরে ছিলো এতদিন। চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের ঝুলবারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রেগনাণ্ট মেয়েরা রাস্তা দেখছিল। ভবানীপুর থানার গায়ের রাস্তায় অ্যাকসিডেণ্ট গাড়িগুলো।

চব্বিশ-পঁচিশ বছরের ছেলেরা আশুতোষ কলেজের গেটে দাঁড়িয়ে গেটমিটিং করছে। আমি ওখান থেকেই গ্রাজুয়েট। এখন আমি মধ্যবয়সী গৃহস্থ। মুণ্ডুটার ওজন অন্তত পনেরো কে-জি। বুকের ছাতি পঁয়তাল্লিশ। শরীরে যেখানে হাত রাখি —সেখানে থক থক করছে মাংস।

পানের দোকানে দাঁড়িয়ে সিগারেট নিতে গিয়ে দিলীপ দেখলো, তার ভ্রূ বলতে আর কিছু নেই। একদম মুছে গেছে। চোয়ালের দু' ধারে দুই খাবলা চবি। চোখে কোন আলো নেই। এ কোন্ দিলীপের মুখ?

এই মুখখানা একসময় তার বন্ধুদের হাসাতো। বান্ধবীদের চোখে আলো এনে দিতো। শরীরটা এখন তার বোঝা লাগে। আগে এই শরীরটাই ছিল স্প্রিং।

হাঁটতে হাঁটতেই কালিকা সিনেমার সামনে স্কুলজীবনের ক্লাসফ্রেণ্ড—এখন মোটা ভিজিটের ডাক্তার—বংশীর কাছে গেল।

বংশী সব দেখেশুনে বললো, তোর তো আইয়োডিন দরকার শরীরে। একদম কোন সিক্রিসন নেই। থাইরয়েড গ্ল্যাণ্ডের গণ্ডগোল। তোর খুব বেশি করে হাঁটা দরকার।

এ রোগের কারণটা কি বল্ তো?

কারণ? অনেক কিছুই হতে পারে।

যেমন?

টেনশন।

সিমটম্?

জেনে কি করবি দিলীপ! শরীর থাকলেই রোগ থাকবে।

তবু এ-রোগের গোলমালটা কি?

খিদে পাবে খুব। আস্তে আস্তে কিডনি, লিভার—সব জখম করবে।

তাই নাকি?

শেষে হার্টকে ট্রাবল্ দেবে দিলীপ।

কিভাবে?

তোর ওজন বাড়তেই থাকবে। অলস লাগবে শরীরটা। যা খাবি—তাই হজম।

তাহলে তো ভালোই।

ওটাই খারাপ দিলীপ। তুই প্রোটিন আয়োডিন টেস্ট করা আগে। ওজন বাড়তেই থাকবে। তোকে রিলাকস্ড্ থাকতে হবে। তাহলে টেনশন তোকে ছুঁতে পারবে না। এক ফাঁকে সমুদ্রের তীরে ঘুরে আয়। প্রচুর আয়োডিন সমুদ্রের মাছে। ম্যাকারেল মাছভাজা খাবি। তাহলেই সেরে যাবি।

বংশী ডাক্তারের চেম্বারে কেওড়াতলা ক্রিমোটেরিয়ামের উজ্জ্বল মার্কারি আলো। এ আলোতে পোকা পর্যন্ত চকচকে লাগে। দিলীপ কথা বলছিলো, আর পরিষ্কার বুঝতে পারছিলো, জীবন মানে ডাক্তার। জীবন মানে গ্ল্যাণ্ড—টেনশন, ওষুধ, মাংস,

ওজন। এবং টাকা। সব কটা জিনিসের শেষে আরেকটা জিনিস—আয়ু।

পরদিন সকালে দিলীপের ঘুম ভাঙলো। রাত্রি সওয়া চারটেয়। কাছাকাছি কোন মসজিদে মাইকে আজান দেওয়া হচ্ছিল। দিলীপ বস্তু কেডস্ পায়ে দিয়ে হাঁটতে বেরিয়ে পড়লো। চেতলার দিশী কুকুররা তাকে বোধহয় চেনে। কিন্তু সাহানগর রোডের খাঁটি দিশীরা কিছুতেই তার পেছন ছাড়ে না। সকালবেলায় পাতলা ঠাণ্ডা বাতাস। জীবনটা যেন এইমাত্র শুরু হলো। এক এক পাল কুকুর দিলীপকে দেখে এগিয়ে আসে—আর, দিলীপ অদৃশ্য ঢিল হাতে নিয়ে ছুঁড়ে মারার নকল পোজ দেয়। অমনি কুকুরগুলো পিছিয়ে যায়। ওরা যে যার এলাকার দখল প্রমাণে ব্যস্ত।

একসময় হাল ছেড়ে দিল দিলীপ। সে রাস্তা পালটে সদানন্দ রোড দিয়ে হেঁটে চলেছে। পেছনে তিনটি দিশী কুকুর বাঁয়ে ঘেঁষে এগোচ্ছে। ওরা তিন ভাই বা তিন বোন হবে। কারণ চোখের এক জায়গা দিয়ে কালো ছোপ। ডাইনে মাত্র একটি—কিন্তু বেশ মোটাসোটা। পেছনের একটা পা টেনে চলে। চোখজোড়া ঘোলাটে। গলায় শুধু একটিই আওয়াজ—ভুগ্। ভুগ্ ভুগ্।

যে-পাড়া দিয়েই দিলীপ হাঁটে—সেখানকার লোকাল স্ট্রীট ডগরা তাকে ফলো করে। কি খেয়াল হতে দিলীপ হাঁটতে হাঁটতে একদম অফিস পাড়ায়। হাতঘড়িতে সওয়া পাঁচটা। ডান হাতে একটা ব্যাংক বাড়ি। বাঁদিকের বাড়িগুলোর একতলা জুড়ে একের পর এক ঘড়ির দোকান। ওপরের ফ্লোরগুলো অফিসে অফিসে ভর্তি।

সামনেই কোল ইণ্ডিয়ার মাল্টিস্টোরিড অফিস। এপাশ থেকে যে এগারো-বারোটা এয়ারকুলারের বাক্স দেওয়াল ফুঁড়ে বসানো—তারই দুটিকে সে চেনে। একটি অনাথ চক্কোত্তির ঘরে বসানো। অন্যটি সাধন গুপ্তর ঘরে। এর ভেতর কোনোটা হয়তো ঋষির ঘরে বসানো হয়েছে। সেটাকে দিলীপ এখনই সনাক্ত করতে পারবে না।

এই অবস্থায় দিলীপকে কোল ইণ্ডিয়ার অফিসের সামনে দেখলে অনেকে অনেক কিছু মনে করতে পারে। তার নিজের এখন ইচ্ছে করছিল—শেকড়সুদ্ধ এই বাড়িটাকে পুরনো দাঁতের কায়দায় উপড়ে তুলে ফেলে। কেননা, এখানেই তো সামান্য সামান্য টেবিল চেয়ার ঘিরে—নানা রকম মিটিং, নোট, কনফিডেনসিয়াল ক'রে তবে রাগ, অপমান, ক্ষোভ এটসেটরার বীজ বোনা হয়। ঈর্ষার চাষ হয়। আত্মরতি, ইডিওসিনক্রেসির ঢিমে আঁচে বাতাস দিয়ে দিয়ে ভ্যানিটির পচা বড়াগুলো ভাজা হয়।

ভোরবেলার গঙ্গা ফাঁকা অফিস পাড়ায় হাওয়া পাঠাচ্ছিল। সেই ঠাণ্ডা

বাতাস দিলীপ বস্থর রগ ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছিল। এখানকার কোন কোন বাড়ি আগের সেঞ্চুরির মাঝামাঝি তৈরি। কিংবা তারও আগের। তখন এসব রাস্তা দিয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতাপ প্রবাহিত হতো। এখন দিশী সাহেবদের কথাবার্তায় সেই ট্র্যাডিশনের নামে নাক দিয়ে পোঁটা পড়ে।

রেড রোড দিয়ে হেঁটে ফেরার পথে দিলীপের একবার মনে হলো, আমি কি আর আগের মত হতে পারি না?

যেমন, সেই হাল্কা চেহারার দিলীপ বস্থ—যার পা মাটিতে পড়তো স্প্রিং হয়ে। সে হাঁটতো টগবগ করে। তার মুখখানা ছিলো চর্বিশূন্য। চোখে আলো ছিলো। তখনো রবি এমন হয়নি। সবে সে স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ঋষি তখন দিলীপের সঙ্গে দেখা হলে পাগলের মত করতো। কি খাওয়াবে। কেমন করে আদর করবে। একেই কি ভালবাসা বলতো! অনেককাল আগে ঋষিদের বাড়ি গিয়েছিল একবার। ঋষির তখন সদ্য বিয়ে হয়েছে। সন্ধ্যারাতের চাঁদ দোতলার ঘেরা বারান্দায় ক্যাম্পখাটে এসে পড়েছিলো। সেখানে ওরা দুজনে সারারাত ধরে গল্প করেছিল। ঘরের ভেতর নতুন বউ লাবণ্য। কথাই ফুরোচ্ছিল না সে রাতে—দু বন্ধুর। একেই কি বলে ঘন ক্ষীরের মত মেশামিশি—কিংবা ভালবাসা!

আমি কি খুব বেশি দাবি করছি?

বয়স হয়ে গেলে তো মানুষ পাল্টায়। তীব্র পছন্দ—তীব্র অপছন্দ গড়ে ওঠে মনের ভেতর। এক-একজনের খাদ্যে রুচি এক-এক রকমের। তাই কি মেশামিশি শেষ হয়ে যায়! ভালবাসা উড়ে যায়! জীবনটা বাসি লাগে!

কেডগং-এর নিচে ছায়া ছড়ানো বড বড় গাছের ঝরা ফুল—বেগুনী, বাসন্তী রংয়ের—সব পিচ রাস্তায় থেঁতলে যাচ্ছিল। কোন্ দিকে যে পা ফেলবে বুঝতে পারছিল না দিলীপ। এইসব ফুলের কোন গন্ধ নেই। ডান হাতে ফোর্ট উইলিয়মের ছাদে জেনারেলের নিজের পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছিল।

দিলীপের বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠলো। এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে ফাইনালি। কোন মায়াদয়া নেই। যাবার সময় হলেই চিরকালের জন্যে চলে যেতে হবে। তখন রাণী বড় একা পডে যাবে। নিউ রোডে মাল্টিস্টোরিড বাড়িটার ফ্ল্যাটে ফাঁকা লাগবে কুটুর। আমার চলে যাওয়ার পর অয়ারড্রোব ভর্তি আমার জামাগুলো নিশ্চয় রাণীকে বাসন রাখতে সাহায্য করবে। চারজোড়া জুতো নিয়ে যাবে পুরনো কাগজওয়ালা। আমি শেষমেষ একখানা ফটোতে গিয়ে শেষ হবো। ফ্ল্যাটে ঢুকতেই ভিজিটররা আমায় উল্টোদিকের দেওয়ালে পাবে।

বিবেকানন্দের স্ট্যাচুর পেছনে পি জি হাসপাতাল। দিলীপ ন্যাশনাল লাই-

ব্রেবির রাস্তা ধরলো। চিড়িয়াখানার দরজা খুলতে দেরি। একঘোড়ার এক্কায় দুধের বালতি যাচ্ছে হাসপাতালে। চিড়িয়াখানার দেওয়াল ঘেঁষে ভেতরে খানিকটা নকল পাহাড়, খাল তৈরি করা আছে। সেখানে হরিণরা খেলে। সেই নকল পাহাড়ের উঁচু ঢিবিতে একটা কিশোর হরিণ সদ্যগজানো সিং তুলে বাইরের রাস্তা, সিগারেটের হোর্ডিং দেখছিল।

তাকে দেখে দিলীপ দাঁড়িয়ে পড়লো। ভোরবেলায় ফাঁকা কলকাতা। আমি তো এই চেয়েছিলাম। পৃথিবীর গায়ের ওপর দিয়ে সবচেয়ে সস্তার একখানা হাওয়াগাড়িতে ঘুরে বেড়াবো। সে-গাড়ি তেল খাবে সবচেয়ে কম। দমকলের ঘণ্টা থাকবে হর্নের বদলে। ঢং ঢং করে রাস্তা পার হবো। আমার পাশে থাকবে এমনই একটি হরিণশিশু। হুড্‌খোলা গাড়িতে রোদ এসে সে-হরিণের পিঠে পিছলে পড়বে।

মর্নিং ওয়াকের দিলীপ বসু সেই হরিণটাকে হাত দিয়ে ডাকলো, আয়—। চলে আয়—

হরিণটা চমকে তাকালো। মাথা শূন্যে তুলে ধরলো। চোখ স্থির। ভোর-বেলার বাতাসে আকাশে তিনখানা ছেঁড়া মেঘ স্লোলি উত্তরে যাচ্ছিল।

দিলীপ রাস্তার গায়ের একটা গাছ থেকে পাতাসুদ্ধ কাঁচা ডাল ভাঙলো একটা। তারপর তা ছুঁড়ে দিল হরিণটার দিকে।

হরিণটা অবাক হয়ে দেখলো। চোখ তখনো স্থির। পাতাসুদ্ধ কচি ডালটা ওর কাছে পৌঁছয়নি। দিলীপ দেওয়ালের গা থেকে ডালটা তুলে আবার ছুঁড়ে দিল। এবারেও পৌঁছল না। ডালটা কুড়িয়ে নিয়ে দিলীপ ওর ঠাণ্ডা চোখে তাকালো। আমায় চিনতে পেরেছিস?

মানুষের গলার স্বর এত ভোরে কোনদিন শোনেনি বোধ হয়। অবাক চোখে দিলীপের দিকে তাকালো।

আমার পাশে বসবি তুই। আমরা সারা পৃথিবীর ওপর দিয়ে চলে যাবো।

হরিণটা কি ভেবে গলা বাড়িয়ে দিল দেওয়ালের দিকে।

তাতে উৎসাহিত হয়ে দিলীপ বসু চিড়িয়াখানার দেওয়াল বেয়ে ওঠার চেষ্টা করতে গেল। হাত দিয়ে ধরবে এমন কিছু নেই। লাফ দিয়ে দেওয়ালের প্যারাপেট ধরতে গিয়ে পড়ে গেল।

আর ঠিক তখুনি পুলিসের একটা ছোট কালো মত ভ্যান রাস্তায় থামলো। দিলীপ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ভ্যানের সাইড দরজা খুলে একজন অফিসার বেরিয়ে এলো। এই তো দিলীপ-বাবু! আপনাকে আমরা ময়দানের চারিদিক খুঁজে এলাম।

হতভম্ব দিলীপ ধুলোবালিসুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকালো।

শেষ রাত থেকে আমরা সারা বাড়ি সার্চ করছি। আপনি ঘরে ছিলেন না। কোথায় গিয়েছিলেন ?

মর্নিংওয়াকে—

এত ভোরে! রবিকে কোথায় রেখে এলেন বলুন ?

রবিকে আমি বহুদিন দেখিনি।

তার ফূর্তি মারার মাগীটাকে তো বাড়িতে এনে তুলেছেন।

মাগী নয়। আমার পুত্রবধূ। রবি বসুর স্ত্রী মালাবিকা বসু।

তা যা বলেছেন। মাল একখানা। বিয়ে হলো কবে ? কার্ড ছেপেছিলেন ?

না।

গোপন বিবাহ! ভ্যানে উঠুন।

ইন্সপেক্টর দিলীপকে পাশেই বসালো। তারপর চলন্ত গাড়িতে বসেই বললো, গাভিন হলো কবে ?

এসব আমার জানার কথা নয়।

তাহলে জেনে রাখুন, আপনার ছেলে কাল রাতে আপনাদের বিল্ডিংয়ে এসেছিল। আমরা জানি।

কি করে জানলেন ?

আমাদের ইনফরমেশন তাই। এখনো সে ও-বাড়িতেই আছে।

ও-বাড়িতেই ? কোথায় ? আমি তো জানি না।

কেন জেনেশুনে ন্যাকা সাজছেন। সব জেনেই তো আপনি বেরিয়ে পড়েছিলেন শেষ রাতে। আমাদের এসে পৌঁছতে একটু দেরি হয়। সেই ফাঁকে—

সেই ফাঁকে ?

রসিকতা হচ্ছে বাঞ্চোৎ! আমরা কিচ্ছু বুঝি না ভেবেছো ? কোত্থেকে অত টাকা আসে ? প্রায়ই গাড়ি কেনা। বদলানো। সারানো। সব আমরা নজরে রেখেছি।

কোত্থেকে টাকা আসে মানে—

মানে ? রবির দল থেকেই টাকা আসে। এ তো জলের মত সোজা। নয়তো চাকরি করে অত টাকা হয় নাকি। বাপকে ট্রেজারার বানিয়ে ছেলে পার্টি চালাচ্ছে।

দিলীপ আর কথা বাড়ালো না।

ম্যান্টিস্টোরিড বাড়ির সামনে ভ্যান থেকে নামতেই ইন্সপেক্টর বললো, চিড়িয়া-

থানার দেওয়ালে উঠে পালাতে যাচ্ছিলেন কেন ?

পালাইনি তো।

তবে ?

হরিণের বাচ্চাটা দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে গাছের পাতা খাওয়াবো ভেবেছিলাম।

ইন্সপেক্টরের ভ্রূ কুঁচকে গেল। স্ট্রেঞ্জ! তারপর ঠোঁট ভেঙে বললো, পশুপ্রেম! মিথ্যে ছেনালীর আর জায়গা পাওনি শুয়োর।

ভাল ভাল কথায় কান সয়ে এসেছিলো দিলীপের। সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে চমকে গেল। বারোতলা বাড়িতে মোট ছেষট্টিটা ফ্ল্যাট। প্রায় সব কটা ব্যালকনিতেই কোন না কোন ফ্যামিলির কেউ না কেউ দাঁড়িয়ে। একতলার পার্কিংলনের তিন দিক ঘিরে সি. আর. পি.। শুধু যেদিকটায় জাপানী কনস্যুলেট—সেদিকটায় লাগোয়া দেওয়াল ঘেঁষে প্রাচীন রেনট্রি গাছটার গা জুড়ে কাঁটালতা। দিলীপের মুখে হাসি এসে যাচ্ছিল। সামলে নিল। মনে মনে বললো, এমন ফাঁদ পাতা জায়গায় কেউ বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসে ? উজবুক!

শ'তিনেক সি আর. পি. মিলে সব কটা ফ্ল্যাটের তোশক, লেপ, ড্রয়ার, বাথরুম—সব সব তছনচ করেছে। ছেলের জন্যে এই প্রথম গর্ব হতে লাগলো দিলীপের।

লিফ্‌ট্ দিয়ে উঠতে গিয়ে দিলীপ দেখলো, সেকেণ্ড লিফ্‌টের ফাঁকা গর্তটায় দুজন সি. আর পি. দাঁড়িয়ে। মেশিনের অর্ডার গেছে কোঅপারেটিভ থেকে। কিন্তু লিফ্‌ট্ এসে পৌঁছয়নি। জাপানী কনস্যুলেটের দেওয়ালের দিকেই এ বাড়ির এমারজেন্সি একজিট। সেদিকটার সিঁড়ি ইনকম্‌প্লিট। সিমেণ্ট মিকসার, বাঁশ, চুনের বালতিতে জায়গাটা গোলমেলে হয়ে আছে।

নিজের ফ্ল্যাটে লিভিং রুমে ঢুকে দিলীপ বুঝলো, পুলিস কি জিনিস। উত্তর-প্রদেশের গাড়োয়াল জেলার বাইশ-তেইশ বছরের ছোকরা রাইফেল কাঁধে দাঁড়ানো। কাঁধে তিনটি হরফ। সি. আর. পি.।

কেন যে রবি এ ঝামেলায় তুই জড়ালি ? কি দরকার ছিল ? আমাদের জীবন কি সুখের ছিল না ? আমি না হয় তোর চোখে দালাল। কিন্তু তোর মা ? বোন ? বউ ? এদের কি অপরাধ ? কি অপরাধ এই সারা বাড়ির লোকজনের ?

রাণী একবার কুটুকে সামলাচ্ছে। একবার মালবিকাকে। দুজন দুই বিছানায়। সেদিনের শুকনো মালা মেঝেতে। তাতে গুচ্ছের পিঁপড়ে। দিলীপ তুলে ফেলে দিতে গেল। সি. আর. পি. যুবা তা করতে দিল না। খানিক বাদে দিলীপ আর মালবিকাকে থানার গাড়িতে উঠতে হলো।

এসবই ঘটে গেল বেলা নটার সময়। থানায় গিয়ে ওদের দুজনকে প্রায় বেলা

একটা অব্দি বসে থাকতে হলো। সওয়া একটা নাগাদ একজন ইনভেস্টিগেটিং অফিসার এলো। দুজনকেই খাতির করে ভেতরের একটা বড় ঘরে বসতে দেওয়া হলো। তারপরই শুরু হয়ে গেল প্রশ্ন—প্রশ্নের পর প্রশ্ন। যেমন—

আপনার স্বামী কাল কতক্ষণ ছিলেন ?

আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।

তা তো জানিই। কিন্তু তিনি ছিলেন কতক্ষণ ?

মালবিকা চুপ করে থাকলো।

দিলীপ একবার বললো, ওকে না হয় বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি। তারপর আপনার যত ইচ্ছে কোশ্চেন করুন আমায়—

না। মিসেস বসু এখন এখানে থাকবেন। উনি আগাগোড়া সব জানেন।

মালবিকা চোখ তুলে তাকালো। ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের বয়স তিরিশের নিচেই হবে। মালবিকা বললো, বিশ্বাস করুন—আমি কিছু জানি না। আমি আর বসতে পারছি না—বলে উঠে দাঁড়ালো মালবিকা।

ওর চোখে কি ছিল! ইনভেস্টিগেটিং অফিসার উঠে দাঁড়ালো। আপনার দুটো সই রাখবো আমরা—

কাগজপত্তর নিয়ে আসুন। আমি চেতলার মেয়ে। অ্যাথলেটসে বেঙ্গলকে তিনবার রিপ্রেজেণ্ট করেছি। সবাই জানে—আমি কোনদিন পলিটিক্স করিনি।

কাগজপত্র এলে দিলীপকেও দু জায়গায় নমুনা সই করতে হলো। তারপর থানার গাড়িতেই—হুস করে একদম বাড়ি।

লিফ্‌টে দুজনে কোন কথা হলো না। একদম দোরগোড়ায় এসে দিলীপ জানতে চাইলো, সকাল থেকে কিছু খেয়েছো ?

না। সে তো আপনিও কিছু মুখে দেননি।

রবি এসেছিলো নাকি ?

মালবিকা চারদিক তাকালো। বাড়ির আশেপাশে একজন সি. আর. পি.র টিকিও দেখা যাচ্ছে না। তখন মালবিকা মাথা নামালো।

ঠিক এই সময় কুটু দরজা খুলে দিল। দিলীপকে দেখে মুখ-চোখ উচ্ছ্বসিত। জানো বাবা, দাদা ধরা পড়েনি—

কুটুর পেছনে রাণী। এগিয়ে এসে সে মালবিকাকে ভেতরে নিয়ে গেল।

কুটু তখন বলছিল—দাদা ওদিককার দরজা দিয়ে থার্ড ফ্লোরে নেমে যায়—এমারজেন্সি একজিট দিয়ে—

ও পথ তো তৈরি হয়নি সবটা—

দমকল ওঠবার জন্যে যতটা তৈরি হয়েছে—তাই দিয়ে দাদা গিয়ে রেনট্রি গাছটার গায়ের লতা ধরে ঝুল খেয়ে একদম কনস্যুলেট কম্পাউণ্ডে। আর অমনি জাপানী কুকুরগুলো চেঁচিয়ে উঠেছে একসঙ্গে—

পায়ে চোট খায়নি তো ?

একদম না। একচল্লিশ নম্বরের সুলতাদি নিজের চোখে দেখেছেন। তিনিই তো বললেন—সি. আর. পি. চলে যেতে।

পুলিস টের পায়নি ?

যখন পেয়েছে—দাদা ততক্ষণে কনস্যুলেট পেরিয়ে ওপাশের রাস্তায় বাসে উঠে পড়েছে।

রবি এসেছিলো—তুমি জানতে মালবিকা ?

বিশ্বাস করুন—আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। দেখা হলে—এভাবে আসতে বারণ করতাম।

ঠিক এই সময় কারেণ্ট গেল। রাণী বললো, আমপোড়া করেছি। কুটু, সরবতটা এনে দে না তোর বাবাকে। খেয়ে তবে চানে যাও—

তখুনি কারেণ্ট গেল বরেন দত্তর বাড়িতেও। বেলা দেড়টা অব্দি মক্কেল এসেছে বরেনের। বেশির ভাগই চায় বারো-তেরো হাজারের ভেতর অ্যাম-ব্যাসাডার। নয়তো সিক্সটিএইট-নাইনের ফিয়াট। সকাল থেকে তিনটি ডিল ক্লোজ করতে পেরেছে বরেন দত্ত। সবই কলকাতার বাইরের পার্টি, অ্যামব্যাসাডার বেচে খুব একটা পড়তা থাকে না। তার চেয়ে সিক্স কিংবা আরও তেলখোর গাড়ি বেচতে পারলে প্রফিট বেশি আসে। যেমন আট সিলিণ্ডারের স্টুডিবেকার কমাণ্ডার। গাড়ির মালিক তিন হাজার টাকা পেলেই খুশি, ঘাড় থেকে নামলে সে বাঁচে। বাকি সবটাই বরেনের। চা-বাগান এলাকার পার্টি এসব বড় গাড়ি চায়। তারা কিনে নিয়ে ডিজেল বসায়। বেশি বেলায় খাওয়া-দাওয়া করে বরেন ঘুমোচ্ছিল। পাশেই বড় ছেলের ঘর। সেখান থেকে কি পড়বার শব্দ পেয়ে উঠে দাঁড়ালো তড়াক করে। বরেনের এখন ষাটের ওপর বয়স। বেশি বয়সে বিয়ে করে এই প্রথম ছেলে। সিধে তার ঘরে গেল।

বাবা ! লোকজন ডেকে আমায় তোলো।

বরেন একতলা থেকে তার অফিসের লোকজন, ড্রাইভারদের ডাকলো। তারা এসে ছোটকর্তাকে খাটে তুলে দিয়ে চলে গেল।

হাড় ভাঙেনি তো ?

নাঃ! কিন্তু একা একা দাঁড়াতে পারছি নে বাবা।

এই তো মুশকিল করলি। তুই না পাশে দাঁড়ালে আমাদের ব্যবসা দেখবে কে? বলতে বলতে বরেন প্রায় কেঁদে ফেললো। কথাটা সত্যি। বিক্রির জন্যে গাড়ি এলে বড ছেলে চালিয়ে দেবে। ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স, ডিফারেন্সিয়াল—শব্দ শুনে, নেড়েচেড়ে বলে দেয়—দর ঠিক করে মালিকের সঙ্গে। আবার খদ্দেরকে গাড়ি গছাবার সময় বড় ছেলেই চালিয়ে দেখায়। পরিষ্কার হাত। কলকাতার ভিড়ে পঞ্চাশ কিলোমিটার স্পিডে হামেশা চালায়। তাছাড়া গ্যারেজে লোক খাটানো—তাও দেখে বড ছেলে।

করেছিস কি বাবা! হাড ভাঙেনি তো?

তুমি তোমার ব্যবসাই দেখছো বাবা। আমার দিকটা দেখছো না একদম। উঃ!

কোথায় লাগছে?

পিঠে। ঠিক মেরুদণ্ডের নিচে।

বিপদে ফেললি তো। এখুনি ডাক্তার ডাকতে হয়—

তার আগে মাকে ডাকো তো।

তোর মা তো তেতলায়। আমি উঠতে পারবো না সিঁড়ি ভেঙে।

ফোন করো মাকে।

এত ব্যায়াম করছিস কেন? মাস্টার মশাইয়ের সামনেই ব্যায়াম করা ভালো মল্লিকরা তো তোকে পছন্দ করে গেছেই।

তা করুক। এত মোটা বলে শেষে যদি এ বিয়েটা কেঁচে যায় বাবা—তখন তুমি আমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারবে?

কোথায় তুই মোটা? তাছাড়া ওদের মেয়ে তো রোগা নয়।

আমি মোটা নই! হাসালে বাবা। একশো দশ কেজি ছিলাম। এই ন' মাস ব্যায়াম করে—ডায়েটিং করে এখন একানব্বুই কেজি হয়েছি। চাই কি চেষ্ট করলে আশি কেজিও হতে পারি—

তাই বলে দিনের পর দিন না খেয়ে থাকবি বাবা?

দরকার হলে থাকতে হবে। আসলে বাবা তুমি আমার বিয়ে দিতে চাও না:

কে বললে?

আমি বলছি।

আমার স্বার্থ?

খুব পরিষ্কার। জলের মত পরিষ্কার বাবা।

ক্ষেপে উঠলো বরেন দত্ত। চল্লিশ বছর ধরে দালালী করে এই প্রপার্টি, এই গুডউইল—আমার জন্যে গড়ে তুলিনি। সবই তোমাদের জন্যে।

উঁহু। তোমার জন্যে বাবা। তোমার নিজের তৃপ্তির জন্যে সব করেছো বাবা।

একথা বলছো কেন?

বলছি তার কারণ আছে বাবা।

নিজের ছেলেকে কোনদিন এত গম্ভীর দেখেনি বরেন। ভেতরে ভেতরে সে নিজেও ভয় পাচ্ছিল। ছেলের এ চেহারা সে নিজেও কোনদিন.দেখেনি।

একটা গাড়ির জন্যে যতটা সময় দিয়েছো—আমি রোজ মোটা হয়ে যাচ্ছি—সেজন্যে ততটা সময় নিয়ে একবেলার জন্যে আমাকে কোন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওনি।

আমি—

দাঁড়াও। আমাকে বলতে দাও বাবা। আমার বিয়ের সম্বন্ধগুলো যখন ভাঙতে শুরু করলো—তখন তুমি একজন ব্যায়ামের টিচার এনে হাজির করলে—

এ রোগ তো তুমি তোমার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছো।

তুমি তো আমার বাবা।

বরেন চোখ তুলে তাকাতে পারলো না।

আমি কিন্তু ষোল বছর বয়স থেকে ছায়ার মত তোমার পাশে আছি। একদিনের জন্যেও কামাই করিনি। যেদিন তিনটে গাড়ি বেচে তোমার দশ হাজার টাকা লাভ হয়েছে—সেদিনও তুমি জানতে চাওনি—হ্যাঁরে খোকা—তুই এত মুটিয়ে যাচ্ছিস কেন? তখনো যদি আমার চিকিৎসা শুরু করতে তাহলে ন্যায়রত্ন লেনের বিয়েটা আমার ভেঙে যেতো না।

তোর খুব পছন্দ হয়েছিল মেয়েটিকে? আগে বলিসনি কেন? ওখানেই আমি তোর বে দেব। যত টাকা লাগে—

টাকায় সব হয় না বাবা। আর আমাকে অপমান কোরো না। আমি তোমার বিনে মাইনের—পেটে-ভাতায় ম্যানেজার—অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী। নিজের বড় ছেলে।

ও কথা বলিসনি খোকা। তোর জন্যে আমি সব করবো। কালই গাড়ির ব্যবসা তুলে দেব।

হয়েছে। থাক বাবা। সময়মত যদি আমাকে পড়াশুনো করাতে। আমি হয়ে গেলাম—মোটর মেকানিক।

ন্যায়রত্ন লেনের মেয়ের বাবা তো নিমরাজি ছিল। চেষ্টা করি। নগদ তিন

লাখ টাকা নিয়ে দেখা করবো ?

আর আমায় অপমান কোরো না বাবা। আমার ছোট ভাইরাও বড় হচ্ছে। ওদেরও মোটার ধাত। এখন থেকেই ওদের চিকিৎসা করো। এখনো সময় আছে।

ন্যায়রত্ন লেনকে আমি রাজি করাবো খোকা। তুই মনে কোন দুঃখ রাখিস নে। এখুনি আমি নগদ টাকা আর গাড়ি নিয়ে বেরোবো। আমার এই চল্লিশ বছরের ব্রোকারিতে কত পার্টিকে রাজি করালাম—

মানুষ আর গাড়ি এক নয় বাবা। যে মেয়ে আমায় দেখে খিলখিল করে হেসে উঠেছে—হাসি চাপতে পারেনি—সে কি করে বিয়ে করবে আমাকে। তুমি বরং ডাক্তারকে খবর দাও।

খুব ব্যথা করছে ? কেন সারাদিন আসন করছিস ? সুস্থ শরীর ব্যস্ত করে কি লাভ হলো ?

বোধহয় হাড় সরে গেছে। ডাক্তারবাবুকে খবর দাও। আমি যে করেই হোক আরও পনেরো কেজি ওজন কমাবো।

ভুল করিসনি বাবা। শরীর কি তোর কারবোরেটর ! জেট পিন পাল্টে তেল কমিয়ে মাইলেজ বাড়াবি ! শেষে ইঞ্জিনটাই যাবে খোকা। ভালভ জ্বলে যাবে শেষে।

তুমি ডাক্তারকে ডাকবে ?

ধমক খেয়ে বরেন বেরিয়ে এলো। ফোন করছি দাঁড়া—

লম্বা ঢাকা বারান্দায় শ্বেতপাথরের টেবিলে আকাশী রঙের টেলিফোন। বার তিনেক ডায়াল করেও লাইন না পেয়ে নিচে নেমে এলো বরেন। তারপর নিজের হাতে সাজানো ইমপোর্টেড মরিসখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

ডাক্তারকে পেল না। বেরিয়ে গেছে। অন্য যেসব ডাক্তারকে গাড়ি দিয়েছে বরেন—তাদের কেউই হাড়ের ডাক্তার নয়। কেউ হার্টের—কেউ বা গাইনি।

গাড়ি চালাতে চালাতে বরেনের এক সময় খেয়াল হলো—সে এখন সন্ধ্যের মুখে বজবজের কাছাকাছি এসে গেছে। ওই তো গঙ্গা। পেট্রল পাম্প। পাটকলের চিমনি। লঞ্চ আলো জ্বেলে নদী পার হচ্ছে।

একটা রাস্তা বড় চেনা লাগলো। তখনো বড়খোকা হয়নি। বিয়েই হয়নি যে। বরেনের বয়স তখন বাইশ-তেইশ। এই পথটা দিয়েই তো—

তখন এ রাস্তা ছিল ঘেঁষ ফেলা এক চিলতে পথ। রাস্তাটা ঠিক চিনতে পেরেছে বরেন। গাড়ির স্পিড কমিয়ে কাঠের গেটওয়ালা একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো বরেন। স্টিয়ারিংয়ে বসেই দোতলায় তাকালো। কাঠের দোতলা।

লতানো ফুলগাছের ঝাড়। কাঠের সিলিং থেকে ঝোলানো আলো জ্বলে উঠলো। খচ করে মনে পড়ে গেল বরেনের—তখন ওখানটায় গ্যাসের বাতি জ্বলতো।

গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলে ভেতরে গেল বরেন। ম্যাডাম—

ইয়েস—বলে একজন ধবধবে ফ্রক পরা মেম বেরিয়ে এলো। চোখে চশমা। মাথার চুল সাদা।

আই গেভ ইউ এ ফিয়াট একজাক্টলি ফর্টি ইয়ার্স এগো। আই অ্যাম ইওর বরেন—

মহিলা দু হাতে বরেনের হাত দুখানা ধরলো। ধরে নিয়ে গিয়ে বসালো।

তুমি তো একটুও পাল্টাওনি।

নো নো। আমি এখন সিক্সটিথি।

বাট আই অ্যাম সেভেন্টিফাইভ।

ইউ ডোণ্ট লুক সো ম্যাডাম—

থ্যাংকয়ু। দেয়ার্স দ্য কার—

সত্যি! এখনো সে গাড়ি রেখেছেন ম্যাডাম!

ভেরি মাচ। আমি এখনো নিয়ে বেরোই। এঞ্জিন ইজ ইয়ং।

দুজনে মিলে গাড়িটার কাছে গেল। একদম চকচক করছে। বাম্পারের নিকেল অব্দি নিখুঁত।

ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিয়ে দেখবো?

সিওর।

গানের কলির মত ইঞ্জিনটা গুনগুন করে গেয়ে উঠলো। বরেনের মনে পড়লো, গাড়িটা বিক্রি করে সে চব্বিশ টাকা মারজিন পেয়েছিলো। সে কি আনন্দ!

মহিলা বরেনকে হাতে ধরে চেয়ারে এনে বসালো। কি খাবে?

চা দিন।

আর?

আর কিছু নয়।

একটু কেক নাও। সেবারেও তোমায় আমার হাতের তৈরি কেক দিয়েছিলাম। মিস্টার র‍্যামস্ বুথম্ মৃত্যুর আগে এ বাড়িটা কিনে নিয়ে আমার নামে করে দিয়ে যান।

একটি ছোট ফুটফুটে ছেলে দেখেছিলাম?

সে এখন তিন ছেলের বাবা। সাসেক্সে কোলিয়ারি ম্যানেজার। ওই গ্যাখো আমার নাতিদের ছবি।

বরেন উঠে গিয়ে কাবার্ডে সাজানো ছবি দেখলো।

মহিলা এগিয়ে এসে বরেনের গালে স্নেহচুম্বন দিলেন। দু হাত মাথায় বুলিয়ে দিয়ে নিজের চোখ বুজলেন। সে একটা দিন ছিলো বরেন। তখন আটশো টাকায় একটা ফিয়াট কেনা যেত। এখন এক পাউণ্ড মাখনের দাম বারো টাকা। উইডো পেনসন নিয়ে গঙ্গার তীরে বেশ আছি আমি।

ছেলে আসে ?

একবার এসেছিলো। সাত বছর আগে। ইংল্যাণ্ড তো শীতের দেশ। ঠাণ্ডায় আমার ছেলের মাথায় অকালে টাক পড়ে গেল। ইণ্ডিয়ায় থাকলে এটা হতো না। বিয়ে করেছো নিশ্চয়—

হুঁ।

কটি ছেলেমেয়ে ?

তিনটি ছেলে।

সেদিনের সেই বরেন। তিন ছেলের বাবা এখন! পৃথিবীটা কত তাড়াতাড়ি পাল্টে গেল। তাই না!

আমার এখন তেষট্টি।

শরীরটা ভালোই রেখেছো।

ভোরে টেনিস খেলি।

র‍্যামস্ বথ্‌ম্‌ও খেলতো। ভোরে ওই গাড়ি নিয়ে চলে যেতো। তখন পেট্রল কত সস্তা ছিল। কোন কোনদিন আমিও সঙ্গে গেছি।

সুন্দর কেক হয়েছে। আজ উঠি ম্যাডাম।

উঠবে? বেশ। এই প্যাকেটটা নিয়ে যাও।

ওসব আবার কেন ?

নিয়ে যাও। তোমার ছেলেদের জন্যে—। বলবে আমার হাতের তৈরি কেক।

অন্ধকার রাস্তা পার হয়ে বরেনের মনে হলো—মহিলা কি অতবড় বাড়িতে একা থাকেন? কে দেখাশুনো করে? অসুখ করলে কে ডাক্তার ডেকে দেয়? চিঠি ডাকে দিয়ে আসে কে?

কলকাতার রাস্তায় পড়েই আগেকার মাইল মিটারের কাঁটা ষাটে গিয়ে তির তির করে কাঁপতে লাগলো।

সতেরো

দশ বছর আগেও পাটনা সিটি জংশনে এতগুলো হোটেল ছিল না। আই. টি. ডি সি.-র হোটেল পাটলিপুত্রের বার বেশ সাজানো। বাঁশের চাঁচারি দিয়ে দেওয়াল মোড়া। কিন্তু গান নেই। বাজনা নেই। তাই সিটি জংশনের গায়ে এই দশতলা হোটেলবাড়ির বারে সবচেয়ে ভিড়। এখানে এখন এয়ারকণ্ডিশণ্ড বারে হাসিগানের রীতিমত ফোয়ারা ঝলকাচ্ছে। কাঁচের দেওয়ালের ওপিঠে পাটনা তখন লু-এর কবলে। রাস্তাগুলো ফাঁকা। এখন বেইলি রোডে হয়তো দু-একটা গাড়ি দেখা যাবে। দুপুরে কলেজের ছেলে, অফিস-পালানো একজিকিউটিভ, বোকারোর ঠিকেদার আর দালালের ভিড়। সন্ধ্যে হলে শহর ঠাণ্ডা হবে। তখন আরেক দল লোক এখানে গলা ভেজাতে আসবে। তখন এই দশতলা হোটেল-বাড়ির গায়ে নিওনের লাল হরফে একটি লেখা ফুটে উঠবে। রাজগৃহ। লোকাল লোকজন শর্টে বলে হোটেল রাজ।

সেভেন্থ ফ্লোরের জানলায় দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথ বাচ্চুকে বললো, দরবারীলালের পছন্দ আছে।

কিছু বুঝতে পারলো না বাচ্চু। টাপু তখনো তার বিছানায় ঘুমিয়ে।

বিশ্বনাথ বললো, ডাকাতির পয়সায় হোটেল। কিন্তু দরবারীলাল ইতিহাস বই দেখে নাম রেখেছে হোটেলের। রাজগৃহ।

ইতিহাসে আছে বুঝি ?

কেন ? মনে নেই তোর ? বুদ্ধদেবের ধর্মপ্রচার শুরু হয়েছিল—এই পাটনার কাছাকাছি—রাজগৃহ নামে এক জায়গা থেকে—। হিস্ট্রিতে পড়িসনি ? তখন অবিশ্যি পাটনার নাম ছিল পাটলিপুত্র।

ইতিহাস আবার কবে পড়লাম ! সব তো তুই জানিস। জেনেশুনে ইয়ার্কি হচ্ছে !

আমিও স্কুলে থাকতে কিছু পড়িনি।

পড়লে তো আমরা পাসই করে যেতাম।

বিশ্বনাথ জানলা দিয়ে দূরের মাঠটার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক স্বরে বললো, পাস করা থাকলে যে কোন চাকরি পেয়ে যেতাম। রোজ সন্ধ্যে হলে এই বারে বারে গেয়ে বেরোতে পারবো ?

কিন্তু এই মাইনে, খাতির, খাওয়া-দাওয়া—চাকরিতে পাওয়া যেতো ? সব

খরচ বাদ দিয়ে এত টাকা কে দিত বিশ্বনাথ ?

গভর্মেণ্ট চাকরি হলে এই দুশ্চিন্তা থাকতো না বাচ্চু। আজ দরবারীলালের সঙ্গে কণ্ট্রাক্টে আছি। কাল তো কোন কাজ নাও জুটতে পারে। তখন কোথায় যাবো ? আর—

কি ?

এ গলা তো চিরদিন থাকবে না। তখন কে ডাকবে আমাকে !

এত তাড়াতাড়ি একথা বলছিস কেন বিশ্বনাথ ! এখনই—

কোন দিন কি আমরা এ হোটেল থেকে বেরোতে পারবো ?

চুক্তির মেয়াদ ফুরোলেই আমরা চলে যাবো। অসুবিধে কিসের ?

আবার যদি চুক্তিতে বাঁধে দরবারীলাল—। কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।

'চুক্তি হলে থেকে যাবো। খারাপ কি ! এত টাকা। আদর যত্ন। খাওয়া থাকা ফ্রি। কে দেবে আমাদের বিশ্বনাথ ?

তাহলেই তো মরেছি বাচ্চু। কোনদিন আমরা বেরোতে পারবো না এখান থেকে। রোজ সন্ধ্যেবেলা তোদের বাজনার সঙ্গে গলা মেলানো। খদ্দেরদের হাততালি।

এই তো চেয়েছিলি বিশ্বনাথ। এর ভেতর অরুচি এসে গেল ! হয়তো আরও বড় জায়গায় আমাদের ডাক পড়তে পারে।

বিশ্বনাথ আটতলার জানলা দিয়ে দেখলো—একপাল লোমছাঁটা ভেড়া তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে একটা বড় মত ল্যাংটা ছেলে। রোদের দিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বাচ্চুর কথায় একদম অন্য রকম জবাব উঠে এলো বিশ্বনাথের গলায়। কেন যেন সন্দেহ হচ্ছে—কুটুর সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না।

কুটু তোকে খুব ভালবাসে—তাই না ?

কুটুর জন্যে আমার খুব চিন্তা হয়।

কেন ? বেশ তো ভালো আছে।

বাইরে থেকে সব বোঝা যায় না বাচ্চু।

হবে। বলে বাচ্চু ইলেকট্রিক গিটারের তারে লম্বা নখসুদ্ধ নিজের ডান হাতের আঙুলগুলো বোলাতে লাগল। তাতে সরাইখানার আড্ডায় তারের বাজনার সুর ফুটে উঠছিল। একদম সরাইখানার সুর। আঁকা ছবির সরাইখানা। যেখানে নীল রঙের জ্যোৎস্নায় আঙুল আর তার মিলে গান গায়। পাগড়ি মাথায় লোক গাধা থেকে নেমে শুনতে বসে যায়। এরকমই একটা ছবি বিশ্বনাথের মনে কাজ করছিল।

বাজাতে বাজাতে বাচ্চু বললো, চল্ বিশ্বনাথ—অরোরার ওখান থেকে ঘুরে আসি।

না। এখন যাবো না।

এই তো একটা ফ্লোর নিচে। যাবো আর আসবো।

না। টাপু শেষ রাত থেকে অরোরার ওখানে ছিলো। এখন বেচারা ঘুমুচ্ছে হয়তো।

ও ঘুমোয় না বিশ্বনাথ। ঘুমোলেই নাকি—লাডাকের বরফ ঢাকা পাহাড়ের চাঁই ভেঙে পড়তে দেখে—

ওসব নেশার কথা বাচ্চু। আর্মিতে ছিলো। ফ্রণ্ট লাইনে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে খোঁড়া হয়ে চাকরি গেছে।

নেশার কথা নয়। ও নিজে বেশি খায় না। পেনশনের টাকায় হোটেলে থাকে। আর বাজনা শেখে একা একা।

বাড়ি গেলে পারে।

কোন বাড়ি নেই। একদম একা। গিটারে স্বর তোলে। চল্ না বিশ্বনাথ।

দুজনে সিঁড়ি দিয়ে না নেমে লিফ্‌টে নামতে গেল। লিফ্‌ট্ ওপরে যাচ্ছিল। ওদের দেখে থামলো। কিন্তু ওদের নিলো না। লিফ্‌টের দরজা খুলে খোদ দরবারীলাল বেরিয়ে এলো।

এ কেয়া বাত? তুম লোক নিদ যাও। আভি বাহারমে লু—

দরবারীলালকে দেখলেই বাচ্চু স্ট্যাচু হয়ে যায়। এবারো তাই হলো। তার মুখে কোন কথা নেই। দরবারীলাল পাকা ছ' ফুটের ওপর লম্বা। ভারি ঝকঝকে মুখখানায় প্রায় ছবি আঁকা একটি গোঁফ। শাহী আদ্দির পাঞ্জাবির সঙ্গে সরু পাজামা। চোখগুলো বড় বড়। মাথায় ছোট কিন্তু কোঁকড়া কালো চুল। হাসলে কিংবা রাগলে—মুখে একই ভাব। শুধু কালো ভ্রূটা কুঁচকে যায়। অল্প ফরসা চেহারার কোথাও এক ছটাক বাড়তি চর্বি নেই। বিশ্বনাথের মনে হলো, বছর চল্লিশ বয়স হবে।

যাও। আভি শোনে যাও বাচ্চে লোগ্। রাত মে গানা হ্যায়—

ওদের ঘরে পাঠিয়ে দরবারীলাল আবার লিফ্‌টে ঢুকে গেল।

বিশ্বনাথের বিচ্ছিরি লাগছিলো। কিন্তু এই হল গিয়ে রাজগৃহের নিয়ম। এখানে দরবারীলালের কথাই শেষ কথা। ঘরে ফিরে বিশ্বনাথ এয়ারকুলারের নবটা ঘুরিয়ে দিলো—জায়গাটা যাতে আরো ঠাণ্ডা হয়—তাই।

তিন মাসের চুক্তিতে এখানে আসা। এপ্রিল মে জুন। থাকা খাওয়া নেশা

—সবই ফ্রি। তার ওপর মাথাপিছু মাসে সাতশো টাকা। কণ্ট্রাক্ট হবার পর টাপু হু-র-রে বলে লাফিয়ে উঠেছিল। তার প্ল্যান—টাকা জমিয়ে এবারে অ্যাম-প্লিফায়ারটা কিনে ফেলবে। টাপুর দিকে তাকালো বিশ্বনাথ। অঘোরে ঘুমোচ্ছে টাপুদা। শেষ রাত থেকে মেজর জিতেন অরোরাকে গিটারের তালিম দিয়েছে। সেই সঙ্গে ফ্রি রাম। তাই এখন ঘুম।

বাচ্চু বললো, দেখলি বিশ্বনাথ—দরবারীলালের চেহারাটা।

বিশ্বনাথ চুপ করেই থাকলো। সে জানে হিন্দি ছবিতে বড় সাইজের মস্তানের কাণ্ডকারখানা দেখতে দেখতে বাচ্চু সিনেমা হলেই হাততালি দিয়ে ওঠে। একট ছবিতে অমিতাভ বচ্চন ডিনামাইট থেকে বিড়ি ধরিয়েছিল। সেই ধরাবার স্টাইল দেখে বাচ্চু এনকোর দিয়ে উঠেছিল।

বাচ্চু আবার বললো, ডাকু হো তো অ্যায়সা হো।

তোর খুব ভালো লাগে দরবারীলালকে ?

ভীষণ। কেমন ঠাণ্ডা গলা। টান টান চেহারা। চোখের ইশারায় সবাই কাজ করে। লোকটা নাকি প্রথম জীবনে কিলার ছিল।

কিলার ?

হ্যাঁরে বিশ্বনাথ। আমি রাজগৃহের পুরনো লোকদের মুখে শুনেছি—

কি শুনেছিস ?

দরবারীলাল টাকা নিয়ে খুন করতো।

কি রকম ?

ধর্ তোর টাপুদাকে খুন করতে হবে। দরবারীলালকে টাকা দিলি। অ্যাডভান্স। খুন করার পর বাকিটা দিয়ে দিলি দরবারীলালকে। তোর কাজ কমপ্লিট। পিকচারে থাকতে হলো না। অমন সুন্দর চেহারার মানুষ খুন করতে পারে বলে কেউ ভাবতেও পারতো না। সেই করেই তো দরবারীলালের ক্যাপি-টাল হলো। এক-একটা মার্ডারে দশ হাজার—পাঁচ হাজার। আবার অনেক সময় সস্তায় কাজও করতে হয়েছে। ধর্ মাত্র আটশো টাকার জন্যে—

বিশ্বনাথ বাচ্চুর মুখ দেখছিল। দরবারীলালের কথা উঠলে বাচ্চু একদম কথক হয়ে ওঠে। যেন কোন রূপকথা বলছে। চোখের সামনেই ও তখন রূপকথা দেখতে পায়। হোটেলের এই ঘরের বাইরেই পাটনা পুড়ে যাচ্ছে। ঝলসে যাচ্ছে। ভেতরে এখন ঠাণ্ডা। আরামের শীত।

বাচ্চু বললো, দরবারীলাল একদম হিরো প্যাটার্নের লোক। এখন কোথায় গেল বল্ তো ?

আমি জানবো কি করে! যার সারা ইণ্ডিয়ার সব হাইকোর্টে একটা দুটো মামলা ঝুলছে—তার সবকিছু কি জানা যায়? এই দশতলা হোটেলের মালিক—অমন হিরো হিরো চলাফেরা—তার তো একটা পাস্ট্ থাকবেই বাচ্চু—

তোর কথাগুলো বিশ্বনাথ খুব বেঁকা-বেঁকা। কি হয়েছে বল্ তো তোর?

কিছু না। যা বলছিলি বল্—

এখন দরবারীলাল তার কেপ্টের কাছে গ্যালো—কী সুন্দরী—দশতলার দক্ষিণের ফ্ল্যাটে থাকে। সেখানে সব আলাদা ব্যবস্থা। ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট। স্টিরিও। সফট মিউজিক বেজেই চলে—

অবাক হয়ে তাকালো বিশ্বনাথ। এত সব জানলি কি করে?

জানতে হয়। গত রবিবার তোরা ঘুমোচ্ছিলি। অপারেটর ফোনে বললো, দশতলায় যেতে হবে। মাগীমা একটু শুনবেন। ডাকছেন—

মাগীমা?

ওই নামেই এখানকার ওয়ার্কাররা ওঁকে ডাকে—। ভারি সুন্দরী। পায়ের আঙুলেও আংটি। ঢলঢল মুখখানায় নাকছাবি।

খুব আড্ডা দিয়ে এসেছিস মনে হচ্ছে!

তা তো দিয়েছি। ছত্তিশগড়ী মানুষ মন দিয়ে গিটার শুনলো।

কি বাজালি?

ভীরু মাধবী তোমার দ্বিধা কেন—।

একদম রবীন্দ্রসংগীত! বুঝলো?

একটা দোলা আছে তো বাজনায়। মাগীমা শুনছিলো আর অল্প অল্প দুলছিল। ফিরে বাজাতে বললো। বাজালাম। আবার আবার। বারবার তিনবার—

খুব মুগ্ধ করেছিস বল্।

বাঙালী দেখেনি তো। মাগীমায়ের খুব বাঙালী দেখার ইচ্ছে ছিল। তাই-তো আমায় ডাকা। সেই সঙ্গে বাজনা।

দেখে সার্থক!

বাচ্চু হেসে ফেললো। তা বলতে পারিস। শেষে খেতে দিলো। ফ্রিজ থেকে মন্টুর দোকানের রসগোল্লা। পেঁড়া। তরমুজ। তুইও তো বিশ্বনাথ দু'-দিন পাঁচতলায় গেছিস। গান শোনাতে—

কে বললো?

জানি। সব জানি। দরবারীলালের নিজের ফ্যামিলি থাকে। মেয়েটা কলেজে। তোর গান শুনতেই তো ডাকা।

হো হো করে হেসে উঠলো বিশ্বনাথ। থামতে চায় না।

বাচ্চু চেঁচিয়ে বললো, অত হাসির কি হলো? হাসছিস কেন?

শোন্। এ বাড়িটাই আস্ত একটা সিঁড়ি ভাঙার অঙ্ক।

বাচ্চু অবাক হয়ে তাকালো। এ্কথা বলছিস কেন বিশ্বনাথ?

তাই না তো কি! একতলায় আমরা গাই বাজাই। পাঁচতলায় দরবারী-লালের ফ্যামিলি। সিক্সথ ফ্লোরে মেজর অরোরা। সেভেন্থে আমরা। দশ-তলায় মাসীমা। একই সিঁড়িতে গোলকধাম। শুধু ঘুরে ঘুরে ওঠা। নয়তো নামা—

টাপু আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো। তোরা খেয়েছিস?

না।

দেড়টা বেজে গেল। চল্। খেয়ে নিই আমরা—। তারপর আরেকটু ঘুমিয়েই তো গান আছে—আজ বিশ্বনাথ তুই অমরভূপালীর সেই গানটা গাইবি তো।

ক্লাসিকের ওপর তো। মদ খেতে এসে কেউ ও গান শুনবে না—

তুই গেয়েই গ্যাখ্ না। ঠিক শুনবে—

কদিন ধরেই দিলীপের কাছে কলকাতা বড ছোট লাগছে। সেই কোল ইণ্ডিয়ার অফিস। কয়েকটা ঠেক। যেখানে খানিক গান। কিছু ড্রিংকস্। মাছ ভাজা নয়তো বোনলেস চিকেন। সভাভঙ্গের সময় টিপস্।

কলকাতা অ্যাতো ছোট কেন? কলকাতার গায়ে এত গন্ধ কেন? কয়েকটা রাস্তার গায়ে কিছু ছালবাকল তোলা বাড়ি দাঁড করানো মাত্র। ব্যাপারটা বোঝা যায় শেষ রাতে হাঁটতে বেরোলে। তখন সারা কলকাতা ঘুমোয়। রাস্তায় লোক নেই। আছে শুধু বাড়ি আর ফাঁকা রাস্তা। লোক বেরিয়ে পড়লে এটা বোঝা যাবে না।

কলকাতা এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে এলো। চেনাজানা লোকজনের নিরিখ বাসি লাগছে বলেই কি এমন হলো?

অনেকদিন পরে অফিসে এসে নিজের টেবিলটাকেই অচেনা লাগছিল দিলীপের। এই টেবিলে সে কনুই রাখছে আজ প্রায় পনেরো-ষোল বছর। এই টেবিলের ডানদিকের তিনটে ড্রয়ারের ভেতর মাঝেরটা একটু জ্যাম। টানলে খোলে না। চাপলে বন্ধ হয় না। বেলা দশটাও বাজেনি। কোল ইণ্ডিয়ার কিউবিকলগুলো বেয়ারারা এসে এয়ারকুলার চালিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখছে। খানিকক্ষণের ভেতর কোল ইণ্ডিয়ার বাজার গরম হয়ে উঠবে। তারপর লাঞ্চ-আওয়ারের পর দিলীপের নাকে ভাঙা বাজারের পচা মাছের গন্ধ উঠে আসবে। আসবেই। সেই সাত-

পুরনো রসিকতার গন্ধ। সেই একই ওয়াগন মুভমেণ্ট। কয়লার চালান। পিটসাইড স্টক। উঃ! শেষ নেই। শেষ নেই।

তার চেয়ে পাণ্ডবেশ্বরের এরিয়ায় তরতাজা ভৌমিক খাদান ছিল। ছিল কি! এখনো তো আছে। কয়লাও উঠছে। সে কয়লা বাজারেও আছে। ভৌমিক খাদান তো প্রাইভেট মাইনিং-এ একটা নাম এখন। সবাই জানে চেনে—

এই তো বেশ সুবোধ বালকের মত টেবিলে বসে আছিস। কবে জয়েন করলি?

একদম সামনাসামনি ঋষি এসে দিলীপের উল্টোদিকের চেয়ারে বসলো। দিলীপ জানতো না—তারও বুকের ভেতর এক বালতি রক্ত একসঙ্গে এমন চল্‌কে ওঠে। দিলীপের মনের ভেতর এখন একই সঙ্গে পর পর তিনটে সেণ্টেন্স একদম ডায়ালগের স্টাইলে পর পর লাইন দিয়ে দাঁড়ালো।

তুই ঋষি এ-র‍্যাকেটের ভেতর কি করে আছিস?

আমাকে বাদ দিয়ে তোর অন্য লোকের সঙ্গে মিশতে ভালো লাগে?

আমাকে দেখে কোল ইণ্ডিয়ার জন্যে তোর ভেতর কোন ধিক্কার ওঠে না?

কিন্তু এর কোনটাই বলা যায় না। পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ কথাগুলো বলতেই মানুষের গলা বুঁজে আসে। কথা চোক করে। দিলীপ একদম হাল্কা টোনে বললো, দিল্লি তো ভালোই কাটলো।

তা কাটলো। আমি আর অনাথদা একটা রাতের জন্যে নাঙ্গাল রেস্ট হাউসে চলে গিয়েছিলাম। তাকালেই চোখের সামনে শিবালিক পাহাড। রেস্ট হাউসের চত্বরেই টিলার গাছের ছায়ায় বসে চিল্ড বিয়ারের সঙ্গে রেশমি কাবাব। তুইও যেতে পারতিস। কথা তো শুনলি না। একটা না একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে বসবি—

আমি কি এসব শুধু শুধু করি ঋষি? একদম অকারণে?

তা বলতে পারি না। তবে না করলেও তো চলতো। অনাথদা তো তোকে কম ভালবাসে না। শিবালিকের সামনে ডেকচেয়ারে বসে আমরা—বিকেলবেলা—সর্বক্ষণ শুধু তোর কথা।

আমি তো কারও বিরুদ্ধে নই ঋষি।

তবে?

আমারও তো তাই প্রশ্ন। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, কোল ইণ্ডিয়া আমার জায়গা নয়। ভৌমিক খাদানের বাজার দখল দেখে চেয়ারম্যান চায়—ক্লিপ হিজ উইংস। প্লু হিম টু হিজ চেয়ার! সাধন গুপ্ত আমাকে ধৈর্য ধরতে বলেছে। অনাথ চক্কোত্তি নাকি আমাকে ভালবাসে! আমি কি করি বল্ তো?

যা এখন করছিস তাই করে যাবি। তবে আমি বলবো—তুই যেমন ছিলি

তাই থাকলেই তো ভালো ছিলো।

কেমন ?

হাসবি। নাচবি। ভৌমিক খাদানের কাজ ভালো লাগলে করবি।

সে-খাদান তো আমার ইচ্ছেয় নয়। তুই আর অনন্ত যেমন চাইবি তেমন হবে। অনন্ত আর মীরা তো ভৌমিক ট্রাস্টের তরফে স্বত্বাধিকারী। সেখানে আমার কথা টিকবে না। আর এখানে! সে তো আরও ভালো। আমি এখানে যুক্তির খাতিরে যে-কথাই বলবো—সেটা গিয়ে দাঁড়াবে—আমি তোর বিরুদ্ধে কথা বলছি। অথচ আমি তা বলতে চাই না।

লোকে কিন্তু তাই বলছে।

মজা তো ওইখানে! ঋষি, আমি যা বলবো—তারই অর্থ ওই একটাই দাঁড়াচ্ছে।

আমি বলি কি দিলীপ—তুই মন থেকে ওসব ঝেড়ে ফেলে দে। রাগ রাখিস নে কারও ওপরে। ওতে শরীর খারাপ হয়।

আমি কারও বিরুদ্ধে নই।

জানি আমি। আসলে দিলীপ—আমি আর তুই দুই রকমের লোক। তুই চাইছিস—আমরা যেন একরকমের হয়ে যাই। তা তো হয় না।

তবু এরই ভেতর ঋষি—মানুষ ন্যায়ের কোটে গেলে একরকমের হয়। অন্তত সেই কোটে থাকবার সময়টায়। বন্ধুত্বের কোটে গেলেও তাই হয়। মেশামিশির সময় তাই হয়। অল্পক্ষণের জন্যে হলেও—খানিকক্ষণ তো দু'রকমের লোক এক হয়। প্রতিবাদ দুজনকে এক করে। বন্ধু করে। প্রোটেস্টের ধর্মই তাই। ধিক্কারের ধর্ম ও তাই।

আমি কি বলতে পারি সাধনদাকে—দিলীপের অনেক বছর হয়ে গেল এক টেবিলে ?

কক্ষনো নয় ঋষি। সেটা তো বেগিং।

তাছাড়া সেটা তোর পক্ষে সম্মানেরও নয় দিলীপ।

বটেই তো। যাদের যা তা নিজে থেকে না করলে বলার তো কিছু নেই। যারা এরকম করে—তারাই তো র‍্যাকেট। সেই র‍্যাকেটের পার্টনার আমি কোন-দিন হইনি। হবো না। আমার যন্ত্রণা তো ডবল। কোল ইণ্ডিয়ায় কিছু বললে তা যায় তোর বিরুদ্ধে। আর—

থামলি কেন ? বল্—

পাণ্ডবেশ্বরে আমাদের—সরি, তোদের খাদানের জন্যে যত শেয়ার ক্যাপিটালই যোগাড় হোক না—সে-খাদানে মাইনিং বাড়ানো হবে না।

সেভাবে তো কোনদিন ভাবিনি। সে তো দিলীপ আগে অনেকবারই বলেছি—বিশাল কোম্পানি হোক—এ তো কোনদিন চাইনি আমরা—

চাওয়া না-চাওয়া অধিকারের ওপর নির্ভর করে।

শুধু অধিকার কেন ?

তা নয়তো কি ঋষি ! আমি চাইলেই কি ভৌমিক খাদান বড় হবে ! আমার ইচ্ছেটা প্রমাণের মত—ট্রানশ্লেট করার মত কোন কাগজপত্রই তো নেই। আমি তো কোন ট্রাস্টের বংশধর নই। তাছাড়া—

তাছাড়া কি ?

নাঃ ! অন্য কথা বলি আয়—

দুজনেই এক সঙ্গে চুপ করে গেল। দিলীপ ঋষির মনের ভেতরটা জানে না। কিন্তু তার নিজের মনের ভেতর আর একটা সেণ্টেন্স—বেশ পুরনো সেণ্টেন্স—একদম ডায়লগ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। যেমন—

এমন তো নয় ঋষি—ভৌমিক খাদানটা তোর খেলা ? আর কোল ইণ্ডিয়া তোর কাজ ? এক জায়গায় তুই কমপিটিটর। আর এই কমপিটিটরের পশ্চারেই কোল ইণ্ডিয়ায় তুই নয়নের দুলাল ? শুধু খেলা খেলা সারাবেলা—

দিলীপ জানে এ-কথাটার ভেতর তার যে চেহারাটা ফুটে ওঠে, তাতে তাকে খুব ছোট দেখাবে। এমন দেখাবে বলেই কি সে ও-কথা বলতে পারে না ! কেন তুই সন্ত বিয়ের পর আমার সঙ্গে সারারাত গল্প করেছিলি ? কেন প্রথম প্রথম আমার নেশা হলে তুই কপালে হাত বুলিয়ে দিতিস ? বমি হয়ে যেতে খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। কেন তুই তখন বলতে গেলি—'ও কিচ্ছু না দিলীপ। লিভার ভালো আছে বলেই অ্যালকোহল রিফিউজ করছে। এটা গুড সাইন। যখন আর বমি পাবে না, তখন বুঝবি, লিভার অ্যালকোহল অ্যাবজর্ব করতে করতে শক্ত হয়ে গেছে—'। কেন তুই এসব করতে গেলি ? এসব বলতে গেলি ? নয়তো আমার তো কোন মায়া থাকতো না তোর জন্যে। আমি যা প্রাণ চায় বলতে পারতাম। এইভাবে কি লোক লোককে ভালবাসে ?

এর কোন কথাই উচ্চারণ করা যায় না। উঠবার সময় ঋষি বললো, আমি চাই তোর মন থেকে সব রাগ মুছে যাক। তুই শান্ত হ। ভাল করে ঘুম দিয়ে মনটা মেজাজটা ঠাণ্ডা কর্।

আমার মন খুব ঠাণ্ডা ঋষি। নয়তো অত অল্পদিনে অত শেয়ার ক্যাপিটাল আনা যেতো না।

সেখানে তুই ঠিক ছিলি। এখানে দিলীপ তুই অস্থির। ধৈর্য ধর্ না—

এই কথাটাই তো সাধন গুপ্ত বলে।

কিছু অন্যায় বলেননি।

তা তো ঠিকই।

দরবারীলালের রাজগৃহ সন্ধ্যেবেলা জমজমাট। পুরুষদের ফ্লেয়ার্স, প্যারালাল, উঁচু গোড়ালির জুতো—প্রায় সব ক'জনকেই কাপড়ের বিজ্ঞাপনের পুরুষলোক করে দেয়। দূর থেকে দেখতে সাহসী, লম্বা-চওড়া ; দরাজ দিল। তাদের কানে সিলিং থেকে লুকোনো স্টিরিও মারফত সুর আসে। গান আসে। বিশ্বনাথের গলা। টাপু আর বাচ্চুর বাজনা।

সব কোই হৃদয় তোড় দিয়া—

মুকেশের বিখ্যাত গানের পয়লা কলি জুড়ে দিয়ে বিশ্বনাথ দম নিতে একটু হাসলো। তার সামনের টেবিলে তারই বয়সী একটি ছেলে—সঙ্গে উঁচু খোঁপার বান্ধবী—হাতে ঢিলে ব্যাণ্ডে বড় হাত-ঘড়িটা ঝুলে পড়েছে—প্যারালাল ছাড়িয়ে জুতোর দু' ইঞ্চি হিল। সামনে পাথরের প্লেটে বেয়ারা যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে খুব সাবধানে ধোঁয়া-ওড়া সিজলিং চিকেন দিচ্ছিল।

'হৃদয় তোড় দিয়া' কথাটা শুনে ছেলেটি সিধে হয়ে বসে বিশ্বনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। সে হাসি ফিরিয়ে দিয়ে বিশ্বনাথ খুব দুঃখু-দুঃখুভাবে গানের বাকিটুকু ধরলো। সারা বার তখন 'উ-উ-আঃ' ধরনের একটা চাপা শব্দ করে উঠলো। টাপু বাজাতে বাজাতে দেখলো—দরবারীলাল তার লোকজন নিয়ে পেছনে কোণের বড় টেবিলে বসে। টাপু পর পর তিনটে স্ট্রোক দিল তারে। মাথা নিচু করে। সে জানে দরবারীলালের টেবিলে কারা কারা বসে আছে। পাটনা সেক্রেটারিয়েটের রুলিং পার্টির ট্রেজারার—ভাই চিরঞ্জীলাল। আর শহরের সেরা ফৌজদারী উকিল। দরবারীলাল বলে—ভকিলসাব। বোকারোর বড় ঠিকেদার—ঠিকাদারসাব। এরকম চার-পাঁচজন।

রাত এগারোটায় বার ভাঙলে—ওই টেবিলে কাগজপত্তর নিয়ে বসবে দরবারী-লাল। ফাইল আসবে বিভিন্ন মামলার। পাঁচতলা থেকে। আর আসবে দশতলা থেকে মাগীমায়ের টেলিফুঁ—ঘন ঘন।

তারই ভেতর দরবারীলাল আর তার লোকজন ফাইল দেখবে। হাসবে। কথা-বার্তা বলবে। আস্ত আস্ত রোস্ট খাবে। বড়সড় সাইজের একজন আবার মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে বাথরুমের দরজা খোলা রেখে পৈতে কানে পেচ্ছাপে বসবে।

এরই মাঝে দরবারীলাল তার প্রিয় এক-একটা গানের অর্ডার দেবে। যব পিয়া গয়ে শ্বশুরাল—। ফাঁকা বারে বিশ্বনাথের এক-একটা গান শেষ হবে—আর দরবারীলাল বাঁ হাতের তিনটে আঙুল তুলে ধরবে। অমনি একজন বেয়ারা এসে তিনটে ঠাণ্ডা বিয়ারের বোতল ব্যাণ্ড-স্ট্যাণ্ডে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যাবে। ওরা তিন-জন তখন একসঙ্গে মাথা ঝুঁকিয়ে সেলামের পোজ করে আবার নতুন গান ধরবে।

এই হয়ে আসছে আজ দু' হপ্তা। আলো নিভলে ওরা তিনজনে পনেরো থেকে আঠারোটা বিয়ারের বোতল নিয়ে নিজেদের ঘরে যায়। পরদিন সকালে এই বারেই সেগুলো বেচে দেয়।

এই হয়ে আসছে আজ ক'দিন। আজও রাত একটা নাগাদ ওরা যখন আলো নিভলে লিফ্‌টে উঠছিল—তখন ঘুমন্ত মাণ্টিস্টোরিড হোটেলবাড়িটার এক জানলা দিয়ে আকাশে গিটারের এক কলি ঝুলে পড়লো।

ভীরু মাধবী তোমার দ্বিধা কেন—

বিশ্বনাথ নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো, বেশ শিখেছে তো অবোরা—

টাপু লজ্জা লজ্জা গলায় বললো, কাঁহাতক আর বিনি পয়সায় রাম খাবো! তাই কাল শেষ রাতে না ঘুমিয়ে শিখিয়ে দিলাম লোকটাকে—

হাত খারাপ নয়।

উঁহু। স্ট্রোকে একটু ভুল হচ্ছে।

ওরা তিনজনে তখন অন্ধকার ঘরের জানলায় গিয়ে দাঁড়ালো। বাইরে এখন ঠাণ্ডা পাটনা। রাজগৃহের সামনে দুপুরের সেই মাঠটায়—অনেকদূরে—একটা চৌকো আলো লম্বা হয়ে পড়ে আছে। বাচ্চু বুঝলো, মাগীমায়ের জানলার আলো। একদম দুর্গাপ্রতিমার মত মুখ। এখনো দরবারীলাল গিয়ে উঠতে পারেনি।

ওরা তিনজনই না খেয়ে শুয়ে পড়লো।

অন্ধকারে প্রথম কথা বললো বিশ্বনাথ। আমরা আর কোনদিন এখান থেকে বেরোতে পারবো না।

টাপু তড়াক করে উঠে বসলো। আমায় যেতে হবেই। উরে বাবাঃ! ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্‌সে ক্যালকাটা স্কুলের লেসন নেব আমি। ওটি হচ্ছে না। চির-কাল কি কেউ এ-কাজ পারে! তোকে না বিশ্বনাথ আজ অমরভূপালীর সেই গানটা গাইতে বলেছিলাম—

লোকে নিতো না টাপুদা—

খুব নিতো।

বাচ্চু বলে বসলো, খারাপ কি আছি। বাড়িতে টাকা পাঠাচ্ছি

খেতে হচ্ছে না। দোবেলা চিকেন। তার ওপর বিলিতি স্প্রিংয়ের খাটে ডানলপের গদি। এয়ারকুলার বসানো ঘরে চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে রুম সার্ভিস। আর কি চাই বড়দা! কোন চাকরিতে থাকলে আমরা এই খাতির যত্ন পেতাম? আমি তো স্কুল-ফাইনাল ফেল।

অন্ধকারের ভেতরেই বাচ্চুর বড়দা বললো, তোর কোন উচ্চাশা নেই? এই খাওয়া-দাওয়া আর সাতশো টাকাই কি কারও জীবনের অ্যাম্বিশান হতে পারে?

তাহলে তুমি কি করতে চাও?

আমি মিউজিক ডিরেক্টর হবো। আমার সুরে বসানো গান হোল ইণ্ডিয়ায় হিট করবে। ইণ্ডিয়ার বাইরেও—যেখানে যত ইণ্ডিয়ান আছে—তারা কান পেতে শুনবে। হিন্দি ছবির টাইটেলে থাকবে—মিউজিক ডিরেকশন—টি. পালিত।

তাহলে তো টাপুদা আমাদের এখুনি বেরিয়ে পড়তে হয়। নয়তো চিরকালের মত আমরা এখানে বন্দী হয়ে যাবো।

বিশ্বনাথকে উঠে বসতে দেখে বাচ্চু বললো, ওকথা বলছিস কেন বিশু? দরবারীলাল তো কোন খারাপ বিহেভিয়ার করেনি আমাদের সঙ্গে।

টাপু উঠে দাঁড়িয়ে বললো, তবে তুই থেকে যা বাচ্চু। একাই গাইবি। একাই বাজাবি।

তা হয় নাকি বড়দা! ও কি? তোমরা সত্যিই চললে নাকি?

তা না তো কি! গিটারের খাপ দুটো বের কর্। খাটের নিচে আছে।

বিয়ারগুলো কি হবে বড়দা?

খা বসে বসে।

তা হয় নাকি? না গেলেই না বড়দা?

তবে তুই থাক না। কাল দিনের বেলা বোতলগুলো বেচে দিয়ে দুপুরের ট্রেন ধরবি।

তখন আমায় একা পেলে দরবারীলাল ঠিক চামড়া তুলে নেবে।

বিশ্বনাথ বললো, কতকাল বাংলা খাইনি টাপুদা। মুখ নষ্ট হয়ে গেল বিলিতিতে। তারপর রোজ রোজ চিকেন খাওয়া যায়? কেমন গন্ধ গন্ধ লাগে।

খানিকক্ষণের ভেতর তিনজনে অন্ধকার সিঁড়িতে। গেট লক করে দারোয়ান দাঁড়ানো। ওরা আন্দাজে সিঁড়ি ধরে নামতে নামতে এমারজেন্সিতে বেরোবার সিঁড়ি পেয়ে গেল। এ সিঁড়ি অনেক সরু। বাতিল জিনিসপত্রের গোডাউন প্রায়। আগুন-টাগুন লাগলে দমকলের জন্যে এ রাস্তা। টেলিফোন অপারেটরই একদিন বলেছিল এ রাস্তার কথা।

ওরা তিনজন ঠোকর খেতে খেতে সরু সিঁড়ির এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছলো—যেখানটায় ল্যাণ্ডিং অনেক চওড়া—জায়গাটা পরিষ্কার।

সিগারেট ধরাতে গিয়ে টাপু অবাক হয়ে গেল। দেশলাইয়ের আলোতে প্রথমেই একটা রিভলভিং চেয়ার—গদি মোড়া—তার সামনে বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিল। টেবিলে টেবিল ল্যাম্প। বাচ্চু গিয়ে খুট করে আলো জেলে দিল। কিলারের অপারেশন রুম বিশ্বনাথ।

টাপু কাউকে কিছু না বলে টেবিলের ওপর থেকে দু-দুটো মোটা ফাইল—কাগজপত্র উপচে পড়ছিল তার ভেতর থেকে—সবসুদ্ধ গিটারের বড় বাক্সের ভেতর ভরে নিল। বড় জ্বালাতো রোজ লোকটা। রাত এগারোটার পর গানের অর্ডার। কাগজ হারিয়ে বাছাধন একটু হয়রান হোক। চল্ বাচ্চু—

এটা কি করলে বড়দা? দরবারীলাল বিপদে পড়বে—

দরবারীলাল তোমার শ্বশুর! এক মাসের টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে এসেছিলাম আমরা। আর দিয়েছিল ট্রেন ভাড়া। যাবার ভাড়াও তো আমরা ছেড়ে দিয়ে গেলাম—

তাই বলে কাগজপত্র হাপিস করে নিয়ে যাবে?

তবে তুই এখানে দরবারীলালের জামাই হয়ে থাক বাচ্চু। মাগীমা তোর শাশুড়ি হবেখন। বাজনা শোনাবি।

তোমার শেখানো বাজনা তো অরোরা এখানে বাজাচ্ছে।

টাপু একটু থমকে দাঁড়ালো। তারপর বললো, জোরে কথা বোলো না কেউ। এমারজেন্সি এগজিটের রাস্তাটা হোটেলের পেছন দিকটায় এসে শেষ।

খানিক বাদে ওরা তিনজনে পাঁচিল টপকে একদম শেষ রাতের পাটনায়। ঠাণ্ডা বাতাস এসে ওদের রগে আরাম দিল। ঠাসা লরি ফুল স্পীডে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ওদের সামনেই একটা অন্ধকার দশতলার গায়ে নিওনে লেখা—রাজগৃহ।

বিশ্বনাথ খুব কৃতজ্ঞ গলায় বললো, তুমি না থাকলে টাপুদা আমরা কোনদিন এখান থেকে বেরোতে পারতাম না।

আগে স্টেশনে চল। টিকিট কাটতে হবে। ভোরের যে-কোন ট্রেনের। এখুনি পাটনা ছাড়া দরকার—

আঠারো

সকালের ডাকে হরি ডাক্তারের চিঠি এসেছে। আবুধাবি থেকে। দূর থেকে অনেক দিন পরে কারও চিঠি পেলে দিলীপের খুব ভালো লাগে।

প্রিয় দিলীপ,

এদেশে এলে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতো। এখানে পেট্রলের লিটার আমাদের টাকায় মাত্র পঞ্চাশ পয়সা। সুপারমার্কেটে ঢোকার সময় লোকে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে না। পেট্রল ওদের কাছে জলের চেয়ে অনেক কম দামী। বরং খাবার জলের কদর আছে। এক গ্লাস এক টাকা। আমি আছি তেলের শহরের এক হাসপাতালে। এখানে চুক্তি করে বিয়েয় বসা যায়। ছ' মাস, আট মাস, এক বছর, দু' বছরের জন্যে। তারপর ছাড়াছাড়িতে কোন আপত্তি নেই। আমি আট মাসের জন্যে একটি চুক্তি করেছি।

আমার ইচ্ছে তুমি এখানে চলে এসো। তোমার মনোমত সবচেয়ে সস্তায় এখানে গাড়ি মেইনটেন করতে পারবে। অনেক ঘুরেও সারা মাসে তেল খরচ দেড়শো টাকার ওপর নয়। পৃথিবীর সবচেয়ে সস্তা গাড়ি—সবচেয়ে সস্তায় তুমিই চালাতে পারবে। তোমার ড্রিম অনুযায়ী। এখানে রিপেয়ারিং চার্জ বেশি বলে অনেক ইমপোর্টেড গাড়ি—বলতে গেলে—বাট ফর এ সঙ্-এ হাত বদল হয়। এই ধরো আমাদের টাকায় নশো মাত্র। তুমি ভালো করে নাচ দেখালে চাই কি বিনি পয়সায় অমন চকচকে একটা গাড়ি পেয়ে যেতে পারো। আমি থাকতে থাকতে চলে এসো।

ঋষির খবর কি? খাদান কদ্দূর? গোকুলদা এখানে এলে ডবল বে করতে পারতো। এখানে গোকুলদার মত ভিরাইল লোকের ডিমাণ্ড খুব বেশি। বলে দিও গোকুলদাকে।

তোমরা কি আমার চেম্বারে আর বসছো না? জায়গাটা একটু দেখাশোনা কোরো—

আর পড়তে পারলো না দিলীপ। ভাদ্র মাসের সকালে বৃষ্টি-ধোয়া রোদ্দুর। চারদিক ঝকঝক করছিল। দিলীপ গোড়ায় বুঝতে পারছিল না—কেন তার চোখে জল এসে যাচ্ছে। চোখ ভার হয়ে এলো। খোলা চোখ দিয়ে আপনা-আপনি দু ফোঁটা গড়িয়ে পড়লো। ব্যালকনিতে বসে দূরের ময়দান—হাওড়া ব্রিজের কঙ্কাল—সবই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। ঘরের ভেতর মালবিকা ভারি পায়ে হাঁটাহাঁটি

করছিল। ওর তো এখন যে-কোন দিন ডেলিভারি হতে পারে।

আমি কাঁদছি কেন? চার পেগের পর আমি সত্যি সত্যি এক-একদিন যে-কোন রেকর্ডের সঙ্গে নাচতে পারতাম। শরীরটা সুর ধরে নিয়ে লাফাতো। এক-দম স্প্রিং। তখন বন্ধুত্বের হালকা বাতাসে ভেসে বেড়াই। দিনগুলো বড় সুন্দর ছিলো। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল। আমি তো আর ঋষির খবর জানি না। আর আগে? কতো জানতাম! এখন আমি ঋষির মনের খবর জানি না। এ কি আমার পাগলামি? ঋষির কি একবারও মনে হয় না—দিলীপ ছাড়া আমি আসলে কেমন আছি? কেমন কাটছে আমার?

চোখ মুছে ফেললো দিলীপ। কেউ দেখতে পায়নি। এই বিশাল আকাশে ব্যালকনিটা ঝুলে আছে। দিলীপ উঠে গিয়ে নিজেই ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জলের বোতল বের করলো। এমন সময় ডোর বেল বেজে উঠলো।

দরজা খুলে দিলীপ অবাক। কি মনে করে গোপাল?

চলে এলাম খুঁজে খুঁজে। যদি কোন গাড়ির দরকার থাকে—

বোসো। কি গাড়ি আছে?

গাড়ি তো অনেক আছে। কি দরকার আপনার?

সে তো আমিই জানি না। ধরো যে গাড়ির দাম সবচেয়ে কম। তেল খাবে সবচেয়ে কম।

গ্যালনে একশো দশ কিলোমিটার ছুটবে—আনকোরা ইমপোর্টেড ফিয়াট আছে একখানা। নেবেন? ফোর-সিটার। সাদা রংয়ের ছোট্ট গাড়ি—

দাম কত?

তা পয়ষট্টি পড়বে।

ফোর-সিটার পয়ষট্টি হাজার—

তা তো পড়বেই। তেল খরচটা কত কমে যাচ্ছে বলুন। যাগ্‌গিয়ে! আমি অন্য কাজে এসেছি আপনার কাছে।

কি ব্যাপার গোপাল?

গাড়ি নয়। শুনে আপনি হাসবেন। ভালো করে গান শিখতে চাই আমি। লোকে বলে আমার গানের গলা মুকেশের মত। চাই কি শিখে-টিখে আমি মুকেশের জায়গাটা নিতে পারি। মানুষ ইচ্ছে করলে তো সব পারে।

তা পারে গোপাল।

অনেক আগে আমি বারে গাইতাম। বলেছি বোধহয় আপনাকে।

বলে থাকতে পারো। কত কথাই তো বলেছো।

বালির লরি চালাবার আগে কলকাতার তিন-চারটে বারে গেয়েছি।

কি গান ?

ফিলমি সং। হিন্দি ছবির গান। মুকেশ, কিশোর, রফি—সবার গানই আমি দরদ দিয়ে গাইতে পারি। এখন যে জেসুদাশ গাইছে—ওর চেয়ে খারাপ গাইবো না। যদি ভালো তালিম পাই—

গাড়ি কেনাবেচা করবে না ?

অনেক দিন তো করলাম। এবার একটু মুখ বদলাই। আপনি আমার গান শেখার ব্যবস্থা করে দিন।

অবাক হয়ে তাকালো দিলীপ। এরই ভেতর গোপাল দাবি করতে শুরু করেছে। কতটুকুই বা আলাপ।

গোপাল ফিরে বললো, আমায় কোথাও নাড়া বাঁধতে হবে। সেসব আপনাকে করে দিতে হবে। আমি বছরখানেক তালিম পেলে সব পারবো। কেউ আমার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না।

বেসমেন্ট থেকে গাড়ি বের করে দিল গোপাল। বললো, কোন্‌দিকে যাবো বলুন ?

আস্তে আস্তে ময়দানের দিকে চলো।

গোপাল আদৌ আস্তে চালাতে পারে না। অনেকগুলো গাড়ি ওভারটেক করে গোপাল যখন রেসকোর্সের গায়ে গাড়ি দাঁড় করালো—তখন মাথার ওপর তিনখানা মেঘ ওই এরিয়ায় গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি ফেলতে লাগলো। এখানে এলেন যে ?

নির্জন আছে। তোমার গান শুনবো একটু। যে কোন গান—

মুকেশ ভালো লাগে আপনার ?

যে কোন গান—

গোপাল গলা খুলে গাইতে লাগলো। হিন্দি ছবির দুঃখের সিনের গান। একটু চন্দ্রবিন্দু ঘেঁষা গলা। বলা যায়—এটাই গোপালের গায়কী।

দিলীপ ওকে থামিয়ে বললো, চলো তাহলে। আজই আলাপ-পরিচয় হোক। আমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড। সাগর রায়ের ক্লাসিকাল রাগপ্রধান এখন সব ফাংশনেই থাকে। ওর কাছে একটি বছর তালিম পেলে তোমার আর ভাবনা নেই—

দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি বড় ফ্ল্যাটবাড়িটার তেতালায় ওরা দুজন যখন সাগর রায়ের বসবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো—তখন সাগর নিজের ঘরের কার্পেটে বসে একা একা তানপুরা নাড়ছিল।

দিলীপকে নিজের পরিচয়ও ঝালিয়ে নিতে হলো। অনেকদিন দেখা নেই। কলেজ ছাড়ার পর সবারই চেহারা পালটে গেছে। তারপর আসল কথাটা পাড়লো দিলীপ। গলা ভালো। তুমি শুনে ত্থাখো সাগর।

তা তো শুনবো। কিন্তু ওর জন্যে আমার যে আর সময় বের করবার উপায় নেই দিলীপ। সারা হপ্তা জুড়ে আমি সাতদিনের জন্যেই বুকড্।

তাহলে ও তোমার সামনে এসে বসে থাকবে। শুনে শুনে যা তালিম পায়—

তালিম না নিলে কোন শিষ্য কিছু শেখে না। আর শুধু সামনে বসে তালিম হয় না। বরং এক কাজ করুক। রবিবার রবিবার দুপুরবেলা চলে আসতে পারে।

তখন তো তোমার স্টুডেন্ট আসবে।

না। ছাত্ররা আসে তিনটে নাগাদ। খেয়ে উঠে যে-সময়টা শুয়ে থাকি— তার খানিকটা বের করে নেব। সেই সময়টা যদি ওর কাজে লাগে।

স্যার, আপনার তখন শেখাতে কষ্ট হবে।

কিচ্ছু না। তুমি পারলেই হলো। একটা গান শোনা যাক ততক্ষণ। কেমন গলা শুনে দেখি।

গাইতে গিয়ে গোপাল নার্ভাস হয়ে পড়লো। সে কোনদিন কারও কাছে কিছু শেখেনি। রেডিও রেকর্ড সিনেমা থেকে শুনে শুনে গান তুলেছে।

গাও না। ভয় কিসের।

তবু গোপাল গলা খুলতে পারছিল না।

সাগর রায় আবার সাহস দিলো। দিলীপ বললো, আমি একটু আসছি।

কোথায় ?

সিগারেট ফুরিয়ে গেছে।

বোসো। আনিয়ে দিচ্ছি।

ব্যস্ত হতে হবে না। আমি এখুনি আসছি সাগর।

বেশ বড় ফ্ল্যাটবাড়ি। দুদিকে ঘোরানো সিঁড়ি। দিলীপ বাঁদিকের সিঁড়িটা ধরবে বলে এগোচ্ছিল। তার আগেই আরেকজন তাকে ধরে ফেললো।

আধো-ভেজানো দরজার ভেতর থেকে একখানা হাত এসে দিলীপের কাঁধ ধরে ফেললো। তারপর তার হাত ধরে একটা ঘরে টেনে নিলো তাকে।

দিলীপের বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠলো। একদম হকচকিয়ে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠলো প্রায়।

আস্তে! নন্দন ঘুমোচ্ছে।

ঘরের ভেতরকার অন্ধকার সয়ে আসতেই দিলীপ চমকে উঠলো। তুমি স্বাতী।

একদম ডিটেকটিভ বইয়ের মত আচমকা আমায় টেনে আনলে—

না হলে তোমায় চমকে দিতাম কি করে ! সাগরবাবুর ওখানে এসেছিলে ? কে গান শিখবে ?

কোন জবাব না দিয়ে দিলীপ বললো, তুমি এখানে ? কতদিন ?

এখানেই তো চলে এসেছি। সুধীর অবশ্য জানে না। নন্দনকে একদিন চুরি করেছিলো। তুমি তো জানো।

চুরি কেন বলছো ? সুধীরেরই তো ছেলে নন্দন। বাপ হয়ে ছেলেকে দেখতে চাইবে না ?

ওইটেই তো মুশকিল হয়েছে। আমি আছি এ-বাড়িতে একটা ঘর নিয়ে। আমাদের জানাশোনা স্নলতাদির বাড়ি এটা। মিডওয়াইফারি করেন হসপিটালে। এই তো এখন ফেরার সময় হয়ে এলো।

নাইট ডিউটি ?

হ্যাঁ। মাসের ভেতর অন্তত বিশদিন। তোমাব কথা ওকে বলেছি।

শুনেটুনে কি বললেন ?

বোসো না।

না। আমি সিগারেট কিনতে বেরিয়েছি। ওরা ওয়েট করা'ব।

করুক গিয়ে। তুমি বোস তো।

সারাটা শরীর দিয়ে দিলীপকে ঠেলে নিয়ে স্বাতী বড একটা সোফায় বসিয়ে দিল। এখান থেকে ফ্ল্যাটটা পরিষ্কার দেখা যায়। পুরনো কায়দার ভেতর বেশ নতুন করে গোছানো। জানলাগুলোর ওপর কাঠের পেলমেট। কলের মুখ লাগানো কুঁজো।

ছেলে এতবেলা অব্দি ঘুমোচ্ছে ? তুলে দাও।

না। ঘুমোক। কাল স্কুলে ড্রিল একজামিন ছিলো। সন্ধ্যে অব্দি। অন্য কথা তুলো না। আমি একটা কথা বলতে চাই তোমায়—

সিগারেটটা কিনে আনি আগে। ওরা বসে আছে—

থাকুকগে। আর সময় হবে না হয়তো। আমার সঙ্গে সুধীরের সেপারেশন হয়ে গেছে। ও এখন নন্দনের দখল চাইছে। সে আমি কিছুতেই হতে দেবো না। তুমি একটা ব্যাপারে আমায় সাহায্য করতে পারো। ওর একজন বাবা দরকার।

বাঃ ! নিজের বাবা থাকতে আমায় বাবা ডাকবে কেন !

তোমাকে ও রেসপেক্ট করবে। তুমি লোভী নয়। এসো। আমরা এক

সঙ্গে থাকি। আমি ভীষণ আনপ্রোটেকটেড। এক এক সময় ভয় করে দিলীপ—

তোমার তো ভয় করার কথা নয় স্বাতী। দিব্যি অজানা স্মার লেজলিউডের সঙ্গে মিশে গেলে সেবারে—

সেটা তোমার প্রয়োজনেই দরকার ছিল দিলীপ।

তাই বলে অতটা ?

তুমি কেন পালিয়ে এসেছিলে দিলীপ ? সহ্য হয়নি ? তাই না ?

এই সকালবেলা ঝগড়া করে কি লাভ। তোমার কমিশন তো চেকে পাঠানো হয়েছিল।

হ্যাঁ। মোটা টাকার চেক। দুজনে একসঙ্গে থাকলে আরও বড় অঙ্কের চেক পেতাম। এসো। আমার সঙ্গে এখানে থাকবে। বৌদিকে জানাবার দরকার নেই। আমাদের বিয়েরও দরকার নেই। নন্দন বড় হয়ে বুঝবে। তখনো তোমাকে সমান রেসপেক্ট করবে। আজকাল একা আমার ভীষণ ভয় করে। বয়স হচ্ছে। পুরুষলোক তবু আমার দিকে না তাকিয়ে পারে না—

তাদের দোষ কি। তোমার স্কিন যে ভালো।

এভাবে বোলো না দিলীপ। এসো। আমরা একসঙ্গে থাকি।

আমি যে কোন দিন দাদু হবো। এখন কি আর নতুন করে পারবো ?

দাদু ?

হ্যাঁ। রবির বউয়ের বাচ্চা হবে।

বিয়ে দিলে কবে ?

দিলীপ শর্টে সেরে দিল। এই তো। বছরখানেক। তোমার সঙ্গে চা-বাগানে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে ফিরেই তো সব হয়ে গেল। কাউকে খবর দিতে পারিনি।

তুমি এখনো টাইট আছো দিলীপ। দিব্যি আরেকটা বিয়ে করতে পারো। পুরুষলোকের আবার বয়স কিসের! আমাদের কোন অভিভাবক নেই দিলীপ। বেশ মাথার ওপর থাকবে।

ভালো চাকরি।

ঠাট্টা কোরো না। নয়তো আমি যে কোনদিন স্থলতাদি হয়ে পড়তে পারি। বলতে বলতে অন্ধকার কার্পেটে হাঁটু মুড়ে স্বাতী দিলীপের কোলে মাথাটা রাখলো। নিরুপায় অবস্থায় দিলীপ স্বাতীর পিঠে ডান হাত রাখলো। জানলার আলোয় স্বাতীর পিঠটা পরিষ্কার বলে দেয়—শরীরচর্চায় কোথাও মেদ জমতে দেওয়া হয়নি —অসম্ভব ভালো স্কিন—যা ভালো রাখবার সব নিয়মকানুন স্বাতীর নখদর্পণে।

তাই বয়স এখানে পিছু হটে গিয়েছে।

দিলীপের পাঞ্জাবির ওপর মুখখানা রেখে স্বাতী যা বললো—তার মানে দাঁড়ায় —সে সুলতা হয়ে যেতে পারে। কোন কোনদিন বাড়ি ফেরে সুলতাদি। আবার ফেরেও না। তিন-চারদিন পরে ফিরে এসে টানা দুদিন ঘুমোয়। তখন খদ্দের এলেও ফোন ধরে না। নামিয়ে রাখে—। সেও সুলতা হয়ে যাক—দিলীপ কি তাই চায়?

দিলীপ আস্তে বললো, উঠে বোসো। সিগারেট কিনে আমায় এখুনি ফিরতে হবে। সুলতা হওয়ার দরকার কি? তুমি বিউটিসিয়ানের কাজ করো। ওটাই তো তোমার প্রফেশন।

মাথা তুলে তাকালো স্বাতী। সে উপায় নেই দিলীপ। চেম্বার করবো বলে যে কটা টাকা জমিয়েছিলাম—তার বারো আনা চলে গেলো সুধীরের সঙ্গে মামলায়। তারপর সুলতাদি প্রায়ই ছুতোনাতায় টাকা চেয়ে নেয়। ফেরৎ দেওয়ার নাম নেই। নন্দনের স্কুল আছে। আমাদের খাওয়া-দাওয়া আছে। কি থাকতে পারে হাতে! দুটো ফিক্সড্ ডিপোজিট ভাঙা হয়ে গেছে।

কাউকে বিয়ে করো তুমি। তাহলে সব চিন্তা তার ঘাড়ে পড়বে। তুমি নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

সবাই ভালোবাসতে চায় দিলীপ। বিয়ে তো কেউ করতে চায় না।

তা কেন? একটু বেশি বয়সের পুরুষ ছাখো। যার সঙ্গতি আছে এমন লোক। সে তোমায় মাথায় করে রাখবে।

সেরকম পুরুষ আর কোথায়। তাদের তো বিশ বছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে। আমি কি খুব খারাপ দেখতে হয়ে গেছি?

তা কেন? তুমি তো রীতিমত সুন্দরী।

তাহলে তোমার আপত্তি কিসের দিলীপ?

আমার কথা বাদ দাও। আমি এমনিতেই ভালো নেই।

কি হলো আবার?

আমি স্বাতী মোটা হয়ে যাবার রোগে ভুগছি। তাছাড়া আমি তো আর সে আমি নেই। তোমার কাজ চালানো গোছের ঠেকা দিয়ে যাবার মতও যোগ্যতা আমার আর নেই।

একথা বলছো কেন দিলীপ?

আমি আজকাল আর অবাক হতে পারি না। বিস্মিত কথাটা আমার কাছে এখন মিনিংলেস। সকালে ঘুম থেকে উঠে তো সেই একই জীবন। ভীষণ বাসি লাগে স্বাতী।

বৌদি তো এতটা অসাবধানী নয়। বৌদি কি কোন খোঁজই রাখে না তোমার ?

আমরা তো অনেকদিন একসঙ্গে আছি। রাণী মনে করে—আমি আছি মানে থাকবোই। আমি রাণীর কাছে—একদম—ফর গ্র্যান্টেড। শালগ্রামশিলা! কোন অদল-বদল নেই। অজর অমর অক্ষয়!

আমার সঙ্গে থাকো। আমি তোমায় নতুন করে দেবো দিলীপ। পুরুষকে যা জাগায় তার খোঁজ আমি রাখি।

বাঃ : বেশ সুন্দর বাংলা বলছো তো! আমি উঠি। এবার ওরা নিশ্চয় খুঁজতে বেরিয়েছে।

স্বাতী কিছু বলবার আগেই খোলা দরজা দিয়ে দিলীপ টুক করে বেরিয়ে পড়লো। পেছনে তাকাতে তার সাহস হলো না। দৃশ্যটা সে জানে। আধো খোলা দরজায় মুগা সুতোর ফুলতোলা পাড়ের তাঁতের শাড়ি পরে সকালবেলাকার স্বাতী দাঁড়ানো। চমৎকার স্কিন। মুখের ব্যায়াম আর ওষুধ-বিষুধের দরুন গালে কোথাও চর্বি জমেনি। টান টান চোখ। বড়। নাকের নিচের রিংকলস প্রসঙ্গে অনেকদিন আগে স্বাতী একবার বলেছিলো, শশার রস ঘষলে কোন দাগ থাকে না। স্বাতীর এ কথাটা যে আমি কেন ভুলতে পারি না।

বেশি বেলায় সাগর রায়ের বাড়ি থেকে গোপালকে নিয়ে বেরুলো দিলীপ। সাগর বললো, তোমায় কোন পয়সা দিতে হবে না ভাই। একখানা বাঁধানো খাতা এনো। যা বলবো লিখে রেখো।

দিলীপকে সাগর বললো, ছেলেটির গলার বেস ভালো। তবে স্ক্লোর দরকার।

গোপাল গাড়ি চালিয়ে দিলীপদের ফ্ল্যাট বাড়ির বেসমেণ্টে এসে পৌঁছলো, আজ সে উৎসাহে আনন্দে ফেটে পড়ছিল। গাড়ি লক করতে করতে দিলীপকে বললো, জানেন স্যার—যখন বালি বোঝাই লরি ড্রাইভ করে শেষরাতে গৌহাটি ঢুকতাম—তখনো আমার গলায় গান থাকতো। সারা রাত হাইওয়ে দিয়ে চালাতাম। এন. এইচ. থার্টিফোর। এন. এইচ. থার্টিসিক্স। এক এক রাতে একই গান তিরিশবার গেয়েছি স্যার—

এখন গোপাল তুমি নিয়ম করে গান শিখবে। এখন আমাকে বা কাউকে স্যার বোলো না।

কেন স্যার ?

এ তো আর গাড়ি কেনাবেচা নয়। তাই না ?

আপনি যা বলবেন স্যার। সরি—

গোপাল চলে যাচ্ছিল। দিলীপ তাকে থামালো। পেছন দিকটা খুলে দাও। বউমার জন্যে কটা ডাব কিনেছি—

গোপাল চলে যেতে দিলীপ তিনটে ডাব নিয়ে বেসমেণ্ট থেকে বেরোচ্ছিল। ফেরার পথে গাড়ি থামিয়ে কিনেছে। মালবিকার এখন ডাবের জল ভালো লাগবে। এক-একদিন ভাদুরে গরমে সারা ফ্ল্যাটবাড়ি তেতে থাকে।

মাটির নিচে বেসমেণ্টে প্রায় তিরিশখানা গাড়ি থাকে। তাছাড়া থাকে ওপরে। এখন বেসমেণ্ট প্রায় ফাঁকা। সেই ফাঁকা বেসমেণ্টে গুলির মতই একটা কথা ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো। একদম অর্ডারের ভঙ্গীতে।

দাঁড়াও।

প্রথমবার বুঝতে পারলো না দিলীপ। বেসমেণ্ট থেকে বেরিয়ে এসেছিলো প্রায়। আবার দাঁড়াও কথাটা রিবাউণ্ড করে তার কানে আছড়ে পড়লো। দিলীপ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, কে ?

দুটো অ্যামবাসাডরের পেছন থেকে রোগা মত টাপু বেরিয়ে এলো। মাল্টি-স্টোরিডের চওড়া কলমের গায়ে বিল্ট-ইন সুইচ। সেটা টিপে দিতেই টাপুর পুরো চেহারাটা দেখতে পেল দিলীপ। রক্তচক্ষু। ডান হাতে খালি সোডার বোতল একটা।

কি রে টাপু! এটাই তোদের আখড়া হয়ে গেল !

আজ দিলীপদা তুমি আমার ফ্রেণ্ড হবার চেষ্টা কোরো না। আজ আমি একটা ফয়সালা চাই—

কতটা খেয়েছিস ?

তাতে তোমার কি দরকার ?

কোথাও বাজিয়ে টাকা পেয়েছিস নিশ্চয়। এভাবে ওড়াস নে। তুই তো আমাকে অ্যামপ্লিফায়ার কিনে দিতে বলেছিলি। এভাবে না উড়িয়ে নিজেই তো কিনতে পারিস—জমিয়ে জমিয়ে।

ও রিকোয়েস্ট উইথড্র করে নিচ্ছি। আই ওয়াণ্ট এ শো ডাউন। তোমায় কৈফিয়ৎ দিতে হবে—

কি হয়েছে বল্ না। অত ইংরিজি বলছিস কেন ? বলতে বলতে দিলীপ দেখলো সোডার বোতলসুদ্ধ টাপুর হাত উঠছে।

দিলীপ খুব সাবধানে বাঁ হাতে ঝোলানো ডাবগুলো ঢালু বেসমেণ্টে গড়িয়ে দিল। তার চোখ তখন টাপুর হাতের দিকে। কি হয়েছে তোর টাপু—? বলতে বলতে দিলীপ এগিয়ে গিয়ে দু হাতে জড়িয়ে ধরলো। কি ব্যাপার বল্ তো?

ছাড়ো। ছাড়ো বলছি।

না। ছাড়বো না। বলে দিলীপ গোড়াতেই সোডার বোতলটা কেড়ে নিল। কে কে খাচ্ছিলি? এটা বারোয়ারি বার হয়ে গেল শেষে। কে ছিল সঙ্গে? অনেকটা খেয়ে ফেলেছিস দেখছি।

কেউ না। আমি একা।

একা একটা বড় বোতল খেলি? এই ভ্যাপসা গরমে?

সে খবরে তোমার দরকার কি? তোমার ছেলে আমার বোনের সর্বনাশ করেছে। রবি কোথায়? বল আমাকে। খুলিটা উড়িয়ে দেব।

দিলীপ হেসে ফেললো। চেষ্টা করলেও তা বোধহয় পারবি না।

নিজের ছেলের জন্য খুব গর্ব? তাই না? অমন চোরের মত পালিয়ে থাকে কেন? আমার বোনটার ক্যারিয়ার ফিনিশ। অ্যাথ্‌লেটের লাইফ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো।

তোদের বৌদি তাকে তো ছেলের বউয়ের মত বাড়িতে নিয়ে এসেছে।

তাতে সব অপমানের ফয়সালা হয়ে গেল!

আমাকে বলে কয়ে তো মালবিকা রবির সঙ্গে মেশেনি। আর আমরাও তোর বোনকে মাথায় করে রেখেছি।

জুতো মেরে গরু দান?

কি বাজে বকছিস? যা বুঝিস নে টাপু—

অমন ভড়কি দিও না। তোমার ছেলেটা একটা কাওয়ার্ড। পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

তার সামনে এসব কথা বললে পারিস।

দেখা হলে তো!

আচ্ছা। দেখা হলে রবিকে তোর সঙ্গে কথা বলতে বলবো। তখন এসব চোটপাট কোথায় থাকে দেখব।

টাকার গরম দেখিয়ো না। তোমাদের মত বড়লোকের ছানাপোনা যে কোন ক্রাইম করে ছাড়া পেয়ে যায়। কেউ তাদের ছুঁতে পারে না।

টাপু! এবার কিন্তু আমি তোকে তুলে আছাড় দেব। রবি নিজের প্রফিটের জন্যে কিছু করতে যায়নি। পুলিসের তাড়া খেয়ে পালিয়ে থেকে সে সণ্ট লেকে দু

কাঠা জায়গা পাবে না। নে, সরে দাঁড়া। ডাবগুলো গেল কোথায়?

নিজের মাল খুঁজে নাও। আমি পারবো না।

তা পারবি কি করে। তোর বোনের জন্যেই এনেছিলাম—। একবার তো দেখতে গেলেও পারিস।

বাইরে নিশ্চয় এখন অনেক মেঘ এসে পড়েছে। নয়তো বেসমেণ্টের ভেতরটা এত অন্ধকার হয়ে এলো কেন। একটা ডাব পাওয়া গেল চওড়া কলামের পাশেই। বাকিগুলো গড়িয়ে কাছাকাছিই ছিল। টাপু গুছিয়ে-গাছিয়ে দিলীপের হাতে তুলে দিচ্ছিল। দিতে দিতে বললো, মৃত্যুর পর কাগজে আমাদের ছবি উঠবে। নিচে লেখা থাকবে ইনি সারাজীবন বেকার ছিলেন—

অন্যদিন হলে দিলীপ হো হো করে হেসে উঠতো। আজ বললো, এরই ভেতর নেশা কেটে গেল!

কতটুকু খেয়েছি দিলীপদা?

দাদা ডাকবি না আর—

ও হ্যাঁ। মালবিকার শ্বশুর তো। তা মেসোমশায়, তোমাদের মত পয়সা পাবো কোথায়। তোমরা তো বড়লোক।

এই ছিঁচকাঁদুনে কথাগুলো রাখ্।

তাহলে কি বলবো? জন্ম থেকে মৃত্যুর মধ্যে যে পাঁচ পয়সা কামাই করেনি—এমন একটা উদাহরণ দাও তো।

ইচ্ছে করলেই কামাই করা যায়। ওসব কথা বলে কথা ঘোরাসনি। ববির সঙ্গে যদি কোন দিন দেখা হয় তো বলিস—তার ওপর আমার আর কোন রাগ নেই। আমি দালালী ছেড়ে দিয়েছি—

দিলীপ ডাব হাতে লিফটের দিকে এগোচ্ছিল।

পেছন পেছন টাপু। তুমি দালালী করতে নাকি?

হ্যাঁ টাপু। একটা খাদানের শেয়ার ক্যাপিটাল—ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সবই আমি যোগাড় করে দিয়েছি। সেজন্যে আমি কমিশনও পেয়েছি। এই কমিশন অবিশ্যি খরচ-খরচায় অনেকটা বেরিয়ে গিয়েছে। তবু দালালী তো—

ঠিক এই সময়—কলকাতা থেকে অনেক দূরে—সামনে একটা পাহাড় সাক্ষী রেখে খবি কোল ইণ্ডিয়ার গেস্ট হাউসের বারান্দায় এসে বসলো। আগেকার খনি মালিকের বাংলো এখন সরকারী বিশ্রামালয়। চারদিকে ঘোরানো বারান্দা।

ভাদ্র মাসের পড়ন্ত বেলায় মেঘলা আকাশের নীচে পাহাড়টা আগাগোড়া ভিজে

যাচ্ছিল। ঋষি যেদিকেই তাকাচ্ছিল—সেদিকেই হয় কালো—না হয় সবুজ। গাছপালাগুলো ক্রমাগত বৃষ্টির জল পেয়ে পেয়ে সবুজ। ধুলোমাখানো পাহাড়গুলো জলে ধুয়ে গিয়ে নিজের নিজের স্বরূপ ফিরে পেয়েছে।

এটা কোল ইণ্ডিয়ার জারনালে পাণ্ডবেশ্বর এরিয়া। গদিওয়ালা চেয়ারে বসে ঋষি গুনগুন করে গাইছিল। টেবিলে পেপারওয়েটের নীচে কাল বিকেলের একটা টেলিগ্রাম পড়ে আছে। কবার পড়া হয়ে গেছে। আরেকবার দেখার ইচ্ছে হলো। কিন্তু দেখলো না।

এখন এখান থেকে বসে সে এই পাণ্ডবেশ্বরেরই আরেকটা খনির কথা ভাবছিল। এই চেয়ারে বসে ভৌমিক খাদান দেখা যায় না। দেখতে হলে জিপে করে অন্তত কয়েক মাইল যেতে হবে। তবে দেখা যাবে।

বৃষ্টির গুঁড়োগুলোকে দলা পাকিয়ে ভাদ্র মাসের ক্ষ্যাপা বাতাস উঁচু-নীচু মাঠের ওপর দিয়ে রোল করে ছুটে যাচ্ছিল। টেবিলে চাপা দেওয়া টেলিগ্রামটা ফড়ফড় করে উড়ছে।

ঋষি লেটার প্যাড নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো।

প্রিয় অনন্ত,

গতকাল সন্ধ্যেবেলা এক টেলিগ্রামে হেড অফিস থেকে আমার আরেকটি প্রোমোশানের খবর পেলাম। আমাকে যত শীগগিরি সম্ভব চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে হেড অফিসে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আবার সেই কোল ইণ্ডিয়ার অফিসে গিয়ে আমাকে বসতে হবে। কলকাতায় ফিরতে কার না ভালো লাগে।

আমি এখন কোল ইণ্ডিয়ার গেস্ট হাউসের বারান্দায় বসে তোমায় চিঠি লিখছি। বেলা পড়ে এলেও বৃষ্টির ছাট মেশান ঠাণ্ডা বাতাস খুব ভালো লাগে এখানে। আমি চেয়ারে বসে ভৌমিক খাদানের বেন্টিং ক্রেন বা অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছি না। না দেখতে পাওয়াই ভালো। ওই খাদানে আমি আমার এক বন্ধুকে হারিয়েছি। আমি পুরো ব্যাপারটাকেই এখন ক্যাটাসট্রোফি বলে মনে করি। দিলীপকে আমরা আর কোনদিন ফিরে পাবো না। সে দিলীপ আর নেই। কেউ কেউ বলে আমার ওপর ওর একটা বিদ্বেষ চিরকালই চাপা ছিল। নানা ঘটনায় তা বেরিয়ে পড়েছে। এসব কথা আমি এখনো বিশ্বাস করি না। কিন্তু সারা ব্যাপারটাই কেমন আগলি হয়ে পড়েছে। তাকানো যায় না। ভেতরে ভেতরে আমার ভীষণ কষ্ট হয়। দিলীপ যদি তিন বছর ধরে একটানা ঘুমিয়ে তারপর জেগে উঠতো! তাহলে হয়তো সব ভুলে গিয়ে সুস্থির হতো। বাঙালীর শিল্প-প্রয়াসে ভৌমিক খাদান একটি ল্যাণ্ডমার্ক। দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলের এই খাদান অলরেডি ইতিহাসে

জায়গা করে নিয়েছে। পরবর্তীকালে এ খাদান গবেষণার বিষয় হবে। অনেক মালমশলায় বোঝাই। এ খাদানের স্বাভাবিক মৃত্যু রুদ্ধ করে আমরা আবার জাগিয়ে তুলেছি। জাগাতে গিয়ে বন্ধু হারালাম। বাণিজ্যের সাফল্যের পেছনে সর্বদাই নীল রঙের খানিকটা পাপ থাকে। এভরি ফরচুন হ্যাজ এ সিন বিহাইণ্ড। এ কথাটা আমি খুব বিশ্বাস করি অনন্ত। তার দাম আমাদের—আমাকে দিতে হচ্ছে। ভৌমিক খাদান শুরু হয়েছিল আনন্দের ভেতর দিয়ে—হাসি গান—আড্ডায়। সে খাদান এখন আমার কাছে একটা ক্যাটাসট্রফি ছাড়া কিছুই নয়।

দ্বারকানাথের আমলের খাদানকে ইতিহাস থেকে টেনে তোলা ঠিক হয়নি। তার স্বাভাবিক মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক ছিল। ইতিহাসকে ইতিহাস থাকতে দেওয়াই শ্রেয়ঃ।

এই অব্দি লিখে ঋষি আবার চোখের সামনের পাহাড়টার দিকে তাকালো। এরিয়া ম্যানেজার থেকে এবার আমি পুরো একটা রিজিওনের ভার নেব। কলকাতার হেড কোয়ার্টারে বসে সবটা দেখতে হবে আমাকে।

আচ্ছা এই পাহাড়টা এখান থেকে কতদূরে? এটা টপকালেই কি ভৌমিক খাদান? অনন্তদের পূর্বপুরুষরা সারফেস মাইনিং করে এ খনির পত্তন করেছিলেন। তখন রাস্তা ছিল না। চারদিকে জঙ্গল। রোদে রোদ। শীতে শীত।

উনিশ

ঋষির মনে পড়লো, কয়েক বছর আগে—সে, দিলীপ আর অনাথদা সারা দিন ধরে গাড়িতে বাইরোডে শিলিগুড়ি ফিরছিল। ভুটানের একটা পাহাড় ডান দিকের আকাশে সারা দিন দাঁড়িয়ে ছিল। মাইলের পর মাইল। নর্থ বেঙ্গলের এক-একটা পাগলা নদী শীতের বিকেলে নিরীহভাবে শুয়েছিল। ব্রিজ পার হয়ে যাচ্ছিল গাড়ি। পরের পর। তিনজনেরই চোখে ঘুম।

দু ধারে পাকা ধানের মাঠে যতদূর চোখ যায়—খানিক দূর অন্তর অন্তর প্রদীপ জ্বলছে।

দিলীপ সোজা হয়ে বসেছিল, মাঠে কি ব্যাপার রে ঋষি?

তখন সন্ধ্যের হিম অন্ধকারে পাহাড়টা মুছে গেছে। ড্রাইভার গাড়ি চালাতে-চালাতেই বলেছিল, হাতি পাকা ধান খাবার জন্যে আসে। হাতি তাড়াবার জন্যে আলো—

আমরা তিনজনই সারাটা পথ উঠে বসে মাঠের আলো দেখেছিলাম। চোখের

ঘুম কোথায় চলে গেল। সারাটা আকাশ তখন অন্ধকার। একটা ব্রিজের নিচে সংকোচ নামে একটা নদী পড়েছিল তখন। এই নদীটা নাকি বর্ষাকালে ভুটান পাহাড় থেকে পাথর আর বালি নিয়ে চা-বাগানে ঢুকে পড়ে।

কদিন আগে দিলীপকে নিয়ে অনাথদার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। অনাথদা বা আমি—কেউই আমাদের দিলীপকে খারাপ লোক বলতে পারি না। ও সত্যি সত্যি খারাপ লোক হলে আমার কোন অসুবিধা ছিল না। তাহলে আমার ভেতরে ভেতরে কোন যন্ত্রণাই হত না। একটা খারাপ লোকের জন্যে কে চিন্তা করে। তাকে স্বচ্ছন্দে হিসেবের বাইরে ফেলে দেওয়া যায়।

চিঠিখানা আবার শুরু করল ঋষি।—

অনন্ত। আমার এক এক সময় মনে হয়—দিলীপ পাগল হয়ে গেছে। কমপ্লিট প্যারানোইয়াক। আমি পরিষ্কার দেখতে পাই—ও একটা পাহাড়ের বাঁকে দাঁড়িয়ে ডিনামাইট চার্জ করছে। পুরো পাহাড়টাই ও উড়িয়ে দিতে চায়। সেজন্যে নিজের যদি ক্ষতিও হয়—তাও ও মেনে নেবে। হাসি মুখে। কিন্তু পাহাড়টা ও ওড়াবেই। যেভাবেই হোক। দরকার হলে নিজের গায়ে আগুন মেখে ও বারুদে শুয়ে পড়বে। এই জিনিসটাই আমাকে কষ্ট দেয় অনন্ত। এই পয়েন্ট অব নো রিটার্ন হলো কেন? এ জন্যে কি আমি দায়ী? সাধনদা? অনাথ চক্কোত্তি? আমরা? ভৌমিক খাদান? ঠিক কোন্ জায়গাটা দিলীপকে খোঁচা দিচ্ছে—তা আমি এখনও ঠিকমত ধরতে পারিনি। অবিশ্যি ধরেও আর লাভ নেই। দিলীপকে কিছুতেই ফেরানো যাবে না।

এখন আমার মনে হয়—ইতিহাস থেকে কোন জিনিসকে জাগাতে নেই। প্রত্যেক জিনিসের একটা স্বাভাবিক মৃত্যুর মাত্রা আছে। সেই মাত্রাকে ডিসটার্ব করতে নেই।

বাকি কথা কলকাতায় গিয়ে হবে।

কলম বন্ধ করে নির্জন রেস্টহাউসের বারান্দায় ঋষি চুপচাপ বসে থাকল। তার চোখের সামনে বৃষ্টিতে পাহাড়টা ভিজছে। জায়গার নাম পাণ্ডবেশ্বর। পাহাড়ের নাম পাণ্ডবেশ্বর। এখানে ক বছর আগে আমরা একদিন সন্ধ্যেবেলা হাসতে হাসতে ট্রেন থেকে নেমেছিলাম। তখন কত আনন্দ ছিল। আরেকটা খাদান দিয়ে কি দরকার ছিল আমাদের।

ঠিক এই সময় গোকুল দত্তর ম্যারাপ বাঁধা ছাদে গোকুল দত্ত তার পয়লা নাতির অন্নপ্রাশন দিচ্ছিল। রেকর্ডে সানাই। গোকুলের স্কুলজীবনের বন্ধুরা

পরিবেশন করছিল। ক্যাটারারের লোকের হাতে পোলাউয়ের বালতি। তার ভেতর থেকে মাংসের সুগন্ধী টুকরো তুলে তুলে গোকুলের এক বাল্যবন্ধু সবাইকে পরিবেশন করছিল। লাবণ্যর থালায় দু টুকরো সুগন্ধি মাংস এক সঙ্গে দিতেই লাবণ্য বলে উঠল, আর দেবেন না। পারব না। বরং রেখাকে দিন—

বলে লাবণ্য রেখার দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেল। তারপর ভয়ে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াল। আর যারা খেতে বসেছিল—তাদেরও অনেকেই খাওয়া থামিয়ে তাকিয়ে আছে। বছর আটেকের একটি মেয়ে খেতে খেতে কেঁদে উঠল।

গোকুল দত্ত—তার ছেলেরা ছাদের দক্ষিণ কোণের লোকজনের খাওয়া দেখছিল। মাছ পড়ল কিনা। আরেক হাতা দই। এটুকু খেতেই হবে। এই সব কথা হচ্ছিল। চিৎকার শুনে তারা এদ্দিকে ছুটে এল।

এসেই গোকুল রেখার এঁটো হাতখানা চেপে ধরল। কী হলো রেখা?

রেখার এঁটো হাত পিছলে যেতেই সে ক্যাটারারের টেবিলে সাজানো আরেকটা আধুলি টুপ করে মুখে পুরে দিল।

এবার গোকুল বেশ জোর করেই চেপে ধরল রেখাকে। নিচে চল।

লাবণ্য যা দেখেছে, তা হল কলাপাতার নুনের পাশে এক মুঠো সিকি-আধুলি রেখে রেখা এক এক গ্রাস পোলাউয়ের সঙ্গে দিব্যি দু-চারখানা তুলে তুলে মুখে পুরে দিচ্ছে।

রেখাকে নিচে নিয়ে যাওয়ার পর গোকুল দত্তর বড় ছেলে লাবণ্যর কাছে এগিয়ে এল। ভয় পাবেন না কাকীমা। ছোট মায়ের মাঝে মাঝে মাথা খারাপ হয়। খেয়ে নিন।

খেতে বসে লাবণ্যর ভাল লাগছিল না। কোথায় নিয়ে গেল রেখাকে—

নার্সিং হোমে কাকীমা। আপনি চিন্তা করবেন না। গরমকালে সিট বুক করা থাকে আমাদের। পোলোয়া দেবে আরেকটু—

না। লেবু আছে?

নিশ্চয়ই—বলে গোকুল দত্তর বড় ছেলে ছুটে গেল।

এবার আশ্বিনের শেষেও প্রবল বৃষ্টি হল। নাগাড়ে সাত দিন। কলকাতা ভেসে যায় যায়। কাগজে কাগজে ভাসন্ত ঘর-গেরস্থালীর ছবি। বিহারে, ওড়িশায়, আরামবাগে এরোপ্লেন থেকে খাবারের প্যাকেট ফেলতে হল।

মালবিকার একটি খোকা হয়েছে। কার্তিকের তিন তারিখে। নার্সিং হোম থেকে বাড়ি ফিরে সে বিছানায় কান পেতে এখনও বৃষ্টির শব্দ শুনতে পায়। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে ফিরে আসা রবির পায়ের শব্দ শুনতে পায় সে। নার্সিং হোমে বহাল হবার পর তার একটাই ভয় ছিল। যদি রবি তার ছেলেকে দেখতে আসে। এলেই তো ধরা পড়বে। পুলিস কি আর ফাঁদ পেতে রাখেনি! তার ছেলে হওয়ার দিনক্ষণ রবির একদম কর গুনে গুনে জানা ছিল। এই ভয়েই সে নার্সিং হোমে সিঁটিয়ে ছিল। এই বুঝি ছেলে দেখতে এসে রবি পুলিসের গুলি খায়। কী ভয়ে ভয়েই না কেটেছে কটা দিন।

রাণী এখন নতুন দিদিমা। সে নিউ রোডের মার্ণিটস্টোরিডের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দূরে মাঝেরহাট ব্রীজের নিচের আদি গঙ্গাকে দেখতে পেল। জল একদম ফুলে ফেঁপে উঠেছে। জল দেখলে যে কী ভাল লাগে! কুটুর পার্ট টু পরীক্ষা হয়ে গেলে ওরা সবাই মিলে ট্রেনে করে কদিনের জন্যে কোথাও যাবে—যেখানে যাওয়ার পথে ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখা যাবে—ধান কাটা হচ্ছে একদিকে—আর অন্যদিকে দুই ল্যাংটো ছেলে মাঠের জল ছেঁচে ল্যাঠা মাছ ধরছে-—আর দেখা গেল না—ট্রেন এগিয়ে গেল।

শীতের প্রথম দিকে বিকেলের মরা আলো দিলীপকে ঠেসে ধরে। চেতলা, রাসবিহারীর মোড়, সন্ধ্যে রাতে চিড়িয়াখানার ফাঁকা গেট—সবই কেমন ফুরিয়ে আসা চেহারা পেয়ে যায়। তার যেন কী করার কথা ছিল। কিন্তু করা হয়নি। কিছুতেই মনে করতে পারছে না দিলীপ। এই যে বাতাস বয়ে যায়—এই বাতাসের ভেতরেও আরেকটা বাতাস আছে। পেঁয়াজের খোসার মত ওপরের বাতাসটা তুলে ফেলে ভেতরের বাতাস সে চিরে ফেলে দেখতে চায়।

কলকাতার বাইরে পৃথিবীর মানুষ বসে ছিল না। দেখতে দেখতে ধানকাটা সারা। এবার বানভাসি বৃষ্টির জলও সরে যেতে লাগল। বাতাসে শীতের ধার। বেলা বাড়লে আগুন।

চৈত্রের গোড়ায় একদিন মালবিকা গেছে বাপের বাড়ি। রাণী পাশের ফ্ল্যাটে। কুটু পরীক্ষার ফি দিতে সকালে গিয়ে লাইন দিয়েছে। দিলীপ ফাঁকা বাড়িতে দেখল রবির ছেলেটা একা একা অয়েলক্লথে উপুড় হওয়ার চেষ্টা করছে। সে এগিয়ে গিয়ে এই নবাগত পুরুষ লোকটিকে খানিকটা সাহায্য করল।

ছেলেটা উপুড় হয়ে কি খুশি। হাঁ করে হাসছে।

দিলীপ পরিষ্কার বলল, তোর বাবা তো গুলি খেয়ে মরে গিয়েও থাকতে পারে। জবাবে রবির ছেলে মুখখানা ভরে হাসল।

দিলীপ আবার বলল, তোর বাবা তো খুনের মামলার আসামী।

এবারে কিন্তু ছেলেটি হাসল না।

ওঃ! তুমি বুঝতে পেরেছো। দাঁড়াও। দেখছি। বলে দিলীপ তাকে জোর করে চিৎ করে দিল। আর অমনি ঠাঁ ঠাঁ করে কেঁদে উঠলো রবির ছেলে।

কান্না থামানোর জন্যে নিরুপায় মানুষটাকে কোলে নিল দিলীপ। তোর জন্যেই তো আমার ছেলের জীবনটা আরও ঘোলাটে হয়ে গেল।

দিলীপের এসব কথায় তার নাতি আরও ক্ষেপে গেল। বাচ্চাটাকে নিয়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল—দূরে একখানা হাতটানা রিক্‌শায় বসে মালবিকা ফিরছে। দূর থেকেই মালবিকা একই সঙ্গে তার ছেলে আর শ্বশুরকে দেখতে পেল। তারপরেই দিলীপ দেখলো, হাতরিক্‌শা বেশ জোরে ছুটে আসছে।

অনেকদিন পরে দিলীপ বুঝলো, ছেলে জিনিসটা মানুষের বড়ই দরকারী। কত কাজে লাগে। ভালবাসতে। স্নেহ করতে। ভালবাসা পেতে। পাশে থাকলে সাহায্য হয়। রবি কতদিন আসে না। কোথায় যে আছে? মরে যায়নি তো এর ভেতর। তাহলেই তো চিত্তির।

মালবিকা ওপরে উঠে এসে বললো, দিন। আপনাকে খুব জ্বালিয়েছে।

না। ভীষণ বুদ্ধিমান। আমাকে দেখে একটু আগে হাসছিল।

এ বাড়িরই ধারা পাবে তো।

ও কথা বললে কেন বউমা?

হেসে কেঁদে মায়া বাড়িয়ে দিতে ওস্তাদ। এরই ভেতর দেখুন না কেন—আপনাকে কেমন বশ করেছে এ ক'মাসে।

তোমাদের বাড়ির খবর কি?

বাবা বোধহয় মামলায় জিততে পারে—

রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সেই মামলা? এখনো চলছে?

বাবা তো বললেন, শেষ হয়ে এসেছে। জিতবেন—

তাহলে তো অনেক টাকা পাবেন।

আগে জিতুন। তবে তো! ওদিকে বড়দা—মানে টাপুদা ক'দিন হলো মিসিং। আজ চিঠি এসেছে বম্বে থেকে। মিউজিক ডিরেক্টর হবে।

তা টাপু হয়ে যেতে পারে। ভালো বাজায়—

কম্পিটিশন আছে। ভাগ্য আছে। সবার কি সব হয় বলুন? একথা বলে মালবিকা সরাসরি দিলীপের মুখে তাকালো।

চেষ্টা থাকলে হয়।

সব সময় যে হবেই—এমন কোন মানে নেই। বড়দা অর্কেস্ট্রার ভেতর এখন একজন মিউজিক হ্যাণ্ড মাত্র।

ওখান থেকেই টাপু উঠে দাঁড়াবে। দেখো—

সব সময় হয় না বাবা। আমি তো দশ হাজার মিটার দৌড়ে বেঙ্গল রিপ্রেজেণ্ট করতাম। এখন আমি কোথায়!

ও পথ তো তোমরা নিজেরা বেছে নিয়েছো। বলে খানিক চুপ করে থাকলো দিলীপ। উল্টোদিকের আয়নায় নিজের মাথার সিঁথি দেখতে পেল। সিঁথির পাশ দিয়ে খানিক জায়গায় পাক ধরেছে। দু-তিন বছরের ভেতর নিশ্চয় পেকে যাবে অনেকটা।

রবির ছেলে এই বয়স্ক পুরুষ লোকটির দিকে দু হাত বাড়িয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে দিলীপ তাকে কোলে নিয়ে নিল।

মালবিকা মাথা নিচু করে পড়া মুখস্থর গলায় বললো, আপনার কোলে থাকা অভ্যেস করুক।

একথা বলছো কেন বউমা?

আপনাকে বেশ পছন্দ করে—

আমি ঠাকুর্দা। তা তো করবেই। ও তো এ সংসারে ফেলনা নয়। রবির ছেলে। কুটু বাইরে থেকে এসে প্রথমেই তো ওকে কোলে তুলে নেয়—

আপনারা ভালো বাসবেন। আপনাদের জিনিস।

ওভাবে কথা বলছ কেন?

আমি তো বাবা এখুনি গিন্নিবান্নি হয়ে যেতে চাইনি—

সে-কথা আগেই ভাবা উচিত ছিল। বলতে বলতে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে দিলীপ আবার ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালো। আজকাল এই ঝুলবারান্দাকে তার মনে হয়—পৃথিবীর থিয়েটার দেখার বক্স। তাকালেই থিয়েটার।

ছেলেটা দিব্যি দিলীপের কান চেটে দেয়। কখনো গায়ে পেচ্ছাপ করে। পুতুলপানা হাত দিয়ে দিলীপকে ধরে রাখতে চায়। এখনো তাই করছিল। দিলীপ বকলে—রবির ছেলে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদে। সে এক দেখার জিনিস। তখন অনেক আদর করে তবে ওর মুখে হাসি ফিরিয়ে আনতে হয়। বাইরে পৃথিবীটা এত বিজনেস লাইক। এত কঠিন আর এবড়োখেবড়ো—তার ভেতর দিয়ে এই শিশু চলবে কি করে? রবি কোথায় কেউ জানে না। মালবিকা এখুনি গিন্নিবান্নি হতে চায়নি। ওর মা-বাবা বলতে এখন—রাণী আর আমি। ও আমাদের কচি নাতি। আমরা ওর কচি দাদু-দিদি। দিলীপ রবির ছেলের গায়ের গন্ধ শুঁকলো।

একদম দুধের গন্ধ। সেই সঙ্গে শুকনো শিশু-ঘামের গন্ধ।

বাবা! ও কি করছেন?

মালবিকাকে দেখে দিলীপ চমকে উঠলো। কিছু না।

ও দিব্যি আপনার কোলে উঠে আদর খাচ্ছে।

না। না। গন্ধ শুঁকে দেখছিলাম।

গায়ে বোঁটকা গন্ধ হয়েছে। দিন পাউডার মাখিয়ে আনি। বলে মালবিকা তার ছেলে ফেরৎ নিল। আপনার ফোন বাবা—

বলে দাও বাড়ি নেই।

না। খুব জরুরী নাকি, আপনাকে চাই।

দিলীপ গিয়ে ফোন ধরলো।

কে? মিস্টার বোস? আপনার মনের মত গাড়ি পেয়েছি। যাকে বলে হাওয়া গাড়ি—একদম তাই। হুড খোলা। আমি বরেন বলছি স্যার—আপনাদের বরেন দত্ত।

কাল দেখলে হয় না?

বিকেলে তো ভিড় থাকবে না। ফাঁকায় এসে দেখে যান। টোয়েন্টিএইটের অস্টিন ট্যুরার। বডিতে আপনার এক পয়সা খরচা নেই। ব্যাটারিটা পাল্টাতে পারেন ছ মাস পরে।

মাইলেজ?

তেল ভরুন। আর চড়ে বেড়ান।

তবু? গ্যালনে ক'মাইল যাবে?

পঞ্চাশ-বাহান্ন—

কি বলছেন?

তবে কি স্যার! বলেছিলাম না আপনার জন্যে একটা গাড়ি খুঁজে বের করবো।

দেখতে কেমন গাড়িটা?

যেমন দেখতে তেমন।

আচ্ছা! বুঝতে পারছেন না মিস্টার দত্ত! একটা বদখদ চেহারার গাড়ি কিন্তু আমি নেব না।

পাগল নাকি! সে গাড়ি আপনাকে দেব না আমি। এ একবার ডিপ রেড কিংবা শেল হোয়াইট রং করে বেরিয়ে পড়ুন—এর চেয়ে রইস ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। এ গাড়ি আপনি দেখেছেন।

কি রকম বলুন তো ?

পাহাড়ী সান্যাল শেষদিকে একটা গাড়ি চড়তেন।

সেই ফুটবোর্ডওয়ালা—

হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক ধরেছেন। কিংবা ভবানীপুরে একজন বুড়োমত সাদা দাড়ির সর্দারজী হোমোপ্যাথ আছেন—একা একা চড়ে বেড়ান—ডিপ ব্লু রঙের—অনেকটা সেই ধাঁচের।

সেই ধাঁচের কেন বলছেন মিস্টার দত্ত ?

ও গাড়ি দুটো নাইন্টিন থার্টিসেভেনের। আর এটা হলো গিয়ে টোয়েন্টি-এইটের।

তাহলে তো ভিণ্টেজ কার।

না। তা নয়। এ-গাড়িটা যিনি চড়তেন—তিনি কদর জানতেন। তিনি সেকেণ্ড ওনার ছিলেন। আপনি হবেন থার্ড। আমিই কালু ঘোষকে কিনিয়ে দিয়েছিলাম সেই থার্টিফোরে। এক ইহুদি সাহেবের কাছ থেকে। গাড়ি একদম ঝকঝক করছে। পায়ের কাছে আসল ব্রাস এখনো চকমক করে—

কোন্ কালু ঘোষ ?

কালু ঘোষ আবার কজন। একজনই তো হয়।

তিনি তো মারা গেছেন।

হ্যাঁ। এই তো মাস চারেক হলো খুন হয়েছেন।

সেই যে বারুইপুর লেভেল্ ক্রসিংয়ে মার্ডার কেস—স্টিয়ারিংয়ে খুন হলেন !

হ্যাঁ মিস্টার বোস। ওঁর সঙ্গের লোকটিও বাধা দিতে গিয়ে খুন হয়েছিল।

মিস্টার দত্ত, দামটা বলুন তো ?

দামে আটকাবে না। আপনি এসে দেখুন তো।

আমার ড্রাইভার নেই আজ।

আমি ড্রাইভার দেব। পাঁচ লিটার তেল ভরে সারা কলকাতা তো আগে ঘুরে বেড়ান। তারপর কথাবার্তা হবে।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ বরেনের ড্রাইভার নিয়ে দিলীপ কালু ঘোষের গাড়িতে বেরিয়ে পড়লো। আগেকার স্পোক লাগানো চাকা। হুডখোলা বলে সন্ধ্যেবেলায় বাতাস ভালো লাগছিল। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে পড়ে ড্রাইভার বললো, স্টিয়ারিং ঠিক নেই স্যার। যেতে চাইছি ডাইনে। গাড়ি চলে এলো বাঁয়ে। কি ব্যাপার বলুন তো ?

বাঁয়ে বোধহয় টান আছে।

ড্রাইভার নেমে বাঁয়ের চাকা দেখে বললো, না তো স্যার—

তাহলে চালাও তো।

ড্রাইভার গাড়ি চালালো। গাড়ি সন্ধ্যেরাতের হালকা বাতাসে দিব্যি ফুরফুর করে প্রায় উড়ে এসে ক্যালকাটা ক্লাবের সামনে থেমে গেল। তখনো পুরো থামেনি। সেই অবস্থাতেই ড্রাইভার লাফিয়ে নেমে পডলো। এ গাড়ি স্যার আমি চালাতে পারবো না—

কি হলো ?

যাচ্ছিলাম বেকবাগান। গাড়ি চলে এলো ক্যালকাটা ক্লাবে—

কি বলছো ?

হ্যাঁ স্যার। আমার আগে আগে কে যেন এ গাড়ি চালাচ্ছিল।

কি যা-তা বলছো !

হ্যাঁ স্যার। আমি স্টিয়ারিংয়ে বসে ঠুঁটো জগন্নাথ। আমার সামনে বসে কে যেন স্টিয়ারিংয়ে ভর করে ছিল। এ স্যার নিশ্চয় অ্যাকসিডেন্ট গাড়ি। এ আমি চালাতে পারবো না।

বাজে বোকো না। আমি চালাতে জানি না। গাডি তো গ্যারেজে তুলে দেবে—

আমি গ্যারেজে তুলতে গেলে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যাবে স্যার। ও-গাড়ি আমি ছোঁব না। এ পথটা যে আমি কি করে চালিয়ে এসেছি—সে আমিই জানি।

তাহলে গাড়িটা রাস্তায় পড়ে থাকবে ?

এ গাড়ি একবার চালালে কেউ ছোঁবে না স্যার।

তাই বলে পড়ে থাকবে রাস্তায় ?

বেশ তো সাইড করে আছে রাস্তায়। বলেই ড্রাইভার ছোকরা মোড় ঘোরা একটা স্লো মোশন বাসের পেছনের দরজায় উঠে পড়লো।

দিলীপ রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললো, মিস্টার দত্তকে আমি রিপোর্ট করবো।

জবাবে বড় বাসটা শুধু সাইলেন্সার দিয়ে খানিক ধোঁয়া ছাড়লো।

হাতঘড়িতে সন্ধ্যে ছটা দশ। নতুন মারকারি ল্যাম্পের আলোয় ক্যালকাটা ক্লাবের মোরাম ঢাকা প্রাঙ্গণ মাড়িয়ে এক-একখানা গাড়ি ঢুকছে। আবার বেরিয়েও যাচ্ছে। গোবিন্দ স্টিলের সঙ্গে দিলীপ এখানেই ডিল কমপ্লিট করেছিল। এখানেই স্যার লেজলিউড ওর আর স্বাতীর জন্যে আলাদা করে পার্টি দিয়েছিল।

ক্লাবের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি এক যুবককে দিলীপ চেনে। তাকে খুঁজে

পেলে হয়তো একজন ড্রাইভার পাওয়া যেতে পারে। এতবড় ক্লাবের কি আর ড্রাইভার নেই আলাদা !

কিন্তু খুঁজতে গিয়ে দিলীপ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারিকে পেল না। তার ডিউটি ছিল সকালে। তখন বরেন দত্তকে টেলিফোন করলো। ফোন বেজেই যাচ্ছে। কেউ ধরার নেই। হয় ফোন খারাপ। নয়তো বাড়ি নেই কেউ।

সন্ধ্যে সাতটা সাগাদ ইনফরমেশন সেণ্টারের সামনে এসে দিলীপ দাঁড়ালো। কি আশ্চর্য ! গাড়িটা ছিল ক্যালকাটা ক্লাবের পয়লা গেটে। পাছে অন্য গাড়ি ঢুকতে গিয়ে গুঁতো মারে—তাই কে যেন দয়া করে গাড়িটাকে ইনফরমেশন সেণ্টারের উল্টোদিকে সেফ জায়গায় পার্ক করে রেখে গেছে।

তাহলে শহরে এখনো কনসিডারেট ভদ্দরলোক আছে। কে বলে কলকাতা মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে ! বলিহারি ড্রাইভার ! গাঁজা খায় বোধহয় ! নইলে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে এভাবে সটকে যায় কেউ ? আবার বলে কিনা অ্যাকসি-ডেণ্টের গাড়ি। রইলো আপনার চাবি—আমি চললাম। কলকাতার মত শহরে —চারদিকে লোকজন—ইলেকট্রিকের আলো—ভূতের গল্প বানাতে এসেছে।

অ্যাকসিডেণ্টের গাড়ি কেউ কেনে না ! সারিয়ে নিয়ে কেউ চড়ে না ! তাহলে ইনসিওরেন্স কোম্পানির নীলাম থেকে এত অ্যাকসিডেণ্ট গাড়ি বিক্রি হয় কি করে ?

এই যে বোস। এখানে ? অন্ধকারে ? কি মনে করে ? একখানা থেমে দাঁড়ানো রোভার নাইনটির স্টিয়ারিং থেকে ভারিমত একটা লোক দিলীপের দিকে তাকালো। উঠে এসো। ভেতরে বসে কথা হবে।

আপনি ?

চলো। ভেতরে চলো। তোমাকেই খুঁজছি ক'দিন ধরে। উঠে এসো।

গাড়িতে উঠতেই এক চক্করে ক্লাবের ঘরে এসে ঢুকলো রোভারটা। গাড়ি থেকে নামতে নামতে লোকটিকে চিনলো দিলীপ। স্যার লেজলিউডের কোম্পানির বাঙালী ডিরেক্টর। মেজর জেনারেল রায়। আগে ফোর্ট উইলিয়ামে জি. ও সি. ইস্টার্ণ কমাণ্ড ছিল। রিটায়ারের পর স্যার লেজলি রায়কে টেনে নিয়ে বসিয়ে দিয়েছিল ডিরেক্টরের চেয়ারে। ডিরেক্টর ফর পার্সোনেল। আসলে কোম্পানির শোভা। তখনই রায়ের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয় দিলীপের। দিব্যি মিশুকে লোক। সন্ধ্যের পর বাড়ির হাতায় বসে পাঞ্জাবী বউ নিয়ে গল্প করে। একটি ছেলে। আর্মিতে ক্যাপ্টেন। একটি মেয়ে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে হোস্টেস। এক ঝলকে সব মনে পড়ে গেল দিলীপের।

ক্লাবে ঢুকতে ঢুকতে মেজর জেনারেল রায় বললো, জানো বোধহয়—স্যার

লেজলি হোমে ফিরে গেছেন। পার্লামেন্টে ওঁর এক্সপেন্স অ্যাকাউন্ট নিয়ে কোশ্চেন আদায় হবার পরেই—বিলেতে ডিরেক্টর বোর্ড ওকে ডেকে পাঠালো। নাউ আই অ্যাম টিপড ফর চেয়ারম্যানশিপ—

কনগ্রাচুলেশন্স।

পরেও জানাতে পারবে। এসো আগে বসা যাক। তোমাকে প্রথম দেখেই আমি টেকে রেখেছিলাম—

কি ব্যাপার জেনারেল ?

আমি লেফটেনান্ট জেনারেলও হতে পারিনি দিলীপ—

নামটাও মনে আছে দেখছি।

আমরা কিছু ভুলি না বোস। তোমাকে আমাদের ফার্টিলাইজার ডিভিশনের সেলসে এনে বসাতে চাই। ইস্টার্ন ইণ্ডিয়ায় আমাদের সেলস ফিগার পড়েই যাচ্ছে। আমি জানি। তুমি পারবে। আমি তোমায় তখন দেখেছি। সেই কয়লার ডিল এখনো চালু আছে।

ভৌমিক খাদানের কয়লা নিচ্ছেন এখনো ! বাঃ, বেশ।

তুমি কিছু খাচ্ছো না দিলীপ।

এই তো নিলাম।

আমার এই কার্ডখানা রাখো। কাল সকালে ফোন করবে। ঠিক সাড়ে নটায়। ফেলে যেও না।

ও ভুল আমার হয় না জেনারেল—

উঁহু। শুধু মেজর জেনারেল। ভালো কথা দিলীপ। কালু ঘোষের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কি করছিলে ?

কালু ঘোষকে চিনতেন ?

কালুকে চিনবো না। এবার কিন্তু হাসালে তুমি। ক্যালকাটা অ্যাণ্ড কালু—বোথ অয়ার সিনোনিম ফর ইচ আদার। কালু আমার সঙ্গেই রোটারিয়ান ছিল। পনেরো বছর আগে—আমি তখন লাইট মারাঠা ইনফ্যান্টির লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল। কিছু দিনের জন্যে ফোর্ট উইলিয়মে এসেছি। দেন হি ওয়াজ এ ইয়ং লায়ন। এ ফাইন স্প্যটার। রাফ অ্যাট দ্য অটোমোবিল। তখনই তো কালু ছ-ছটা কোম্পানির ডিরেক্টর। ছ মাস আগেও আমরা দুজনে এই টেবিলেই বসেছি।

শেষদিকে তো অটোমোবিল ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন।

দিলীপের মুখের কথা রায় কেড়ে নিল, গাড়িটা কিন্তু পাল্টায়নি। ওটা চড়েই সব জায়গায় যেতো।

চিজের প্লেটটা পড়েই আছে। দিলীপের মনে নেই—কটা খেয়েছে। তিন পেগ? না চার পেগ? একদম স্মুদ হুইস্কি। গাড়িটা আমি কিনলাম—

ইটস্ এ বারগেইন! ও তো গাড়ি নয়—লিওপার্ড রাস্তা পেরোবে লম্বা লাফে। উড্‌সের স্প্রিং শক অ্যাবজরবার আছে সামনের দিকে। ও গাড়ি আমি জানি দিলীপ। কালুর প্রাণ অন্ত ছিল গাড়িটা। পেছনে দুটো হাইড্রোলিক ব্রেক। সামনের দুটো মেকানিক্যাল। ফার্স্ট গিয়ার স্লিপ আছে। তাতে অবিশ্যি কিছু আসে যায় না—।

আপনার দেখছি মুখস্থ মেজর জেনারেল—

আমি যে চড়েছি কালুর সঙ্গে। হি ওয়াজ এ গ্রেট স্পোর্টস্ লাভার। তাছাড়া ক্লাব লাইফের ও ছিল প্রাণ। কিন্তু গাড়িটা কিনলে কার কাছ থেকে? ওর বউ তো সেপারেশনের পর অনেককাল হলো কানাডা চলে গেছে। ওনলি চাইল্ড— মেয়েটাও তো লুধিয়ানায় থাকে। ল্যাণ্ডস্কেপ গার্ডেনিং করে।

অটোমোবিল ইণ্ডিয়াই বোধহয় ডিলার মারফৎ বেচে দিলো।

তা হবে দিলীপ। আমি উঠছি। খুকীর মায়ের জন্যে একটা সফ্‌ট কিছু নিয়ে যেতে হবে।

আমিও উঠবো।

তুমি থাকো না। তোমার তো এখনো শেষ হয়নি। আমি জানি—এখনো তুমি আরও তিনটে নিতে পাবো—

আমি কমিয়ে এনেছি জেনারেল—

উহুঁ। হলো না। শুধু মেজর জেনারেল। তুমি যেতে পারবে তো?

খুব পারবো।

তাহলে বোসো। কাল সকাল সাড়ে ন'টায়—মনে আছে তো?

খুব। বলতে বলতে দিলীপ দেখলো আর্মির টাটকা স্টেপ ফেলে ফেলে রায় বেরিয়ে গেল। তখনো তার শেষ গ্লাসের বারো আনা বাকি। অনেকদিন পরে হুইস্কি তার বেশ ভালোই লাগছে। যে জন্যে খাওয়া—সে কাজ তৎক্ষণে দিলীপের শরীরে শুরু হয়ে গেছে। গালের বাঁ দিকটা আপনাআপনি কাঁপছিল। এরই নাম নেশা। ডাক্তার বলেছে—ওভাবে খাওয়াদাওয়া চালালে—কোন্‌দিন আপনি রাস্তায় কালীঘাটের পাঁঠা হয়ে পড়ে থাকবেন। তার মানে জিভ বের করা মানতের মুণ্ডু। ধড় তখন হাঁড়িকাঠে!

ক্লাবের ঘন ঘাসে ঢাকা মাঠে এদিককার টেবিলগুলো প্রায় ফাঁকা। আলো কিছু কম। একটা ঝাঁকড়া গাছের ডালের ছায়ায় দূরের ফ্লাড লাইট ঠিক এখান-

টাতেই কিছু ঘোলাটে। খানিক বাদে দিলীপ দেখলো, তার উল্টোদিকের চেয়ারে হাসি হাসি মুখে বেশ সুবেশ একজন বসে। ব্যাকব্রাশ চুল। নিখুঁত করে কামানো গাল। ওখানেই তো একটু আগে মেজর জেনারেল বসে ছিলো।

দিলীপের কেমন সন্দেহ হলো। সে কি আজ সন্ধ্যেবেলা মেজর জেনারেলের সঙ্গে এখানে এসেছিলো? না, গতকাল সন্ধ্যেবেলা? আজই যদি সে এখানে এসে থাকে—তাহলে এতক্ষণ এ লোকটা কোথায় ছিলো?

সব গুলিয়ে গেল দিলীপের।

লোকটি নিজে থেকেই হেসে ফেললো। কি? সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তো? তারপর বেশ আশ্বাস দিয়ে বললো, আজ নয়। কাল সন্ধ্যেবেলা রায়ের সঙ্গে আপনি এখানে এসেছিলেন—

তাহলে?

তাহলে কি দিলীপ?

তাহলে আজ আমি কার সঙ্গে এসেছি এখানে?

কেন? আমার সঙ্গে। আমরা সন্ধ্যে থেকে একসঙ্গে খাচ্ছি। একসঙ্গে ঘুরছি।

আমি তো বিশেষ ঘুরিনি মেজর জেনারেল—

উহুঁ। মেজর জেনারেল নয়।

তবে কে আপনি?

আমি ঘোষ। কালু ঘোষ—

দিলীপের সারা শরীরের ভেতরে কে যেন এক বেলচা বরফকুচি ছুঁড়ে দিল। ঠাণ্ডা। গায়ে বিঁধছে। আপনি তো নেই।

নেই মানে! খুব আছি। এইতো একসঙ্গে বসে আছি। খাচ্ছি। গল্প করছি। এর পরেও বলবেন আমি নেই?

না। মানে—শুনেছিলাম—আপনি নাকি স্টিয়ারিংয়ে বসা অবস্থাতেই—

ওসব বাজে কথা। যত সব গাঁজাখুরী। শত্রুপক্ষের রটনায় কান দেবেন না একদম।

কুড়ি

বলতে বলতে কালু ঘোষ দিলীপের ফাঁকা গ্লাসের দিকে তাকিয়ে বেয়ারাকে চোখের ইশারায় ডাকলো।

আর নেব না। আমার অনেকটা হয়ে গেছে। আপনি নিন বরং মিস্টার ঘোষ।

আমি তো নিচ্ছিই। কিছু হবে না। ওয়ান ফর দি রোড্।

এবারের গ্লাসে কালু ঘোষ নিজেই বরফ তুলে দিল। ক্লাবের এদিকটায় আলো এসে ঝাঁকড়া গাছের ছায়ায় জড়িয়ে গেছে। তার ভেতর কালুর নিখুঁত কামানো গাল স্মৃতির প্যাটার্নে ভেসে আছে। অনেকটা ভিজে মাঠে সাদা ডিমের খোলা—উপুড় করে বসানো। চোখ এড়ানো যায় না। দিলীপ বললে, আমি তো ড্রাইভার আনিনি।

তাতে কি! আপনি বসলেই গাড়ি চলবে—

আমি তো চালাতে জানি না।

স্টিয়ারিংয়ে বসে দুটো পা ক্ল্যাচ আর অ্যাকসেলারেটরে নাড়াচাড়া করবেন। দিব্যি গড় গড় করে গাড়ি চলবে তখন। দেখবেন—। মাঝে মাঝে ব্রেকে পা ছোঁয়াবেন—মাঝখানটায়।

আপনি থাকুন না আমার সঙ্গে মিস্টার ঘোষ। আমায় বাড়ি অব্দি পৌঁছে দেবেন।

সে দেখা যাবে। কোন অসুবিধে তো নেই—

বাইরে কলকাতা নিশ্চয় এখন ঘুমোচ্ছে।

ঘুমোতে দিন। আজ তিরিশ বছর আমি দেখছি—যখনই বাড়ি ফিরি, তখন কলকাতার রাস্তা ফাঁকা।

তা তো হবেই। আপনি বাড়ি ফেরেন রাত বারোটার পরে। তখন তো রাস্তা ফাঁকা হবেই। এই অব্দি বলেই দিলীপ আরেকবার শেষ চেষ্টা করলো। আচ্ছা ঠিক করে বলুন তো—

কি বলবো?

আমি আর আপনিই কি বসেছিলাম এতক্ষণ?

হ্যাঁ।

ঠিক জানেন মিস্টার ঘোষ?

তা নয়তো কি! ও-কথা কেন দিলীপ—

আমার যেন মনে পড়ছে—আমি আর অন্য কে আরেকজন—মেজর জেনারেল রায়—তার সঙ্গেই তো এতক্ষণ বসেছিলাম—

না। আমার সঙ্গে। আমি আর আপনি সেই সন্ধ্যে থেকেই—

তাহলে কে আমাকে গেট থেকে ধরে নিয়ে এলো?

আমি।

আপনি কি আমায় ফার্টিলাইজার সেলস্-এর কথা বলছিলেন?

না তো। সেসব নিশ্চয় রায় বলেছে। আজ সন্ধ্যেবেলা নয়। কাল সন্ধ্যে-বেলা বলেছে।

দিলীপের মাথার ভেতরটা ঘুরে যাচ্ছিল। আজকের সন্ধ্যেবেলাই প্রায় গুলিয়ে গেছে এতক্ষণে। তার ভেতর গতকালের হারানো সন্ধ্যেবেলা খানিকটা মিশে গেল। দেখতে দেখতে সাত-আট পেগ বোধহয় হয়েছে। মৃদু জিনিস বলে এখনো খারাপ কিছু হয়নি। তবে মাথাটা আস্তে আস্তে ডানদিকে ভারি হয়ে উঠছিল।

এবারে দিলীপ আচমকা কালু ঘোষকে সবটা দেখতে পেল। এতক্ষণ টেবিলের ওপর থেকে কালু ঘোষকে একরকম লাগছিল। অনেকটা কোন আবক্ষ স্ট্যাচু। বুক থেকে যে মূর্তির ওপর দিকটা দেখা যায় শুধু। এখন সাদা পোশাকের একটা ধারালো বয়স্ক লোক উঠে দাঁড়িয়েছে।

প্রায় সব টেবিল ফাঁকা। কালু ঘোষ বললো, চলুন, এগোনো যাক।

ক্লাবের বাইরে রাস্তার ওপর গাছতলার ছায়া। গাড়িটা খুব অনুগত পোজে বসেছিল। দিলীপ এগিয়ে গিয়ে বললো, স্টিয়ারিংয়ে আপনি বসুন।

আপনি বসুন না মিস্টার বোস।

আমি কোনদিন গাড়ি চালাইনি।

তাতে কি হয়েছে। স্টিয়ারিংয়ে বসলেই এ-গাড়ি যে-কেউ চালাতে পারে।

দিলীপের মন্দ লাগছিল না। ঠাণ্ডা বাতাস এসে কানের দু পাশের রগ টাচ করে বয়ে যাচ্ছিল। একখানা-দুখানা গাড়ি ফাঁকা রাস্তা পেয়ে দিব্যি উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। গাড়িটা এখন একটা-খোলা প্রায়। ছাদ নেই। ক্যাম্বিশের হুড্ পেছন দিকটা গুটিয়ে রাখা। লেজে চকচকে বাম্পার। গাড়ির নাকের কাছেও তাই। সেখানে দুদিকে দুটো ডাব। আসলে হেড্‌লাইট। টু-ডোর গাড়ি। সামনের সিট ভাঁজ করে পেছনে বসতে হয়।

স্টিয়ারিংয়ে বসেই দিলীপ বেশ চালের মাথায় স্টার্ট নিল। ফাঁকা রাস্তা। ক্ল্যাচ অ্যাকসেলারেটর দু পায়ের বশ হয়ে গেল দিলীপের। সে নিজেই নিজের কেরা-মতিতে আশ্চর্য। ভিক্টোরিয়ার পাশ দিয়ে রেস্‌কোর্সের দিকে যেতে যেতে দিলীপ ফাঁকা রাতে চেঁচিয়ে উঠলো, মিস্টার ঘোষ—আপনি উঠেছেন ?

ঠিক কানের পাশে পেছন থেকে কথা বললো কালু ঘোষ, এই তো আমি। বেশ চালাচ্ছেন। বাঁয়ে একটু টাল আছে।

সারাননি কেন গাড়িটা ?

হয়নি। সময় পাইনি ভাই। ডাইনে চেপে চালান—

এ-অবস্থায় বেচে দিচ্ছেন ?

তাই তো বলেছিলাম বরেনকে। বরেন দত্তই গাড়িটা আমায় কিনে দিয়েছিলো।

ঠিক রেসকোর্সের গেটে আচমকা ব্রেক কষলো দিলীপ। ঝাঁকুনি খেয়ে গাড়িটা থামলো। দিলীপ পরিষ্কার বললো, পাশে এসে বসুন।

পেছন থেকে কালু ঘোষ বললো, না। এই তো বেশ আছি। পেছন থেকে তোমায় বেশ গাইড করতে পারবো। পাশে বসে সবটা বলা যায় না।

গঙ্গায় একটা জাহাজ গলা খুলে ভোঁ দিলো। কালু ঘোষ তাকে 'তুমি' বলায় দিলীপ কোনরকম অফেন্স নিল না। সে স্পষ্ট গলায় বললো, সত্যি করে বলুন তো —আপনি মরেননি?

ওসব মিথ্যে কথা তুমি বিশ্বাস করো!

দিলীপ তখনো তার রেডিয়াম ডায়ালের হাতঘড়ির কাঁটা চিনতে পারছিলো। রাত পৌনে একটা। আজ সবই আশ্চর্য কাণ্ড ঘটছে। আমি কোনদিন গাড়ি চালাইনি—অথচ এখন দিব্যি চালাচ্ছি।

চেষ্টা করোনি—তাই চালাওনি।

আপনি বলছেন—আমি নাকি গতকাল সন্ধ্যেবেলা মেজর জেনারেল রায়ের সঙ্গে ক্লাবে ছিলাম।

তাই তো ছিলে।

আজ সন্ধ্যে থেকেই নাকি আপনার সঙ্গে আছি।

কেন? সন্দেহ আছে তাতে?

কালু ঘোষের গলা এত পরিষ্কার—দিলীপ তার নিজের কানের পাশে পেছন থেকে কালু ঘোষের গলা—গালের সেভিং ক্রিমের গন্ধ পাচ্ছিল—সে কিছুই আর সন্দেহ করতে পারলো না।

নাও। এবার স্টার্ট দিয়ে চিড়িয়াখানার দিকে চলো তো। একটা নতুন জিনিস দেখাবো তোমায়।

এখন তো গেটে তালা ঝুলছে।

চলো না বলছি। গুহ যখন ডিরেক্টর ছিল, সে আমায় তখন এই দরজাটা চিনিয়েছিল। খিদিরপুরের পোল পেরিয়ে চলো।

দিলীপ ধরতে পারছিল না—কে গাড়ি চালাচ্ছে? সে নিজে? না, গাড়ি নিজেই চলছিলো? অস্টিন ট্যুরারটা সেন্ট টমাস স্কুলের গা দিয়ে দিব্যি একটা খোলা দরজা পেয়ে চিড়িয়াখানায় ঢুকে পড়লো। সরু পিচ-রাস্তায় নিবু-নিবু ইলেকট্রিক আলো। গাছপালার ছায়া। একজনও লোক নেই।

পেছন থেকে কালু ঘোষ বললো, হাতির মাহুত এখন ওয়াটগঞ্জে সুমিত্রার বাড়িতে

মজা লুটছে। ও ফিরে তবে দরজা বন্ধ করবে।

সুমিত্রা নিশ্চয় বেশি রাত অব্দি জেগে থাকা কোন মহিলা—যার মাহুতের সঙ্গে বন্ধুত্বেও কোন আপত্তি নেই। মনের এই কথাটা কালু ঘোষকে বলতেই সে তো হেসে অস্থির। এক-একটা কথা বলে আর হো হো করে হাসে। শেষে বললো, মহিলা কি! বাড়িউলি। বালিয়া জেলার মানুষ। সারা গায়ে উল্কি। তুমি গেলেও ভাই ঠাণ্ডা সফ্‌ট্ ড্রিংক এগিয়ে দেবে আগে।

কালুর হাসিতে চিড়িয়াখানার দু-একজন বাসিন্দা জেগে গেল। যেমন, হনু-মানদের ঘরের কয়েকজন বাসিন্দা লাফিয়ে লাফিয়ে এসে দিনের বেলার দাঁড়ে বসলো। বাঘের খাঁচা থেকে একটা গম্ভীর মনোকষ্টের যন্ত্রণা উ-উ-ম করে ঠেলে উঠলো নির্জন বাতাসে। বাঘের সে ডাকের ভেতর সব সময় বনের স্বপ্ন মিশে থাকে। চিরকাল এই কথাটাই মনে হয়েছে দিলীপের। খেলা খেলা ভাবে যে-গাড়ি চালানো যায়, তা জানা ছিলো না। চিড়িয়াখানাকেও কালু বশ করে রেখেছেন।

সামনে এসে বসুন না।

না। এই বেশ আছি। ত্যাখো তো কে তাকিয়ে আছে তোমার দিকে—

কোথায়?

ডান হাতে তাকাও।

দিলীপ ব্রেক কষলো। গাড়ি থামাতেই সে চমকে উঠলো। সেই হরিণটা। ও প্রায়ই সাজানো পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দেওয়ালের বাইরের কলকাতা দেখে। ডাব দুটোয় একবার আলো জ্বলে উঠতেই কালু বললো, হেডলাইট নেভাও।

নেভাতে নেভাতে দিলীপ দেখলো হরিণটা সেই একই ভঙ্গিতে অস্টিন ট্যুরার, তার পাইলট, পাইলটের বন্ধুকে খুব মন দিয়ে দেখছে। মাথাটা একদিকে হেলানো। একদিকের কান খাড়া। অন্যটা ন্যাতানো। আর সেই হরিণের পেছনে হরিণের পর হরিণ। সারা চিড়িয়াখানার হরিণ। একের পর এক। ছুঁচলো মুখ। কাজল-টানা আচ্ছন্ন চোখ। মুখ ওপরে তোলা সারি সারি গলা। মাথায় সিং। নয়তো সিংয়ের আভাস। সব চোখ দিলীপদের দিকে। দেখলেই মনে হবে পার্কিং-সেটে দাঁড় করানো একপাল হরিণ। যেভাবে অফিসপাড়ায় অ্যামবাসাডর, ফিয়াট সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

হরিণরা বুঝতে পেরেছে—আমরা তাদের এপারের বন্দী। ওরা ওপারের—

কালু কোন কথা না বলে চুপ করে থাকলো। দিলীপের ইচ্ছে হচ্ছিল—এবারে ফেরা দরকার। চোখ একদম বুজে আসছে। সে কোনদিন গিয়ার দেয়নি।

দিব্যি লাট্টু গিয়ারে গিয়ে তার হাত পড়লো। ক্লাচ ছাড়া, অ্যাকসেলারেটরে সময়মত চাপ দেওয়া—সবই হয়ে গেল আপনাআপনি।

সেই খোলা দরজা দিয়ে রাস্তায় পড়েই কালু ঘোষ বললো, চলো দিলীপ। মাহুত বেটাকে ধরে নিয়ে আসি।

দিলীপ অনেক কষ্টে বললো, কি হবে। ছেড়ে দিন।

চলো না ভাই। সুমিত্রার বাড়ি থেকে পছন্দমত বেছে নেবে।

হেস্টিংসের দিককার একটা রাস্তায় ঠিক ক্রসিংয়ে ট্রাফিকের লাল সবুজ হলদে সিগন্যাল আপনাআপনি হয়ে যাচ্ছিল। অথচ এই গভীর রাতে তো কোন ট্রাফিক নেই। দিলীপ লাল পেয়ে থেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কালু ঘোষ ধমকে উঠলো। থামলে কেন? চলো। গঙ্গার ধারটা ঘুরে যাই।

বলতে না বলতেই গাড়ি প্রায় আপনাআপনি স্টার্ট নিল। দিলীপ নামকোয়াস্তে শুধু জায়গামত হাতের আঙুল পায়ের গোড়ালি ইউজ করলো। কোন বাম্প নেই। ইঞ্জিনে একটুও ব্যাক ফায়ার নেই। নেই লবিং। যেন জলে চলছে।

গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়া পেয়ে দিলীপ বস্থ স্টিয়ারিংয়েই ঘুমিয়ে পড়লো। সে তখনো বুঝতে পারছিলো, আজকের সন্ধ্যেটাই গোলমেলে। কোত্থেকে কি হয়ে গেল! কোনদিন গাড়ি চালাইনি। তবু চালাচ্ছি। গাড়ির ওনার আমারই পেছনে বসে। অথচ তার অলরেডি মরে যাবার কথা। কিন্তু সে নাকি সারা সন্ধ্যে আমারই সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করেছে। একই টেবিলে—মুখোমুখি বসে। স্মুদ হুইস্কি। বরফের টুকরো।

আরও বেশি রাতে একবার জেগে গেল দিলীপ। তাকে কারা যেন জাগালো। একটা কালো রংয়ের ভ্যান। বাঁ হাতে ভবানীপুরের কাঁসারিপাড়া অনেকটা। ডান হাতে আদিগঙ্গা ঘেঁষে বাতিল মিলিটারি কবরখানা। সিমেন্টের পোলের মাথায় চাঁদ। পোলের নিচেই তিনটে শুয়োর গঙ্গায় নেমে গেল তখুনি।

তারপর আলোয় ভর্তি একটা লিফ্‌টের ভেতর সে ঢুকে গেল। এই অব্দি মনে থাকলো। তারপর সব অন্ধকার।

সকালে তাকে ঘুম থেকে তুললো রাণী। কাল কোথায় গিয়েছিলে?

বেলা আটটায় পরিষ্কার রোদে তাকাতে পারছিলে না দিলীপ। কালকের ট্রাউজার, সার্ট কিছুই খোলা হয়নি। মাথাটা পাথর। চোখের দুই পাতা ভারি। দিলীপ কোন কথা না বলে কলঘরে চলে গেল।

ফিরে এসে খাবার টেবিলে বসলো দিলীপ। একসঙ্গে দুজনে সকালের চা

খায়। অনেকদিনের অভ্যেস। চায়ের কাপ রেখে রাণী বললো, কাল প্রায় শেষ রাতে লিফ্‌টের ভেতর থেকে দারোয়ান তোমায় দিয়ে গেছে। এই তো ছেড়ে দিয়েছিলে। আবার?

দিলীপ মনে করার চেষ্টা করছিলো—কখন সে অন্তর্ধান হয়। বা, কখন থেকে তার আর কিছু মনে নেই।

রাণী বললো, ঋষি ওদের সঙ্গে গিয়েছিলো?

নাঃ। ঋষির সঙ্গে দেখাই হয়নি। পাণ্ডবেশ্বর থেকে কলকাতায় আসছে—

বদলি হলেন?

হ্যাঁ। প্রোমোশন নিয়ে আসছে।

এক বছরে দু'বার?

যোগ্যতা আছে।

চায়ের কাপ হাতে দুজনে মুখোমুখি। দিলীপ সোজাসুজি তাকাতে পারলো না রাণীর মুখে। বউ কেন অফিসের কথা বলবে? এরকম একটা যুক্তি মনে আসতেই রাণীর জন্যে দিলীপের মনে একই সঙ্গে মায়া আর লজ্জা কাজ করে বসলো। তাই সে আর রাণীর চোখে তাকাতে পারলো না খানিকক্ষণ।

কাল কার একটা বিদ্‌ঘুটে গাড়ি নিয়ে এসেছো?

এনেছি? সেই গাড়িটায় চড়ে এসেছি?

কোন্ গাড়ি?

দিলীপ উঠে দাঁড়ালো। ও-গাড়ির কথা কে বললো তোমায়?

লিফ্‌টম্যান বলছিলো।

কি বলছিলো রাণী?

অমন পাগলের মত করছো কেন? বসো। তোমার জন্য একখানা চিঠি আছে।

কার চিঠি? বলেই দিলীপ আবার উঠে দাঁড়ালো। গাড়িটা একবার দেখে আসি।

তোমার তো একখানা গাড়ি রয়েছে। আবার গাড়ি দিয়ে কি হবে?

সব কি তুমি শুনতে পারবে। ড্রাইভার এলে নিচে বেসমেণ্টে যেতে বলো। আমি এখুনি একবার ঘুরে আসছি।

দাঁড়াও। এই চিঠিখানা পড়ো আগে।

কার চিঠি?

পড়ো আগে।

দিলীপ পড়তে গিয়ে চমকে উঠলো। এসব কি লিখেছে মালবিকা ?

আগে সবটা পড়ে ছাখো।

শ্রীচরণেষু বাবা,

আপনি ও মা আমায় ক্ষমা করবেন। অনেক ভেবে দেখলাম—এ-জীবন আমি মানিয়ে নিতে পারছি না। আমার ছিলো অ্যাথেলেটের জীবন। ভেবেছিলাম—একদিন এশিয়ান গেমস—ভালো দৌড়তে পারলে ইণ্ডিয়ার হয়ে অলিম্পিকে যাবো। আপনি বা মা কিংবা কুটু সবাই আপনারা আমায় আগলে রেখেছিলেন। কিন্তু আমি তো আপনার ছেলের খুনের রাজনীতিতে একদম বিশ্বাস করি না।

আমায় ক্ষমা করবেন। আপনাদের নাতি ইতিমধ্যেই তার ঠাকুমার অনুগত। ওইটুকু শিশুর যত্ন নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই সেটা আমি বুঝতে পেরেছি। যদি কখনো মনে হয়—ও আপনাদের কাছে একটি বোঝা—তবে আমায় ডাকবেন। আমি এসে নিয়ে যাব।

আপনাদের ওখানে আমি আরামেই ছিলাম। তবু আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। রবি বলেছিলো—সে মানুষের ভালোর জন্যে এসব করছে। কিন্তু দেখছি সেই মানুষ তার সঙ্গে নেই। বরং মানুষই ওদের ভয় করে।

আমি আমার পুরনো জীবনে ফিরে গেলাম। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নেবেন।

প্রণতা

মালবিকা

দিলীপ প্রথম কথাই বললো, বাচ্চাটাকে দিয়ে আস্থক কেউ—

না। রবির ছেলে আমাদের কাছে থাকবে।

মা ছাড়া বাচ্চা থাকতে পারে না। কেন শুধু শুধু সেণ্টিমেণ্টাল হচ্ছো রাণী—

রবি এলে তাকে আমরা কি দেব ?

রবি আর এসেছে। এমনিই আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে। রবি নিজের হাতে তা আরও শেষ করে দিলো।

কুটুকে পাঠিয়েছি।

কোথায় পাঠালে ?

কাল সন্ধ্যাবেলা এ চিঠি পেলাম। তুমি বাড়ি নেই। কুটু নেই। কুটু থাকলেও আমি নিজেই কাল রাতে যেতাম। গিয়ে বলতাম—তুমি অ্যাতোটা নেমকহারাম কেন মা ? আমরা তোমায় ছেলের বউ করে বাড়ি নিয়ে এলাম। আর খালাস হয়েই তুমি স্বরূপ ধরলে !

না গিয়ে ভালো করেছো।

তুমি ফিরলে শেষ রাতে। আমি জেগেই ছিলাম। এই আসো এই আসো ভেবে অন্ধকার ব্যালকনিতে বসেছিলাম। একটু ঘুমিয়ে পড়েছি—দরজায় বেল—উঠে গিয়ে দেখি দারোয়ান তোমায় ধরে নিয়ে আসছে। এখানে একটু থেমে রাণী বললো, তাই আজ সকালে কুটুকে পাঠালাম—

পাঠাতে গেলে কেন? আমাদের জীবন তো এমনিই নষ্ট হয়ে গেছে।

তবু সে তো আমার ছেলের বউ—বলতে বলতে কুটু ঘরে ঢুকলো।

ঢুকেই কুটু বললো, নাঃ! বউদি আসবে না মা—

কাকে বউদি বলছিস কুটু। বলে দিলীপ নিজে নিজেই মাথাটা খাবারের টেবিলে রাখলো। নুনদানীর নিচে ফ্ল্যাটের কিস্তি বাকি পড়ার রিমাইণ্ডার। ইলেকট্রিক বিল। প্রাইভেট শাড়ির দোকানের নেমন্তন্নর চিঠি। আরো হ্যানোত্যানো—অনেক চিঠি—যার অনেকগুলোই খুলে দেখার সময় হয়নি দিলীপের।

সেই অবস্থাতেই দিলীপ শুনতে পেল—রাণী কুটুকে অস্ফুটে বলছে—খোকার অয়েলক্লথটা পাল্টে দে মা। আমি নিচের দোকানে বড় কৌটোয় গ্ল্যাকসো এনে রাখতে বলেছিলাম। এসে থাকলে আনিয়ে নিতে হবে।

শুনতে শুনতে দিলীপ পরিষ্কার দেখতে পেল—তার এই জীবনে আর কোনো দিকে এগিয়ে যাবার উপায় নেই। সব পথ বন্ধ হয়ে আসছে। অনেকগুলো জট একসঙ্গে পাকিয়ে যাওয়ায় সে আর নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। এর চেয়ে—এর চেয়ে—

ভাবতে গিয়ে পরিষ্কার দেখতে পেলো—পার্কিং লটে গাড়ি দাঁড়াবার লাইনে পরপর হরিণ দাঁড়ানো। শুধু সামনের হরিণটাকে চেনা যাচ্ছে। তার সরু মুখে কাজলটানা দুই চোখ।

অফিসে বেরোবার নাম করে দেরিতেই বেরোলো দিলীপ। রবির ছেলেটার চোখে বেশি করে কাজল দিয়েছে রাণী। চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে রবির খোকা। চিৎপাত হয়ে। বুকে গলায় পাউডার। বেরোবার সময় ঘুমন্ত শিশুকে দেখে তার মুখে চাপা হাসি এসে গেল। শালা জমিদার যেন।

বেসমেণ্টে নেমে দেখলো সনাতন গাড়ি মুছে-টুছে রেডি করে রেখেছে। গাড়ি বের করতে করতে দিলীপের মুখে না তাকিয়েই বললো, ওটা কি এনেছেন দাদাবাবু?

কেন?

ও গাড়ি কে চালাবে?

তুমি চালাবে।

ও গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরুতে পারবেন!

কেন পারবো না। কালু ঘোষ যদি পারে—

সনাতন সবটা শুনতে পেল না। দিলীপ আবার বললো, গাড়িটা দেখলে তুমি?

দেখার কি আছে দাদাবাবু। ওই তো কোণে গড়িয়ে রাখা আছে।

হ্যাঁ। কাল আমি চালিয়ে এসেছি।

দারোয়ান তাই বলছিলো বটে। কিন্তু আপনি শিখলেন কবে? আমি তো আপনাকে কোনো দিন চালাতে দেখিনি।

শিখে নিলাম। শেখার কি আছে, ক্লাচ ব্রেক অ্যাকসেলারেটর। হাত পা সেট হয়ে গেলেই চিন্তা থাকে না সনাতন।

এক সন্ধ্যেতেই সেট হয়ে যায় দাদাবাবু?

হবার হলে হয়ে যায়।

আজ অ্যামবাসাডর আপনি চালান।

নাঃ! ও গাড়ি আমি পারবো না। এই দিনের বেলা—ভিড়ের ভেতর আমি পারবো না। শেষে ঘেমে গিয়ে দিলীপ বললো, অস্টিন ট্যুরারটা আমি চালিয়েছি —ফাঁকা রাস্তায়—মাঝরাতে।

খুব বেঁচে গেছেন। লরি এসে মেরে দিতে পারতো। বলতে বলতে গাড়িতে স্টার্ট নিলো সনাতন।

দিলীপ বললো, চেতলা বেকারির ওদিকটায় চল তো।

বাড়ির ভেতরে ঢুকলো না দিলীপ। গাড়ি থেকে নেমে দেখলো, দোতলার ঘরে বসে কিরীটী পালিত—তার বেয়াই এক মন দিয়ে লিখছে। রাস্তা থেকে ঘর-খানার অনেকটাই দেখা যায়। দিলীপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। যদি মালবিকা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। বাচ্চু তো নেই এখানে। খোকন নিশ্চয় তার কাজের জায়গায়। টাপু বোম্বেতে। কিরীটীবাবু এখনো অফিসে বেরোয়নি। আশ্চর্য! নিশ্চয় আজ বাৎসল্যের আইডিয়াটা লিখে রাখছে। পরে সময় মতো পেটেন্ট করাবে। বুঝতো মজা—বাৎসল্য কাকে বলে—যদি রবির মত ছেলের বাপ হতো।

মালবিকাকে দেখলে ইশারায় ডাকতো দিলীপ। কাছে এলে বলতো, এ তুমি কি করলে বউমা! নিজের ছেলে—নিজের শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে কেউ এভাবে একবস্ত্রে চলে আসে? মন খারাপ হয়ে থাকলে কদিন না হয় বাপের বাড়ি থাকতেই। তাই বলে এভাবে কেউ চলে আসে? না আসতে আছে? সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে? কাটানছাটান করে? একি মারবেল খেলার খাটান? নট কিচ্ছু। আমরা কি

তোমার কেউ নই ? ওই শিশুটি তো তোমারই ছেলে—

মালবিকা দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালো না বলে কিছুই বলা হলো না দিলীপের। গাড়িতে বসে বললো, বরেন দত্তর ওখানে চলো।

টেনিস কোর্ট থেকে সোজা এসে টেবিলে বসেছে বরেন। রোজকার মতই। তিন রঙের তিনটে টেলিফোন। পাশের ঘরে সেল ডিডের খসড়া টাইপ হচ্ছিল খটখট করে। দিলীপকে দেখেই বরেন উঠে দাঁড়ালো। এই দেখুন—আপনাকে সকাল থেকে ধরার চেষ্টা করছি। লাইন পাচ্ছি না। ড্রাইভার এসে কি সব আবোল-তাবোল বলছে। ভুতুড়ে গাড়ি। দিনের বেলা ব্যাটা গাঁজা খায়।

দিলীপ খুব শান্ত গলায় বললো, দাম কত ?

সেদিক দিয়ে গেলোই না বরেন। আপনার খুব কষ্ট হয়েছে। লোক দিয়ে ঠেলে নিয়ে গেছেন গাড়ি ? আমি সরি। আপনার কষ্ট হয়েছে।

ঠেলবো কেন ? চালিয়ে নিয়ে গেলাম। দাম কত ?

গাড়িটা আপনার কাছেই রয়েছে তো। চড়ুন না কদিন। বলেই থেমে গেল বরেন দত্ত। কি বললেন ? আপনি চালিয়ে নিয়ে গেছেন ? আপনি তো চালাতে জানেন না !

কি আছে চালাবার। হাত পা সেট হয়ে গেলেই তো—

এটা কি বলছেন স্যার ? পয়লা দিন গাড়িতে চড়েই হাত পা সেট হয়ে গেল ?

ওসব কথা থাক। দাম কত বলুন ?

আপনি কিনবেন ঠিক করেছেন ?

আমি কি ইয়ার্কি করতে এসেছি ! দামটা বলুন না—

কেমন গাড়ি বলুন তো !

কথা বাড়াচ্ছেন কেন ? দাম কত ?

কালুর তো কেউ নেই। একা মানুষ ছিল। বউয়ের সঙ্গে তো সেই কবে ডিভোর্স হয়ে গেল। একমাত্র মেয়েটাও বিদেশে।

ছিলো কি মশাই। রীতিমত আছে।

অবাক হয়ে তাকালো বরেন দত্ত। আছে মানে ?

মানে আছে।

আছে বলছেন আপনি। কিন্তু সে তো মরে ভূত হয়ে গেছে।

বাজে বকবেন না। আমরা কাল একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করলাম। গাড়ি চড়লাম একসঙ্গে।

খাওয়া-দাওয়া করলেন ? গাড়ি চড়লেন ?

হ্যাঁ মিস্টার দত্ত। সন্ধ্যে থেকে একসঙ্গে একই টেবিলে ছিলাম।

কেমন দেখতে বলুন তো?

কেন? বেশ লম্বা। ভালো করে শেভ করা মুখ। সাদা পোশাক—

হ্যাঁ। সাদা পোশাক পরতে ভালবাসতো।

বাসতো কি! তাইতো পরেছিলেন—। ঠিক আমার পেছনে বসলেন গাড়িতে।

কোথায় নামলেন আপনারা?

এ জায়গাটার জবাব দিতে অসুবিধে লাগলো দিলীপের। কেননা—কাল শেষ রাতের শেষ দিকটা তো তার নেশায় ব্ল্যাক-আউট হয়ে গিয়েছিল। এসব কথা তো গাড়ির ডিলারকে বলা যায় না। বেশ রেগে-মেগেই বললো, সে-খবরে আপনার দরকার কি? আপনি বেচবেন কিনা বলুন? নয়তো আমি খোদ মিস্টার ঘোষকেই বলবো।

কালু ঘোষকেই বলবেন! থাক থাক! কি দরকার? তার চেয়ে আমার কাছ থেকেই নিন। নেট্ বত্রিশ শো টাকা দেবেন।

এক পয়সাও কম নয়?

না। কমাবার হলে সে আপনি কালু ঘোষকে বলুনগে।

বরেন দত্তর মুখে চাপা হাসি দেখে আরও রেগে গেল দিলীপ। হেঁটে গিয়ে গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে চেকবই এনে খসখস করে চেক লিখে দিলো।

কয়েক মিনিটের ভেতর রসিদ করে দিয়ে বরেন দত্ত বললো, গাড়ির সব খবরা-খবর, দরকারী নিউজ আমি কাগজ থেকে কেটে ওই মোটা খাতাটায় আঠা দিয়ে লাগিয়ে রাখি। খাতাটা দেবেন কাইগুলি—

দিলীপ এগিয়ে দিলো।

এই দেখুন। গত নভেম্বরে স্টেটসম্যানে কি বেরিয়েছিলো। কলকাতার সব কাগজেই খবরটা ছিলো।

দিলীপ পড়তে গিয়ে দেখলো—বড় বড় হেডিংয়ে লেখা—কালু ঘোষ শট্ ডেড।

পুরো খবরটা প্রায় পৌনে এক কলমের। খানিক পড়তে পড়তে দিলীপের চোখ অন্ধকার হয়ে এলো। খবরের কাগজের খুদে টাইপগুলো ফুলে মোটা হয়ে গায়ে গায়ে লেগে গেল। আর পড়া যাচ্ছে না—

কি হয়েছিলো বলুন তো?

বরেন অন্য জায়গা থেকে শুরু করলো। আমার ড্রাইভার তো তাহলে মিথ্যে বলেনি। সত্যিই হয়তো গাড়িটার মায়া ছাড়তে পারেনি কালু।

চিনতেন কালু ঘোষকে?

একসঙ্গে আমরা টেনিস খেলতাম যৌবনে। তারপর ও বড় হয়ে গেল। কে আর পরে গাড়ির ডিলারের খবর রাখে বলুন? তবে আমি চিরটা কাল ওর ট্র্যাক রেখে দিয়েছি। শেষে অপঘাতে মৃত্যু—

কি হয়েছিলো?

আবার কি হবে! একা লোক। হি ওয়াজ অলওয়েজ এ গ্রেট স্পোর্টস। বারুইপুরের দিকে একটা বাগান ছিলো ওর। সেখানে ফুর্তি করতে যেতো। নিজের দীঘিতে ন্যাংটো হয়ে চান করতো ঝাঁপিয়ে। শুনেছি—জলকেলিও হতো।

তাই নাকি?

পয়সার তো অভাব ছিলো না। শেষে তো ছ-সাতটা কোম্পানির ডিরেক্টর ছিল। অটোমোবিল ইণ্ডিয়ার এম. ডি. হয়েছিলো। তা পাড়ার ছেলেরাই হোক —কিংবা নকশালরা—ঠিক জানি না আমরা ওকে একদম স্টিয়ারিংয়েই পয়েণ্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে গুলি করে মারলো। স্পট ডেথ্। সঙ্গে সব সময় একটা টাউট থাকতো। কলকাতা থেকে মেয়ে নিয়ে যেত। সে ব্যাটাও ওই সঙ্গে আরেক গুলিতে ঘায়েল। দুজনে গেট বন্ধ থাকার লেভেল ক্রসিংয়ে গাড়ি থামিয়ে ওয়েট করছিলো। গাড়ি বেরিয়ে গেলেই ওরা বাগান-বাড়িতে ঢুকবে—তাই ঠিক ছিলো হয়তো। পড়ে দেখুন না খবরটা আবার—

দিলীপ পেপারকাটিংটা পড়তে গিয়ে দেখলো খুদে খুদে টাইপগুলো আবার ফুলে ফুলে যাচ্ছে। তবে কাল বেশি রাতে আমি কার সঙ্গে বসে শেষ গ্লাসটা উপুড় করে গলায় দিলাম? কে আমায় মাহুতের চোরা দরজা দিয়ে মাঝরাতের চিড়িয়াখানায় নিয়ে গেল? আমি কি তাহলে সন্ধ্যেরাতে মেজর জেনারেল রায়ের সঙ্গেই ছিলাম? রায়ের কার্ডখানা তাহলে কোথায় গেল? আজই বাড়ি ফিরে খুঁজে দেখতে হবে তো। সেই যে মিলিটারির কবরখানার গায়ে সিমেণ্ট পোলের মাথায় চাঁদ—নিচে তিনটে শুয়োর আদিগঙ্গায় নেমে গেল। আমার চেনা হরিণটার পেছনে সারি সারি হরিণ—একদম পার্কিং লটের সারি সারি গাড়ি যেন! সবই ভুল দেখলাম তাহলে?

ও গাড়ি কিন্তু আমি ফেরত নেব না স্যার।

আপনাকে ফেরত নিতে হবে না মিস্টার দত্ত।

শেষে ব্যাঙ্কে বলে পেমেণ্ট যেন বন্ধ করবেন না।

না না। ছিঃ! তা করবো কেন? আপনি বরং আমাকে একটু সাহায্য করুন। আমি যে কিছু বুঝে উঠতে পারছি নে।

বোঝার কি আছে? একবার ক্লাবে খোঁজ নিন। কাল রাতে কার সঙ্গে

ছিলেন শেষ অব্দি ? আর—

আর কি ?

ভালো যজমান ডেকে গাড়িটার একটু শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে নিন। ইঞ্জিন একেবারে এ ওয়ান। আমি জানি। কালুকে তো আমি আজ চিনি নে—

একুশ

ক্যালকাটা ক্লাবে এই সময়টায় সাধারণত মেম্বাররা আসে না। একজন ছোকরা মত অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারিকে দিলীপ চিনতো। কিন্তু খোঁজ করে তাকেও আজ পাওয়া গেল না। সে জায়গায় মধ্যবয়স্ক একজন ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি বললেন, আমি কি করতে পারি আপনার জন্যে ?

দিলীপ দেখলো, সে তো আর সোজাসুজি বলতে পারে না—কাল, এখানে কালু ঘোষ এসেছিলো কি ? কেননা, একথা বলে হয়তো দেখা যাবে—ক্লাবের বহু দিনের মেম্বার কালুর নাম তখনো খাতায় আছে। মারা গেছে তো মোটে কয়েক মাস। হয়তো সারা বছরেরই চাঁদা দেওয়া আছে। হয়তো জানেই না—কালু ঘোষ পটল তুলে বসে আছে।

তবু দিলীপের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, কালু ঘোষ আসেন ?

হ্যাঁ। রোজ আসছেন।

দিলীপের শিরদাঁড়া দিয়ে কি একটা চুলকে উঠলো। একটা মরা লোক কি তাহলে শুধু এখানে আসার জন্যেই বেঁচে ওঠে ? দেখলেই তো চমকে ওঠা যাবে না। তাহলে কালু ঘোষ লজ্জা পেয়ে সবার সামনে আবার মরে যাবে। শুধু এখানেই লুকিয়ে লুকিয়ে বেঁচে ওঠে তাহলে। এতবড় একটা কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে—অথচ সারা কলকাতায় কেউ জানে না। আশ্চর্য !

ওই তো কালু ঘোষ—

দিলীপ ভদ্রলোকের কথায় ঘুরে তাকালো। কোথায় কালু ঘোষ ?

ওই যে—স্টুয়ার্ডের ঘর থেকে বেরোলেন—

দিলীপ ভালো করে তাকালো। নাঃ! সে কালু ঘোষ নয়।

আপনি কোন্ কালু ঘোষের কথা বলছেন ? ইনি তো আমাদের এখানে তিরিশ বছর কাজ করছেন।

নাঃ! বলে দিলীপ বেরিয়ে এলো। বাইরে চিরকালের জমজমাট কলকাতা। গাড়িতে বসে সনাতনকে বললো, বাড়ি চলো।

অফিস যাবেন না?

না। আজ আর বেরুবো না। গাড়ি তুলে দাও।

বেসমেণ্টে গাড়ি লক করে সনাতন চলে যাচ্ছিল। দিলীপ তাকে থামালো। ও গাড়িটার ইঞ্জিন কেমন ছাখো তো সনাতন—

স্টার্ট দিয়ে সনাতন অবাক। চমৎকার সাউণ্ড দাদাবাবু। খুব যত্নে রাখা ছিলো—কার গাড়ি?

কালু ঘোষের। তুমি চিনবে না।

দিদিকে—বৌদিকে বসিয়ে একদিন ঘুরিয়ে আনতে হবে।

এনো। বলে দিলীপ বনেটের দিকে তাকিয়ে থাকলো। সনাতন চলে গেলে নিভু আলোয় দিলীপ বেসমেণ্টে দাঁড় করানো গাড়িটার দিকে ভালো করে তাকালো। এখন কেউ নেই। প্রায় বিড়বিড় করে বললো দিলীপ। এটাই তাহলে আমার মনের মত গাড়ি। দামে সস্তা। তেল খায় কম। আমি পৃথিবীর ওপর দিয়ে এ-গাড়িতে দূরে চলে যেতে পারি। সেই হরিণটাকে পাশে বসিয়ে। হর্নের জায়গায় দমকলের একটা ঘণ্টা চাই শুধু। ব্যাস—

কুটু বড় কৌটোর গ্ল্যাকসো নিয়ে ফিরছিল। বেসমেণ্টে উঁকি দিয়ে নিজের বাবার মাথাটা আগে দেখতে পেল। অফিস যাওনি?

চোখ তুলে তাকালো দিলীপ।

এখানে কি করছো বাবা একা একা?

এ গাড়িটা কিনলাম কুটু।

বিচ্ছিরি দেখতে। এটাকে কিনলে কেন বাবা?

একদম জলের ভেতর নৌকোর মতই স্মুথ চলে। তেল খায় কম। সস্তায় পেয়ে গেলাম—

গাড়ি নিয়ে তুমি পাগল হলে দেখছি। ওদিকে খোকার কান্না থামছে না।

পেটে ব্যথা হয়নি তো? গ্রাইপ ওয়াটার দিলে পারতিস আগে—। চল্ তো দেখি।

কুটুর সঙ্গে এই অসময়ে দিলীপকে ফিরতে দেখে রাণী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো, অফিস যাওনি?

নাঃ। যেয়ে কি হবে?

এইমাত্র অফিসের টেলিফোন অপারেটর তোমার খোঁজ করছিলেন। বললেন, এলেই যেন তোমায় অফিসে ফোন করতে বলি। জরুরী—

দিলীপ সেকথার কোন জবাব না দিয়ে বললো, খোকা খুব কাঁদছিলো? কি হয়েছে?

বাচ্চারা অমন কাঁদেই।

দিলীপের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, আজকালকার মাগুলো কেমন বল তো

ও কিচ্ছু না। এখন ঘুমোচ্ছে। বলে রাণী গ্ল্যাকসোর কৌটোটা ডাইনিং 'টেবিলে রাখলো। তখন দিলীপ কী ভেবে খোকার ঘরে চলে এলো।

এ-ঘরে খোকাকে নিয়ে মালবিকা থাকতো। তার আগে থাকতো রবি। কে?

দরজার দিকে পিঠ দিয়ে একজন বসে। তার সামনে খাটের ওপর খোকা ঘুমোচ্ছে। উল্টোদিকের জানলায় বেহালার দিককার নতুন নতুন কারখানার ছুটো-একটা চিমনি—পরিষ্কার আকাশ—বিজ্ঞাপনের একটা লাল হোর্ডিং।

দিলীপের গলা পেয়ে লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকালো।

আমি জানতাম। ঠিক এখুনি তুমি আসবে।

তার একথার কোন জবাব না পেয়ে দিলীপ আবার বললো, হুট করে কিছু করতে নেই। হুট করে বিপ্লব! হুট করে বিয়ে!

মালবিকাকে আমি বলেছি—

যেন তোমার বলার অপেক্ষায় পৃথিবীটা এতক্ষণ থেমে ছিল!

আজই ভোরে আবার দৌড় শুরু করেছে। সব শুনলাম ওর মুখে—

ভোরবেলা তোমার রিস্ক নেওয়া উচিত হয়নি রবি।

না বাবা--আমি জিরাত পুলের নিচে বসেছিলাম রাত থাকতে। ভোররাতের কুয়াশার ভেতরে দৌড়ে দৌড়ে আসছিল মালবিকা। ওখানটায় কেউ থাকে না। তখন সব শুনলাম।

শুনে কি করলে? বীরত্ব জাগলো?

কারও ইচ্ছের বিরুদ্ধে এ-পৃথিবীতে কিছু বলা যায় না বাবা।

তোমরা ছুজনে পার্সোনালিটি চর্চা করবে। আর আমি আর তোমার মা ছুধের বাচ্চার দেখাশুনো করবো?

কোন্ ফাঁকে কুটু আর রাণী এসে তার পেছনে দাঁড়িয়েছে—তা টেরও পায়নি দিলীপ। রাণী তাকে সরিয়ে দিয়ে ঘরে ঢুকলো। অনেক দিন পরে নিজের ছেলের হাতখানা ধরলো। ওসব কথা থাক এখন। কী রোগা হয়ে গেছিস। আজ এখানে খেয়ে যাবি তুই।

না। আমাকে খানিক বাদেই বেরিয়ে পড়তে হবে মা।

না। তা হবে না। আজ তোর বাবাও অফিস যায়নি। এক সঙ্গে বসে সবাই খাবি—বলে, রাণী ছেলের গায়ের চামড়া দেখছিল। দেড় ছু বছরে রবির গা

অন্য রকম হয়ে গেছে। কপালের মাঝখানে ত্রিশূলের মত তিনটে নীল শিরা। অগোছালো গোঁফ। চিবুকে একছোপ দাড়ি। চোখের নিচে গভীর কালো গর্ত। পায়ের পাতায় অসম্ভব ময়লা। গায়ের শার্টটায় একটাও বোতাম নেই।

পারবো না মা। এভাবে সামান্য সুখ করতে গিয়ে আচমকা ধরা পড়ে কোন লাভ নেই।

তাহলে দাঁড়া। এখানেই তোকে একখানা মাছভাজা দিই।

খেতে খেতে রবি বললো, আরেকখানা দাও।

কুটু ছুটে গিয়ে নিয়ে এল। দেখিস দাদা—গঙ্গার মাছ কিন্তু—কাঁটা দেখে খাস—

কুটু তো দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে মা—

রাণী কোন কথা বললো না। দিলীপও না। ঘুমন্ত শিশুর জেগে থাকলেও কোনক্রমেই জানার কথা নয়—তার পূর্বপুরুষ তারই ঘরে এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাছ খাচ্ছে।

দিলীপ আচমকা জানতে চাইলো, তুমি কি কোন মানুষকে খুন করেছো? নিজের হাতে?

রবির মুখে তখন সুস্বাদু মাছ ভাজার একটা বড় টুকরো। সাবধানে কাঁটা চিবিয়ে রবি বললো, একথা জানতে চাইছো কেন? মানুষের শরীরেও তো কখনো কখনো অপারেশন দরকার হয়। তখন তো আর শুধু মেডিসিনে চলে না।

সে অপারেশন তো মানুষকে মুছে ফেলার জন্যে নয়।

রাণী মাঝখানে পড়ে বললো, ওসব কথা থাক এখন। তুই বরং নিজে একবার মালবিকাকে বলে ছাখ্—

বলেছি মা। যে যার অ্যামবিশান নিয়ে থাকুক। আমি যাচ্ছি।

রাণী বা দিলীপ কিছু বলার আগেই রবি বেরিয়ে গেল। এমারজেন্সির সরু সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে মিলিয়ে গেল।

রাণী বা দিলীপ কেউ কাউকে কোন কথা বলতে পারলো না।

খানিক বাদে দিলীপ তার সেদিনকার ট্রাউজার, শার্ট খোঁজ করে জানলো—ধোপাবাড়ি চলে গেছে। শুনে রাণীকে বললো, এরই ভেতর কাচতে দিলে? ওর কোনো পকেটে একখানা কার্ড ছিল। বড় দরকারী কার্ড—

থাকলে আমি রেখে দিতাম। পকেট উল্টে দেখে তবে তো কাচতে দিয়ে থাকি।

ঠিক দেখেছিলে?

হ্যাঁ। কিসের কার্ড ?

বড় দরকারী কার্ড ছিলো। বলতে বলতে দিলীপ এসে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল। মনে হলো—কার্ড হয়তো আদৌ ছিলো না। মেজর জেনারেল রায় নামে কোন লোকের সঙ্গেই হয়তো তার দেখা হয়নি। কিংবা সত্যিই দেখা হয়েছে। কার্ডখানা পকেটেও রেখেছিল। কিন্তু কোথাও পড়েই গেছে। এই যে রবি এসেছিল—এ কি ছেলেকে দেখতে বাবার আসা ? না, বাপকে দেখা দিতে ছেলের আসা ? কিংবা রবি কি আদৌ এসেছিলো ?

খানিক বাদে দিলীপ নিজেই নিজেকে বললো, যাক বাবাঃ ! বেঁচে আছে এই যথেষ্ট ! মাঝে মাঝে শুধু একটু দেখা দিলেই হল !

যেমন—মরে গিয়েও কালু ঘোষ দয়া করে কাল রাতে দেখা দিয়েছিলো। এতই দয়ালু—দেখা দিয়েই থেমে থাকেনি কালু—এক সঙ্গে বসে খেয়েছে তার সঙ্গে। কিংবা হয়তো কালু ঘোষ আদৌ আসেনি। ক্লাবের স্টুয়ার্ড কালু ঘোষ নামে লোকটাই তার সঙ্গে প্র্যাকটিকাল জোক করেছে। ক্লাব নিশ্চয় জানে—অটো-মোবিল ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর কালু ঘোষ খুন হয়েছে। কারণ, কালু তো এ ক্লাবের একজন পুরনো মেম্বার। খবরটা ক্লাবের স্টাফরাও পাবে। ওরাই নিশ্চয় বরেন দত্তর টেলিফোন পেয়েছে—এক আনাড়ির হাতে গাড়ি পড়েছে। তোমরা একটু নজরে রেখো। ওরাই গাড়িটাকে সাবধানে পার্ক করিয়ে রেখেছে বাইরে। ক্লাবের কোন ড্রাইভার হয়তো মজা মারতে তার পেছনে বসেছিলো। বাকি যা কিছু মনে পড়ছে—তা সবই হয়তো হ্যালুসিনেশন। এর একটাও নিশ্চয় ঘটেনি। মনগড়া ঘটনা আর ছবি দিয়ে লোকে তার স্বপ্ন সাজায়।

তার চেয়ে মেজর জেনারেলের কার্ডখানা অনেক রিয়েল। ইস্! আজই বেলা সাড়ে নটায় ওর অফিসে যেতে বলেছিলেন! তখন যাবো কি করে! আমি তো তখনই সবে কনফার্মড্ হলাম—কালু ঘোষ স্টিয়ারিংয়ে বসা অবস্থাতেই খুন—পয়েন্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে একটি বুলেট মাত্র।

কিংবা এ ঘটনাও তো ঘটতে পারে—সেদিন স্টিয়ারিংয়ে কালু ঘোষ মারা যায়নি। গিয়েছিলো ওঁর পাশে বসে থাকা ওঁরই টাউট লোকটা। রক্তাক্ত গাড়ির ভেতর থেকে এক লাফে বেরিয়ে এসে কালু রটিয়ে দিয়েছিলো, সে মারা গিয়েছে। এই বলে সে গা ঢাকা দেয়। অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্যে। আরও অনেক পরে হয়তো কারণটা জানা যাবে।

কালকের রাতের প্রায় হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নগুলোর ভেতরে স্বপ্নের নিজের একটা গন্ধ ছিলো। এখনো সে গন্ধ পাচ্ছিল দিলীপ। মিলিটারির বাতিল কবরখানার

সামনে দাঁড়িয়ে সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল—পুলিসের কালো ভ্যান—সিমেণ্ট পোলের মাথায় একটা চাঁদ লটকানো—তিনটে শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে আদিগঙ্গায় নেমে গেল। তখনই—ঠিক তখনই—বাতিল কবরখানার ফাটা সিমেণ্টের ওপর দিয়ে খিদেয় হন্যে হয়ে একটা পুরনো সাপ খাবার খুঁজতে বেরুলো। তার গায়ের গন্ধ বাতাসে। বুনো। আঁশটে। অথচ আত্মীয় আত্মীয়। গাছপালার ছায়ায় মাখামাখি হয়ে গিয়ে জ্যোৎস্নাটা অনেকটাই ময়লা। তার ভেতরে নিজের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে সাপটা একটার পর একটা ফাটা চৌচির কবর টপকাচ্ছিল। যদি কিছু পাওয়া যায়। মুখের ভেতর জ্যান্ত জিনিস কতদিন তার যায়নি। এই গন্ধের সঙ্গে সম্ভবত বুনো লতাপাতার টক গন্ধও মিশে যাচ্ছিল। দিলীপ অনেক কষ্টে গন্ধ দিয়ে স্বপ্ন মাখানো ঘটনাগুলো তুলে আনছিলো। নয়তো হরিণরা কখনো পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে থাকে!

আজ এ বাড়িতে কেউ আর নিশ্চয় খাবে না। রবি এসেই চলে গেল। ও আসে হালকা পায়ে। চলে যায় ভারি পায়ে। ও কি কাছাকাছি কোথাও ঘাপটি মেরে আছে? ইচ্ছেমত বেরিয়ে আসে। আবার নিজের গর্তে ফিরে যায়। নয়তো কি করে টের পেলে—মালবিকা চলে গেছে?

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই দিলীপ ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের ভেতর তার ছেলে জিরাত পোলের ওপর দিয়ে দৌড়চ্ছে। তখনো ভোর হয়নি। নিচে আদিগঙ্গার ভোররাতের জোয়ার। চারিদিক কুয়াশা। রবির আগে আগে মালবিকা। সাদা কেড্‌স। মোজা। শর্টস। ওপরে সাদা পুলওভার।

রবি এখন পাশাপাশি দৌড়চ্ছে। মালবিকা একবার তাকালো। কিন্তু কিছু বললো না। একদম ভিক্টোরিয়ার পেছনে বিবেকানন্দের মূর্তির রেলিংয়ে এসে থামলো। তুমি আবার আমার পেছনে?

রবি থতমত খেয়ে গেল। তারপর বললো, এত ভোরে? আবার দৌড়োচ্ছ?

তোমাদের বাড়ি ছেড়ে এসেছি আমি—

ছেড়ে এসেছো? মানে?

আমার তো এত তাড়াতাড়ি মা হওয়ার কথা ছিলো না—

কথা তো অনেক কিছুই থাকে না। এতদিনে তো আমাদের মুক্তাঞ্চল হয়ে যাবার কথা ছিলো।

তোমাদের কথা বাদ দাও। রানার হিসেবে সব সময়েই বেঙ্গলে আমার একটা ক্যারিয়ার ছিলো।

ক্যারিয়ার দেখবে? না খোকাকে দেখবে?

খোকার ভার মা নিতে পারবেন। ঠাকুমার কাছে পরিষ্কার ফ্ল্যাটবাড়িতেই মানুষ হবে। মেয়ে অ্যাথলেটরদের ভেতর আমার ক্যারিয়ার না হবার কোন কারণ নেই—

আমার ক্যারিয়ার ছিলো না মালবিকা?

ছিলো হয়ত কোনদিন। কিন্তু এখন আর নেই। মানুষের জন্যে হাল ফেরাতে নামলে তোমরা। অথচ সেই মানুষ তোমাদের ভয় পায়। ডরায়—। যেন কোন বর্গী তোমরা। এখন ভালোই করলে। ট্রাফিক পুলিস, মাস্টার মশাই—সবাই তোমাদের শ্রেণীশত্রু। খতম অভিযানের শিকার।

ব্যক্তিসন্ত্রাস বা ব্যক্তিহত্যার লাইন হয়তো ভুল।

কোন সন্দেহ আছে রবি?

এভাবেই তো রাস্তা বেরিয়ে আসে।

রাস্তা খুঁজতে গিয়ে কতগুলো প্রাণ গেল?

উগ্র বাম হঠকারিতা—

ওসব টার্মিনোলজি নিয়ে পাবলিক মাথা ঘামাবে না। সাধারণ মানুষ একে খুন বলে। মার্ডার বলে। বলতে পারো—পৃথিবীর কোন্ দেশের সরকার তোমাদের খুনী মনে না করে—মনে করবে হঠকারি। আহা, ওরা ভুল করে খুন করে ফেলেছে ওরা অবুঝ। সরো। আমার দৌড়নো শেষ হয়নি। পথ ছাড়ো।

রবি সরে দাঁড়ালো। পায়ের নিচের ঘাস ভিজে। রাস্তায় আলো নেভেনি। ঘোড়ার পিঠে মাউণ্টেড পুলিস।

আমাদের ছেলের কি হবে মালবিকা?

দরকার হলে আমি নিয়ে আসবো। একটু থেমে মালবিকা বললো, কিন্তু এ ছেলের তো আসবার কথা ছিলো না রবি। তোমার লোভ, তোমার অস্থির স্নায়ু—আরেকটা প্রাণ নিয়ে এলো এ পৃথিবীতে। আমি তো রেডি ছিলাম না।

যদি এসেই পড়ে। ক্ষতি কি?

তেমন তো কথা ছিলো না। তুমি আমায় কাঁকসার জঙ্গলের ওদিকটায় মুক্তাঞ্চল দেখাতে নিয়ে গেলে। কোথায় মুক্তাঞ্চল। সি আর পি-র তাড়া। কচি শালের কোড়ে গুঁতো খেয়ে পা কেটে যাচ্ছে। পালিয়ে বেড়াবার জীবন। এখান থেকে ওখানে। দু'দিন পালিয়ে রইলাম খড়ের গাদায়। সারাদিন সারারাত। আর তুমি তখন—। এ অব্দি বলে মালবিকা মাথা নোয়ালো। নিচের ঠোঁটটা অজান্তেই দাঁতে কামড়ে ধরলো। চোখের কাছাকাছি জায়গা থেকে এক ফোঁটা জল গিয়ে নিচের ঘাসে পড়লো। ঘাম না চোখের জল বুঝতে পারলো না রবি।

তাতে কি কোন ভালবাসা ছিলো না মালবিকা ?

ভালবাসা ? এর ভেতর কোন্ জায়গাটায় ভালবাসা ! কোন দায়িত্ব নেই। জীবনের দাম নেই কোন। শুধু বোঝা বয়ে যাওয়া। এর ভেতর কোথায় ভালবাসা ? কোন্ জায়গাটায় ? তুমি কবে আমায় ভালবাসলে ? কবে তুমি আমায় ভাল-বাসতে দিলে ? সে সুযোগ কোথায় আমায় দিলে ? তুমি তো ফেরার। সেই কবে থেকে ফেরার। কতটুকু জানলাম তোমায় ?

আমি তো তোমায় জানি।

সে জানা ঠিক নয় রবি। যেমন তুমি জানবে মুক্তাঞ্চল। কোথায় তোমাদের মুক্তাঞ্চল ? এই ভারতবর্ষের কোন্ জায়গাটায় ? তোমার ভালবাসার মতই তোমার মুক্তাঞ্চল। তুমি আগে যা জানতে ধ্রুব—আজ সেই ব্যক্তিহত্যা বলছো—হয়তো ভুল লাইন। সবটা না জেনে ঝাঁপিয়ে পড়ে শেষে তাকে হঠকারিতা বলা সাবালকের কাজ নয় রবি। আমি ট্র্যাক রেসের প্রতিটি স্টেপ জানি। জানি—কোন্ সার্কেল থেকে দম বাড়িয়ে দিয়ে দৌড়বো। তুমি কি ব্যক্তি-সন্ত্রাসের সব-টুকু জানতে ? জানতে না। যেমন জান না—ভালবাসা কি জিনিস। সরো। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—

রবি ভোরবেলাকার বাতাসে থতমত খেয়ে দাঁড়ালো। সকালের ঠাণ্ডা আলো পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছিল। রবি দেখলো, মালবিকা লম্বা স্টেপ ফেলে ফেলে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে।

এবারে দিলীপ তার ছেলে রবি বসুকে পরিষ্কার দেখতে পেলো। শার্টে একটাও বোতাম নেই। বুক খোলা। চিবুকে একছোপ দাড়ি। একজন নতুন বাবা। রবি হওয়ার সময় ওর চেয়ে আমার অবস্থা কিছুটা ভাল ছিলো। মালবিকার চেয়ে রাণী অনেক বুঝদার ছিলো। আমার প্রথম সন্তান রবি। দিলীপের বুকের ভেতরটা মুচড়ে উঠলো।

আপনাআপনি ঘুম ভেঙে যাওয়ায় দিলীপ দেখলো, সে দিব্যি ইজিচেয়ারে পড়ে আছে। এখন বেলা তিনটেও হতে পারে। আবার চারটেও। শীত আসবে বলে বাতাস ঠিক তৈরি হয়ে আছে। সন্ধ্যের পরই একটু একটু ঠাণ্ডা ভাব আসবে। দিলীপ উঠে গিয়ে দেখলো, রাণী অসাড়ে ঘুমুচ্ছে। সুন্দর মুখখানা আগের তুলনায় সামান্য ভাঙা। কুটুর মাথার নিচের বালিশ সরে গেছে। কি খেয়াল হতেই পাশের ঘরে গিয়ে দিলীপকে ছুটে খাটের কাছে যেতে হলো। রবির খোকা উঠেছে অনেক-ক্ষণ। নতুন হামা দিতে শিখে একদম খাটের কিনারে এসে পৌঁছেছে। আরেকটা ঝোঁক দিলেই একেবারে মেঝেতে উল্টে পড়তো।

দিলীপ কোলে তুলে নিতেই অতটুকু মানুষটা খুব খুশি। একদম কলকল করে উঠলো।

তোর বাবা এমন করলো কেন বল্ তো ?

জবাবে রবির খোকা তার বাবার হয়ে দিলীপ বসুর বাঁ দিককার গাল খানিকটা চেটে দিলো।

দিলীপ রাগবে কি! হাসতে হাসতে বলে উঠলো, ও দুষ্টু! এই তোমার মনে ছিলো ?

এর ফলে ছোট মানুষটি আরও উৎসাহ পেয়ে গেল। সে তার ঠাকুর্দার বুকখানা দোলনা জ্ঞানে ব্যবহার করতে লাগলো—দুলে দুলে—ঝাঁকুনি দিয়ে—

দিলীপের তখন মনে হচ্ছিল—আমার বাবা তো আর বেঁচে নেই। তাঁর দেওয়া শরীরটা নিয়ে আমি দিব্যি খাবার সুখ পাই। ঘুমোবার সুখ পাই। আবার ব্যথা পেলে ব্যথা পাই। এ শরীর দুঃখ পায়। চোখে জল আনে। অথচ যে এই শরীর দিয়েছিলো—সে আর নেই। আমিও থাকবো না একদিন। রবিও থাকবে না। তখন এই শরীর নিয়ে তুই কি করবি খোকা ? কেমন করে কাটাবি এ পৃথিবীতে ? তোর কষ্ট হবে একা একা।

খোকাকে কোলে নিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে দিলীপ তার ঠিক নেই। ব্যালকনিটা পৃথিবী নামে একটা থিয়েটার দেখার বেশি দামের বক্স সিট। এখান থেকেই ক্ল্যাপ দিতে ইচ্ছে হয় দিলীপের। এখান থেকেই স্টেজে ফুলের মালা ছুঁড়তে ইচ্ছে করে। এখানে—পৃথিবীর এ জায়গাটায় আমি যাকে যাকে আঁকড়ে ধরলাম—ভালো বাংলায়, যাকে যাকে ভালবাসলাম—তাদের সবারই একটা করে সাইড বিজনেস আছে। রবি মুক্তাঞ্চল তৈরির ঠিকে নিয়েছে। বাবা কীভাবে তৈরি হয় —কী করে বাবা বানানো হয়—তা জানলো না মূর্খ! স্বাতী কোন সময় একা থাকতে পারে না। সেই কবে টিউশনিতে আমি ক'দিন অ্যাবসেন্ট ছিলাম—ও ফস্ করে এক সিঁথি সিঁদুর ঢেলে সুবীরের গলায় মালা দিয়ে বসলো। ঋষি তুইও শেষে! কোল ইণ্ডিয়ার র‍্যাকেট তোকে কয়েকটা সুবিধে দেওয়ায় তুই দিব্যি র‍্যাকেটের অংশীদার এখন। কিছুতেই নিজেদের একটা খাদান বড় করে বানানোর ঝুঁকি নিলি না। এক ধরনের নিজের গা-বাঁচানো সুখের পুরিয়া একটু একটু করে চেখে দেখা—ছায়ায় বসে বসে। শুধু কালু ঘোষ। কালু ঘোষ শুধু। স্টিয়ারিংয়ে বসে পটল তোলার পর সে আমার হাতে স্টিয়ারিং পুরোপুরি ছেড়ে দেয়নি। সব সময় পাশে পাশে থাকে। যেটুকু দেখা যাচ্ছে—এই সামান্য আলাপেই সে আমায় আগলে আগলে চলে। তাও তো পটল তোলার পর আলাপ। ইস্!

আরেকটু আগে যদি আলাপ হতো! বেঁচে থাকতে থাকতে! কি ভাবছি আমি? হয়তো সত্যিই বেঁচে আছে। আমরা বেমালুম ভুল জানি।

ঘরে ফিরে এসে দেখলো, কুটু নেই বিছানায়। এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে দিলীপ সিওর হলো—কুটু নিশ্চয় পাশের কোন ফ্ল্যাটে গেছে।

আসলে কুটু তখন পার্ক স্ট্রীট দিয়ে হাঁটছিলো। পয়লা শীতেই অকালে বৃষ্টি। সামান্য সামান্য। টিপ টিপ বা টিপিস টিপিস করে। এইচ. এমটি.র বাড়িটার গায়েও বিশ্বনাথের পোস্টার। আজকের কাগজেও বিজ্ঞাপন দিয়েছে রোডসাইড ইন। বাচ্চুকে বলে কুটু লজ্জার মাথা খেয়ে একটা সিট বুক করেছে। বিজ্ঞাপনে ছিলো—রিজারভেশন ইন অ্যাডভান্স।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ রোডসাইড ইনের ভেতরটা মনোরম অন্ধকার। টেবিলে টেবিলে রঙীন কাগজে ঢাকা আলো।

মাতাসাকি কোঠারি অল্প ঝুঁকে কুটুর সামনে দু'পাতা জোড়া মেনুকার্ড মেলে ধরলো। কুটু কোন দিন এমন জায়গায় আসেনি। আন্দাজে দুটো খাবারের ওপর আঙুলের নখ বোলালো। মাতাসাকি কোঠারি কী বুঝলো কে জানে।

একটু বাদে কুটুর টেবিলে জিন এলো। লাইমের শিশি থেকে একটু ঢেলে মুখে দিয়ে ভালোই লাগলো কুটুর। আস্তে-আস্তে টেবিলগুলো ভরে যেতে লাগলো। সওয়া ছটা নাগাদ ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে বাচ্চু বিশ্বনাথ—আরেকটি মেয়ে। কানে ঝিঙে প্যাটার্নের বড় দুল। স্পট লাইটের ভেতর চিকচিক করছিলো।

আধো অন্ধকারে খেয়াল নেই—বেয়ারা কবার গ্লাস বদলে দিয়ে গেল। শুকনো ভাজা মুর্গি। ঈষৎ গরম। সঙ্গে স্যালাড। কাঁটা চামচ সরিয়ে দিয়েই কুটু কামড়ে কামড়ে খেতে লাগল। শরীরের ভেতরে তখন সে আস্ত একটা আগুনের দলা বুক থেকে নাভি—নাভি থেকে বুক গলা অব্দি গড়িয়ে গড়িয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল। নাকের ডগা এরই ভেতর মাঝে মধ্যে থরথর করে কেঁপে উঠছিলো। এরই নাম তাহলে নেশা।

ভয়ংকর সেন্সিটিভ স্টিরিও থেকে রক্ত নাচানো বাজনা আছড়ে পড়লো টেবিলে। স্পট লাইটের ভেতর গাইয়ে বিশ্বনাথের হাসি মুখ। এই মুখখানাই পার্ক স্ট্রীটের দেওয়ালের পোস্টারে পোস্টারে এখন হয়ত বৃষ্টি পেয়ে ভিজে যাচ্ছে।

সেই তালে গান ধরলো বিশ্বনাথ। টিপিকাল মুকেশ। দুঃখের গান। মধুর উচ্চুতে হাসতে হাসতে গাইছে বিশ্বনাথ। ফিরতি কলির ধুয়ো ধরছিলো মেয়েটি।

ও বনজারে! বনজারে!! তেরি গলিমে আয়ে হ্যায় মেহমান—

গায়কী অব্দি মুকেশের। একদম বিবিধ ভারতী।

রোডসাইড ইনের খদ্দেররা একসঙ্গে নেচে ওঠার যোগাড়।

খানিক বাদে ব্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডের মেয়েটি নাচতে শুরু করলো। সেই তালের সঙ্গে ঝাঁঝরের দাপাদাপি। বাচ্চুর হাতে লম্বা স্ট্রোক। বিশ্বনাথ মেয়েটির হাত ধরে দুলছিলো আর গাইছিলো। মাঝে মাঝে গানের মানেটা বিশ্বনাথের চোখে মুখে ওঠে—আবার মিলিয়ে যায়।

কুটুর নাচের কোন পোশাক নেই। মাকে লুকিয়ে—বাবাকে লুকিয়ে সে আজ ম্যাক্সি পরে এসেছে। ট্যাক্সিতে। একা একা। ম্যাক্সি পরে সে ফ্ল্যাটবাড়ির বাইরে কোন দিন যায়নি। এই প্রথম। এতক্ষণ কোমর থেকে বাকিটা টেবিলের নিচে রাখতে পেরে সে বেশ স্বস্তিতেই ছিলো। ঠিক এখুনি সেসব জড়তা তার কেটে গেল।

উঁচু হিলের স্লিপারে ভারি কার্পেটের ওপর দুলতে দুলতে কুটু একদম গিয়ে স্পট লাইটের গোল উজ্জ্বল সার্কেলটার ভেতরে গিয়ে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে সব কটা টেবিল থেকে ক্ল্যাপ। গানের ভেতরই। একদম রক্ত নাচানো বাজনার মাঝখানে।

ম্যাকণ্টন ব্রাদার্সের একজিকিউটিভ ডিরেক্টর চন্দ্রকান্ত বক্‌সি দিল প্রথম ক্ল্যাপটা। কোণের জানলার কাছে টেবিল থেকে। তারপর স্বাতী। একজন টাকমাথা ভদ্রলোক আর সে একই টেবিলে বসেছিলো। টাকমাথা ভদ্রলোককে স্বাতী বললো, দেখেছো জ্যোতির্ময়? কি কচি মুখ মেয়েটার—

জ্যোতির্ময় বললো, তোমার ভালো লাগছে? মাঝে মধ্যে এরকম বেরোতে হয়। নয়তো সব সময় ঘরে বসে থাকলে মন খারাপ হবেই।

তুমি বলেছিলে বলে ভাগ্যিস এলাম।

নন্দনকে আনলে কোন দোষ হতো না।

না না। এত অল্প বয়সে আমার ছেলে এখানে আসবে না।

এ তো একদম নিরিমিষ্যি গানবাজনা—খানাপিনা। দোষের কিছু ছিলো না স্বাতী।

এক টেবিল থেকে আরেক টেবিলের মাঝখানটা অন্ধকার। তবু এর ভেতর একটু চেষ্টা করলেই চন্দ্রকান্ত বক্‌সি স্বাতীকে চিনতে পারতো। স্বাতী চন্দ্রকান্তকে।

ক্ল্যাপের জবাবে কুটু অল্প একটু বাও করলো। তারপর বিশ্বনাথের একখানা হাত ধরে এক চক্করে ফ্লোরটা ঘুরে নিলো।

চমকে গিয়ে বিশ্বনাথের গলার গান প্রায় যায়। তবু সামলে নিয়ে সে হাসিমুখেই গাইতে লাগলো। বাচ্চুও চমকে গিয়েছিলো। সে এতটা ভাবেনি। তাই ব্যাণ্ড-

স্ট্যাণ্ড থেকে সামান্য হেসে সে কুটুর মুখে তাকালো।

তখন কুটু গাইছিলো। গোল্লা পাকানো গড়ানো গলায়—

বনজারে !! তেরি গলিমে আয়ে হ্যায় মেহমান—

বিশ্বনাথের ডান হাতের চক্করে কুটু। বাঁ হাতের বাঁধুনীতে রোডসাইড ইনের মাইনে করা মেয়ে। বিশ্বনাথ গান গাইবার সময় খায় না। কিছুই খায় না। বিশেষ করে কোন ড্রিংকসের কথা তো ওঠেই না। কিন্তু কুটুর শরীরের ভেতর দিয়ে তখন আগুনের বলটা দলা পাকিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল। সে এই প্রথম মুরগি ভাজার সঙ্গে ঠাণ্ডা টক টক ড্রিংকস নিয়েছে। কবার মনে নেই। ওর শরীরে এখন নাচ। গলায় গান। হাততালি আর রক্ত চলকানো বাজনা কুটুকে কোথাও স্থির থাকতে দিচ্ছিল না।

মাতাসাকি কোঠারি জীবনে কখনো এমন বিপদে পড়েনি। সে সিণ্টো দেবতাদের নাম জপছিলো। খেতে বসে কোন ইণ্ডিয়ান মহিলা কখনো এমন করেনি। এখন একে সামলায় কি করে। মাতাসাকি ফ্লোরের কানাতে দাঁড়িয়ে দু-দুবার কুটুর যাকে বলে বাহু ধরে ফেলার চেষ্টা করলো। পারলো না। ধরা দিতে দিতে টিপসি কুটু পিছলে বেরিয়ে গেল। লম্বা একটা নাচের ভেতর এই ধরা না পড়ার অংশটুকুও কুটু জুড়ে নিলো। প্রায় খেলার মত। সব চেয়ে বিপদ রোডসাইড ইনের মাইনে করা মেয়েটির। তাকে এই তাল-কাটা নাচের সঙ্গে নিজেব তাল ভেঙে ফেলে মিলিয়ে মিশিয়ে নাচতে হচ্ছিল। নাচ ঠিক বলা যায় না। নাচের ভান।

মাতাসাকি পাগল হবার যোগাড়। সারা শহরে প্রেস পাবলিসিটি করে আজ রোডসাইডে বিশ্বনাথের গান দিয়ে স্পেশাল ইভিনিংয়ে নামকরা খদ্দেররা এসেছে। তার ভেতর এসব কি ? সব না ভেস্তে যায়।

মাতাসাকি আবার কুটুকে ধরবার চেষ্টা করলে বিশ্বনাথ চোখের ইশারায় তাকে সরে যেতে বললো। ভাবটা এই—তুমি ভেবো না মাতাসাকি। আমি আছি। আমি সব সামলে দিচ্ছি। মুখে তখনো হাসি বিশ্বনাথের। এ ভাবটা সে ধার করেছে দিলীপকুমারের কাছ থেকে। তার জন্মের আগের সিনেমা দেখে। খুব দুঃখের সিনেও দিলীপকুমার এই পোজে গাইতো। ভেতরে বুকটা দুখানা হয়ে যাচ্ছে। তবু দিলীপকুমারের মুখে হাসি। গলায় মুকেশ। এই পোজটা বিশ্বনাথের একটা ইমেজ গড়ে তুলেছে। সে এখন ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়ায় বার-সিঙ্গারদের ভেতর এক নম্বর নাম। মাতাসাকির রিকোয়েস্টেই আজ এখানে বিশ্বনাথের প্রোগ্রাম। সে রোডসাইডে তার রেট বাড়ায়নি। মাতাসাকি বলেছিলো, ভিস-

'সোণ্ট তুমি একটা ইভিনিং দাও। আমাদের ব্যবসা ভালো যাচ্ছে না। তোমার নামে আবার ভিড় হবে। আমি কিন্তু তোমায় কোন বড় টাকা দিতে পারবো না।

না না। দরকার নেই। তুমি যা দেবে তই নেবো, মাতাসিকি। এই রোডসাইডেই তো আমার হাতে খড়ি। মাতাসাকির সেই গালা-ইভিনিং ভেস্তে যাচ্ছে দেখে বিশ্বনাথও অস্থির হয়ে পড়ছিলো।

কুটুর নাচেরও শেষ নেই। তাতে হাজারো বাজনা। একবার চক্কর দিয়ে কাছাকাছি গিয়ে বিশ্বনাথ বললো, কি হচ্ছে কুটু ? খুব চাপা গলায়। আরেকটু কাছাকাছি গিয়ে মুখ সরিয়ে নিলো বিশ্বনাথ। পরিষ্কার জিনের গন্ধ। মনে মনেই বললো, এ কি করছো কুটু ? কিন্তু তখন থামবার উপায় নেই। বাজনা চড়া তালে। মুখের হাসিটা ফিরিয়ে আনলো বিশ্বনাথ। তারপর—রাগে কী সুখে—ঠিক বোঝা গেল না—বিশ্বনাথও প্রায় পাগলা তালে কুটুর সঙ্গে পা মেলাতে লাগলো। তারও গলায় সেই দলা-পাকানো গড়ানে সুর—একদম কুটুর মত।

রোডসাইডের মাস মাইনের মেয়েটি এমন তালে কোন দিন নাচেনি। গায়-নি। সে কোন রকমেই মেলাতে পারছিলো না। বিশ্বনাথের গলা আর পায়ের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় মেয়েটিও অবাক হচ্ছিল।

স্বাতী বললো, জানো জ্যোতির্ময়—ও মেয়েটি পেশাদার নয়। তাই অমন চড়া তালে নাচছে। গাইছে।

ভালো তো গাইছে—

না। এখুনি পড়ে যেতে পারে। ছাখো ছাখো—পা রাখতে পারছে না মেয়েটা—

বুঝলে কি করে স্বাতী ? তুমি বুঝছো কি করে ?

চুপ করো ! এটা তোমার ম্যানেজমেণ্ট কলেজ নয়। এত বয়স অব্দি বিয়ে করোনি। মেয়েদের তুমি কি বুঝবে জ্যোতির্ময় ?

বিয়ের সময়ই পাইনি। তোমার সঙ্গেও আমার দেখা হয়নি এতদিন।

চুপ করো। নাচ ছাখো।

নাচ আর দেখা হলো না জ্যোতির্ময়ের। ঠিক এই সময়েই কুটু ঘুরে দাঁড়িয়ে রোডসাইডের মাইনে করা মেয়েটির গালে ঠাস করে এক চড় কষালো।

তাল কাটা গান আর বাজনা থামাতে কোন রাস্তা না পেয়ে মাতাসাকি মেইন অফ করে দিলো। চন্দ্রকান্ত বক্সি উঠে দাঁড়ালো। লোডশেডিং ?

সেই অন্ধকারে অ্যামপ্লিফায়ার ছাড়াই বাজনা বাজছিলো। গোলমালের ভেতর বিশ্বনাথ কুটুকে টানতে টানতে কিচেনের পাশের গলি দিয়ে রোডসাইড

ইনের পেছনে কারনানি ম্যানশনের খোলা চত্বরে নিয়ে এলো।

সন্ধ্যা রাতে পাতলা বৃষ্টি। বিশ্বনাথ কুটুর কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিলো। কি হচ্ছিল? তুমি তো কোনো দিন মদ খাও না।

কুটু প্রথমে কোনো কথাই বলতে পারলো না। আরেক ঝাঁকুনিতে মাথা তুলে তাকালো। ওর চোখ ধরে বিশ্বনাথ রোডসাইডের পেছনটা দেখে বুঝলো, আবার আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয় এখন রেকর্ড চলছে। নয়তো মাইনে করা মেয়েটি বাচ্চুর বাজনার সঙ্গে গাইছে।

কি হয়েছিলো তোমার? বলো আমায়।

গায়ে হাত দিয়ে অত ঝাঁকুনি দিও না। আমি ঠিক আছি।

না। ঠিক নেই তুমি। এখানে এলে কেন কুটু? এলেই যদি—আমাকে বলে আসোনি কেন?

তুমি আমার কে যে বলতে যাবো?

ওঃ! ওই মেয়েটিকে চড় মারলে কেন?

বেশ করেছি। অত হাত ধরাধরি করে ঢলাঢলি কিসের!

বুঝেছি। তোমার তো নেশা হয়ে গেছে। কি নিয়েছিলে?

জানি না। বলেই থেমে গেল কুটু। তারপর আবার ধ্বক করে বলে উঠলো, শিলিগুড়ি থেকে ফিরে তো একবারও এলে না।

বিশ্বনাথ.কোন জবাব না দিয়ে বললো, চলো—ও দোকানটায় ভালো সরবৎ পাওয়া যায়।

চলো। আমারও বড় তেষ্টা লাগছে।

আজ কি করলে বলো তো! আমি কি বলবো সাধনাকে?

যা ইচ্ছে বলে দিও। বলেই কি মনে পড়তে কুটু দাঁড়ালো। জানো, বৌদি চলে গেছে।

জানি। বাচ্চু বলছিলো। বলে বিশ্বনাথের অবাক লাগলো। এইমাত্র সে টের পেয়েছে পৃথিবীতে একই সঙ্গে অনেক ঘটনা ঘটতে থাকে। দোকানদারকে বললো, ভালো করে দুটো লেবুর সরবৎ বানাও। আদা দিয়ে—

বিশ্বনাথ নিজেকে তারপর মনে মনে বললো, মাতাসাকিটার বুদ্ধি আছে। মেইন অফ না করে দিলে কী কেলেংকারিটাই হতো। সাধনা যদি এগিয়ে এসে পাল্টা চড় কষাতো? তাহলে? কুটুও ছাড়তো না নিশ্চয়?

আকাশে যত তারা এই পৃথিবীতে বোধ হয় ঠিক তত ঘটনা। অনর্গল ঘটে যাচ্ছে। একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত। পৃথিবীর সব নদীর সঙ্গে যেমন সব

নদীর যোগ আছে। সব মাটির সঙ্গে সব মাটির।

সরবৎ খেতে খেতেই বিশ্বনাথ বললো, চলো মাঠে গিয়ে বসি। অন্ধকার আছে। ঠাণ্ডা আছে।

বৃষ্টি পড়ছে একটু একটু।

তা হোকগে। আজ আমি তোমায় গান শোনাবো। অন্য গান।

বাইশ

লতা মঙ্গেশকর আন্ধেরি স্টুডিওতে রেকর্ডিং করে এয়ার কণ্ডিশনড ভলবো গাড়িতে উঠলো। টাপু দাঁড়িয়েছিল দরজায়। গাড়ি স্টার্ট নিয়েও লতার কথায় থামলো। লতা দরজা একটু খুলে তাকালো।

লতাজী আপনি আমায় ডেকেছিলেন?

আপকো? কিঁউ?

আমিই গিটার বাজাচ্ছিলাম—

ও হ্যাঁ। হাতটা সুন্দর। উঠে এসো—

খুব সাবধানে টাপু ভেতরে এসে বসলে লতা নিজেই দরজা টেনে দিলো। তুমিই তাহলে সেই নতুন মিউজিক হ্যাণ্ড। তোমার স্ট্রোক বড় সুন্দর। গাইবার সময় তোমার স্ট্রোক আমার কানে লেগেছিলো। তারপরেই তোমার খোঁজ করলাম।

আপনি এখন কোথায় যাবেন?

আর. কে. স্টুডিওতে একটা রেকর্ডিং আছে। সি. রামচন্দ্রর সুরে—

ম্যায় ওয়ারি ওয়ারি যাঁউ—গানটা আপনার গলায় এত সুন্দর।

আমার গলার কথা বাদ দাও। রেকর্ডিংয়ের সময়টায় একটু বসবে। তারপর আমার সঙ্গে বেরুবে—

আর. কে. স্টুডিওতে ঘণ্টা তিনেক বসতে হলো টাপুকে। সন্ধ্যের মুখে দেখা গেল—সে লতা মঙ্গেশকরের লিভিংরুমে বসে আছে। লতা খোঁপা ভেঙে দিয়ে বসলো। সারাদিনে তিনখানা গানের রেকর্ডিং ছিলো মোট। আঁটোসাঁটো সুরের ভেতর গলাকে খেলতে দেওয়াই তাঁর কাজ। বিশ বছর এই চলছে। সে বুঝতেই পারছিলো—নতুন ছেলেটি তার সামনে অস্বস্তিতে পড়েছে। কিছুতেই সহজ হতে পারছে না। লতা তার ফ্যান মেইল মেলে ধরলো কার্পেটের ওপর। ত্তাখো তো। কলকাতার কোন চিঠি আছে কি না?

বাংলায় লেখা একখানা চিঠিতে চোখ আটকে গেল টাপুর। টাপু চিঠিখানা

পড়ে শোনালো লতাকে।

মাননীয় লতাজী,

আমি গত পনেরো বছর আপনার গান শুনিয়া আসিতেছি। আপনার কণ্ঠ আমার কাছে স্বর্গের ঝরনা। এ কণ্ঠস্বর আমাকে পাগল করে। আমি সামান্য গান শিখিয়াছি। আপনি যদি একবার পরীক্ষা করিয়া ভাখেন তবে সারা জন্ম কৃ[illegible]ব। আমার জীবনের একমাত্র বাসনা—আপনার সঙ্গে একবার একটি রেকর্ডে ডুয়েট গাহিব। আমি আগে বারে গাহিতাম। তারপর বালি বোঝাই দিয়া লরি চালাইতাম। আবার গান গাহিতেছি। এই ডুয়েট গানখানা রেকর্ড হইলে আশা করি সারা ভারতবর্ষ সে গান চিরকাল স্মরণ করিবে।

আপনি আমার শতকোটি নমস্কার জানিবেন।

ইতি—

বিনীত

গোপাল

পুনশ্চ : ঠিকানা রহিল। আপনার চিঠি পাইলেই দেখা করিব।

টাপু বললো, অনেক চিঠি পান আপনি—

বর্ষাকালেই বেশি চিঠি আসে। বঙ্গাল অউর গুজরাটসে—। আচ্ছা টাপু, তুমি একদিন বম্বে টি. ভি তে সোলো বাজাও না—

কে আমার প্রোগ্রাম দেবে! কে আমায় চেনে!

লতা মঙ্গেশকর একথায় একটু হাসলো।

এই অন্ধেবেলার ঠিক একুশ দিন পরে বম্বের টি. ভি. স্ক্রিনে নবীন সুরকার টাপু পালিত ইলেকট্রিক গিটারে ওয়েস্টার্ন বাজালো। পুরো পঁয়তাল্লিশ মিনিট। সন্ধ্যে ছটা পনেরো থেকে সাতটা।

গ্রেটার বম্বের বাসিন্দারা তাদের টি. ভি.তে যখন এ প্রোগ্রাম শুনছিলো, দেখছিলো—ঠিক তখন পাটনায় বসে আরো কয়েকজন একই সঙ্গে টি ভি তে টাপু পালিতকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলো।

রাজগৃহ হোটেলের এয়ারকন্ডিশন্ড সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংয়ে চওড়া মত বসবার জায়গায় বসে। [illegible] টি. ভি. হংকং থেকে আনানো। এই টি. ভির কোন লাইসেন্স করেনি সে।. আন্দাজে নব ঘোরাতে ঘোরাতে বম্বের প্রোগ্রামে [illegible] স্ক্রিনে ফুটে উঠতেই [illegible] চেঁচিয়ে উঠলো, এই তো সে। ওহি ছোকরালোগোকো পাণ্ডা। ওরাই আমার কাগজপত্র নিয়ে পালিয়েছে। আমার এই [illegible] ওরাই দায়ী। ওদের আমি এবার কাঁচা খেয়ে নেবো।

ভকিলসাব, বুঝাই মে খবর করিয়ে—

আভভি করতা—

কলকাত্তাকে পুরা ঠিকানা কা ইন্তেজাম কিজিয়ে—

টাপু এসবের কিছুই জানলো না। সে লতাজীর বাড়ি বসে প্রোগ্রাম শুনছিলো। কার্পেটে বসে। মারাঠী ছবির একজন প্রোডিউসার বসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে লতাজী আজই তাকে ইন্ট্রোডিউস করেছে। এই প্রথম টাপু আস্ত একটা ছায়া-ছবির সুরকার হতে চলেছে।

লতাজীর লিভিংরুমটা বিরাট। একটু পরেই টাপু সুরকার হিসেবে সাইন করবে। মারাঠী ছবি দিয়েই তার শুরু হলো। আজ যদি দাদু শুনতেন—তাহলে কী খুশীই না হতেন। দিলীপদাকে কাল সকালেই একটা চিঠি লিখবে টাপু। শুরু করবে এইভাবে—তুমি শুনিয়া সুখী হইবে যে, আমি একটি মারাঠী ছবির··· চলে আসার আগে কী অপমানটাই করেছি। লতাজী আবছা অন্ধকারে বসে আছে—যেন সুরের দেবী। সারা ঘরের দেওয়াল জুড়ে চন্দন কাঠের প্যানেল।

সাউথ ক্যালকাটার চেতলায় তখন লোডশেডিং। দোতলার ঝুল বারান্দা থেকে মালবিকা দেখলো, মেজদা মানে খোকনদা টোপর মাথায় ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামছে। সবার অমতে খোকন পালিত বিয়ে করতে গিয়েছিলো। এই এখন নতুন বউ নিয়ে ফিরলো। মালবিকার কোলে খোকন পালিতের ছেলে দুলে উঠলো, পিসি, বাবা—।

মালবিকা বললো, চুপ করো।

ছেলে সুড়ুৎ করে পিসির কোল থেকে নেমে টলে টলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। মালবিকার খুব রাগ হচ্ছিলো। বারণ না শুনে মা পাড়ার ডেকরেটিং দোকান থেকে হ্যাজাক ভাড়া করে আনিয়েছে। বউ বরণ করতে হবে না! বিয়ে করেছে তো বেশ করেছে খোকন। সারাজীবন এইটুকু ছেলে বিবাগী হয়ে থাকবে?

বাবা উকিলবাড়ি। এখন পাকা মামলায় ঢিলে দিয়ে কিরীটী পালিত ঘুঁটি কাঁচাতে চায় না। বাচ্চু নিশ্চয় বিশ্বনাথের ল্যাংবোট হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সিঁড়িতে কান্না শুনেই ছুটে গেল মালবিকা। নিশ্চয় নামতে গিয়ে পড়ে গেছে। অতটুকু ছেলেকে একা নামতে দেওয়া উচিত হয়নি তার। যত তাড়াতাড়ি নামা দরকার—মালবিকা তা পারলো না। অনেকদিন পরে দৌড়ে তার দু পায়ের হাঁটুতেই ভয়ংকর ব্যথা হয়েছে।

মালবিকা যখন সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে পৌঁছলো—তখন নতুন বউ নিয়ে

মেজদা একদম হ্যাজাকের আলোর নিচে। মা বরণ করছিলো। মালবিকা বাধ্য হয়ে বাচ্চাটাকে গিয়ে কোলে তুলে নিলো।

মা ঘুরে তাকালো মালবিকার দিকে। আজ ওকে একটা নতুন জামা পরাতে পারিসনি? আজ খোকনের বে—। যা, নিয়ে যা সামনে থেকে। বাপের বে দেখতে নেই, অকল্যাণ হয় বাপের—

মালবিকা কিছু না বলে ওকে কোলে নিয়ে আবার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল দুম দুম করে। এ-বাড়িতে সে এখন একরকম আনওয়ান্টেড্। এ বাজারে কোন্ সংসারে বিয়ের পর এক ছেলের মা অ্যাথেলেট্ হবার জন্যে বাপের বাড়ি ফিরে আসে! শুধু বাবা বলেছে মালবিকাকে—কোনো ভয় নেই খুকু। আমি আছি তোর পেছনে। তুই চালিয়ে যা। মন যা বলবে তাই করবি।

কিন্তু সব কথা তো বাবাকে সব সময় বলা যায় না। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে এক কোটি টাকার মামলাটা নাকি জেতবার মুখে। এখন এসব কথা বলে বাবাকে ডিস্টার্ব করা যায় না।

মা প্রবল জোরে উলু দিচ্ছিল। উলুধ্বনিতে মালবিকার মনের ভেতরে সব গোলমাল হয়ে গেল। এখন দশতলার ওপর আরও ছোট একটি বাচ্চার কথা মনে পড়তেই মালবিকা দু হাত বাড়িয়ে তার মেজদার ছেলেকে ডাকলো, আয়! কোলে আয়—

.

মহানন্দার তীরে। কোন লোডশেডিং নেই। সেখানে শুকনো বালির ওপর প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে গাঁয়ের মেয়েরা এইমাত্র চলে গেল। বালির ওপর দিয়ে আরও অনেকটা হাঁটলে তবে মহানন্দার জলের দেখা পাওয়া যায়। প্রথম যৌবনে বৃন্দাবন পালিত কলকাতা থেকে স্টিমারে এ-নদীতে এসেছে। আর এখন! বর্ষাকাল ছাড়া নৌকো চলে না।

আজ সন্ধ্যে থেকেই বৃন্দাবনের খুব অবাক লাগছে। যেন অন্য কোন একজন মানুষের কথা সে ভেবে আসছিলো। আচমকা সেই মানুষটার সঙ্গে তার নিজের জীবন মিলে যাচ্ছে। পৃথিবীতে কি আরও একজন বৃন্দাবন পালিত আছে? একটু একটু করে অনেক কিছু তার মনে পড়ছে। এসব এতদিন সে ভুলে ছিলো কি করে? আশ্চর্য! আমার একজন ছেলে আছে। অথচ তার কথা—তাদের কথা আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আমার ছেলে কিরীটী। তার মেজো ছেলে খোকন। খোকন বিপত্নীক। আমাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতো। একতলার ঘরে। মেটে জ্যোৎস্নায় সামান্য বাতাস উঠে একটার পর একটা প্রদীপ নিভিয়ে দিচ্ছিল।

সেই আবছা অন্ধকারে বসে বৃন্দাবন পালিত সরায় সাজানো মানতের শশা গুড় বুনো ফল কচকচ করে খাচ্ছিল। এখন তাকে এ অবস্থায় দেখলে গাঁয়ের মেয়েরা ভয় পেয়ে যেতো। পাকা দাড়িতে অনেকটা গুড় লেগে গেছে। মাথায় জট। গায়ের চামড়ার সঙ্গে কাদের দেওয়া একটা শার্ট প্রায় চামড়া হয়ে মিশে আছে। কতকাল চান করেনি—ঘুমোয়নি বৃন্দাবন। নদীর পার থেকেই লবঙ্গীর জঙ্গল। সেখান থেকে পাখিদের ঘুমের আয়োজনের শব্দ আসছিলো।

দেশের গাঁ ঘরে বানানো গুড় এমনি গুড়ের চেয়ে কিছু মিষ্টি হয়। বিকেলের দিকে গাঁয়ের মেয়ে বউরা এসেছিলো গান করতে করতে। বালি সাজিয়ে সাজিয়ে পাহাড় করেছে। প্রতি চূড়োয় একটা করে সেই বুনো ফল। লবঙ্গীর জঙ্গল ক্ষেতে এ ফল অঢেল। বেঁটেমত নাম না জানা একটা গাছের সর্বাঙ্গে। পাখিতে খায়। মানুষে খায়। আবার গাঁয়ের হাড়-জিরজিরে গরুগুলো চরতে বেরিয়ে খায়। রাখালরাও খায়।

ভীষণ খিদের চোটে গুড় দিয়ে পরমানন্দে মানতের ফল খেতে খেতে সব মনে পড়ে গেছে বৃন্দাবনের। তখন সব কটা প্রদীপ নিভে গেছে। হাঁটতে হাঁটতে দিন কয়েক হলো সে এ তল্লাটে এসেছে। পথে রঘুনাথদা স্টেশনে বোধহয় রেলের লোকজন তাকে নামিয়ে দিয়েছিল। এর আগে সে আরেকটা নদীর পারে মাস কয়েক গান করেছে। সেখানকার লোকজন রোজ বিকেলে মালশায় করে ভাত ভোগ দিয়ে যেত। জায়গাটার নাম সে জানে না। নদীর নাম তার মনে নেই। তবে অনেক জল। একদিন বান এসে তার গাছতলা ভাসিয়ে দিয়েছিলো।

সেই মেটে জ্যোৎস্নার ভেতর আচমকাই বৃন্দাবন উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। গলার সব জোর দিয়ে। কিরীটী। কি-রী-টী—ই—

নদীর খাত এত বড় যে বৃন্দাবনের গলার সবটুকু আওয়াজ অল্পক্ষণের ভেতর বাতাসে ক্ষয় হয়ে গেল। একদম গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে হারিয়ে গেল।

ঠিক তখন দূরে নদীর ওপর দিয়ে একটা ট্রেন যাচ্ছিলো। গুম গুম করে। তার জানলায় মানুষের মুখ। তাই দেখে বৃন্দাবন পাগল হয়ে যাবার যোগাড়। এ ট্রেন নিশ্চয় কলকাতায় যায়। দাঁড়াও। দাঁড়াও তোমরা—বলতে বলতে বৃন্দাবন পালিত ছুটলো।

অনেকদিন ঠিকমত ঘুম হয়নি বৃন্দাবনের। খাওয়া হয়নি। একদিন কি করে যেন সব ভুলে গিয়েছিলো সে। তার কিছুই মনে পড়তো না। সে কোথাকার? কোথায় যাবে? কোত্থেকে এসেছে? এসব কিছুই তার মনের ভেতর হাতড়েও বৃন্দাবন বের করতে পারেনি। পায়ে হেঁটে, রেলে, কুমড়োর লরি করে সে যে

কতকাল ঘুরে বেড়াচ্ছে সে নিজেই জানে না। বছর, মাস, দিন, তারিখ—কোনো হিসেবই তার কাছে পরিষ্কার নয়। শুধু জানে—খিদে পেলে গাইতে হয়। গাইলে খাবার জোটে। ছাউনি মেলে। কেউ বা জামা দেয়। কেউ বা পয়সা।

এইমাত্র সব মনে পড়ে যাওয়ায় বৃন্দাবন পালিত চমকে উঠেছে। বেহালার ছড়ের এক টানে তার সারা জীবনের সবটাই গোড়া থেকে মনে ভেসে উঠেছে খানিক আগে। বৃন্দাবন দৌড়োচ্ছিল। নদীর বালির ওপর দিয়ে। ট্রেনের লোকজন ডাকতে ডাকতে। ট্রেনটা ব্রিজ ঘুরিয়ে ফেলে এইমাত্র ডাঙায় উঠে গেল। এখন ভীষণ তাড়াতাড়ি হারিয়ে যাচ্ছে ট্রেনটা। যে করেই হোক ট্রেনটাকে ধরতে হবে।

পায়ে কি বেঁধে উল্টে পড়লো বৃন্দাবন। বালি বলে অতটা লাগেনি। কিন্তু নিজের পায়ে পা বেঁধে গিয়ে আর উঠতে পারলো না।

বসে বসেই বৃন্দাবন দেখতে পেলো—চারটে ছায়া চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে। ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল বৃন্দাবন। পারলো না। বসে বসেই বললো, কে ? কে ওখানে ? কে তোমরা ?

ছায়াগুলো কোন কথা না বলে সোজা এগিয়ে আসতে লাগলো। কী যেন গোটাবার ভঙ্গী। এইবার টের পেল বৃন্দাবন। কে ? কে তোমরা ? কে ?

বৃন্দাবন বুঝলো, তার পায়ে কিসের ফাঁস লেগেছে। সে উঠে দাঁড়িয়েছিলো প্রায়। ছায়াদের ভেতর কেউ সেই ফাঁসে ওদিকটা ধরে টানতেই সে আবার পড়ে গেল। এবার বৃন্দাবন ওদের দেখতে পেল।

জনা চার-পাঁচ পুরুষ। পরনে বোধহয় লেংটি। চ্যাটালো বুক। মাথায় চুল কোঁকড়া বোধহয়। তাই অন্ধকারে বাতাস থাকলেও উড়ছে না।

ওরা কাছে এসে বৃন্দাবনকে দেখলো। তার পর ওদেরই একজন হো হো করে হেসে উঠেই থেমে গেল। শেষে প্রায় পাখির ভাষায় কিচিরমিচির করে উঠলো পাঁচজনেই।

আমি কলকাতায় যাবো। আমায় ছেড়ে দাও তোমরা—

জবাবে ওরা কোন কথা বললো না। একটু পরেই বৃন্দাবন টের পেল—ওরা তাকে মরা গরুর কায়দায় বালির ওপর দিয়ে হেঁচড়ে নিয়ে চলেছে। টেনে টেনে। চোখ বাঁচাবার জন্যে বৃন্দাবন এক হাত চোখে দেয় তো—মাথা বাঁচাতে আরেক হাতের আড়াল আগাম অন্ধকারে সাজিয়ে রাখতে হয়।

নদীর বুকে এখন বালি থাকলেও বর্ষাকালে ভেসে আসা কাঠের গুঁড়ি, কুচো শংখ, সামুদ্রিক ঝিনুক সব সময়েই থাকে। ভাঙা কলসির কানা তো সব সময়েই

থাকে। মাথা, মুখ, চোখ, গা বাঁচাতে বাঁচাতে ক্লান্ত হয়ে পড়লো বৃন্দাবন। সে এবারে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো। ওরে আমার মত বুড়োকে দিয়ে তোরা কি করবি ? আমায় ছেড়ে দে রে বাবারা। আর কোনোদিন ভুলেও ইদিকে মাড়াবো না। আমায় ছেড়ে দে। আমি কলকাতায় ছেলের কাছে যাব। ছেড়ে দে বাবারা—

কে কার কথা শোনে। একবার বৃন্দাবনের মাথাটা লাফিয়ে উঠে থেঁতলে গেল শক্ত কি এক জিনিসে। ওরা কিন্তু থামলো না। পায়ের ফাঁস ধরে হেঁচড়ে টেনে চলেছে তো চলেছেই।

বৃন্দাবন একবার, কিরীটী রে—বলে ডাক দিয়েই জ্ঞান হারালো।

জ্ঞান এলো যখন—তখন শেষ রাতের ফিকে বাতাস। ফিকে আলো। সে তখন জনা চারেক লোকের ঘামে-ভেজা কাঁধে। শুকনো, মরা কোন লম্বা মাছের ধারা। ওদের হাঁটার দুলুনিতে বৃন্দাবনের শরীরটা দুলছিলো। সে চুপ করে থাকলো। যদিও যে কোনো সময়ে ওদের পিঠ থেকে পিছলে নিচে পড়ে যাবার ভয় তাকে কাঁটা করে রাখলো।

মাথার ওপর গাছপালার ঝুলে পড়া ডাল। জঙ্গলের লতায় পাতায় গা চুলকোচ্ছিল বৃন্দাবনের। তবু সে চুপ করে থাকলো।

দিন এসে পড়ার মুখে মুখে ওরা এসে এমন এক জায়গায় থামলো—যেখানে সারি সারি মাটির ঘর। মাঝখানটা নিকানো। ছেলে, বুড়ো, গুঁড়ো, মেয়ে, বুড়ি মিলিয়ে প্রায় শ দুই মানুষ যেন তারই অপেক্ষায় চুপ করে ছিলো।

ওই পাঁচজন তাকে ধপাস করে নিচের মাটিতে ফেলে দিয়ে গম্ভীর মুখে বাঁশের চাঁচারি দিয়ে গায়ের ঘাম কাচিয়ে ফেলে দিতে লাগলো। চার পাশের বাচ্ছারা তাকে দেখে আনন্দে লাফাচ্ছে। বুড়োদের মুখে তৃপ্তির হাসি। বউ-ঝিরা খুশী মনে তাকে দেখিয়ে নিজেদের ভেতরে কথা বলে চলেছে। তখনো আকাশে চাঁদের সামান্য আভাস।

নিচে পড়ে ব্যথা লাগলেও বৃন্দাবন উঠে বসেছে। কারও গায়ে বিশেষ জামা-কাপড় নেই। মেয়ে-পুরুষ সবারই কোমরে থানিক থানিক ঘুনসি পরা লতাপাতা, নয়তো গেঁয়ো তাঁতির বুনোট চট।

এসব দেখতে দেখতে বৃন্দাবনের চোখ একটা জায়গায় গিয়ে আটকে গেল। কালচে একটা বড় পাথরে অনেকটা সিঁদুর ল্যাপটানো। পাথরের নিচে কয়েকটা বনমুর্গির ধড় তখনো ছটফট করছে। মুণ্ডু নেই।

দেখেই বৃন্দাবন পালিত লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠলো গলা চিরে। বাঁচাও ! বাঁচাও আমাকে ! ওরে কিরীটী রে—আমার বাপ কিরীটী রে—! শেষটায় কান্না

বৃন্দাবনের গলা দখল করে নিলো।

বাচ্চা, বুড়ো, গুঁড়ো, মেয়েরা—সবাই বৃন্দাবনের কান্নায় কুলকুল করে হেসে উঠলো। একজন গুরুগম্ভীর ল্যাংটো লোক এগিয়ে এসে সে কান্না কান ঝুঁকিয়ে শুনলো। যেন কোন পবিত্র শব্দ। বৃন্দাবন লোকটার এ ভঙ্গী দেখে একদম বোবা হয়ে গেল। হয়তো ওদের পুরুত হবে। কানে কী একটা গাছের পাতা গোঁজা। পুরুতই হবে।

বৃন্দাবন এবার বাবা গো বলে কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে বসে পড়লো। পুরুত তার এই কান্না শোনার জন্যে মাথা ঝুঁকে একদিকের কান নামিয়ে আনলো।

বৃন্দাবন তাক বুঝে এক লাফে লোকটার কান কামড়ে ধরার জন্যে তৈরি হলো। তার গালে পাকা দাড়ি। পাকা ভুরু। ছেঁড়া জামার ভেতর দিয়ে গাছপালায় কেটে যাওয়া গায়ের রক্ত শুকিয়ে কালচে। দিন ফুটে গেছে। প্রায় তড়াক করে লাফ দিচ্ছিলো বৃন্দাবন। কিন্তু পারলো না।

সেই পাঁচজন লোক দিব্যি গম্ভীর চালে ভিড় সরিয়ে কালো পাথরখানার সামনে পাকা বাঁশের হাড়িকাঠ এনে মাটিতে বসাতে লাগলো।

যা ভেবেছিলাম—বলেই বৃন্দাবন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। পুরুতপানা লোকটা তখন কী সব বলে তার গায়ে দুর্গন্ধ একটা তেল ছেটাচ্ছে।

বৃন্দাবন চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো।

তখনো সেই পাকা বাঁশের হাড়িকাঠ বসানো হচ্ছিল। পাঁচ পাঁচটা খালি গায়ের মানুষ খুব গম্ভীর ভাবে গর্ত করছে। পাথরখানায় আগুন ছোঁয়াচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে বৃন্দাবন ডুকরে কেঁদে উঠলো। ওগো বাবারা! তোমরা কারা? আমায় মারবে কেন? আমি কি করেছি? কান্না যে কারও এমন করে ফুরিয়ে আসে তা জানা ছিলো না বৃন্দাবনের। সামনেই একটা বড় সরায় জল ছিলো। বৃন্দাবন হুমড়ি খেয়ে সেই জলে মুখ ডোবালো। তারপর যতটা পারে একসঙ্গে এক চুমুকে খেয়ে নিতে লাগলো।

ওই পাঁচজনের একজন কাজ ফেলে উঠে এসে বৃন্দাবনের গলা ধরে মাটিতে ছিটকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। পড়তে পড়তে বৃন্দাবন দেখলো, লোকটার চোখের জায়গায় দুখানা ছোট পাথর বসানো।

বৃন্দাবন সেই মাটি থেকে আর উঠলো না। কী হবে উঠে। সে গান ধরলো। তখন শ দুয়ের ওপর মানুষ তাকে দেখছে। সে কোনো ভ্রূক্ষেপ না করে গাইতে লাগলো। আলো ফুটে পরিষ্কার সকালবেলা। কাছে-পিঠে সম্ভবত ঝরণা আছে।

একটানা জল বয়ে যাওয়ার শব্দ। কিংবা বাতাস।

মাটিতে শুয়ে গাইতে তো বেশ লাগে। চারদিকে গাছপালার ঝালরের ভেতর দিয়ে খানিকটা আকাশ। বৃন্দাবন নিজের গলা শুনে নিজেই অবাক হলো। দরবারী রজন লাগানো গলা যেন। ভোরবেলা পেয়ে তাঁর গলা যেন বাতাস হয়ে বইতে লাগলো। গানের কথা এখন আর খুব বড়ো কিছু নয়। সুরটাই সব।

সে নিজের দাড়ির ভেতর দিয়ে চন্দনের গন্ধ পেলো। আশপাশের মানুষজন তার কাছে মুছে যাচ্ছিল। শুধু শিশুদের কিচির-মিচির বনের পাখীদের নানা রকমের ডাকের ভেতর, পাখা ঝাপটানির ভেতর হারিয়ে যাচ্ছে দেখে তার খুবই কষ্ট হলো।

কিরীটী একাই আয় করে সংসারে। কতকাল একা একা সংসার টানছে। পিঠটা বেঁকে গেল ওর। আমি একবারও পাশে দাঁড়াতে পারিনি। ছেলের আমার কোন দোষ নেই। বড় ভালো ছেলে।

ওর গর্ভধারিণীও খুব ভালো ছিলো। অনেককাল আগে—কিরীটী তখন ছোট —সাবি আমার ধুতি কুচিয়ে রাখতে রাখতে বলেছিলো, কী করে মেয়েমানুষ পুষতে হয়, তা তুমি জানো না।

পোষা—মানে, সাবি বুঝতো—বউকে খেতে পরতে দিয়ে আদর-যত্নে রাখা। বউয়ের মন জেনে নিয়ে চলা। আমি সব সময় তা পারিনি। টপ্পার দানা তখন আমার গলায়।

আর ভাবতে পারলো না বৃন্দাবন। পরিষ্কার আকাশে কুটোটি পর্যন্ত নেই। মেঘের ছড়া পড়েছে অনেক দূর দিয়ে। একদম আকাশের কিনারা দিয়ে। বৃন্দাবন এবার পরিষ্কার বুঝলো, একটু আগে নিজের দাড়ির ভেতর থেকে সে যে চন্দনের গন্ধ পাচ্ছিলো—তা আসলে সদ্য মাড়-গালা ফুরফুরে ভাতের গন্ধ। চারদিকের গাছপালার ভেতর দিয়েও সে গন্ধ বয়ে যাচ্ছে। কোন কচি সব্জি দিয়ে পাতলা করে রান্না টাটকিনি মাছের ঝোল দিয়ে এ ভাত গরম থাকতে থাকতে খেতে হয়। একবার উনিশশো উনিশে ডালটনগঞ্জ ডাকঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আখ খেয়েছিলাম। এত রস! এত মিষ্টি! খেতে খেতে নেশা ধরে গিয়েছিলো। দাঁত ব্যথা করছিল—তবু খেয়ে চলেছি। এখনো মুখে লেগে আছে।

কাল সন্ধ্যেয় লটকানো পায়ের ফাঁসটা এখনো খুলতে পারেনি বৃন্দাবন। সেটা আসলে গাছের বাকল দিয়ে বোনা দড়ি। সে-দড়ির অন্য দিকটা একটা খুঁটোয় বাঁধা। এইটেই খানিক আগেও ভয়ংকর অপমানের লাগছিলো বৃন্দাবনের। এখন আর এ-জিনিসটা তার তেমন কিছু মনে হচ্ছে না।

এই বনজঙ্গল, আলো, অপরিচিত মেয়ে-মদ্দ, কুচো-কাঁচার কিচির-মিচির, ওদের পুরুতের বড় পাতা গোঁজা কান—পাঁচজন গম্ভীর পুরুষ—যারা সর্বসময়েই কোন না কোন কাজ করে চলেছে—এই সব—সবই বৃন্দাবনের কাছে এখন একটা চলন্ত ছবি মাত্র। কয়েকটা আঁচড়ে আঁকা।

ওই পাঁচজন এবার তার সামনে এসে দাঁড়ালো।

বৃন্দাবনের মুখ দিয়ে আপনাআপনি বেরিয়ে এলো, এসেছো তোমরা। চলো। বড় বেলা হয়ে গেল কিন্তু।

ওরা বৃন্দাবনকে ধরে পাথরখানার দিকে এগোলো। আশ্চর্য! পাথরের ওপর কোত্থেকে একটা বুনো চিল এসে বসলো। সঙ্গে সঙ্গে সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। বুনো কথাবার্তায় বোঝাই কিছু আনন্দ, হাসি, চিৎকার। বৃন্দাবন মনে মনে বললো, কাছে-পিঠে তো কোন নদী নেই। মহানদীর জল তো অনেক দূরে। তাহলে?

একটু বাদেই বৃন্দাবনের মুণ্ডুটা গড়িয়ে বন-মুর্গিদের শবস্তূপে গিয়ে আটকে গেল। অমনি গম্ভীর বুনো চিলটাও পাখা মেলে দিয়ে আকাশে উঠে পড়লো। বনভূমি তখন মানুষের কলকণ্ঠে ভরে যাচ্ছিল।

শীতের রাত দশটা মানে আলিপুরের দিকে রাত দুটো। এমনিতেই ন্যাশনাল লাইব্রেরির পাশ দিয়ে যেতে রাত আটটাতেও মনে হবে গভীর রাত। অস্টিন ট্যুরার এখন দিলীপের পুরোপুরি কব্জায়। নতুন ব্যাংক বাড়ির পাশ দিয়ে ফাঁকা ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরলো দিলীপ। আজ সে একাই চিড়িয়াখানার ভেতরে যাবে। পার্কিং লটের দাঁড়ানো গাড়ির পোজে শিং তুলে তাকানো সারি সারি হরিণগুলোর সঙ্গে আজ সে দেখা করবে। সব কটা চোখ একসঙ্গে তার দিকে তাকানো। ওর ভেতর পয়লা হরিণটা মাঝে-মধ্যে আবার ওদের খাঁচার ভেতর নকল পাহাড়ে উঠে, রাস্তার মোড়ে ঝোলানো বড় বড় রঙীন বিজ্ঞাপনের দিকে তাকিয়ে থাকে। খুব সমঝদারের চোখে।

গাড়ি কিন্তু সেণ্ট টমাস স্কুলের পাশে মাহুতের সে-দরজার দিকে গেল না। বরং সোজাই চলতে লাগলো।

রাস্তায় একটাও লোক নেই। দু-একটা পান-বিড়ির দোকান ঝাঁপ খুলে তখনো বসে। দিলীপ পরিষ্কার গলায় বললো, কী হচ্ছে কালুবাবু?

ঠিক হচ্ছে। চলুন না। ফাঁকা রাস্তা তো। গিয়ার টপে তুলুন—

না কালু। এ কি হচ্ছে ?

ঠিকই হচ্ছে। ক্লাচ দিন—

দিলাম। কিন্তু এভাবে গাড়ি চালানো যায় !

কোন অসুবিধে নেই তো। ঠিকই যাচ্ছেন।

আমাকে তো কিছুই করতে হচ্ছে না। গাড়ি তো আপনিই চলছে।

কে বললো ? আপনি তো স্টিয়ারিংয়েই আছেন দিলীপবাবু—

আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

বাঁয়ে কাটান। বাঁয়ে কাটান। এই তো। বেশ হাত সেট হয়েছে আপনার। এই তো আমরা এসে গেছি। এবার ডাইনে—

এ তো ওয়াটগঞ্জ।

ব্রেক দিন। ব্যাস্।

থামা গাড়িতে বসে দিলীপ দেখলো, সে একটা বন্ধ ডাক্তারখানার সামনে এসে থেমেছে। সাইনবোর্ডে লেখা—ডক্টর জাহিরুল হোসেন। এম. বি. বি. এস.।

রাস্তার দু-ধারে সারি সারি দোকান ঘর। বস্তি-মার্কা ছাউনি। পাকা বাড়ি। দড়দড় করে একটা কল জল নষ্ট করে যাচ্ছে। সারা এলাকায় লোডশেডিং। কুপির আলো। মোমবাতি। একটা টিনের ছাউনি। খাবারের দোকানে হ্যাজাক। রাস্তায় লোকের অভাব নেই এখানে।

কালু বললো, হর্ন দিন না—

শুধু শুধু দেব কেন ? বললেও দিলীপের ডান হাত গিয়ে রবারের ভেঁপুটিকে তিন তিনবার টিপে ছেড়ে দিল। আর অমনি—

দিলীপ বিশ্বাস করতে পারছিলো না। এ কি হয়ে গেল !

আশপাশের তিন-চারটে ঘরের দরজা খুলে গেল। ছ-সাতটি মেয়ে বেরিয়ে এসে দিলীপকে টানতে লাগলো। একজন বললো, ঘোষবাবু আসেননি ?

একটু ভয় হলো দিলীপের। এখন সে হারমোনিয়মের সঙ্গে কাওয়ালীর সুর শুনতে পাচ্ছিল। হিংয়ের গন্ধ। কে অনবরত হামানদিস্তায় কী যেন পিষছে।

একটি মেয়ে তার উরুতে টোকা দিয়ে বললো, কালুবাবু কোথায় গেলেন ?

দিলীপের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, খাবার আনতে গেছে। এক্ষুনি আসবে—

তো আপনি বসে কেন ? আসুন।

দিলীপকে টানাটানির হাত থেকে বাঁচালো রাশভারি একজন মোটাসোটা মেয়েলোক। এই—এই মারবো এবার তোদের। যা—ঘরে যা। আসুন বাবু। আপনি ভেতরে এসে বসুন। ঘোষ মশাই কেন নিজে খাবার আনতে

গেলেন ? আমাদের গুস্তাকি কি হলো তা বুঝতে পারছি নে—

ঘর মানে বেঁটে পায়ার চৌকির ওপর মোটা তোশক। দেওয়ালে লম্বা আয়না। একটি মেয়ে এগিয়ে এসে বললো, সুমিত্রাদি, তোমার ঘরে ফিনাইল আছে ?

সেই মোটাসোটা রাশভারি মেয়েলোকটি গম্ভীর গলায় বললো, আমি কি ডাক্তারখানা—না, করপোরেশন ? নিয়ে যা—ওই তো।

সুমিত্রা আঙুল দিয়ে ঘরের কোণে দাঁড় করানো বোতলটা দেখালো।

দিলীপ চমকেও গেল—আবার মনে মনে বললো, এই সেই সুমিত্রা তাহলে ? কি কদাকার রে বাবা !

মেয়েটি বোতল নিয়ে যাবার সময় বললো, এসেছিলো তো ভালো। খানিক খাবার পর এমন বমিই করেছে—

অমন লোক ঢোকানো কেন ঘরে ?

তোমার মত ভাগ্য করে তো আসিনি সুমিত্রাদি।

দরজা খোলাই থাকলো। দেওয়ালে 'রাঢ়ে চঃ' লেখা তারকেশ্বরের শিবলিঙ্গের ছবি। ফুলচন্দনে ঢাকা। শীতকাল বলে ঘরের ছোট হ্যাজাক বাতিতে কোন রকম গরম লাগছিলো না। উঠোন ঘিরে সারি সারি ঘর। সে উঠোনে সব ঘর থেকেই খানিক খানিক আলো পড়ে মিশে গেছে। সে উঠোন দিয়ে কারা যেন ঘোরাঘুরি করছিলো।

ঘোষ মশাই আমাদের ওপর কি রাগ করেছেন ?

একথা বলছো কেন সুমিত্রা ?

না। আপনারা তো মানী মানুষ। কোনো ঘাট হয়ে থাকলে নিজ গুণেই মাফ তো করে দেবেন। তাই না ? আজ চার-পাঁচ মাস প্রায় আসেনই না। এলেও শুনি তিনি ও-ঘরে গেছেন। সে-ঘরে গেছেন। দেখা হয় না আমার সঙ্গে একদম। বেশি রাতে রাস্তায় বেরিয়ে শুধু গাড়িটাকে দেখতে পাই। তাও দেখি না অনেকদিন। কি হয়েছে বলুন তো ঘোষ মশায়ের ?

নিজের ভেতরেই কেঁপে উঠলো দিলীপ। মুখে বললো, কি আবার হবে। কই কিছু হয়নি তো। এখুনি এলে জেনে নিও।

তা জানবোখন। আপনি ওঁর অনেক দিনের বন্ধু।

বন্ধু ? তা হ্যাঁ। কিছুদিনের তো বটেই—

ঠিক কী হয়েছে বলুন তো ঘোষ মশায়ের ? এসেছেন শুনে লজ্জার মাথা খেয়ে এ-ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছি। সে-ঘরের দরজায় কান পেতেছি। কোথায় ? তিনি তো আসেননি। ছুটে বাইরে এসে দেখি ওঁর গাড়িটা চলে যাচ্ছে—

অন্য গাড়ি নয় তো ?

না না। ও গাড়ি আমরা এখানে সবাই চিনি। আমার মায়ের কাছেও উনি ও গাড়িতে আসতেন। আমি তখন কতটুকু ! একটা গান শোনাই আপনাকে—

গোটা কয় রিড্ টিপেই আঙুল থেমে গেল সুমিত্রার। আচ্ছা, এখনও আসছেন না কেন বলুন তো ?

এসে যাবে।

যাবার সময় কি বলে গেল আপনাকে ?

তোমার যে খুব চিন্তা সুমিত্রা। কে হয় তোমার ?

সুমিত্রা মাথা নামিয়ে নিলো। আবার আঙুল খেলতে লাগলো রিডে। কেউ না। মায়ের আমল থেকেই দেখছি তো। এলেই ফুর্তিতে চাদ্দিক মাতিয়ে রাখতেন—। কি গান গাইবো বলুন ?

তোমার যা ইচ্ছে—

আচ্ছা কোন বিপদ-আপদ হয়নি তো ? উনি যেখান থেকে বোতল নিতেন— সে জায়গাটা কিন্তু উঠে গেছে।

তুমি গান গাও না। এখুনি এসে পড়বে।

সুমিত্রা বেশ দম নিয়ে হু হু করে রিডের ওপর দ্রুত গত বাজালো। তারপর ঝনাৎ করে নিজেরই হাতখানা রিডের সারিতে এলোমেলো ভাবে মেলে দিলো। আমায় মাফ করবেন। আমি পারছি নে। বলে একদম খোলা চোখে কেঁদে ফেললো সুমিত্রা। শেষবার যখন আসেন—তখন ওঁর শরীরটা ভালো ছিলো না। আপনি একটু দেখুন না বেরিয়ে। এত দেরি হবার তো কথা নয়।

দিলীপ ওপর ওপর অনিচ্ছার ভঙ্গি করলো মুখে। তারপর সোজা বেরিয়ে এসে স্টিয়ারিংয়ে বসলো।

তেইশ

আই. এ. সি.-র ডোমেসটিক ফ্লাইট নম্বর তিনশো দুই আধ ঘণ্টা লেট ছিল। দিল্লী-এলাহাবাদ-লখনউ-পাটনা-রাঁচি-কলকাতা। বেলা দশটা দশের জায়গায় দশটা চল্লিশে এসে ভি সি সাতশো সাত থামলো। বোর্ডিং জেটের দরজায় গিয়ে গ্যাংওয়ে লাগতেই প্যাসেঞ্জাররা নামতে লাগলো। শীতের ভোরে দিল্লির যাত্রীরা ডবল সোয়েটার পরে প্লেনে উঠেছিলো। এখন তারা খুলতে খুলতেই প্লেন থেকে নামছিলো। শেষ প্যাসেঞ্জার এসে যখন গ্যাংওয়ের মাথায় দাঁড়ালো—তখন ডোমেসটিক ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে অন্য জায়গার যাত্রীরা প্লেনের খোলা

দরজার মুখে অবাক হয়ে তাকালো।

সরু পাজামা। তার ওপর চুড়িদার পাঞ্জাবি। বেলা এগারোটায় রোদ পোহানো শীতে শেষ প্যাসেঞ্জারের জামার নিচে যে কোন গেঞ্জীও নেই তা বোঝা যাচ্ছিল। কারণ, ফাইন আদ্দির নিচের শরীরটাও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল।

নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটির সোশ্যালে গানের নেমন্তন্ন পেয়ে গোপাল যাচ্ছিল বাগডোগরা। অশোকতরু হিমন্ন ওদের সঙ্গে এই প্রথম সে একসঙ্গে গাইবে। বোর্ডিং টিকিট বুকপকেটে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিলো। এমন সময় তার পাশ দিয়ে ঝকঝকে বিশাল চেহারার লোকটি হেঁটে গেল। গায়ে শুধু আদ্দির পাঞ্জাবি। গোটানো হাতের বাইরে ঘন লোমে ঢাকা চওড়া কব্জিতে একটা কালো ডায়ালের ঘড়ি। অন্য হাতে রূপোর চওড়া শেকল জড়ানো। যে-ই দেখছিল—সে-ই এই শীতে অমন পোশাক দেখে অবাক হচ্ছিল। লোকটির কাঁধের ব্যাগে বড় করে লেখা—ডি লাল। গোপাল এক ঝলকে পড়ে ফেললো।

দরবারীলাল এয়ারপোর্টের বাইরে এসে দেখলো হাইকোর্টের বাঙালী উকিল-সাব তাঁর নিজের গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ-গাড়ি সে শহরে পৌঁছেই ছেড়ে দেবে। এখন তার ঠিকানা সে কাউকে জানাতে চায় না।

সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যুর চেনা হোটেলটায় উঠে দেখলো—তার চেনাশুনো লোক-জন সব বদলে গেছে। তাহলে কি মালিকানা বদলে গেল?

বিকেলের দিকে একতলায় চা খেতে নেমে যার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো—তাকেই খুঁজতে সে এখানে উঠেছে। হাত তুলে চেনা দিলো দরবারীলাল। আরে গুংগা?

গুংগা সে-ডাক শুনে ফিরে তাকালো। দরবারী? কতদিন পরে! কাছে উঠে এসে বললো, কী মনে করে? তুমি তো অনেক কাল এদিক মাড়াও না। পাটনা থেকেই উকিল দিয়ে মামলা চালাও। এখন তুমি বড়লোক।

তোমারই খোঁজ করছিলাম। এখন কী করা হয়?

সেই পুরনো ধান্দা—

ওহি পুরানা খেল? সাবাস!

তাছাড়া কী করবো দরবারীভাই। হামি তো আর কিছু জানি না।

ভালো আছো। সাহসী জানবাজ আদমিই থেকে গেলে। আমরা তো সবাই চুহা। ডরফোক বনে আছি।

দরবারী, তুমি তো ভাই শেঠ আছো। এখন হোটেল মালিক।

এসব কথা ছাড়ো গুংগা। একটা কাজ নিয়ে এসেছি।

এক কিঁউ? শ' কাম কর গুংগা! মগর কেয়া কাম?

মামুলী সা একঠো কাম। সিধা মার্ডার—

ও তো হরবখত্ হো রহে হ্যায়। কিন্তু—

কিন্তু বলে গুংগা গাঁইগুঁই করছিলো। দরবারীলাল ধমকাতেই গান্ধু যা বললো, তা পরপর সাজালে এই দাঁড়ায়—তোমার সঙ্গে ভাই আমার অনেকদিন আলাপ। আমরা এক সময় মহা আনন্দে একসঙ্গে খুন করেছি। মজুরি নিয়েছি। কিন্তু সেসব জামানা আর নেই। এখন বঙ্গালী ছোকরাবাবুরা হামেশা খুন করছে। পুলিস ভি খুন করছে। খুন অউর বদলা—আজকাল বহুৎ মাহেঙ্গা নেহি হ্যায়—।

দরবারীলাল বললো, আসল কথাটা বলে ফেলো ভাই।

তখন সস্তার দিন ছিলো। আমি তুমি পানশো টাকাতেও লাশ গুম করেছি। কিন্তু সেসব দিন তো আর নেই!

দিনগুলো কোথায় গেল গুংগা?

এখন প্রাইভেট মার্ডার বিশ হাজার টাকা।

বেশি বলছো ভাই। এ রেট হলে তো আমি হোটেল বেওসা ছেড়ে দিয়ে কলকাত্তা চলে আসি। দ্যাখো না আমার জন্যে এরকম অর্ডার যোগাড় করে দিতে পারো কি না।

আমি অর্ডারের সেলসম্যান নই দরবারী। আমি এখন দিন আনি দিন খাই। যেমন কাজ জোটে—তেমন কাজ করে দিন গুজরান করে যাচ্ছি।

. দরটা বড়ো বেশী বলেছো গুংগা।

কিছু বেশি বলিনি। পলিটিকাল মার্ডারে তো দো রূপেয়াও খরচা নেই। কিন্তু প্রাইভেট মার্ডারের দর এখন বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা। শুনেছি কানপুরে পন্দেরো হাজারেও হচ্ছে। কিন্তু এ তো কলকাত্তা। ইণ্ডিয়ার রাজধানী ছিলো এক সময়।

আমার ভাই মামুলী কেস। গানে-বাজানেওয়ালা তিন বঙ্গালী c আমার মামলার কাগজপত্তর চোরি করে কলকাত্তা নিয়ে এসেছে।

ঠিকানা?

নম্বর জানি না। কিন্তু এলাকা জানি।

তাহলে অসুবিধা কিসের দরবারী?

কুছু না। কাগজ আগে নিতে হবে। তারপর বদলা—

তিন খুন?

নেহি নেহি। স্রিফ এক। দলকো লিডরকা শির চাহিয়ে—

কোহি ভারি কাম নেহি দরবারী। জানপয়ছানী কর দো।

আম্মিও তো খুঁজে বেড়াচ্ছি ওদের। এই চায়ে! অওর দো কাপ দেও—। কিন্তু গুংগা—তুমি ভাই দরটা বড় বেশি বলছো।

কিচ্ছু বেশি বলিনি। এ সালে এই রেট যাচ্ছে। আমাদের সে আমল তো আর নেই দরবারী। তখন আমরা আসলি ঘি খেয়েছি—ছ রূপৈয়া ভাও। আর এখন? চব্বিশ টাকা ছাব্বিশ টাকা কিলো। দরটা এমন কি বেশি বলেছি বলো?

একদম দুবলা বঙ্গালী। গান গায়। বাজায়।

তব তো ফেমাস আদমি দরবারী।

টি ভি-তে বাজায়।

তাহলে আরও চার হাজার দিতে হবে। পুরা চব্বিশ হাজার। খুন করার পর কাগজে ছবি বেরোবে। পুলিসের কুকুর আসবে। রিপোর্টার লোক ভি আসবে। রেট তো বেশি বলি নাই। আগলে সাল সস্তা ছিলো। তখন একটা এম এল এ খুন করেছি মাত্র ষোল হাজারে। তখন যদি আসতে দরবারী—তাহলে রেট কচ্ছু কম হোত।

চায়ে পিও গুংগা। বাদমে বাত হোগা। আজ রাতে চলো গান শুনবো লক্ষ্মীর ওখানে।

আজকাল আর গান শুনি না। কান নষ্ট হয়ে গেছে।

ভালো ঠুংরি শোনাবো।

তার চেয়ে চলো দরবারী—আজ রাতে দো ভাই এক সাথে মার্ডার করি। কত কাল এক সঙ্গে মার্ডার করিনি।

আম্মি আর পারবো না গুংগা। অনেক দিন হলো নিজের হাতে কোন মার্ডার করিনি। ব্যাপারটা একদম ভুলে গেছি।

দু ভাই জায়গা মত পড়লে সব মনে পড়ে যাবে।

দরবারীলাল কোন জবাব দিলো না। মাথা নিচু করে চায়ের কাপে মুখ দিলো। তখন খোলা দরজার বাইরেই সন্ধ্যের সঙ্গে কলকাতায় শীত ঘনিয়ে আসছিলো। বাতাসে সস্তা আলুর চপের গন্ধ। ম্রিয়মাণ সব দেওয়ালে গর্ভপাতের অস্পষ্ট বিজ্ঞাপন। রিক্শায় মাতাল। দুই সারি বাড়ির মাঝামাঝি শিয়ালদা বরাবর আকাশে সম্পূর্ণ গোল একখানা চাঁদ। কলকাতা যেমন হয় আর কি। তবু মায়াময়। গাঢ়। সর্বত্র রহস্যের আভাস। অথচ কিছুই এখন ঘটলো না।

দরবারীলাল চা খেতে খেতে মনে করলো—হারানো কাগজগুলো আগে উদ্ধার হওয়া দরকার। নয়তো ছ' ছটা মামলার ভাগ্য অনিশ্চিত। ওরা ছাড়া কেউ ও কাগজ নেয়নি। কিন্তু কেন নিতে গেল? ওদের তো কোন কাজে লাগবে

না। তাহলে? সিরিফ দিল্লাগীর জন্যে?

খানিক বাদে দেখা গেল—গঙ্গার ঘাটে একটা খোলা ফিটনে চড়ে দু'জন অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান পুরুষ সামান্য পাঞ্জাবি গায়ে সন্ধ্যেবেলা শীত খেতে বেরিয়েছে। নতুন হাওড়া ব্রিজের ঢালাই খুঁটিগুলোর কাছে গিয়ে ফিটনওয়ালা বললো, ওদিকে আর যাবো না। জায়গাটা বড় অন্ধকার।

গুংগা হো হো করে হেসে উঠলো। তোমার দুই সওয়ারির ওপর কেউ হামলা করতে আসবে না।

এসব কথার সময় ঠিক উল্টোদিক থেকে আরেকখানা খোলা ফিটন বেরিয়ে এলো। তাতেও যারা বসে—তারা রোগাভোগা নয়। দিব্যি ছ্যাচা শরীরের দু'জন মানুষ।

তখন গুংগাদের ফিটন অন্ধকারের দিকে চলে গেল।

নতুন ফিটনের পুরুষটির গায়ে গরম পাঞ্জাবি। কাঁধে শাল। তার পাশে খুবই স্বাস্থ্যবতা একজন মেয়েলোক। তারও গায়ে দামী শাল জড়ানো।

পুরুষটি বললো, রেখা, এই ঠাণ্ডায় আর ঘোরা ঠিক হবে না।

মেয়েলোকটি বললো, কেন? তোমার ঠাণ্ডা লাগছে?

না। তোমাকে নিয়ে চিন্তা।

আমাকে নিয়ে চিন্তা কোরো না। তোমার বুঝি ভয় হচ্ছে খোলা ফিটনে?

গোকুল দত্ত ভয় পাবার মানুষ নয়। বলে বাকিটা আর ভাঙলো না গোকুল। বাকি কথাগুলো রেখাকে বলা যায় না। এই কলকাতায় কোথায় কখন কতরকম ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। তার যে কোন একটা দেখে রেখার মন তোলপাড় হয়ে যেতে পারে। আর অমনি হয়তো সেবারের মত টপাটপ সিকি আধুলি খেতে শুরু করতে পারে। সেবার নাকি রেখা কাগজে লোকাল ট্রেনের দুর্ঘটনার খবর দেখে একা একা দমদম জংশনে চলে গিয়েছিলো। ওল্টানো বগি, আকাশের দিকে চাকা তুলে শুয়ে থাকা কম্পার্টমেণ্ট দেখেই নাকি রেখার মাথা গরম হতে থাকে। তার-পর ওই সিকি আধুলির ব্যাপারটা।

তারপর থেকেই গোকুল অনেক সাবধান। পাছে কোন মোটর অ্যাক্সিডেণ্ট চোখে পড়ে—তাই কোন রাস্তায় পড়েই গোকুল আগে থেকে অনেকটা দূর দেখে নিচ্ছিল। মনে কোন রকম চোট লাগতে পারে—এমন কিছু দেখলেই সে গাড়ি ঘোরাতে বলবে।

রেখা বললো, ভয় তো তুমি পাচ্ছো। পাছে তোমার ছেলেরা আমার সঙ্গে তোমায় হাওয়া খেতে দেখে ফেলে।

ফিটনখানা ইনডোর স্টেডিয়ামের দিকে এগোচ্ছিল। গাড়ি ঘোরাতে বলে গোকুল খানিকক্ষণ গুম হয়ে থাকলো। তারপর বললো, আমার ছেলেরা খুবই ভালো। তারা তোমায় ছোট মা মনে করে।

তা মানি। কিন্তু ওদের সামনে পড়ে যাওয়ার অস্বস্তি তো তোমার থাকবেই।

তা তো থাকবেই।

তাহলে আমি বলি কি—আমার একবার মা হওয়াটা দোষের নয় কোন।

তুমি তো মা আছোই। আমার ছেলেরাই তোমার ছেলে।

ওরা তো আমারই ছেলে। কিন্তু ওদের একটা ভাই হোক না কেন—

এরকম জায়গায় কেউ কারও মুখে তাকাতে পারছিলো না। গোকুল দত্ত বললো, আমি তো আর যুবক নেই। আবার ছেলে হবে—আবার তাকে বড় করা —সে বড় কঠিন কাজ রেখা।

তুমি তো আর মানুষ করছো না।

কিন্তু আমি তো বাবা। আমি আর ক'দিন বাঁচবো?

ওসব কথা তুললে আর কথা হয় না। এ ছেলে তার দাদাদের সম্পত্তিতে ভাগ বসাবে না।

ও কথা বোলো না রেখা। শুরু করেছিলাম একটা দিশী গাই নিয়ে। সব চলে গেলেও একটা দিশী গাই তো আবার কিনতে পারবো।

তাহলে আর আমার মা হতে আপত্তি কোথায়?

শীতকালের সন্ধ্যায় রেখার এক-একটা কথা পেছনের ফোর্ট—সামনের জেটি—ময়দানের ওপারের হোটেলবাড়ি—সব অন্যরকম করে দিচ্ছিল। গোকুল এ কথারও এখুনি কোন জবাব দিতে পারলো না। জবাবটা মুখের ওপর রেখাকে বলাও যায় না। যদি বাচ্চা হতে গিয়ে তুমি পাকাপাকি পাগল হয়ে যাও? তখন? তখন ও বাচ্চাকে কে দেখবে?

গোকুলকে চুপ করে থাকতে দেখে রেখা বললো, জানি। তুমি ভাবছো—মা হতে গিয়ে আমি আবার পাগল হয়ে যেতে পারি—

গোকুল না শোনার ভান করে কাঁটা হয়ে থাকলো।

রেখা নিজেই বললো, বাচ্চা হতে গিয়ে আমি তো পাকাপাকি সেরে যেতে পারি—একদম ভালো হয়ে যেতেও তো পারি। আমায় ভালো হতে দিচ্ছো না কেন? একবার একটা চান্স দিয়ে ছাখো না।

মরেও তো যেতে পারো। এই বয়সে তোমারও কি মা হওয়া ঠিক হবে। হয়তো ভীষণ কষ্ট পেলে। বাচ্চা বাঁচলো না। তখন?

সবই হতে পারে। কিন্তু মা হবার কথা মনে থাকলে আমি কিছুতেই আবার পাগল হবো না। মরে যাবো না। দিব্যি হেঁটে-চলে বেড়াবো। দেখো তুমি।

বাচ্চা কি খুব দরকারী রেখা? বাচ্চা এসে শরীর নষ্ট করে দেয়।

শুধু শুধু শরীর দিয়ে কি করবো! এক এক সময় শরীরটা নিয়ে ঘেন্না হয়।

দ্যাখো তো মীরাকে। কে বলবে ওর প্রায় বিশ বছর বে হয়েছে।

শুধু শরীর দিয়ে শেষ অব্দি কি করবে মীরা? ভিটামিন খায়। ভিটামিন ইনজেকশন নেয়। ভিটামিন তেল মাখে সারা গায়ে। ঠাণ্ডা জলে চোখ-মুখ ধোয়। যোগাসন করে। কিন্তু শেষ অব্দি শরীরটা নিয়ে কি করবে বল তো?

বলতে বলতে খোলা ফিটনেই রেখা গোকুল দত্তর কাঁধে হাত রাখলো। এই শহরের সঙ্গে এই সন্ধ্যের সঙ্গে এ দৃশ্য মানাচ্ছিল না। এই পোশাক, এই বয়স এই ফিটন—এই সময়ের সঙ্গে খাপ খাচ্ছিলো না। সে-সবের পরোয়া না করে রেখা বলতে যাচ্ছিলো, আজ রাত থেকেই তোমার খাওয়া-থাকা আমার ওখানে। কিন্তু গোকুলের মুখ দেখে তা বলতে পারলো না। মুখে বেরিয়ে এলো—কী ভাবছো বল তো অ্যাতো?

দিলীপ অনেক দিন হলো আসে না। রাণী আসে না—

কি হয়েছে ওদের বল তো?

দিলীপটা পাগল। যদি সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারতো—তাহলে কি ভালোই যে হতো।

খুব আমুদে লোক কিন্তু। যাই বলো তুমি।

কি আর বলবো! হাসি-মুখখানা অনেক দিন দেখি না। ঋষি কলকাতায় বদলি হয়ে এলো—তাও আর আসে না দিলীপ। কেউ ওর টিকি দেখতে পায় না।

তোমাদের খাদানের কাজে আসছেন না?

নাঃ। তবে আর কি বলছি এতক্ষণ।

এখন যদি কেউ মানোয়ারী ঘাট থেকে আকাশবাণী বাড়িটার দিকে তাকাতো—তাহলে দেখতে পেতো—একটা খোলা ফিটন কেমন আনাড়ি চালে একবার নতুন হুগলী ব্রিজের খুঁটি আর ইনডোর স্টেডিয়ামের ভেতর শুধু পারাপার করে চলেছে। রাতের সঙ্গে সঙ্গে শীত বাড়ছিলো—আর ফিটনের ঘোড়াটা একটু একটু করে মুছে যাচ্ছিল।

তিরিশ লিটারের ট্যাঙ্ক দুবার ফুল করেছে দিলীপ। একবার হাওড়া থেকে

বেরিয়ে জে সি রোডে পড়েছে। আরেকবার চাপাডাঙার মোড়ে। অস্টিন কোম্পানি কি গাড়িই বানিয়েছিলো! তেল ফুরোবার নাম নেই। বাইরোডে বোধ হয় গ্যালনে পঞ্চাশ মাইল দিচ্ছে।

সেই কোন্ ভোরে গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে দিলীপ। জল, মবিল, তেল আর চাকায় হাওয়া থাকলে এ গাড়ি তো বিষুব রেখা থেকে কর্কটক্রান্তি—ইজি চলে যাবে।

রাণী তখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। কুটু সবে বাথরুমে। রবির ছেলেটা জেগে গিয়ে দিলীপকে দেখে বিছানা থেকেই হাত নাডছিলো। একবার ভেবেছিলো—ওটাকে সঙ্গে নিয়েই বেরোই। ভাগ্যিস বেরোয়নি।

রেড রোডে তখনো বেশ কুয়াশা। একবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেলো। সেল্‌ফ নিচ্ছিলো না। সামনে পেছনে কিছুই দেখা যায় না। চোক টানলেই কারবো-রেটরে ময়লা এসে যায়।

পেছন থেকে কালু ঘোষ বললো, তুমি স্টিয়ারিংয়ে বসো। আমি ঠেলছি।

তুমি আমার চেয়ে বড। তুমি বরং স্টিয়ারিংয়ে বসো। আমি ঠেলছি।

উঁহু দিলীপ। এটা সিনিয়রিটির ব্যাপার নয়। তুমি বসো। আমি ঠেলছি। এখুনি স্টার্ট হয়ে যাবে—

স্টার্টিং ট্রাবল্ কি আগেও ছিলো?

না না। হয়তো ফ্যান বেল্ট ঢিলে হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। গাড়ি খানিক চললেই ব্যাটারি চার্জে এসে যাবে। নাও। ঠিক হয়ে বসো।

অস্টিন ট্যুরারের ওজন এমনিতেই কম। কয়েক মিনিটের ভেতর গাড়ি চালু হয়ে গেল। পেছনে না তাকিয়েই দিলীপ বললো, উঠেছো?

কখন!

আজ একটু দমকলের হেড কোয়ার্টারটা দেখবো।

ওদিকে আবার কেন? সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে ফেরার পথে ভিড হয়ে যাবে—

হোক না। তুমি তো আছো।

ভোরবেলায় দমকলের হেডকোয়ার্টারে লোকজন কম। উল্টোদিকের ফুটপাথে গাড়ি দাঁড় করিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকে গেল দিলীপ। বলতে গেলে কোন পাহারাই নেই।

লাল রঙের লম্বা চকচকে সব গাড়ি। টায়ারগুলো ধোয়া হচ্ছিলো। দিলীপ হাত বাড়িয়ে একটা ঘণ্টা টেনে দেখলো, শক্ত করে লাগানো কিনা—কিন্তু ফল

হলো উল্টো। ঢং করে বেজে উঠতেই সবাই ওর দিকে তাকালো।

কাকে চাই?

নাঃ! এমনি।

এমনি মানে? এখানে ঢুকলেন কি করে?

খোলা জায়গা। তাই এসে পড়লাম। ঘণ্টাটা তো বেশ। এ কি কিনতে পাওয়া যায়?

এটা প্রোটেকটেড এরিয়া। বাইরে যান।

কোথায় তৈরি হয় ভাই এসব ঘণ্টা? সেখানে আমি একটার জন্যে অর্ডার দিতাম। যেখানে সেখানে তো ঠিক এ জিনিস পাওয়া যায় না। পেলে আমি কিনে নিতাম।

পায়ের রবার বুট হাঁটু অব্দি। ছেলেটি বছর চব্বিশের হবে। তাগড়াই চেহারা। সোজা উঠে দিলীপের দিকে বড় বড় পায়ে এগিয়ে আসছিলো।

দিলীপ পিছিয়ে যেতে যেতে ফুটপাথে নেমে পড়লো। রাগ করলে ভাই?

কয়েকখানা লরি যাচ্ছিল পরপর। তাদের ফাঁক দিয়ে দিলীপ ওপারে গলে গেল। ভোরবেলায় কলকাতার ফুটপাথের সঙ্গে চা আর সিঙাড়ার গন্ধ। স্টিয়ারিংয়ে বসে দিলীপ ফাঁকা রাস্তা পেয়ে একদম হাওড়া ব্রিজের মুখে উড়ালপুলে এসে উঠলো। তারপর ব্রিজ পেরিয়ে গঙ্গার পারের ফুটপাথে দত্ত কেবিন। ভিড় নেই। স্টিয়ারিংয়ে বসেই দু খুরি চা আর চারটে সিঙাড়ার অর্ডার দিল।

কালু ঘোষ পেছন থেকে বললো, আমি এখন আর চা খাবো না। তুমি খাও ভাই।

খাও না। সকালের আড়মোড়া কেটে যাবে।

দু খুরি চা এলো। এক খুরি পেছনে রেখে দিলীপ বেশ তারিয়ে তারিয়ে চা খেতে লাগলো। সেই সঙ্গে সিঙাড়ায় কামড় দিতে থাকলো। ইচ্ছে হচ্ছিল পেছন ফিরে তাকায় একবার। তা না তাকিয়ে দিলীপ বললো, খুব গরম চা। তাই না?

হুঁ। কোন দিন তো এত ভোরে চা খাইনি।

কি খেতে?

কিছুই না। এখন তো আমি ঘুমে। বেলা নটা নাগাদ ঘুম ভাঙলে আমের সময় খেতাম চিল্ড ম্যাংগো। ঠাণ্ডা রস একদম লিভারে গিয়ে লাগতো।

তাহলে চা ফেলে দিয়ে সিঙাড়াটা খাও।

ওরে বাবাঃ! কতকালের অ্যাসিডিটি আমার। খাই আর মরে যাই।

গঙ্গা থেকে উঠে আসা কুয়াশা তিন হাত দূরের ঠ্যালাওয়ালাকেও ঢেকে

ফেলেছে। দিলীপ পয়সা দিতে নেমে গেল। ফিরে এসে দেখলো—তার সিটে শালপাতায় একজোড়া সিঙাড়া। রাস্তায় তার ফেলে দেওয়া খুরির পাশে আর একটা ভাঙা খুরি পড়ে আছে।

প্রায় ভোররাতে বেরিয়েছে দিলীপ। এসব দেখেশুনে সে মনে মনে নিজেকেই বললো, বেশ তো চলছে। চালিয়ে যাও দিলীপ।

কলকাতা ছাড়িয়ে, হাওড়া ছাড়িয়ে রোদ পোহানোর মত পরিষ্কার সূর্যের সঙ্গে দেখা হতে হতে বেলা প্রায় আটটা। হাইওয়ে দিয়ে অল ইণ্ডিয়া পারমিটের দশ চাকা লরির আনাগোনা। তাদের পাশ কাটিয়ে অস্টিন ট্যুরার দিব্যি ছুটছিলো।

পথে তেল নিতে হলো। একবার জল দিতে হলো রেডিয়েটরে। জল দিয়ে রাস্তার পাশে পেচ্ছাপ সেরেই স্টিয়ারিংয়ে এসে বসলো দিলীপ। তোমার কি পিপাসা পায় না?

না। জল আর কতটুকুই বা খেলাম জীবনে।

পেচ্ছাপ পায় না?

কি খাই যে পাবে। আমার চামড়ার নিচেই তো রক্তের বদলে হুইস্কি।

সবটাই শরীরে রেখে দিয়েছ?

এখন তো আগের মত আর স্পোর্টস নেই। টেনিস খেলতাম। সুটিংয়ে যেতাম। ঘাম হয়ে সব বেরিয়ে যেতো।

এখন আবার খেললে পারো।

কখন খেলবো দিলীপ? সব সময় তো তোমার সঙ্গেই আছি।

আমাকে এবার একটু ছাড়ো কালু ঘোষ।

হ্যাঁ। এই গাড়ি দিয়ে ছেড়ে দিই আর কি। কোথায় চার চাকা কার ঘাড়ে তুলে দেবে তার ঠিক কি? তোমার তো আবার লাইসেন্সও নেই।

পেলাম কোথায়? শিখবার আগেই তো তুমি আমায় স্টিয়ারিংয়ে বসিয়ে দিলে।

গাড়ি তখন চাঁপাডাঙার মোড় দিয়ে যাচ্ছিল। খানিক গিয়ে বাঁ হাতের মেটে রাস্তায় নেমে পড়লো গাড়ি।

এটা কি হলো কালুদা?

ছাখো না কোথায় যাই। এখানে মোটে আমি দুবার এসেছি।

কথা শুনবে কি দিলীপ। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা দিয়ে গাড়ি লাফাতে লাফাতে এগোচ্ছিল। শীতকালের বুনো ফুল ফুটে আছে গাছ ভরে। কুলতলায় একটা হুলো বেড়াল। বেলা আড়াইটে তিনটে হবে। রাস্তায় কোন লাইট পোস্ট নেই। তাহলে তো এ গাঁয়ে আলো যায় নি এখনো। তবে মাইকের শব্দ গাছপালায়

ভেতর দিয়ে ভেসে আসছে কি করে?

প্রথমবার এখানে আসি মায়ের পেট থেকে। এ গাঁয়েই আমার জন্ম।

তাহলে আমরা এখন কালু ঘোষের গাঁয়ে যাচ্ছি।

না না। আমার গাঁ বোলো না। আরেকবার এসেছিলাম—গাঁয়ের উন্নতি করতে। শুনলে হাসবে তুমি দিলীপ—এ গাঁয়ে একখানা খবরের কাগজও যায় না। কয়েকটা ট্রানজিস্টর আছে। আর আছে কয়েক ঘর কুঁদুলে মানুষ। সেকেণ্ড বারে এসে অটোমোবিল ইণ্ডিয়া থেকে কয়েকটা টায়ার দিয়ে গিয়েছিলাম—

টায়ার?

গাঁয়ের একটা হরিসভা আছে। ওদের দুখানা ঠেলা আছে তারকেশ্বর বাজারে। সে দুখানা টায়ারে চললে বেশি কাজ হতে পারে। হরিসভাও দুটো পয়সা বেশি পায়—

তা এখানে আসবে যদি আগে বললে না কেন?

ঠিক ছিলো না দিলীপ। বড় রাস্তায় পড়েই মনে পড়লো। এই তো। বেশ হাত সেট হয়ে গেছে দেখছি। হ্যাঁ—ওই টালির ঘরটার সামনেই থামাবে। দেখো—ফাঁকা ড্রেন আছে সামনে—

ব্যাটারিতে মাইক বাজছে তাহলে।

তবে না তো কি!

কালুবাবু লাস্ট কবে এসেছিলে এখানে?

তা বিশ বছর হয়ে গেল। না। তার চেয়েও বেশি।

ব্রেক কষতে কষতে গাড়ি গিয়ে একদম কাঁচা ড্রেনের গায়ে থামলো। দিলীপ তখনো গাড়ি থেকে নামেনি। সবে স্টার্ট বন্ধ করেছে। আর অমনি টালির চালা থেকে একজন নেমে এসে তার গলায় একটা লম্বা মালা গলিয়ে দিল। পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?

তার কথার জবাব দেবে কি দিলীপ! কিছু বলার আগেই আরেকজন বললো, অনেকদিন পরে আপনাকে দেখছি কালুবাবু। আমারও চোখের ছানি কাটানো হয়নি। বয়স বেড়েছে—অথচ চেহারা তো পাল্টায়নি আপনার একদম।

মাইকে শুধু তারস্বরে একটি চরণই ঘুরছিলো। হরে কৃষ্ণ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ। হরে রাম। রাম রাম॥

দিলীপ চেঁচিয়ে বললো, আগে মাইকটা থামান তো। কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

মাইক থামলে দিলীপ বললো, কি বলছিলেন?

মাঠের ভেতর মাইক থেমে যাওয়াতে আচমকা চারদিক একদম নিঃঝুম।

আরেকটা মালা হাতে আরেকজন বয়স্ক লোক এগিয়ে এসে বললো, প্রায় আট-দশ মাস আগে এ অনুষ্ঠানের কথা জানিয়ে আপনাকে পত্র দেওয়া হয়েছিলো। আপনি যথার্থই জন্মভূমিকে ভালোবাসেন। ঠিক মনে রেখে চলে এসেছেন।

দিলীপ কি বলতে যাচ্ছিলো। আরেকজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। খালি গা। ন্যাড়া মাথা। চেহারায় কিসের একটা মর্যাদা যেন। বললেন, আপনার দেওয়া সে চারখানা টায়ার আজও আছে—ক্ষয়ে গেছে অবিশ্যি—

এবারে দিলীপ সত্যিই চমকে উঠে তার পেছনে তাকালো। কোথায় কে? পেছনের সিট একদম খালি। একটা গরু এগিয়ে এসে গোটানো হুডের পুরনো ক্যাম্বিস কামড়াচ্ছিল। দিলীপ তেড়ে গিয়ে গরুটাকে সরিয়ে দিলো।

অনেকেই অনেক কথা বলছিলো। কারও বয়স পঞ্চাশের নিচে নয়। তাহলে কি এ গাঁয়ে সবাই বুড়ো? এরা কি খবরের কাগজ একদম দেখে না? নইলে?

একটি ছোট ছেলে কোত্থেকে এসে তার হাতে একটা গন্ধরাজ ফুল তুলে দিলো।

শোনো শোনা। তুমি কে গো?

আমার মা হরিসভায় ভাত রাঁধে।

ও। আমি কে বল তো?

অভয় পেয়ে ছেলেটি বললো, আপনি তো বিখ্যাত কালু ঘোষ। এ গাঁয়ে আপনার জন্ম। আপনি একবার হরিসভায় ঠেলার জন্যে বিনি পয়সায় চারটে টায়ার দিয়েছিলেন।

সে ঠেলা তুমি দেখেছো?

চড়েছি। একবার হরিসভার জন্যে এক ঠেলা ঘুঁটে এনেছিলাম—

ওঃ!

বিকেলের দিকে গ্রাম ঝেঁটিয়ে লোক এলো। কাছাকাছি ইস্কুলের গুটি কয় ছেলে শ্লোগান দিলো, জয়! কালু ঘোষের জয়!!

অনেকেই শুনেছে, কালু ঘোষ বড়লোক। একজন তো মাইকে দাঁড়িয়ে বলে গেলো, এ গাঁয়ে ওঁর জন্ম। এ গাঁয়ের কথা উনি ভুলতে পারেন না। এ দেশেই ওঁর বাবা-মা দেহ রেখেছেন। বালক বয়স থেকে কষ্ট করে উনি বড় হয়েছেন। নিজের অধ্যবসায়ের গুণে। তবু মাথা ঠাণ্ডা আছে। কতদিন আগের নেমন্তন্ন। তবু মনে করে চলে এসেছেন। এই তো মহৎ মানুষের লক্ষণ!

দিলীপ মনে মনে রেগে যাচ্ছিলো। এ কোথায় আমায় ফেলে দিলে কালুদা!

এ তোমার জন্মভূমি হতে পারে, কিন্তু আমার কি? আমার তো কোন মায়া নেই এখানকার জন্যে।

ঘোষ মশায়, এবার আপনি কিছু বলুন—

অগত্যা—

মাইক ধরেই দিলীপ বললো, আপনাদের এই ঘোষকাঠি ধন্য। ধন্য আপনাদের জন্মভূমি। ধন্য এই হরিসভা।

বেশ জোর দিয়ে থেমে থেমে বলায় সারা গাঁয়ের মানুষ কী যেন খুঁজে পেলো এই সামান্য ক'টি কথায়। তারা সবাই একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠলো। হরিসভার ন্যাড়া মাথা ভদ্রলোকটি বললেন, সাধু। সাধু।

বোঝাই যাচ্ছিল—এখানে কেউ গত বিশ-বাইশ বছরে কালু ঘোষকে দেখেনি।

এই ঘোষকাঠির আমিও একজন। আমিও একজন ঘোষ। আমার শিরায় শিরায় ঘোষকাঠি রয়েছে। এখানে দিলীপ তার ডান হাতখানা মেলে ধরলো। এই শিরায় রয়েছে ঘোষকাঠির রক্ত।

সন্ধ্যের অন্ধকারে ধান কাটা মাঠ দিয়ে কুয়াশা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিলো। মাঠের ভেতর দিয়ে গো-গাড়ি বিচুলি বোঝাই হয়ে বড রাস্তায় উঠছিলো। তাদেব ওপব গাড়ির হেড লাইট পড়তেই গরু চমকে যাচ্ছিল।

গাড়োয়ানরা চেঁচাচ্ছিলো। আলো নেভান। আলো নেভান কালুবাবু—

চাঁপাডাঙার মোড ছাড়িয়ে দিলীপ তেতো-বিরক্ত হয়ে কলকাতার পথ ধরলো। এটা কি হলো কালু?

আমিও তো এ রকম ভাবিনি দিলীপ।

তোমার মাথায় যে কত মতলব ধরে তা কে বলতে পারে! আজ যা হোক ভালো শিক্ষা দিলে আমায় কালুদা—

আমি এ-সব কিন্তু একদম ভাবিনি।

আর কেন। এবার কালুদা আমার পাশে এসে বোসো।

না। পেছনেই বেশ আছি। কাটিয়ে কাটিয়ে এগোও। লরি ছাডার সময় হয়ে এলো।

ওপর থেকে যদি কেউ দেখতে পেতো—তাহলে ছবিটা এখন এরকম। ভারি ভারি লরির সারির ভেতর দিয়ে একটা পুচকে গাড়ি দুলে দুলে এগোচ্ছে। কখনো ডুলকি চালে। কখনো—হড়বড় করে। লরিগুলিই যেন ভড়কে যাচ্ছে।

কালু ঘোষ বললো, এবার দিলীপ তুমি একটা লাইসেন্স করাবে।

লাইসেন্স আমায় দেবে না কালুদা—

কেন? বেশ তো চালাচ্ছো।

এ-গাড়ি শুধু চালাতে পারি। অন্য গাড়িতে উঠলে সব গুলিয়ে যায়।

যাঃ! ইয়ার্কি করছো।

সত্যি কালুদা। আমার অ্যামবাসাডর তো আজকাল বেশির ভাগ সময় পড়ে থাকে। ইউজই হয় না একদম।

চব্বিশ

কোনার কাছে লরির জট রাস্তা বন্ধ করে ফেলেছে। দিলীপ পিছিয়ে গিয়ে তে-মাথানীর মোড়ে এক ধাওয়ায় বসলো। তারপর গরম গরম মাটন কবিরাজির সঙ্গে দু' বোতল বিয়ার নিয়ে বসলো।

ঘন ছনের ঢালু ছাদ। মাটির মেঝে। কাঠের বেঞ্চ। তার ভেতরে ফ্রিজ। ইলেকট্রিক। বাইরেই কড়া শীতে জ্যোৎস্নার পাতলা প্রলেপ মাখানো কুয়াশা। লরির রাগী হেডলাইট। মাঠের ভেতরে হাই টেনশন তার থেকে এখানকার লাইন টানা। বেঞ্চে বসেই ধাওয়ার পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছিলো। যেমন হয় আর কি। নাবাল জমি, ধান কাটা মাঠে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ওঠা কুয়াশা আর ধোঁয়া। অনেক-দূরে কোথাও বিচুলি বোঝাই গো-গাড়ির গাড়োয়ান লেজ মোচড়ালো। ড্রুবা-ড্রুবার—। সবই ধোঁয়াটে। এর ভেতর চোখের সামনে ধাওয়ার গায়ে পার্ক করানো অস্টিন ট্যুরারটাই শুধু পরিষ্কার। রাস্তার আলোর সঙ্গে ধাওয়ার আলো পড়ে পাদানীর ব্রাস চকচক করছে। চাকার স্পোক অ্যালুমিনিয়ম রংয়ের। আজ সারাটা দুপুর-বিকেল-সন্ধ্যের অনেকখানি কালু ঘোষ সাজতে চলে গেছে তার। পৃথিবীতে এমনও একটা গাঁ আছে? এখনো তার কানে বাজছে। কালু ঘোষ কি জয়। কালু ঘোষ কি জয়।

বেয়ারা এক প্লেট মাটন কবিরাজি আর দু' বোতল বিয়ার রাখলো নড়বড়ে টেবিলে। আর একটা গ্লাস। ওপেনার—।

দিলীপ বললো, আরেক প্লেট কবিরাজি দেবে। আরেকটা গ্লাস।

ধাওয়ার ছোকরা বললো, আরেক সাহেব আসবেন?

সে তোমার দেখার দরকার নেই। যা বলছি তাই দাও।

ছেলেটা অবাক হয়ে ফিরে গেল। একজন খদ্দের। অথচ ডবল কবিরাজি! ডবল গ্লাস! এরকম সে কোনদিন দেখেনি।

বড় চুলোয় সুগন্ধি ঘুগনি রান্না হচ্ছিল। বাতাসে তার আন্দাজ পেয়ে মনটা

খুশিতে ভরে গেল দিলীপের। বড় তাওয়ায় কাবাব ভাজার ছ্যাকছোঁক। ঝোলানো তারের ব্যাগ ভর্তি লাল টুসটুসে টমেটো। সামনেই চওড়া রাস্তা দিয়ে শুধু যাতা-য়াত। লরি, মানুষ, গো-গাড়ি, টেম্পো, প্রাইভেট—কত কি। জায়গাটার ভাবটাই হলো—খাওদাও, রওনা হও। সামনে চেক পোস্ট। বাম্প। বাইপাস। থানা। পোল আছে। সাবধান—শার্প বেণ্ড। স্কুল আছে। বাজার এলাকা। লোকালয়। সাবধানে চালাতে হবে। স্পিড্ বাড়ালে চলবে না কিন্তু।

ছোকরা আরেক প্লেট কবিরাজী, স্যালাড্—খাট্টা—আরেকটা গ্লাস টেবিলে রাখতেই দিলীপ বললো, একটা ওয়েস্ট প্লেট দাও।

নিচে ফেলুন। কিছু হবে না।

না। নোংরা করে খাবো কেন? নিয়ে এসো। ঝোল চাইনি। স্যালাড্ চাইনি। একটা একস্ট্রা প্লেট দিতে পারবে না?

ছোকরা গোড়া থেকেই অবাক হয়েছিলো। খদ্দের একজন। আয়োজন দুজনের। আরেকজনের তো দেখাই নেই। গাড়ি থেকে নেমে সিগারেট কিনুক—কি পেচ্ছাব সেরে ফিরুক—তাতে তো এত সময় লাগার কথা নয়।

ধাওয়ার ভেতরটা উঠোনের সাইজের। ছোকরা ছুটে গিয়ে প্লেট এনে রাখলো আর সঙ্গে সঙ্গে চাদ্দিক জুড়ে সোরগোল উঠলো। ঘুরঘুট্টে অন্ধকার।

একজন বাঙালী ড্রাইভার দূরে বসে ছিলো। সে বললো, বড লাইন গেছে। ফিরতে দেরি হবে—

দিলীপের সামনে টেবিলের উল্টোদিক থেকে কালু ঘোষ বললো, তাতে কি! এখুনি হ্যাজাক জেলে দেবে'খন।

এসে গেছো! নাও। আন্দাজে ঢাললাম কিন্তু। ফুরোলে বলবে—

সে তোমায় বলতে হবে না।

মাটন কবিরাজি দিয়েছে। দেখে খেয়ো।

ওসব আবার কেন? ও তুমি খাও দিলীপ।

সারাদিন খাওনি। খেয়ে নাও কালুদা। এখনো কলকাতা পৌছতে ঘণ্টা তিনেক লাগবে। ফিরে গিয়ে কোন দোকান তো খোলা থাকে না। পেলেও খাবার থাকবে না কিছু।

আমার আবার পৌছানো! আমার আবার খাওয়া!!

কেন? ও কথা বলেছ কেন কালুদা?

আমি তো কোথাও পৌছাই না। কোথাও যাই না দিলীপ। কোথাও কিছু খাই না।

তবে এই যে আমরা ঘোষকাঠি পৌঁছলাম। সারা বিকেল—সারা সন্ধ্যে থাকলাম সেখানে ?

আমি কোথাও আসি। এই যেমন এখানে এসেছি। কোথাও যাই না। সেখানে শুধু আসি। থাকি।

হেঁয়ালী রাখো কালুদা। ওই তো দিব্যি চোঁ চোঁ করে খাচ্ছো।

ও তো শক্ত জিনিস নয়। আজ সকালে তো সিঙাড়া খাইনি। খাওয়াতে পেরেছিলে ?

কষ্ট করে চেখে ত্যাখো না। ভালো রেঁধেছে মাংসটা।

খেতে পারবো না দিলীপ। গলা দিয়ে নামবে না।

খুব পারবে। মুখে দিয়ে ত্যাখো। চমৎকার রেঁধেছে।

না। গলায় লাগবে। তার চেয়ে বরং আরেকটু ঢেলে দাও। গলা শুকিয়ে কাঠ।

তোমার কেন শুকোবে কালুদা ? শুকোবে তো আমার। কেমন লেকচার দিলাম একখানা। একবারে কালু ঘোষ কি জয় পড়ে গেল। ঢেলে দিতে দিতেই কথা বলছিলো। মাংসটা খেয়ে নাও।

পারবো না দিলীপ। গলায় গুলি লেগেছিলো দুটো।

সেই লেভেল ক্রসিংয়ে ?

আমি তো সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারী লোক ! তাই—

কে বলেছে কালুদা ?

কেন ! যারা গুলি করেছিলো !

দিলীপ আর কথা বলতে পারলো না। মুখ ভর্তি হয়ে গেছে মাংসে। চিবিয়ে ছিবড়ে ফেললো ওয়েস্ট প্লেটে। ওকি ? এর ভেতর তোমার গ্লাস খালি ? উঁহু। এত তাড়াতাড়ি ভালো নয়। রয়ে সয়ে খাও।

আমি আর রয়ে সয়ে খেয়ে কি করবো। রোজ তোমাদের ফ্ল্যাট বাড়ির বেসমেণ্টে রাত বাড়লে ইলেকট্রিক হর্নের আওয়াজ পাই। ঘটাঘট করে ইলেকট্রিক ট্রেন এসে পড়ে। লেভেল ক্রসিংয়ে গেট পড়েছে। আটকে গেছি গাড়িতে। গেট খুললেই ফার্লং খানিক এগিয়ে বাঁ হাতে সুবুদ্দিপুরে যাওয়ার একটা ভালো রাস্তা পেয়ে যাই।

ওখানেই তো তোমার বাগানবাড়ি ? একদিন গেলে হয়—

হুঁ। যেতে পারো। যে কোনো দিন গেলেই হয়। এতদিনে আমার বসানো গাছপালায় ফুল এসেছে। গাছ বড় হয়ে ছায়া দিচ্ছে লোককে। বেড়াতে যেতাম ওখানে। মাছ ধরতাম পুকুরে।

একদিন ধরলে হয়। বড় মাছ আছে ?

রুই কাতলা তো বড় হওয়ার কথা। দেড় কেজি—দু' কেজি সাইজের হয়েছে হয়তো।

গ্যাখো গিয়ে পাড়ার লোকে তুলে নিয়ে গেছে এতদিনে।

না। তা পারবে না। অনেক জল। অটোমোবিল ইণ্ডিয়া পাহারা বসিয়েছে। দু'জন গুর্খা দরোয়ান। স্টেট ভার্সাস দায়রা কেসে আমার মেয়ে তো সমন পেয়ে এলো বলে। যেদিন আসবে সেদিন এয়ারপোর্টে যাবো আমরা—

চিনতে পারবে দেখে ?

তা সত্যি! অনেককাল তো দেখাই হয়নি। আজ টরেণ্টো, কাল লণ্ডন করে বেড়ায়। কী সব ইণ্টারন্যাশনাল ল না কি—

অনেক খবর রাখো দেখছি।

তা কী করবো ? তুমি তো বেসমেণ্টে গাড়ি তুলে দিয়ে গুডনাইট করে লিফটে উঠে পড়ো। সারা রাত গাড়িতে বসে কাটানো যায় ? তখন একা একা সব ঘুরে দেখি। তত্ত্বতালাস করি। রাত বাড়লে ইলেকট্রিক ট্রেনের সেই হর্ন আমার মাথা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেয়। আর ঘটাঘট। ট্রেনের আওয়াজের ভেতরেই পয়েণ্ট ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে ওরা আমার গলায়, মাথার খুলিতে গুলি করে। রোজ রাতে। আমি বাধা দিতে গিয়েও পারিনি। দায়রায় তিন আসামীই বলেছে—আমি নাকি সমাজের ক্ষতিকারী লোক। রোজ রাতে এই এক রিপিট শো। চলেছে তো চলেছে—থামে না—একদিনের জন্যেও বন্ধ হয় না।

চলো তোমার বাগানবাড়িতে একদিন পিকনিক করে আসি।

বেশ তো।

জায়গাটাও দেখা হবে। ছিপ নিয়ে যাবো। সারাদিন বঁড়শী ফেলে বসে থাকবো।

ছিপ নিতে হবে না। আছে ওখানে।

খুব ফুর্তি হতো বাগানে ?

তা হতো দিলীপ। অটোমোবিল ইণ্ডিয়া তো দেখতেই হতো। তাছাড়া আমি কলকাতার বাছাই সিটিজেনদের একজন। কতগুলো কোম্পানিতে ডিরেকটর। সুটিং ক্লাবের প্যাট্রন। টার্ফ ক্লাবের মেম্বার। সাতশো জায়গার সভাপতি। একটু রিল্যাক্স করতে তো যেতেই হতো।

মেয়েছেলে ?

কেউ কেউ নিয়ে গেছে।

তুমি কালুদা ?

নিয়ে গেছি। সাঁতার। রান্না। গান। হৈ হুল্লোড়। তার চেয়ে বেশি কি আর হবে—

হয়ে থাকলে দোষের কি ?

হয়তো হয়েছে কখনো। সবার ভ্যালুজ তো এক রকমের নয় দিলীপ। কাউকে তো জোর করে নিয়ে যাইনি ওখানে।

সবই ভলাণ্টারি !

হ্যাঁ। দিলীপ।

নট এ ফিউড্যাল অ্যাড্‌ভেঞ্চার !

ইয়েস।

একদম ওয়ার্কিং উইকএণ্ড।

ঠিক ধরেছো দিলীপ। কিন্তু ওরা আমায় লেভেল ক্রসিংয়ে পেয়ে গুলি করে দিলো। বোকা আর কাকে বলে ! আমি নাকি সমাজের ক্ষতিকারী লোক !

কথাটা শুনলে কোথায় ?

পরদিন ওদের কাগজে দেখেছিলাম। আমি খতম হওয়ায় কীর্তিধরদের অভিনন্দন জানিয়ে আমাকে এক কলম ধিক্কার দেওয়া হয়।

একদম পরদিনই দেখে ফেললে—!

কোন কাজ ছিলো না, কি করবো ! আমার বডি তো তখন পুলিস মর্গে। রাতারাতি অন্য সব কাজকর্ম একদম ফুরিয়ে গেল।

কথা হচ্ছিলো, আর দিলীপ লক্ষ্য করছিলো—টেবিলের ওপাশ থেকে কালু ঘোষ মাটন কবিরাজির পুরো প্লেটটা তার দিকে সরিয়ে দিচ্ছে। তার জলের গ্লাসের পাশ থেকে প্রায় ফাঁকা বিয়ারের বোতলটা এদিকে চলে গেল।

খাওয়ার সেই ছোকরা উঁচু টুলে হ্যাজাক বসিয়ে দিয়ে দিলীপের বারোয়ারী টেবিলে তাকালো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ বড় হয়ে গেল। দিলীপ দেখতে পেয়ে মনে মনে হাসলো। বাইরে গম্ভীর। ছোকরা টেবিলের কাছে এলো। মুখোমুখি দুটো খালি গ্লাস। গ্লাসের ভেতর বিয়ারের ফেনা। মুখোমুখি দুটো ফাঁকা বোতল দাঁড়ানো। পাশাপাশি দুটো ফাঁকা প্লেট। ওয়েস্ট প্লেটে চিবোনো হাড়ের, স্তূপ।

আপকা দোস্ত আয়া থা ?

এসেছিলো। কেন ?

নেহি। কাঁহা গয়া ?

কি দরকার ?

ছোকরা বোকা বনে গিয়ে ধার করা হিন্দিতে বললো, ইউহি—

টেবিল সাফ করো। আর এই টাকা ভাঙিয়ে বাকিটা ফেরত দাও।

লোড শেডিংয়ের ভেতরেই অস্টিন ট্যুরার ফের ছুটলো। কিন্তু ছুটবে কি! সারা রাস্তা জুড়ে লরির জট। দাঁড় করানো লরির সাইলেন্সার দিয়ে ডিজেলের কাশি। কেউ তো স্টার্ট বন্ধ করেনি। একটু একটু করে সবাই এগোচ্ছিল। ত্রিপল ঢাকা বড় বড় লরির গা থেকে কোথাও লোহার রডের ডগা—কোথাও বা কয়লার চাক বেরিয়ে ছিলো। সেসব লরির নাকের ডগা দিয়ে লোম ঢাকা কুকুরের কায়দায় অস্টিন ট্যুরারটা এদিক সেদিক দিয়ে গলে গলে এগোচ্ছিলো।

এক লরি ড্রাইভার তো চমকেই গেল। সে তার উঁচু সিট থেকে দেখতে পেলো—অস্টিনটার স্টিয়ারিংয়ে বসা এক বাবু গাড়ি চালাতে চালাতে কথা বলছে। আবার হাসছেও মাঝে মাঝে। পথ না পেয়ে গাড়িটা তার লরির সামনে দাঁড়ালো। তারও চোখ বড় হয়ে গেল। আজব কাণ্ড! স্টিয়ারিংয়ের বাবু কথা বলে যাচ্ছে। পেছনে ফিরে ফিরে। স্টিয়ারিংয়ে চোখ রেখে। অথচ পিছনের সিটে কেউ নেই! পাশেও কেউ নেই বাবুর!

লরি ড্রাইভার নিজের চোখ ডলে ভালো করে তাকালো। আর সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে বসে থাকা ঘুমন্ত হেল্পারকে এক ধাক্কা দিয়ে জাগালো। অস্টিনটা ততক্ষণে সামনের লরির পাশ কাটিয়ে আরেকটা ফাঁকের ভেতর গলে গেছে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে দিলীপের ঘুমে চোখ বুজে আসছিলো। নিউ রোডে পড়তে পড়তে রাত বারোটা। শীতের ঠাণ্ডা বাতাস লেগে কানের দু'দিক শিরশির করে উঠছিলো। বেসমেন্টে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে দিলীপ গুডনাইট করলো। অটোমেটিক লিফটে ঢুকতে ঢুকতে সে পরিষ্কার শুনলো, হুডখোলা ট্যুরার থেকে কালু ঘোষের গলা—গুডনাইট।

ভোর বেল বাজতেই দরজা খুলে গেল। রাণী দাঁড়িয়ে। তার কোলে মাথা দিয়ে রবির ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। এখনো জেগে?

কার কথা বলছো?

তোমরা দু'জন—

সন্ধ্যে থেকে খেলছিলো বিছানায় বসে। ওর পিসির সঙ্গে। মাথা গরম হয়ে গিয়ে ঘুম আসছিলো না ওর। এই ঘুম পাড়ালাম। গান গেয়ে—গল্প বলে।

ভাগ্যবান বলতে হবে। আমি তোমার গান শুনিনি কতদিন বল তো?

হাত পা ধুয়ে খেতে এসো।

কুটু?

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি একা একা টেবিলে বসে খেতে পারি নে।

কে তোমার জন্যে জেগে বসে থাকবে বল তো?

তুমি বোসো। খাওয়া হয়ে গেছে রাণী?

না। আমি রাতে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি তো অনেকদিন।

কোনো খোঁজই রাখি না বাড়ির। না খেয়ে খেয়ে শেষে একটা অসুখ বাধাবে।

রাতে না খেয়ে বরং ভালো আছি আমি। তুমিও খাওয়া ছেড়ে দাও এক-বেলা। এখন তো বয়স হচ্ছে আমাদের।

পাগল! আমি না খেলে মরে যাবো। এই তো সন্ধ্যেবেলা মাটন কবিরাজি খেলাম।

তাহলে আজ রাতটা উপোস দাও। কি চেহারা হয়েছে তোমার দেখেছো? অফিস যাও না কতদিন।

গিয়ে কি হবে! অনেক ছুটি জমে আছে।

ফোন এলে যাও না। ফোন ধরো না। জবাব দাও না। চাকরি থাকবে শেষে?

পাকা চাকরি। তা অত সহজে যায় না। আর গেলেই বা।

কি হয়েছে তোমার বল তো?

পরে বলবো। খেতে দাও।

ওকে রেখে আসি।

ফিরে এসে রাণী বললো, সনাতনকে ছাড়িয়ে দিলে। ভালো গাড়িটা বসে বসে নষ্ট হচ্ছে। কোত্থেকে একটা বদখত দেখতে গাড়ি এনে তার পেছনে সারাটা দিন কাটাচ্ছো। কোথায় যাও কেউ জানে না। ফোন এলে আমি বলতে পারি নে—। ভালো কথা। আজ যেন কে একজন ফোন করেছিলেন—

মনে করে দ্যাখো। না মনে পড়লে কাল সকালে ভেবে দেখো। ঠিক মনে পড়বে। খেতে দাও।

খেতে খেতে দিলীপ বললো, রবির ছেলেটা সোহাগ কুড়োনোর একশেষ। রোজ কাঁচা ঠাকুমার গান শুনছে।

আমি আর কাঁচা আছি নাকি!

দেখে কে বলবে—তুমি একজন ঠাকুমা।

তাহলে চেহারা রাখতে জানি বলো।

কোমর সরু রাখতে এমন জোরেই সায়ার দড়ি বাঁধো যে গোল হয়ে কালসিটে পড়েছে। দেখেছো?

ফিক করে হাসলো রাণী। এত রাতে অত ভাত খেয়ো না। শরীর খারাপ হবে। সেই একই নিঃশ্বাসে রাণী বললো, দাগ পড়লো, তাতে কি! আমার দিকে তাকাও তুমি?

সব গান তো প্রবোধের জন্যে গেয়ে রেখেছো। আমার জন্যে তো কিছু আর পড়ে নেই!

বাজে বোকো না। প্রবোধ এসে ক'খানা গান শিখিয়েছিলো বিয়ের আগে। তারপর আর কি! কোন যোগ নেই।

প্রবোধ তোমায় চুমু খেয়েছিলো?

রাণীর চোখ অন্যরকম হয়ে গেল।

চেষ্টা করেছিলো।

কি রকম?

এই—গলার কাছে ঠোঁট এনে ঘষতে ঘষতে মুখখানা ওপরের দিকে তুলছিলো।

তুমি কি করলে তখন?

সরে গেলাম।

ব্যাস! আর কিছু নয়?

আর কি করে বোঝাবো তোমায়? এক গল্প এ ক' বছরে কত হাজারবার বললাম—তাও তোমার বিশ্বাস হলো না?

পান দাও একটা। আছে তো?

ওসব ভুল হয় না আমার সংসারে।

রাণীর মুখে 'আমার সংসার' কথাটা শুনে দিলীপের ভালো লাগলো। পৃথিবীর সব মেয়েলোক ইচ্ছে করলেই আলাদা করে এক-একটা পৃথিবী বানাতে পারে।

সিগারেটে সুখটান দিতে দিতে দিলীপ এসে সেই ঝুলবারান্দাটায় দাঁড়ালো। কলকাতার লোকালয়ের মাথায় মাথায় এখন সব জায়গায় একটা করে কুয়াশার টুপি।

রাণী এসে পিঠে হাত রেখে বললো, শোবে চলো। রাত হয়ে গেছে অনেক।

রবি কোথায় খায়? কোথায় শোয়? চান করে? জামাকাপড় ময়লা হয়ে গেলে কি গায়ে দেয়? বলতে পারো আমায়? আমার এক এক সময় খুব জানতে ইচ্ছে করে।

ভেবে কি হবে? না খেয়ে নিশ্চয়ই নেই। শোবে চলো। ভালো কথা মনে পড়েছে। তোমায় একজন মেজর জেনারেল সন্ধ্যে থেকে অন্তত চারবার ফোন করেছেন। নম্বর লিখে রেখেছি।

লাইন কেটে দেয়নি এখনো। বিল দিইনি ছ' মাসের—

ভদ্রলোক তোমায় যত রাত হোক রিং ব্যাক করতে বলেছেন।

মেজর জেনারেল রায় তো?

হ্যাঁ।

ও নামে কাউকে আমি চিনি নে হয়তো।

তাহলে নাম জানলে কি করে?

হয়তো স্বপ্নে দেখা হয়েছিলো রাণী।

স্বপ্নের লোক টেলিফোন করে না। নম্বর দিয়েছেন ভদ্রলোক। লিখে রেখেছি। স্টাডিতে থাকবেন।

স্বপ্নের লোক ওরকম আবোল-তাবোল বকে রাণী। মনে রাখতে নেই।

বাজে বকছো কেন? আমি পরিষ্কার কথা বললাম তাঁর সঙ্গে। খুব জরুরী বললেন।

আমি চিনিই না লোকটাকে। ওরকম কোন লোক আদপেই আছে কিনা জানি না। থাকলেও আমার সঙ্গে শুধু আবছা স্মৃতির ভেতর দেখাশুনো হয়েছিলো, হয়তো কিংবা গত জন্মেও দেখা হতে পারে। ঠিক মনে নেই আমার। এর ওপর নির্ভর করে কেউ কি গত জন্মে ফোন করতে পারে রাণী? গতজন্মে কোন লাইন পাওয়া যায় না।

কী সব বাজে বকছো! ভদ্রলোক তোমায় রীতিমত চেনেন। আমি বলছি—চেনেন তোমাকে। বিলক্ষণ চেনেন।

বিলক্ষণ কথাটা কত দিন পরে শুনলাম রাণী।

তুমি ফোন করো মেজর জেনারেলকে—

এক সন্ধ্যেবেলা হয়তো দেখা হয়েছিলো। হয়তো হয়নি। ব্যাপারটাই আমার কাছে গোলমেলে। কিংবা ভৌমিক খাদানের শেয়ার ক্যাপিটালের টোপ গেঁথে তোলার সময় কোথাও দেখা হয়ে থাকবে।

আমি লাইন ধরে দিচ্ছি—বলে রাণী চলে গিয়েই ডায়াল করলো। এই যে ধরুন। মিস্টার বসুকে দিচ্ছি। এসো। এই তো মেজর জেনারেল রায়ের গলা—

অনিচ্ছায় এগিয়ে গিয়ে রিসিভার ধরলো দিলীপ। কেন শুধু শুধু আবছা [illegible] জিনিস খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলছো রাণী?

রাণী দিলীপের মুখে অবাক হয়ে তাকালো। এরকম কথা সে এর আগে কোনদিন শোনেনি। এ একদম অন্য দিলীপ। ঠিক তার স্বামী নয়। কিংবা যেন রবির বাবাও নয়।

হ্যালো? নমস্কার জেনারেল—

ওপাশ থেকে ভেসে এলো পরিষ্কার ভারি গলা। উঁহু। শুধু জেনারেল নয়। মেজর জেনারেল। তাও রিটায়ার্ড। আমি মেজর জেনারেল রায় বলছি। কার্ড দিয়েছিলাম—মনে নেই?

হ্যাঁ। একটু একটু মনে পড়ে বটে মাঝে মাঝে—

কি বলছো দিলীপ? কথা হলো—সকাল সাড়ে নটায় দেখা করবে আমার সঙ্গে—

তেমন তেমন মনে পড়ছে বটে। আচ্ছা একটা কথা বলি। সত্যি সত্যি মেজর জেনারেল রায় বলে কেউ আছেন কি? আপনার কি মনে হয়?

ঠাট্টা ইয়ার্কির জন্যে এত রাত অব্দি তোমার ফোনের আশায় আমি জেগে বসে থাকিনি দিলীপ। এটা নিশ্চয় বোঝো।

বুঝি তো অনেক কিছু। তার আগে একটা জিনিস পরিষ্কার হোক। সত্যি সত্যিই মেজর জেনারেল রায় বলে কেউ আছেন? না, পুরো ব্যাপারটাই ফেক্?

কি বললে? কতটা টেনেছো? রোজ এমনি বেহেড্ হয়ে বাড়ি ফেরা হয় বুঝি!

আহা চটছেন কেন? সত্যিই কি একদিন রাতে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো?

ক' পেগ টেনেছো? একদম অন দি রক্ যাওয়া ছেড়ে দাও এবারে।

সত্যি বলছি স্যার—আমার একটুও নেশা হয়নি। মাথা একদম পরিষ্কার। সন্ধ্যেবেলা আমি আর কালু ঘোষ দু বোতল বিয়ার চুক চুক করে খেয়েছি।

কে? কার নাম বললে? কার সঙ্গে খেয়েছো?

চিনবেন আপনি। কালু ঘোষ।

ওঃ! তাহলেই বুঝেছি। একদম বেহেড্ তুমি এখন। লাইন ছেড়ে দিচ্ছি। কাল সকালে কথা হবে তাহলে—

ছাড়বেন না। দোহাই আপনার। একটা জিনিস আগে পরিষ্কার হোক। কালু ঘোষ বলছিলো—

কালু ঘোষ কি বলবে আবার?

কেন? সে মানুষ নয় স্যার?

ছিলো এক সময়। প্রায় বছরখানেক হলো সে মরে ভূত হয়ে গেছে—

সে আপনাদের ভুল ধারণা।

ধারণা কি হে দিলীপ। এ তো ফ্যাক্ট। খবরের কাগজের রিপোর্ট। খুব ফুর্তিবাজ লোক ছিলো কালু।

এখনও ফুর্তিবাজ আছে।

আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারো?

খুব পারি। এখুনি চলে আসুন। চিনে আসতে পারবেন?

ওপাশে মেজর জেনারেল রায় খুব হো হো করে আর্মির হাসি হাসলো। তারপর বললো, আমি অরিজিন্যালি মারাঠা লাইট ইনফ্যানট্রির কর্নেল। তোমার রসিকতা বোধের জন্যে আর্মিতে হলে এখুনি তিনটে রাম পাঠিয়ে দিতে বলতাম মেসকে। যাক্, শোন। স্যার লেজলি তো এখন হোমে। আমাদের কোম্পানির নাড়ীনক্ষত্র তোমার জানা। নতুন করে আর কি বলবো তোমাকে। তুমি এসে তোমার মনোমত লোকজন নিয়ে ফার্টিলাইজার ডিভিশনটা সাজাও। বিক্রি বাড়াও। ইস্টার্ন জোনে মার্কেটিং গ্রুপ এখন শুধু একটা স্টিফ ফল।

কালু ঘোষকে নিয়ে যাই।

ওপাশে মোটা গোঁফ টপকে হো হো হাসি।

কালুদার এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু খুব কম লোকের আছে।

ভালো কথা। কিন্তু ওকে পাচ্ছো কোথায়? ও কি এখন নেমে আসতে রাজি হবে?

নামবে কোত্থেকে?

ধরো স্বর্গ!

না না। ও তো আমার বাড়ির বেসমেণ্টে থাকে। একদম প্লেন সিমেণ্ট করা জায়গা। ওঠানামার তো কোন ব্যাপার নেই।

হাসালে। খুন হওয়ার পর কালু তোমার ওখানেই থাকছে? আশ্চর্য! এরকম আর কজন আছেন ওখানে?

একা কালুদাই থাকে বেসমেণ্টে।

খাওয়াদাওয়া?

বিশেষ ঝামেলা নেই। আমরা একসঙ্গেই থাকি। খাওয়াদাওয়াও একসঙ্গেই করি।

ফানি! তোমার মতই একজন মজাদার মানুষ আমাদের দরকার। তুমি জয়েন করো আমাদের এখানে।

তা তো করবো কিন্তু আপনি সিওর ?

কি ব্যাপারে দিলীপ ?

মেজর জেনারেল রায় বলে সত্যি সত্যি কেউ আছেন ?

হাসালে। তাহলে আমি কে ?

আপনি হয়তো দৈববাণী। আপনাদের তো কোন বডি থাকে না স্যার। আপনি তো সব জানেন। একটু খুলে বলুন না।

রাতের দিকে অ্যাতো বেশি খাচ্ছো। সকালবেলায় নিশ্চয় হ্যাংওভার পোহাতে হয়।

তা তো হয়ই। কানের পাশে অয়েণ্টমেণ্ট। ভোর রাতে ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে সেরিডান। তা খুলে বলবেন কি ? সত্যি আপনি বলে কেউ আছেন কি ?

এ সন্দেহ কেন দিলীপ ? আমি তো তোমায় কার্ড দিলাম—

সে কি আমার এই জীবনে দিয়েছেন স্যার ?

পাকামো করো না। তোমার আবার আরেক জীবন কি হে! আমরা আর্মি থেকে রিটায়ার করে আবার নতুন জীবন শুরু করলাম—

কিন্তু কালুদা বলছিলো—

কি বলছিলো ?

আমি নাকি কোনো কার্ড পাইনি।

একদম বেহেড তুমি এখন। পরে কথা হবে দিলীপ। আমরা ক্লাবে একসঙ্গে বসে খেলাম। কথা হলো দুজনে।

কালুদা বললো, আপনার সঙ্গে নয়—তার সঙ্গেই নাকি আমি বসেছিলাম সন্ধ্যে থেকে। আমারই চোখের ভুল—

কালুটাকে যদি পাওয়া যেতো হাতের কাছে—

চলে আসুন না এখুনি। আমি দেখা করিয়ে দিচ্ছি।

না। থাক। কাল বরং তুমি একবার আমার ঘরে চলে এসো।

দিলীপ আর কথা বলতে পারলো না। মেজর জেনারেল রায় ফোন নামিয়ে রেখেছেন।

দিলীপও ফোন নামিয়ে রেখে রাণীর দিকে তাকালো। আজকাল আমার কথা কেউ বোঝে না, রাণী। তারপর আচমকাই বললে, একটা গান গাইবে কচি ঠাকুমা—

পাগল! এই নিষুতি রাতে ?

শুনলে আমি ভালো হয়ে যেতাম কিন্তু।

তুমি ভালই আছো। কিছু হয়নি তোমার।

সুপ্রিম কোর্টের করিডর থেকে নেমে রাস্তায় পড়লো কিরীটী পালিত। যাবে আগ্রা হোটেলে। সেখানেই উঠেছে আজ তিনদিন। এইমাত্র বার লাইব্রেরিতে বসে তার উকিল যা বলেছে—তার মানে—সে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মামলায় জিতে যাচ্ছে। কন্সটিটিউশন বেঞ্চ এ ব্যাপারে একমত যে কিরীটী পালিত রেলের দুর্ঘটনা বীমা বাবদে রিজার্ভ মুনাফা থেকে কম করেও এক কোটি টাকা পাবে। তাছাড়া পাবে মামলার খরচ।

পার্লামেণ্ট স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিরীটী ফুটপাথে বসে পড়লো। তার মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে। বাতাস লাগানো দরকার। এর নাম হাই ব্লাড-প্রেসার নয়তো ?

শীতকালের দিল্লি। তবু মাথাটা ঘুরছিলো কিরীটীর। রাস্তায় লোকজন। গাড়ি। কিরীটী উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বিড় বিড় করে বলে ফেললো, আজ যদি বাবা থাকতেন—

কী মনে হতে নিজেকে কারেক্ট করলো কিরীটী। বাবা নিশ্চয় আছেন। নিশ্চয় এই বিশাল ভারতবর্ষের কোথাও না কোথাও আছেন। আমি আমার বাবার অক্ষম ছেলে। তাই তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না। টাকাটা হাতে পেয়ে ইণ্ডিয়ার সব কাগজে ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন করবো। বাবা ফিরে আসুন। ইতি—আপনার অধম পুত্র—কিরীটী।

এসব কথার খানিক সে বিড় বিড় করে বলছিলো। খানিকটা তার মনের ভেতরেই ডুবে ছিলো। ভাগ্যিস নিজের আইডিয়াগুলো এতকাল পেটেণ্ট করে করে এসেছে সে। নইলে এ মামলায় তার তো কোন স্ট্যাণ্ড থাকতো না।

একা একা তিনবার দিল্লির রাস্তায় বাবা কথাটা উচ্চারণ করলো সে। তারপর কনট প্লেসের দিককার একটা ভাগের স্কুটার রিকৃশায় উঠে পড়লো।

এখানে কলকাতার মত রাস্তায় বাচ্চাদের জামা-কাপড় নিয়ে দোকান বসে না। কনটে গিয়ে তার দিশেহারা হওয়ার যোগাড়। ভালো ভালো দোকান। হাল ফ্যাশনের পোশাক। কিন্তু সাইজ তো বলতে পারে না। গুচ্ছের পয়সা দিয়ে একজোড়া হাফশার্ট হাফপ্যাণ্ট কিনলো। মালবিকার ছেলেটার গায়ে হবে তো ! বড় হলে না হয় কেটে ছোট করা যাবে। কিন্তু ছোট হলে ?

দোকান থেকে বেরিয়ে প্রচণ্ড ভিড়। কোন বাসে উঠতে পারলো না কিরীটী। তখন সে রাস্তার লোককে জিজ্ঞাসা করতে করতে আগ্রা হোটেলের দিকে এগোতে লাগলো।

সে হাঁটতে হাঁটতে বুঝলো, তারই পেটেণ্ট করা প্ল্যান মাফিক সারা দেশের গাড়িগুলোর একটা তালিকা হওয়া দরকার। এই তালিকা দেখে চলাচলের রাস্তা ঠিক করতে হবে। তারপর মাসিক পনেরো টাকা চাঁদার কার্ড করাতে হবে সবার। মাসে পনেরো টাকা চাঁদা দিলে যে-কেউ তার রাস্তায় ফাঁকা গাড়ি পেলে উঠতে পারবে কার্ড দেখিয়ে। ড্রাইভার, পেট্রল, মবিল, ট্যাক্স, রিপেয়ার সবই ওই টাকা থেকে আসবে। রাস্তা বড় করে গাড়ি বাড়াবার সুযোগ থাকলে ওই চাঁদার টাকা থেকেই নতুন গাড়ি আসবে—গাড়ি রিপ্লেস করা যাবে।

কলকাতায় থাকতে সেণ্টারে ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টারকে কিরীটী রেজিস্ট্রি করে এই প্ল্যানটা পাঠিয়েছে। প্ল্যানের সঙ্গে তার পরিকল্পনার পেটেণ্ট নম্বরটাও লিখে দিয়েছে সে, যদি অ্যাকসেপ্‌টেড হয় তো সারা দেশে বিপ্লব ঘটে যাবে। মোটরগাড়ি কারখানায় গাড়ি তৈরি বেড়ে যাবে।

হেঁটে ফিরতে ফিরতে প্রায় বিকেল হয়ে গেল। হোটেলের ঘরে ঢুকে কিরীটী দেখলো—তার নামে ইনল্যাণ্ড খামে চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে।

শ্রীচরণকমলেষু বাবা,

আমি সম্ভবত এবার এশিয়ান গেমস্‌-এ ইণ্ডিয়াকে রিপ্রেজেণ্ট করছি। মেয়েদের ট্রাক রেসে। আমি সাবধানেই তৈরি হচ্ছি। তুমি একবার স্পোর্টস কাউন্সিলে গিয়ে খোঁজ নেবে—বিবাহিতা বলে আমার ডিসকোয়ালিফায়েড হওয়ার কোন বিপদ আছে কি না। এশিয়ান গেমসের রুলস অ্যাণ্ড রেগুলেশন আমি ঠিক জানি না। তুমি দিল্লি জিমখানা লাইব্রেরিতে এ সম্পর্কে বই পাবে। অ্যাসিসট্যাণ্ট সেক্রেটারি একজন বাঙালী। শ্রী টি. এন দাশ। তাঁকে বললেই তিনি সব বলে দেবেন। তোমায় একটুও ঘুরতে হবে না।

আরেকটা কথা বাবা—লক্ষ্মীটি রাগ করো না আমার ওপর—একটু খোঁজ নিয়ে জানবে—এবার সিঙ্গাপুর যোগ দিচ্ছে কিনা। সিঙ্গাপুর যোগ দিলে আমার কোন চান্স নেই বাবা। ওরা ক'বছর ধরে ভীষণ তৈরি।

সবজিবাগান লেন — প্রণামান্তে
চেতলা — তোমার খুকী

ফাঁকা ঘরে কিরীটী পালিত একা একাই বলে ফেললো, খুব ফেরে পড়ে গেলাম।

পঁচিশ

আবুধাবি থেকে চিঠি এসেছে। ভোরের পয়লা কাপ চা দিয়ে চিঠিখানা কাগজের ওপর রাখলো রাণী।

খবরের কাগজ সরিয়ে দিয়ে দিলীপ বললো, কই? দেখি। হরিদার চিঠি?

শীতকালের সকালে রোদে বসে কাগজের দুয়ের পাতা দেখছিলো দিলীপ। স্টিরিও, ফ্রিজ, মোটর গাড়ি, কার্পেট, এয়ারকুলার, রাইসকুকার, মাল্টিচ্যানেল টি-ভি—কত কি বিক্রি আছে। সবই ব্র্যাণ্ড নিউ। স্পেয়ার সুদ্ধু বিক্রি। ইম্পোর্টেড। সবাই কি বিক্রিবাটা করে দিয়ে সংসার তুলে সাধু হয়ে যাচ্ছে? সবারই এক যুক্তি—ডিউ টু চেঞ্জ ইন স্টেশন।

হরিদা লিখেছে—এখানে এখন প্রচণ্ড শীত। গরমে প্রচণ্ড গরম।

চিঠির কাগজখানা ময়লা। গোড়া থেকে পড়তে লাগলো দিলীপ।

'তুমি তো জানো দিলীপ—কোনদিনই আমি ডাক্তার হিসেবে নিয়মের মধ্যে থাকিনি। এখানে বাতাসে টাকা। বালিতে টাকা। কিন্তু জীবন অতিষ্ঠ। এই হঠাৎ রাজার দেশে ডাক্তারখানা মানে জেলুসিল আর ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। আর ভাল ভাল ওষুধ বলতে সবই বড় কর্তাদের জন্যে। কাঁহাতক রোগী ঠকিয়ে দিন কাটাই। মুখ ফস্কে কিছু কথা বলে ফেলায় আজ আমি হাসপাতাল থেকে বিতাড়িত। যে মেয়েটির সঙ্গে আট মাসের চুক্তিতে বিয়ে হয়েছিল—চুক্তির মেয়াদ ফুরোতেই সেখান থেকে আমায় পাততাড়ি গোটাতে হয়েছে।

এখন আমি দেবদত্ত নামে হরিয়ানার এক ঠিকেদারের কনস্ট্রাকসন কুলিদের সঙ্গে তেরপলের বস্তিতে থাকি। এদের বড় কষ্ট। ভাল মত থাকার জায়গা নেই। চানের জল নেই। ছায়া নেই যে একটু জিরিয়ে নেবে। সেই রাত বাড়লে তবে স্বস্তি।

অবশ্য এখানে এখন প্রচণ্ড শীত। গরমে প্রচণ্ড গরম। আমি গরমকালের কথা বলছিলাম।

আরেকটা জিনিসের অভাব খুব। মেয়েমানুষের। টাকার লোভে বিদেশে কাজ করতে এসে আমার দেশের এতগুলো পুরুষমানুষ মেয়েমানুষের অভাবে আস্তে আস্তে অস্বাভাবিক হয়ে পড়ছে। ওদের নাড়ী দেখেছি আমি। বিট গোলমাল করছে। প্রেসারের গোলমাল। কালেভদ্রে হোমরাচোমরাদের বাচ্চাদের দেখা-শুনো করতে আনা আয়াগোছের ইণ্ডিয়ান মেয়েছেলে যাও বা ওরা পায়—তার

জন্যে আয়াটির পায়ে ওদের এক হপ্তার মজুরি—সব কটি ডলার গুণে দিয়ে আসতে হয়। উপরি-পাওনা শিবের অসাধ্য রোগ। সে-রোগের ডাক্তার আমি এখন এখানে। ওরা ভিজিট দেয়। খেতে দেয়। থাকতে দেয়। বেশ আছি। এখানে তুমি কনট্রাসেপটিভ পাবে না। ফ্যামিলি প্ল্যানিং বেআইনী।

এম্বারকেশন কার্ড পেয়ে গেছি। যে-কোন দিন এখানকার সরকার আমাকে দেশে ফেরত পাঠাবে। ওদের হিসেবে আমি সি ক্যাটাগরির লোক। হয়ত কোস্টাল ভেসেলে নিয়ে গিয়ে কাণ্ডালায় ছেড়ে দেবে। সেখান থেকে থার্ড ক্লাসে মিটার গেজ ব্রড গেজ করে কলকাতায় পাচার করবে আমাকে। তার চেয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার ফ্লাইটে একখানা টিকিট দিলে কত ভাল হত। শেখদের আমি যে খুব জ্বালিয়েছি। এখানকার ইণ্ডিয়ান কনসাল জেনারেল একজন মারাঠী। আমায় দেখলে মুখ ঘুরিয়ে নেন। কী শাসানি! তোমার বিরুদ্ধে হোম মিনিস্ট্রিতে চিঠি লিখছি আমি।

আমার চেম্বারের খবর কি? তোরা যাস? গোকুলদার একখানা চিঠিতে জানলাম—তুই আর খাদানে নেই। কি ব্যাপার? হলো কি? এই এত ভাল-বাসাবাসি—তারপর একদম কাটান-ছাঁটান? না না। এ ভাল করিসনি দিলীপ। ঋষি তোকে খুব ভালবাসে। একদম বলে দেখাই নেই তোদের! এটা ঠিক নয়। ঠিক করিসনি দিলীপ। তোর খুব কষ্ট হবে পরে। এসব তোর পক্ষে নরমাল নয়।

একটা জাতির বয়স হলে তবে তার মর্যাদাবোধ আসে। এদের সেসব বালাই নেই। সবে তো দেশটা জন্মাল—সবে অবস্থা ফিরছে। হামবুর্গে দেখেছি—রেড লাইট ডিস্ট্রিক্টে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে। গায়ে কিছু নেই। খেয়েদেয়ে একদম টং। আমি যেতেই রিফিউজ করল। গোড়ায় ভেবেছিলাম—আমি কালা আদমী বলে—

কিন্তু তা নয়। মেয়েটি বলল, আজ শুধু জার্মান দিয়ে বউনী করব। আমাদের আজ ন্যাশনাল ডে। তুমি খানিকক্ষণ ঘুরেঘেরে ফিরে এসো। তখন আদর করে বসাব। আগে জার্মান দিয়ে বউনীটা করে নি।

এখানে পেঁয়াজের সঙ্গে কিছু মেয়েমানুষ পাঠাতে পারলে ইণ্ডিয়া অনেক ডলার কামাতে পারত। গোকুলদাকে বল না—। আমায় রেজিস্ট্রি করে কিছু ডলার চিঠির ভাঁজে লুকিয়ে পাঠাতে পারিস। তাহলে আমি·এখনি ফিরে আসতে পারি। কতদিন কলকাতা দেখি না! শুনেছি, নিউ মার্কেটের কোন্ গলিতে ডলার কিনতে পাওয়া যায়!'

ফোন তুলে সব বলল ঋষিকে। ঋষি বলল, পাণ্ডবেশ্বর থেকে আবার কলকাতায় ফিরে এই প্রথম তোর গলা শুনলাম। কোথায় কোথায় থাকিস? অফিসে আসিস না কেন?

গিয়ে কি হবে! আর ছুটি তো আমার অনেক জমে আছে। হরিদার জন্যে কিছু করা যায় না?

কি করতে চাস? ল্যাণ্ডরুট থাকলে—সব দেশের ভিসা পাসপোর্ট থাকলে হরিদা লরি ধরে ধরে ফিরে আসত।

তা অবিশ্যি।

কোন চিন্তা নেই হরিদাকে নিয়ে দিলীপ। মানুষটা তো ওরকমই। কোথাও তো শেকড় নামায় না। থাকগে। তুই আসিস না কেন?

ওসব কথা থাক ঋষি। আমি অন্য একটা কথা বলছি। আয় না? তুই আর আমি স্যার লেজলির ফার্টিলাইজারে জয়েন করব।

কেন? কোল ইণ্ডিয়া কী দোষ করল?

তোর বাসি লাগে না?

তা লাগবে কেন? অবিশ্যি বেশি দিন আমি আর চাকরি করব না। আমার পিয়ারলেসগুলো কমপ্লিট হয়ে গেলেই আমি রিজাইন দেব। আর ছ বছর।

তারপর কি করবি ঋষি?

জমানো টাকার সুদে খাটে শুয়ে শুয়ে পা নাচাব। অনেকদিন তো চাকরি হলো।

তার চেয়ে চল্ না—আবার সেই অল্প বয়সের নতুন জীবনের মত করে নতুন চাকরি শুরু করি দুজনে। স্যার লেজলির ফার্টিলাইজারকে গড়ে তুলি আয়।

ওসব ইচ্ছে আমার একদম নেই। তুই কেন আসিস না? তুই কি আর খাদানের জন্যে মাথা ঘামাবি না?

তোরা তো ঘামাচ্ছিস।

তোর মত তো আমরা কেউ পারি না।

আমি আর আগের মত পারি না ঋষি। তুই, গোকুলদা—অনন্ত—সবাই আছিস।

তুই না এলে জমে না দিলীপ।

তোর কোম্পানি আমার ভাল লাগে ঋষি। ভীষণ ভাল লাগে।

সে তো আমারও লাগে।

একদিন নির্জন মাঠে গিয়ে তোর সঙ্গে আমার কথা হবে ঋষি।

আমার মেয়েলোকের স্পর্শ শুধু ভাল লাগে। পুরুষের স্পর্শ অসহ্য।

এ জিনিস তুই জানিস না। তুই মূর্খ। এ কোন মেয়ে-পুরুষের ব্যাপারই নয়। ও লাইন ছাড়া তুই কিছু ভাবতেই পারিস না! তোর আত্মবিশ্বাসই তোর অভিজ্ঞতা আয়ের পথে প্রধান বাধা। তুই যা পাচ্ছিস—তুই ভাবছিস—তা তোরই পাওয়ার কথা—হওয়ার কথা। এ জিনিসটাই তোকে কিছু হয়ে উঠতে দিল না। নির্জন মাঠে আমি কিছু কথা বলতে চাই তোর সঙ্গে।

কী কথা দিলীপ?

এমনি। একটা কথাই। আমি কোল ইণ্ডিয়ায় যাই না। কোল ইণ্ডিয়া তোর কেমন লাগে?

লাগালাগির কি আছে? একটা অফিসে গেলে যেমন লাগে—ঠিক তেমন লাগে।

দিলীপ কথা বাড়াল না। নিজেকেই মনে মনে বলল, আমি কোনদিনই ঋষিকে বোঝাতে পারব না।

তোর নতুন পোস্ট কেমন লাগছে?

কি আর লাগবে! কয়েকটা টাকা মাইনে বেড়েছে শুধু।

তবু একটা অনার তো। আচ্ছা, হরিদাকে ফিরিয়ে আনতে পারি আমরা?

কেন পারব না। কিন্তু প্রবলেম তো সেই থেকে যাচ্ছে। ফ্রাস্ট্রেশন। ফ্রাস্ট্রেশন। তার দাগ তো জীবন থেকে অন্য লোক মুছে দিতে পারে না।

ফোনটা ধর ঋষি। কে যেন এসেছে দরজায়।

এখন রাখছি ফোন। পরে করিস আবার। দুপুরে অফিসে চলে আয় না। সেদিন অনাথদা তোকে খুঁজছিল।

দেখি। যদি পারি যাব।

কী এত কাজ তোর দিলীপ? শুনলাম, বিতিকিচ্ছিরি দেখতে একটা গাড়িতে চড়ে টং টং করে সারা রাজ্য ঘুরে বেড়াস—

বিতিকিচ্ছিরি নয়। ভাল গাড়ি।

কি গাড়ি?

অস্টিন ট্যুরার। নাইন্টিন টোয়েন্টিএইটের।

ও তো ভিন্টেজ। চলে?

দিব্যি চলে। দরজাটা খুলতে হবে—

ফোন রেখে দরজায় এসে দেখল, গোপাল দাঁড়িয়ে। চেহারায় বেশ চেকনাই দিয়েছে।

আসব স্যার?

স্যার স্যার কোরো না গোপাল, তুমি তো এখন সব জায়গায় গাইছো।

পুরনো অভ্যেস। দেখা করতে এলাম আপনার সঙ্গে—

কি ব্যাপার গোপাল? তালিম নিচ্ছো না আজকাল?

কেউ মন দিয়ে তালিম দেয় না স্যার—

আবার স্যার?

সরি। নিজেই ভোরবেলা দু ঘণ্টা গলা সাধি।

বেশি স্ট্রেইন কোরো না। খবর-টবর কি?

বোম্বে যাচ্ছি। নতুন মিউজিক ডিরেক্টর টাপু পালিত—

হ্যাঁ। টাপুর কি হয়েছে?

চেনেন নাকি স্যার?

খুব চিনি।

তা আপনি একখানা চিঠি লিখে দিন না। আমার চিঠি পেয়ে আমায় ডেকেছেন। ভয়েস টেস্ট নেবেন।

চিঠির দরকার হবে না। টাপু এমনিতে ভাল ছেলে। অল্প দিনে বেশ নামও করেছে।

ইয়ং ডিরেক্টরদের ভেতর রাগাশ্রয়ী সুরের সঙ্গে একমাত্র উনিই পপ মিউজিক ভাল পাঞ্চ করেছেন।

কটা বাজল গোপাল? আমায় যে একটু বেরুতে হবে।

সাড়ে নটা।

ওরে বাবা! এয়ারপোর্টে যেতে হবে। এগারোটার ভেতর পৌঁছতে পারব?

খুব পারবেন।

তাহলে তুমিও বোস। তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাব। কোন্‌দিকে যাবে এখন গোপাল?

আমি উল্টোদিকে যাব। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোর ওখানে—চিন্ময় লাহিড়ীর ওখানে যাব।

তাহলে এসো।

ইণ্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের ট্রানজিট লাউঞ্জের মুখে মহিলাকে দেখেই চিনল দিলীপ। আপনি শেফালী?

ইয়েস।

আমি মিস্টার ঘোষের পুরানো ড্রাইভার। কালু ঘোষের শেখানো কথা গড় গড় করে বলে গেল দিলীপ। কোম্পানি থেকে আপনার জন্যে আমায় পাঠিয়ে দিল।

অটোমোবিল ইণ্ডিয়া ?

হ্যাঁ।

বাবার গাড়ি চালাতেন আপনি ? তাহলে বাবার মৃত্যুর সময় আপনি ছিলেন ?

সেদিনই আমি কাজে আসিনি। সাহেব নিজে গাড়ি চালাচ্ছিলেন কলকাতার বাইরে—

অ্যাকচুয়েলি কোন্ জায়গাটায় ঘটেছিল সব—

সুবুদ্ধিপুরের কাছে। ওঁর একটা বাড়ি আছে ওদিকে। আপনাদের সবার ছবি আছে ঘরে ঘরে। সেই ছবি দেখেই তো চিনলাম আপনাকে।

শেফালী চোখ তুলে তাকাল। সে বাড়িটা কেমন ? গিয়ে থাকা যায় ?

খুব থাকা যায়। সাহেব যে আপনার কথা কত বলতেন।

ট্রাউজারের ওপর ভ্যালিস ধরনের ঢোলা ব্লাউজ। হাতের ব্যাগে তিন টুকরো কাগজে ইংরিজিতে লেখা—কুইবেক, লণ্ডন, বোম্বে—

এয়ারপোর্টের বাইরে এসে গাড়ি দেখে তো শেফালী প্রায় চিৎকার করে উঠল। বছর বত্রিশ-তেত্রিশ বয়স হবে। বিয়ে হয়েছে কিনা বুঝতে পারছিল না দিলীপ। খুব নরম করে বলল, ঘোষ সাহেব এ গাড়িতেই চড়তেন। কোম্পানি থেকে মেনটেনান্স হতো। বড় আদরের গাড়ি ছিল সাহেবের।

শেফালী চোখের কালো চশমা খুলে ভাল করে তাকাল গাড়িটার দিকে। চলো।

আপনি সামনে বসুন। ব্যাগটা দিন—পেছনে রাখছি।

ভি আই পি দিয়ে কলকাতায় ঢুকে দিলীপ তাকাল শেফালীর দিকে। ভাবখানা—কেমন কিনা। বলেছিলাম না ! এ-গাড়ি সাহেবের আদরের গাড়ি।

শেফালী বলল, ভালই চলে দেখছি। বাবা এই ভিণ্টেজ কারে চড়তেন ?

হ্যাঁ। খুব ভালবাসতেন গাড়িটাকে। আপনি আসবেন বলে অন্য গাড়িও তো পাঠানো যেত। অনেক ভেবে-চিন্তেই এ-গাড়ি পাঠিয়েছে কোম্পানি। সাহেবের স্মৃতি—

শেফালী বলল, কতদিন পরে কলকাতায় এলাম। রাস্তাঘাট অনেক পাল্টে গেছে।

আপনি কোথায় উঠবেন ?

আজকের দিনটা পার্ক হোটেলে তো আছি। কাল সারাদিন কোর্টে যাবে। তোমার নাম কি ?

আমি দিলীপ।

আচ্ছা দিলীপ—বাবার সেই সুবুদ্ধিপুরের বাড়িতে একবার যাওয়া যায় ?

একশোবার যাওয়া যায়। সবই তো আপনার সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা আছে।

আচ্ছা দিলীপ, খদ্দের পাওয়া যাবে রাতারাতি ?

নিজের অত ভাল সম্পত্তি কেন তাড়াহুড়ো কবে বেচতে যাবেন। আপনার একদিন বিয়ে হবে। মা হবেন। ছেলেমেয়েরা ছুটির দিনে দাদুর বাগানে বেড়াতে যাবে—

শেফালী কড়া করে তাকাল।

দিলীপ চোখ নামিয়ে নিজের ঠোঁট একদম সেলাই করে ফেলল। আজ যেন অস্টিন ট্যুরারটা বেশি ভাল চলছে। একবারও স্টার্টিং ট্রাবল হয়নি।

কালু ঘোষের বুদ্ধিমত দিলীপ গাড়িটা ডালহৌসি দিয়ে নিয়ে গিয়ে রেড রোডে পড়ল। শীতকালের দুপুরবেলা। ময়দানের ওপারে পর পর সব মাল্টিস্টোরিডের আকাশছোঁয়া বাড়ি। পাতাল রেলের ক্রেন। মাসিভ ভিক্টোরিয়া।

শেফালী বলেই ফেলল, এদিকটা তো চেনাই যায় না। এখানে কলকাতার ল্যাণ্ডস্কেপ একদম অন্য রকম।

দিলীপ এখন ড্রাইভার। তাই এমন ভাল ভাল সাবজেক্ট নিয়ে শেফালী কথা বললেও দিলীপ তাতে জয়েন করল না।

বাবা নিজেই গাড়ি চালাতেন ?

সব সময় নয়।

তুমি কত বছর আছ ?

তা দশ বছর হয়ে গেল !

ব্যাপারটা ঠিক কি হয়েছিল ?

দিলীপ বোকাসোকা সাজার পথটাই বেছে নিল। লোকের মনে হিংসা। আর আমাদের সাহেব দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। বুঝতেই পারেননি—ভাবতেই পারেননি—তাঁকে কেউ গুলি করতে পারে।

আচমকা গুলি করে দিল ?

পলিটিক্যাল ব্যাপার-স্যাপার ! সব তো আমরা বুঝিও না।

দিলীপ চুপ করে থাকল। শেফালীও। অস্টিন ট্যুরারের ইঞ্জিন নিঃশব্দে সব বোঝা কাঁধে নিয়ে অরবিন্দ স্ট্যাচুকে ডাইনে রেখে প্ল্যানেটোরিয়ামের পথ ধরল।

পরদিন বেলা দশটায় সিটি সেসন কোর্টে অস্টিন ট্যুরার এসে থামল—ঠিক বেলা দশটায়। করোনার এলেন সওয়া দশটায়। জজসাহেব আগেই হাজির ছিলেন। কোর্টের ভেতরকার ছাদ অনেক উঁচু। হোটেল আর্কেডিয়ানে কাল

সন্ধ্যেবেলা একখানা শান্তিপুরী শাড়ি কিনেছিল শেফালী। সেখানাই পরে এসেছে আজ। কোর্টের ভেতর মানুষগুলোর মুখ দেখে শেফালীর ভালই লাগল। বেশ ওয়েলমিনিং। কলকাতা বলে একটা জায়গা এক সময় যে তার জীবনে ছিল—সেকথা একদম ভুলে গিয়েছিল। নিজের মনে মনেই বলে ফেলল—ইণ্ডিয়া তো বেশ জায়গা।

তার নিজের বাবার মুখখানা ভাল মনে করতে পারছিল না শেফালী। বালিকা বয়সে মায়ের সঙ্গে সাগরপাড়ি দিয়েছিল। কারগোশিপে। তখন ট্যুরিস্ট ক্লাস এক পিঠের ভাড়া বোম্বে টু লণ্ডন ছিল সাতশ তিরিশ।

দিলীপ বাইরে পার্কিং লটে গাড়ি ব্যাক করে রাখতে যাচ্ছিল। সারা কোর্ট এলাকা জমজমাট।

কালু ঘোষ ব্যাক সিট থেকে বলল, তুমি একবার ভেতরে গেলে পারতে দিলীপ। কোনদিন তো আদালতে যাওনি!

দুনিয়া টহল দিচ্ছে।

যাও না দিলীপ একবার ভেতরে। মেয়েটার চোখে আমার চেহারাই মনে নেই।

আমি ভেতরে যাই—আর কেউ তোমার মেয়ের সামনে দিলীপবাবু বলে ডেকে উঠুক! তাহলেই তো চিত্তির! তোমার কেসও কাঁচিয়ে দিয়ে মেয়ে বিদেশে উড়ে যেতে পারে। তখন?

যাও না ভাই একটু ভেতরে। হাজার হোক মেয়ে তো আমার। সরকারী উকিলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও।

দিলীপ গাড়ি ব্যাক করে স্টার্ট বন্ধ করল। তারপর রাগে রাগে কোর্ট ঘরে ঢুকতে গিয়ে অন্ধ হয়ে গেল। আগেকার বাড়ি। দেওয়ালের অনেকটাই—বিশেষ করে ছাদের কাছাকাছি—ঘষা কাঁচে ঢাকা। নরম সূর্যের ছুঁচলো আলো সেই কাঁচের ভেতর দিয়ে সোজা এসে দিলীপের চোখে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বেলা এগারোটা হতে পারে। সামনেই শেফালী তার দিকে পেছন ফিরে বসে আছে। শেফালীর মুখোমুখি কাঠগড়ায় যে দাঁড়িয়ে সেও সোজাসুজি দিলীপের চোখে এইমাত্র তাকালো।

দিলীপ চোখ বুজে ফেললো। আর সঙ্গে সঙ্গে সে বেরোনোর জন্যে ঘুরে দাঁড়ালো।

বাবা—

দিলীপ টুক করে বড় দরজা পার হয়ে স্ট্যাম্প ভেণ্ডারের কাঠের বাক্সের পাশে সরে গেল। কোথায়! কেউ তো তাকে ডাকেনি। ঘষা কাঁচের ওপারের আলো এপারে এসে তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো। তবু খুব সাবধানে গলাটা বাড়িয়ে

সে ভেতরে তাকালো।

বুক-খোলা শার্ট। চিবুকে এক ছোপ দাড়ি। এবড়ো-খেবড়ো গোঁফ। মাথাটা অনেকদিনের চুলের ভারে ছোট মত। দিলীপ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে একদম পারকিং লটে।

হাঁপাতে হাঁপাতে গিয়ে সে স্টিয়ারিংয়ে বসলো।

ভেতরে ঠিকমত সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছো?

হুঁ।

বসবার জায়গা পেয়েছে শেফালী?

হুঁ।

কি হলো দিলীপ? কথা বলছো না কেন একদম?

আচ্ছা কালুদা—একটা কথা বলবে? তুমি যখন খুন হলে—মানে হচ্ছিলে—তখন একদম সামনে কে ছিলো?

নাম জানবো কি করে! আর ওরা তো আমার মেয়ের চেয়েও অনেক ছোট। ছেলেমানুষ সব।

নাম জানতে চাইনি। দেখতে কেমন ছিলো?

তখন কি মাথা ঠাণ্ডা রেখে কিছু দেখা যায়—

তবু মনে করে ছাখো তো কালুদা।

সেসব মনে করে আজ আর কি হবে!

তবু ছাখো না। একদম সামনে যে ছিলো। যার হাতে পিস্তল।

রিভলবার হাতে ছোকরার চিবুকে তো একছোপ দাড়ি ছিলো।

দিলীপ আর শুনতে পেলো না। যে বাজ পড়লে শুধু একজনই শুনতে পায়—ঠিক সেরকম একটা শব্দ দিলীপের কানে তালা লাগিয়ে দিলো। তার হাত থেকে ঘামের ভিজে ভাব এই শীতের দুপুরে স্টিয়ারিংয়ের খানিকটা স্লিপারি করে ফেললো।

কালু তখনো একা একা বলে যাচ্ছিলো—বুক-খোলা শার্ট। একটাও বোতাম নেই। মাথায় অনেক কালের চুলের ভার—

চুপ করো রাসকেল—

ভড়কে থেমে গেল কালু ঘোষ। খানিকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলো না। আশপাশের ভাজাওয়ালা, মুচি, পানওয়ালী মুখ তুলে একবার তাকালো। কিরে বাবা! পাগল হয়ে গেলো নাকি। একা একা ধমকাচ্ছে—

ভাজাওয়ালা নরম গলায় বসে বসেই জানতে চাইলো, কাকে বকছেন বাবা?

দিলীপ কোন জবাব দিলো না।

কালু ঘোষ তো-তো করে বলল, তোমার কি শরীর খারাপ দিলীপ ?

দিলীপ কথা না বলে আচমকা নিজের মাথাটা ঘাড়ভাঙা পাখির চেয়েও তাড়াতাড়ি ভাঁজ করে স্টিয়ারিংয়ে ঠুকে ফেললো।

ওকি ? কাঁদছো কেন দিলীপ ? কি হলো ?

দিলীপ কোন জবাব দিতে পারলো না। ভরা দুপুরে আদালতপাড়া। উকিল, হাকিম, হেকিম, ফকির—সবরকম জিনিস দিয়ে সাজানো জায়গাটা গমগম করছিলো। তার ভেতর দিলীপ একা একা তার নিজের কপালটা স্টিয়ারিংয়ে ঠুকে যাচ্ছিলো।

কী হলো দিলীপ ? ওরকম করছো কেন ? কী কষ্ট হচ্ছে তোমার ? আমায় বলো।

দিলীপ কোন কথা বললো না। শুধু একবার মুখ তুলে তাকালো। তারপর খুব পরিষ্কার গলায় বললো, তোমার ঠিক মনে আছে কালুদা ?

কি ?

বুক-খোলা শার্ট। একটাও বোতাম নেই—

কার ?

চিবুকে একছোপ দাড়ি—

হ্যাঁ। এটা আমি ভুলতে পারিনি। বেঁচে থাকতে এই আমার শেষ স্মৃতি। বলতে পারো এই পৃথিবীতে সবচেয়ে শেষে যা দেখেছি। ভুলি কি করে ?

তোমার তো ভুলও হতে পারে কালুদা—

ভুলে যেও না দিলীপ—আমিও একজন মার্কসম্যান ছিলাম। ঘোড়া টেপার আগে স্যুটাররা যা একবার দেখে কখনো তা ভুলতে পারে না।

ছোকরার বয়স ছিলো কেমন ?

খুব কম বয়স। কচি মুখ একদম। পিস্তলটা এমন করেই ধরেছিলো—কব্জির হাড় জেগে উঠেছিলো। হয়তো প্রথমবার। আমিই হয়তো প্রথম টারগেট। হয়তো হাত কাঁপছিলো।

তুমি বাধা দাওনি কেন ?

আমি তো বুঝতেই পারিনি দিলীপ। ওই বয়সের ছেলেছোকরাদের নিয়ে তো আমি স্যুটিং ক্লাবে মাতামাতি করে বেড়াতাম। ভাবতেই পারিনি—একদম আনরেডি অবস্থায় স্টিয়ারিংয়ে বসে সঙ্গে আরেকজন—সেও খতম হলো আমার সঙ্গে। শুধু শুধু! একদম শুধু শুধু!

দিলীপকে একদম চুপচাপ দেখে কালু ঘোষ বললো, হঠাৎ এসব জানতে

চাইছো কেন? আজকের এই মামলা দেখে?

তবুও দিলীপ কোন কথা বললো না।

খানিক চুপচাপ থেকে কালু ঘোষ বললো, সরকারী উকিল এ মামলা দাঁড় করাতে পারবে না।

কেন? কেন কালুদা?

আমি জানি দিলীপ। এ মামলা টিঁকবে না। জিনিসপত্তরগুলো তো অন্য জায়গায়।

কি জিনিস কালুদা?

কী দিয়ে ভাত খাও ভাই! ভোজালি, রড, পায়ের স্যাণ্ডেল—সে সব তো কিছুই পায়নি পুলিস।

তাহলে কাঠগড়ায় তুললো কি করে?

দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে। সিওর হয়ে গেলে তো এ কেস কোর্টেই উঠতো না, কবে গুলি করে খুলি উড়িয়ে দিতো।

তুমি এত সব জানলে কি করে কালুদা?

আমি তো ঘুরে বেড়াতাম। বারাসত। ঠাকুরপুকুর। শীল ঠাকুরবাড়ির মাঠ। শিবপুর। কত দেখেছি। যাঃ! পালা—বলে ছেড়ে দিয়ে পেছন থেকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক গুলি।

পায়ের স্যাণ্ডেল কোথায় কালুদা?

সে এখন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কেউ জানবে না।

দিলীপ স্টিয়ারিংয়ে বসেই দেখলো, বুক-খোলা—একটা বোতাম নেই শার্টের, চিবুকে একছোপ দাড়ি—মাথায় অনেক কালের চুলের ভার—মুখখানা ছোট মত—এক ছোকরাকে পুলিস কাসটোডির লোকজন ছোট ভ্যানে নিয়ে তুলছে।

দিলীপ মুখ ফিরিয়ে জি. পি. ও. বাড়ির ডোমটা দেখতে লাগলো। শেফালী এসে বসলো বেলা স-তিনটেয়। সামনের সিটে। বসেই বললো, এখুনি হোটেলে যাবো না। কোথাও ঘোরা যাক—

বেশ তো। সাহেবকে নিয়েও তো ঘুরতাম। এতদিন পরে কলকাতায় এলেন।

দিলীপ পাকা ড্রাইভারের কায়দায় ডালহৌসি পার হয়ে গেল।

আচ্ছা, এত কমবয়সী ছেলেরা সব খুন করেছে?

দিলীপ রাস্তার মাঝখানে ঘচ করে ব্রেক কষলো। ব্রেক স্থ বোধহয় গেল।

কি বলছেন?

এতটুকু ছেলেরা সব খুনী?

কাদের কথা বলছেন ?

এই যে রবি না কি নাম—ভুলে গেলাম ছাই—

শেফালীর কথা শেষ হওয়ার আগেই দিলীপ এক দমকায় গাড়ির স্পীড তুললো অন্তত ষাটে। প্রায় ঝাঁকুনি দিয়ে অস্টিন ট্যুরারটা রওনা হলো।

ফাঁকা রাস্তা সেই আকাশবাণীর সামনে। ম্যান অব ওয়ার জেটির কাছে এসে গাড়ি একদম থামিয়ে ফেললো দিলীপ!

ওরকম জোরে চালালে কেন ?

আপনি খুনীর কথা বললেন তো। অনেক রকমের খুনী আছে।

শেফালীর মন্দ লাগছিল না এই ড্রাইভারকে। ভদ্রলোক ক্লাসের চেহারা। কুইবেকে এক পিয়ানো টিচারের ঠিক এরকম চেহারা। শেফালী প্রশ্রয়ের ভঙ্গীতে দিলীপকে বললো, কত রকমের খুনী ?

এই ধরুন একদম চুপচাপ থেকেও খুন করা যায়।

যেমন ?

সাহেবের গাড়ি চালাবার আগে এক জায়গায় ছিলাম। সাত বছর। তা সেখানকার ফোরম্যান তো আমার দিকে তাকালোই না সাত বছরে। তার ইচ্ছে ছিলো—একই জায়গায় আরও সাত বছর আমি বসে বসে পচি। এটাও এক-রকমের খুন নয় ?

তা তো বটেই।

তারপর ধরুন সেখানে যদি আপনার একটা বন্ধু থাকে—বন্ধুটাকে শুধু যদি টেবিল পালটে পালটে ওপরে তোলে ফোরম্যান—লেদ থেকে ভাইসে—এভাবে ফোরম্যানের অ্যাসিস্ট্যান্ট করে তোলে—তাহলে সেটাও কি একরকমের খুন নয় ?

এখানে কে খুন হচ্ছে ?

দুজনই। আপনি। আপনার বন্ধুও। অবিশ্যি বন্ধু কিছুই টের পাচ্ছে না।

তুমি শুধু ড্রাইভার নও। তুমি দেখছি আসলে একজন দার্শনিক।

না না। ওকথা বলবেন না দিদি। আমি আপনার বাবা ঘোষ সাহেবের খেয়ে মানুষ।

বাবা তোমায় খুব ভালবাসতো!

আপনাদেরও বাসতেন। কাল তো যাচ্ছেন সুবুদ্ধিপুরে। আপনার ছোট-বেলার ছবি দেখবেন। চিনতে পারবেন না।

মায়ের ছবি আছে ?

অনেক।

পরদিন সকাল সকাল বেসমেণ্ট থেকে অস্টিন ট্যুরার বের করার সময় দিলীপ আস্তে বললো, খানিকক্ষণের জন্যে বেঁচে উঠতে পারো কালুদা ?

কেন ?

তোমার বউ মেয়ে তাহলে বুঝতে পারতো—তুমি আসলে কী ভীষণ ভালোবাসতে তাদের।

কি হবে আর বেঁচে। আমি তো চলেই যেতে চাই।

ওরে বাবাঃ! কার ওপর এত অভিমান ?

কারও ওপর নয়। তবে কাল থেকে তুমি বড় আনমনা হয়ে গাড়ি চালাচ্ছো। এই ব্রেক কষছো। এই স্পিড তুলছো। দিলীপ, তোমার কি হয়েছে ?

কিছু না।

ভুলে যেও না তোমার লাইসেন্স নেই। তোমার পাশে আরেকজন জীবিত মানুষ বসে ছিলো কাল।

অত চিন্তা করতে নেই মেয়ের জন্যে। বুঝলে কালুদা—

সুবুদ্ধিপুরের বাগানে যাবার এক চিলতে পথটার মাথার ওপর পাতা ভর্তি জামরুল ডাল। তার ভেতর দিয়ে নরম রোদের চৌকোগুলো টুপটাপ সুরকির রাস্তার ওপর পড়ে ছিলো। বাতাসে জামরুল ডাল দুলে উঠতেই রোদের চৌকোগুলো জায়গা পাল্টাচ্ছিলো। তারই ভেতর দিয়ে অস্টিন ট্যুরার বাগানের গেটে এসে দাঁড়াতেই গুর্খা সেপাই দুজন চমকে উঠে সেলাম দিলো। তারা অটোমোবিল ইণ্ডিয়ার পুরনো কর্মচারী। কালু ঘোষকে অনেকবার দেখেছে। মামলার সুবিধের জন্যে—নানারকম একজিবিট তৈরি রাখার জন্যে—আগাগোড়া এভিডেনসিয়াল সিচুয়েশনের ওপর কেস ফ্রেম করার জন্যে সরকারী স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল রিকোয়েস্ট করায় অটোমোবিল ইণ্ডিয়া তাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বাগানবাড়িটা পুরোদস্তুর মেনটেন করছে। চেম্বার অব কমার্সগুলো একসঙ্গে সরকারের ওপর চাপ দিয়েছে—কালু ঘোষের মত মানুষ খুন হলে ল অ্যাণ্ড অর্ডার আছে কোথায় ? যে করে হোক কালপ্রিটের শাস্তি চাই।

গাড়ি থেকে আগে নেমে গিয়ে দিলীপ সেপাইদের বললো, ঘোষ সাহেবের মেয়ে এসেছে। দরজা খুলে দাও। বাংলোর চাবি কোথায় ?

এক সেপাই দরজা খুললো। মোরাম বিছানো রাস্তার ওপর দিয়ে ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ করে লোহার দরজা খুলে গেল। আরেক সেপাই ধুপধাপ করে ছুটে গেল—বাংলোর দরজা-জানলা খুলে দিতে।

গাড়িতে বাগানের ভেতর ঢুকতে ঢুকতে শেফালী বললো, এসব কবে,

বানালো বাবা ?

আপনি ছোট থাকতে জায়গাটা কিনেছিলেন। পরে সাহেব আস্তে আস্তে গড়ে তোলেন।

গাড়ি থেকে নেমে শেফালী একা একাই বাংলোর বারান্দায় উঠে গেল।

তখন ফাঁকা গাড়িতে কালু ঘোষ বললো, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছো ?

কেন ? আমি কি তোমার কেনা চাকর ?

রাগ করছো কেন ? আমার ওই একটাই মেয়ে মোটে—

তাও যদি তোমার খবর নিতো। সব ব্যবস্থা আছে। খাবারের প্যাকেট ট্রেনে এসে একজন দিয়ে যাবে।

কী দিতে বলেছো ?

এই ভাজাভুজি। শুকনো খাবার। মাছ ধরার ছিপগুলো কোথায় বল তো কালুদা ?

সোজা বাংলোর বারান্দায় উঠে গিয়ে ডাইনে সরু মত একফালি ঢাকা জায়গা পাবে। ওখানে ছিপ আছে, সাঁতার কাটার টিউব আছে। সব পাবে।

দিলীপ বারান্দায় উঠে দেখলো—খোলা ঘরের দরজার মুখোমুখি দেওয়ালে একখানা ছবি। শেফালী মুখ তুলে দেখছে। ফটোতে একজন সুন্দরী মহিলা—তার কোলে বছর আড়াইয়ের একটি ফুটফুটে মেয়ে।

দিলীপের মনে হলো—ইস ! এ সিন যদি কালুদা দেখতে পেতো ! দিলীপ খানিক দাঁড়িয়ে ফটোর মহিলাকে দেখলো। বেশ বড় করে বাঁধানো। এই মহিলার সঙ্গেই কালুদার ডিভোর্স হয়ে যায়। সে কোন্ আদিকালে—

একজোড়া ছিপ নিয়ে হাত ছয়েকের তফাতে দুটো ফাৎনা পাতলো দিলীপ। বেশ বড় পুকুর। বাঁধানো ঘাট। পাশেই জামগাছ। তার ছায়ায়। কাঁটাতার আর ঘন করে বসানো রাংচিতের বেড়া দিয়ে ঘেরা বাগান। অন্তত বিশ-পঁচিশ বিঘের। কিছু পাখি আসে। শীতের বেলা। ভীষণ নির্জন। সব গাছের নিচেই শুকনো পাতার ডাঁই। মাটি খুঁড়ে একটা মোটা কেঁচো জোগাড় করতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না দিলীপের। সেটাই দু টুকরোয় টোপ করে জোড়া ছিপের ফাৎনা ভাসালো দিলীপ।

ছাব্বিশ

কালু ঘোষ রেগে উঠলো। এ কি করেছো দিলীপ! এখানেও একজোড়া ছিপ বসিয়েছো? এ কি তোমার জি. টি. রোডের ধাওয়া! শেফালী তো দেখলে চমকে যাবে। সন্দেহ করবে তোমাকে।

এখন তো তুমি মাছ ধরতে বোসো। ওই ছ্যাখো ঠোক্‌রাচ্ছে—

না না। এ একদম ভালো করোনি। লোক একজন। ছিপ দুটো। দেখলেই কি মনে করবে?

অত ভাবছো কেন কালুদা? বলবো, আপনার জন্যে পেতে রেখেছি। শুনলে চাই কি খুশি হতে পারে। এত বড় বাগান। কে তোমার এই ফাঁকা সৌন্দর্য সামলাতে আসবে! তার চেয়ে মাছ ধরতে বসিয়ে দিলে ভালো হবে না?

আইডিয়াটা ভালো।

নাও। তুমি এখন ছিপ ধরে বসে যাও তো। মাছ আছে?

অনেক মাছ আছে। ফি বছর ছাড়া হতো। ধরা হয়নি তো বিশেষ।

দুজন পাশাপাশি বসে। একজনকে দেখা যায়। অন্যজন অদৃশ্য। তার কথা শুধু দিলীপ শুনতে পায়। এবার সত্যি সত্যি কালু ঘোষের ফাৎনা ডুবে গেল। দিলীপ বসে ছিলো। ছুটে গিয়ে ছিপে টান দিলো। মৃগেল হবে। তার আগেই কেঁচোটুকু খেয়ে নেমে গেছে। টান দেবে তো কালুদা—।

আমার এখন আর ওসব আসে না।

ভালো মাছ আছে তোমার পুকুরে। বলতে বলতে দিলীপ কালু ঘোষের জন্যে পাতা ছিপের বঁড়শি তুলে আবার তাতে কেঁচো গেঁথে দিলো। দিয়ে ফাৎনা ভাসাল। বেশ দামী ছিপ। নাইলন সুতো।

নিজের ছিপে বসলো দিলীপ। পুকুরের ওপারটায় ঘন কচুবন। গাবগাছ। তার পেছনেই ধানক্ষেত। জায়গাটা লোকালয়ের শেষ প্রান্তে।

কালু ঘোষ আপনা-আপনি বললো, পূর্ণিমা রাতে এখানে টিয়ার ঝাঁক নামে। আশপাশে তখন পাকা ধান। এই ঠিক লক্ষ্মী পূজোর পরেপর—

তোমার তো সব খেয়াল থাকে।

এখন তো অনেক আগের কথা সব মনে পড়ে। সেবারে শেফালীর মা সব পাট চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার পরের বছর ধান করেছি। সখ করে। একদম জানলার নিচেই হলুদ রঙের পাকা ধান। নিষুতি রাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে

তাকিয়ে দেখি—এ কি বিকেলবেলা এখন ? সূর্যখানা নরম হলুদ রঙের। তখনো ডোবেনি। লাইট জেলে হাতঘড়ি দেখে ভুল ভাঙলো। রাত.স-তিনটে। আকাশে চাঁদখানা তখন প্রমাণ সাইজের থালা।

কালুদা, আবার তোমার টোপ খেয়ে গেল ! সামলাও—

দিলীপ একটা কাতলা তুললো। দেড় কিলোর মত। সেটাকে আছাড় মেরে ধুলো মাখালো। বঁড়শী টেনে খুলতে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে ধুলোর সঙ্গে মাখামাখি। দুপুর বেলার শীতে রোদের আরাম। তার ভেতর মাছটা মরে গেল। চোখের মণিতেও ধুলো। শুকনো পাতার ভেতর শুয়ে।

খাবার এলো না তো এখনো ! শেফালী খাবে কি দিলীপ !

এসে যাবে এখুনি। বলে দিলীপ নিজের ছিপ বসালো। তারপর কালু ঘোষের বঁড়শীতে আবার টোপ দিয়ে ছিপ পেতে দিলো। এবার কিন্তু ঠোকরালে টান দিতেই হবে তোমাকে। ঠিক সময়মত। তুমি ইচ্ছে করলেই পারো কালুদা। তোমার ডিরেকশনে আমি কেমন গাড়ি চালাতে শিখে গেলাম।

এবার একটা লাইসেন্স করো দিলীপ। আচ্ছা এই যে লোকে ভালোবাসা ব'লে একটা জিনিসের কথা বলে প্রায়ই। জিনিসটা কী ? তোমার কোন আইডিয়া আছে ?

ওসব কচকচানি পরে শুনবো। এখন তো মাছ ধরি।

আমার মনে হয় দিলীপ—কাছাকাছি থাকার ইচ্ছেটাই আসলে ভালোবাসা।

মাছ ধরো তো মন দিয়ে—। ওই তো খাবার এসে গেছে। পাকা লোক। ঠিক বাংলো বাড়িতে গিয়ে প্যাকেট রাখলো।

কালু ঘোষ বললো, ভালোবাসা মানে দখল। আঁকড়ে ধরে অধিকার রাখা। এর ফলে কেউ সুখী হয়। আবার অনেকে দম ফেলতে পারে না। নিঃশ্বাস আটকে আসে অনেকের। তারা সংসার করে না।

তাহলে মেশামেশি কী জিনিস কালুদা ?

ভালোবাসার ঠিক আগে বা পরের একটা কণ্ডিশন। তখন মানুষ বুকের ভেতরের গন্ধ পেতে শুরু করে।

আমি যে তোমার সঙ্গে মিশি—তার গন্ধ পাও কালুদা ? আমার বুকের ভেতরকার—

তোমার কথাতেই সে-গন্ধ ছড়ানো থাকে দিলীপ।

তাহলে বন্ধুত্ব কি জিনিস কালুদা ? কাকে আমরা বন্ধুত্ব বলবো ?

কাউকে না দেখলে যদি কষ্ট হয়—তবে সেই কষ্টের নাম বন্ধুত্ব। তার মুখখানা

দেখার ইচ্ছে হলে—এই ইচ্ছের অন্য নাম বন্ধুত্ব।

তুমি ছিলে তো কালুদা অটোমোবিল ইণ্ডিয়ায়। এত সব জানলে কোত্থেকে?

সব জানতাম না। এখন একদম উবে গিয়ে সব পরিষ্কার দেখতে পাই। জলের মত।

আসলে তুমি একজন সৌভাগ্যবান মানুষ কালুদা। কটা লোক অমন একটা বড় কোম্পানির কর্তা হয়? এই সৌভাগ্যের মানে কি?

তোমার ফাৎনা ডুবে গেল দিলীপ—

যাগ্‌গিয়ে। এই সৌভাগ্যের পেছনে কি আছে কালুদা?

আমার পরিশ্রম, আমার মাথার ঘিলু, আমার দূরদৃষ্টি।

হলো না কালুদা। একদম ভুল। এভরি ফরচুন হ্যাজ এ সিন বিহাইণ্ড।

কালু ঘোষ একদম চুপ করে গেল। দিলীপ বঁড়শি তুলে দেখলো—টোপ আর নেই। কালু ঘোষের ছিপেও সেই দশা। দিলীপ পাকা মাছ মারার স্টাইলে ছায়া দেখে এক জায়গার মাটি খুবলে তুলে ফেললো। মোটা মত দুই কেঁচো দিলীপের হাতে পড়ে পাঁচ-সাতবারের টোপের টুকরো হয়ে গেল।

দিলীপ, সৌভাগ্য আর পাপ খুব কাছাকাছি—একথা তোমায় কে বললো?

কেন. বাণী বাণী লাগছে?

আমি তো কোন রিলেসন খুঁজে পাচ্ছি না।

মনে মনে আর একটু চেষ্টা করো কালুদা। ঠিক পাবে। আমি যে কোন বড বাড়ি দেখলেই চোখ বুজে ফেলি। তখুনি একখানা তামার থালা আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তাতে গাঢ় নীল দাগ। কেমন পাপ পাপ। সেই থেকে বসেছি। একটাও তো মাছ ধরতে পারিনি!

শেফালী এতক্ষণ নিশ্চয় ওর ছোটবেলার ছবি দেখছে দেওয়ালে। ওর মায়ের ছবি। আমার যৌবনের ফটো।

দিলীপ কোন জবাব না দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভালো জায়গায় তার ফাৎনাটা ফেলছিলো। ওদিকে কালু ঘোষের ফাৎনায় কাঁপুনি। কোন বুদ্ধিমান মাছ বঁড়শি যাচাই করে জলের নিচে কেঁচোর শরীরের টুকরোটা ঠুকরে দেখছে।

এই যে, এখানে বসে মাছ ধরছো! আমার একার জন্যে এত খাবার কেন?

অনেকটা পথ কলকাতা থেকে এলেন তো।

তাই বলে অতগুলো? তোমার জন্যে রেখে দিয়েছি। খেয়ে নিও।

একটা চেয়ার এনে দি?

নাঃ। এই তো আমি ঘাটের বেঞ্চে বসেছি। ও কি! তুমি দুখানা ছিপ

নিয়ে বসেছো ?

একখানা আপনার জন্যে পেতে রেখেছি। যদি মাছ ধরতে ইচ্ছে হয় আপনার—

মাছ আছে ?

ওই তো একটা ধরেছি।

শেফালী মাছটাকে দেখলো মন দিয়ে। কাতলা। বাবা এত সব দিয়ে কি করতেন ?

শখ সাহেবের। কখনো মাছ ছাড়ছেন। কখনো ধরছেন। কখনো ধ্যান লাগাচ্ছেন।

শেফালী চুপ করে থাকলো। কালু ঘোষ শেফালী আসতেই একদম চুপ করে গেছে। ফাৎনাটা ডুবে যেতেই দিলীপ টান দিলো। সাবধানে। কোন বড় মাছ হবে। বেশ ভারি। শেফালী তার আগ্রহ লুকোতে পারেনি। সোজা হয়ে বসলো।

কালু ঘোষ বললো, সাবধানে টেনো। এ নিশ্চয় তিন চার কেজির মাছ হবে।

শুনতে পেলো শুধু দিলীপ। তবু তার জবাব দেওয়ার উপায় নেই। এখন যদি শূন্য একটা জায়গার দিকে তাকিয়ে দিলীপ কথা বলে যায়—তাহলে শেফালী ভয় পেয়ে ভাবতে পারে—বাবার ড্রাইভারটি আসলে পাগল। খট্‌খটে দিনের বেলাতেই নিশি পাওয়া লোকের অবস্থা।

মাছের বদলে ডাঙায় উঠে এলো—এক পাটি স্যাণ্ডেল। চামড়ার। ভিজে ভারি। কাদা মাখানো। রং গলে গিয়ে চামড়া রংয়ের। মাছ হয়তো গেঁথেছিলো। পালাতে গিয়ে ওই স্যাণ্ডেলের ভেতর গলে যেতেই হয়তো বেঁচে গেছে।

একপাটি স্যাণ্ডেল দেখেই কালু ঘোষ চেঁচিয়ে উঠলো। এ তো সেই স্যাণ্ডেল—

শুনতে পেল শুধু দিলীপ। সে কান খাড়া করে স্যাণ্ডেলের স্ট্র্যাপ থেকে বঁড়শি ছাড়াতে লাগলো। কালু ঘোষ বলে যাচ্ছিলো, ওটাই তো সব চেয়ে বড় এভিডেন্স দিলীপ। তাহলে বুঝেছো এবার ! আমাকে খুন করে আমারই পুকুরঘাটে ওরা পা ধুতে এসেছিলো। এসে একপাটি পুকুরে ফেলে যায়। হয়তো হড়কে গিয়ে জলে পড়েছিলো।

দিলীপ শুনেছিলো, আর বুঝতে পারছিলো, এ স্যাণ্ডেল খুনীর পায়ের নয়। আসলে এ স্যাণ্ডেল খুনীর বাবা পায়ে দিতো। বাবার স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে সেদিন রবি বেরিয়েছিলো। তাই—

তাই আরেক পাটি যে পেয়েছে পুলিস—তাতে পায়ের ছাপের সঙ্গে রবির পায়ের ছাপ মেলেনি। কারণ, ও ছাপ তো দিলীপের। সেদিনই হয়তো ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আমার স্যাণ্ডেলটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এসেছিলো।

ও দিলীপ, স্যাণ্ডেলটা নিয়ে চলো কলকাতায়—। সরকারী উকিলের হাতে দিয়ে বলতে হবে—এগজিবিট তালিকায় এটাও দিতে হবে স্যার—

দিলীপ বলতে যাচ্ছিলো, মরে গিয়েও সাধ মেটেনি। ওসব করলে কি আবার বেঁচে উঠবে? তা তো নয়। তাহলে?

কিন্তু এসব না বলে দিলীপ চুপ করেই থাকলো। তারপর বঁড়শি ছাড়িয়ে ভিজে ঢোল স্যাণ্ডেল পাটিটা যত জোরে পারলো ছুঁড়ে মারলো। ভিজে বেশ ভারি। ওপারে গিয়ে কচুবনে পড়বে কি! পুকুরের মাঝামাঝিও পৌঁছতে পারলো না। গুপুস্ করে ডুবে গেল।

এ কি করলে দিলীপ?

কালুর গলা ফাঁকা শীতের দুপুরে সারা বাগানটাকে দু টুকরো করে ফেললো। জলে ডোবা মানুষও অমন করে শেষবারের মত ভাসতে চায় না। কিংবা পারে না। কালু ঘোষের গলার স্বরের সঙ্গে সঙ্গে সারাটা বাগান একরকমের আক্ষেপে ভরে গেল। একটা বুড়ো গলা সর্বক্ষণের জন্যে বলে যাচ্ছিলো—আ-হা-রে—আ-হা-রে—

তবে এসব শুধু দিলীপই বুঝতে পারছিলো। সে কালুকে নিরস্ত্র করতে তার ছিপে শেফালীকে বসিয়ে দিলো। টোপ গেঁথে দিয়েছি—হাত ঘুরিয়ে ফেলুন। এই তো ফেলেছেন।

আমার মাছ ধরা অভ্যেস আছে। তুমি বরং খাবারটা খেয়ে এসো, ঢাকা আছে। আর পড়ে থাকলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

অগত্যা—

বাংলোবাড়ির বারান্দায় বসে প্যাকেটের ভাজা মাংস চিবোতে চিবোতে দিলীপ দেখতে পেলো—পুকুর পাড়ে শেফালীকে পিছন থেকে সাদা কাপড়ের মত একটা ঢোলা ফোলা জিনিস ঢেকে ফেলছে। তাতে শেফালীর কিছুই হয়নি। সে দিব্যি মন দিয়ে ছিপ তুলে অন্য জায়গায় ফাৎনা ফেলছে।

দিলীপের মুখ দিয়ে নির্জন বারান্দায় বেরিয়ে এলো, রবি তাহলে পুলিস কাসটোডিতে—

সন্ধ্যেবেলা দিলীপ শেফালীকে তার পাশে বসিয়ে পার্ক হোটেলে ছেড়ে দিয়ে এলো। পেছেনের সিটে বসে কালু ঘোষ একটা কথাও বললো না।

ফেরার পথে কালু ঘোষ বললো, শেফালী তো কালই চলে যাবে। কে পৌঁছে দেবে এয়ারপোর্টে ?

তোমায় ভাবতে হবে না। রাত তিনটে দশে ফ্লাইট। ওদেরই গাড়ি এসে নিয়ে যাবে—

অ।

ড্রাইভার সেজে থাকা বড় কঠিন কাজ। কটা দিন বড় ধকল গেল কালুদা—

হুঁ।

কথা বলছো না কেন ?

এমনি।

জলে থাকতে থাকতে পচে যাওয়া স্যাণ্ডেল সেসনসে কোন এগজিবিট হতেই পারে না। আদালতে যা জমা দেবার তা একবারই দিতে হয়।

তবু তো ওটা একটা ভাইটাল প্রমাণ।

প্রমাণ করে এখন কি হবে তোমার ? ফের কি বেঁচে উঠবে ?

তা উঠছি নে আর। কিন্তু তাই বলে কি চেষ্টা একটা করবো না ?

অন্যদেরও একটু বাঁচতে দাও না কালুদা। যে কটা দিন ছিলে খারাপ তো বাঁচোনি। এখন আর যারা আছে তারাও একটু একটু বাঁচুক।

কালু ঘোষ আর কোন কথা বললো না। বেসমেণ্টে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়ে অন্য-দিনের মত দিলীপ লিফটে উঠবে বলে এগোবার মুখে বললো, গুড্ নাইট। হাতে সেই কাতলা মাছটা।

কালু পাল্টা গুড্ নাইট বলতে পারলো না। তার চোখের সামনে তখন আরেকটা জিনিস হচ্ছিলো। পরিষ্কার গিলে করা পাঞ্জাবি গায়ে এক দশাসই জোয়ান দিলীপের পার্ক করানো অ্যামবাসাডর থেকে বেরিয়ে এলো। সরু পাজামা। সোজা দাঁড়িয়ে পেছন থেকে দিলীপের আন্দাজ নিচ্ছিলো লোকটা। মতলব কি ?

আলো-জ্বলা লিফ্ট নেমে আসতেই দরবারীলাল অন্ধকারে সরে গেল। সে খবর করতে করতে সন্ধ্যে নাগাদ এই বেসমেণ্টে এসে ঢুকেছে। তার মামলার ফাইলগুলো যে কোথায়—তার এখনো কোন হদিশ পায়নি।

দিলীপ ওপরে উঠে যেতেই দরবারীলাল বন্ধ অ্যামবাসাডরের দু ধারের দরজা খুলে ফেললো। তারপর ভেতরের আলোটা জ্বেলে সিটগুলো তুলে ফেললো। কোথায় যে রাখতে পারে ফাইলগুলো। খবর যা—তা হলো—ওই লাফাঙ্গা ছোকরাদের দাদা গোছের লোক এই মানুষটা। সাত পুরনো গাড়ি দাবড়ে ঘুরে বেড়ায়। হয়তো এর কাছেই ফাইলগুলো জমা রেখেছে। কত দরকারী মামলার

ফাইল। কেন যে ওগুলোর ওপর নজর পড়লো ছোকরাদের।

কালু ঘোষ কোন বাধা দিতে পারলো না। দরবারীলাল এগিয়ে এসে অস্টিন ট্যুরারের সিট তুলে ফেললে। সামনে। পেছনে। নাঃ! কোথাও সে ফাইল নেই।

অনেকদিন হয়ে গেল অফিসে যায় না দিলীপ। তা মাস দুই তো হবেই। পাড়ার ডাক্তারটি সময়ে সময়ে সার্টিফিকেট সাপ্লাই করে দিলীপকে অফিসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে আসছিলো। মাস মাইনে আসছিলো অফিস থেকে রেজিস্ট্রি চেকে।

এবার চেকের বদলে এলো চিঠি। লিভ পোজিশন জানিয়ে এস্ট্যাবলিশমেণ্টের চিঠি। আর ছুটি নেই। অনেকদিন পরে দিলীপ অফিসে গিয়ে হাজির।

শীতকালে বৃষ্টি—সে এক বিচ্ছিরি জিনিস। ঘরে ঘরে এয়ারকুলার এখন প্রায় গত জন্মের স্মৃতি। আচমকা থর থর করে কেঁপে উঠে কোন শব্দ করে না।

দিলীপ দেখলো, তার বসবার জায়গাটায় কোন টেবিল নেই। সেখানে এখন বেয়ারাদের টুল। কাঠের পার্টিশনে অনেক নতুন নতুন কিউবিকেল হয়েছে। দিলীপ দেখলো—তার টেবিলটা বাইরের জানলা ছুটো বাদ দিয়ে কোণে বসানো হয়েছে।

অনেকেই অবাক হচ্ছিলো। এ কি চেহারা হয়েছে আপনার? কেউ বা বললো, কোথায় ছিলেন এতদিন? একজন শুধু বললো, আপনার ছেলের জন্যে উকিল দিয়েছেন?

দিলীপ বুঝলো, কোর্টকেস তাহলে কাগজে উঠছে। নইলে বুঝবে কি করে—আমারই ছেলে। আস্তে বললো, নাঃ! দেওয়া হয়নি। দিয়ে আর হবেই বা কি?

ইণ্টারকমে দিলীপের টেবিলের ফোনটা বেজে উঠলো। হ্যালো—

দিলীপ এসেছো শুনলাম। একবার দেখা করবে আমার সঙ্গে—

এখন? আসবো অনাথদা?

না। ঘণ্টা দেড়েক বাদে এসো।

আজ কিন্তু আমি সই করিনি। এখনো আমি ছুটিতে—

একটু দেখা করে যেও।

এই দেখা করতে যাওয়াটা গোলমেলে হয়ে দাঁড়ালো। ঋষি ওদের ঘর অনাথ চক্কোত্তির ঘরের মুখোমুখি। সময়মত গিয়ে দেখলো অনাথ বেরিয়েছে কোথায়। ফেরেনি তখনো। ঋষি কাজ করতে করতে কথা বলছিলো দিলীপের সঙ্গে।

দিলাপ বলছিলো, চল্ না—তুই আর আমি স্যার লেজলির ফার্টিলাইজারে চলে যাই। তিনটি বছর একসঙ্গে খাটবো দুজন—তখন দেখা যাবে—আমি একজন মিলিওনিয়ার। তুইও একজন মিলিওনিয়ার। আর আমাদের নবমাল হওয়ার উপায় নেই!

তুই বুঝি মিলিওনিয়ার হওয়া ছাড়া কিছু বুঝিস না দিলীপ—

মিলিওনিয়ার ব্যাপারটা বড নয়। কিছু একটা বড করে গডে তুলতে চাই—

সব সময় বড কেন? ছোট কিছু ভাবতে পারিস না—

দিলীপ কোন কথা বললো না। সে পরিষ্কার বুঝতে পারছিলো—যদিও সে অনেকদিন এখানে কাজ করে আসছে—তবু সে আসলে এখানে একজন বাইরের লোক। কোল ইণ্ডিয়া এখন তার কাছে একদম বাইরের একটা অফিস মাত্র। সেই বাইরের অফিসে ঋষি এখন একজন ভেতরের লোক একথা ভেবেই বোধহয় আমি আরও বেশি কষ্ট পাই। কোল ইণ্ডিয়ার ওপর আমার রাগ তাই আরও বাডে। একথা ভেবে দিলীপ দেখলো, দেড ঘণ্টা মত সে বসেই আছে—তবু অনাথ চক্কোত্তির দেখা নেই।

অনাথ যখন এলো—তখন প্রায় চারটে। এই যে দিলীপ—

আমি তো সেই থেকে বসে আছি।

থাকবেই তো বসে।

কথাটা রসিকতা? না, ধমক? কোনোটাই বুঝে উঠতে পারলো না দিলীপ। এখানে যে-বাতাসে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলো—সে বাতাসের প্যান থার্ড ভাজা ভাজা। তাতে বিডিপাতার গন্ধ। এই বাতাস পুলিস কাসটোডিতে বসে রবি নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ও আমাকে দালালীর পয়সায় আরাম করার জন্যে প্রশ্ন করেছিলো।

তা কেন থাকবো? আমি আজ জয়েন করিনি।

এসব কথা রাখো। আমি তোমাকে চিনি। দিল্লিতে পার্লামেণ্টারি কমিটির কাছে কোল ইণ্ডিয়ার কেস ডুবিয়ে এসেছো।

সেজন্যে তো আপনি হুমকি দিয়েছিলেন। বলে একদম মুখোমুখি দিলীপ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো।

অনাথ চক্কোত্তি চটাপট তিন-চারটে চড কষালো দিলীপের গালে। চড খেয়ে দিলীপ বুঝলো, অনাথ স্থির নেই। চডের জন্যে তোলা হাত তার গালে এসে ধপাস করে পডেছে।

দুপুরবেলা জিন খেলে যা হবার তাই হয়েছে অনাথের। দিলীপ আলগোছে অনাথের হাত ধরে সরিয়ে দিলো। এতগুলো লোকের সামনে এখন এমন চড

মারা—দিলীপ নিজের অজান্তেই ক্ষেপে উঠছিলো।

বেয়ারারা ছুটে এসেছে। ঋষি তার চেয়ার সরিয়ে দাঁড়ালো। অনাথ চক্কোত্তি হাতের আঙুল নেড়ে নেড়ে ধমকানোর গলায় বললো, আমি দেখবো—তুমি এখানে থাকো—না, আমি এখানে থাকি।

দিলীপের কানের ভেতর দিয়ে শব্দগুলো দলা পাকানো কাগজের কুণ্ডুলী হয়ে ঘুরছিল। তার একটায় আগুন ধরে গেল। সে পরিষ্কার চেঁচিয়ে বললো, আমি এখান থেকে গেলে বাইরে করে খেতে পারবো। তোমাকে এখান থেকে বের করে দিলে কুকুরেও টেনে দেখবে না।

তুমি তুমি করবে না বলে দিলাম—

কেন? কি বলতে হবে তোমাকে? অনাথবাবু! আপনি!!

ইউ সোয়াইন—

সোয়াইন মানে কি জানো তুমি? এখুনি উইথড্র করো। নয়তো ব্যথা পাবে—

একশোবার বলবো। সোয়াইন। সোয়াইন। সোয়াইন।

দিলীপের ডান হাত একখানা ধারালো কড়োল হয়ে অনাথের গালের দিকে ছুটে গেল।

অনাথ মেঝেতে। কিউবিকেলের কাঁচ ভেঙে গেছে। কোল ইণ্ডিয়ার গিলপ ফ্লোরের প্রায় সবাই চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে

অনাথ মেঝেতে পড়ে ব্যথায় কাঁদছিলো। দিলীপ এগিয়ে গিয়ে তুললো। কোথায় লেগেছে আপনার? করিডরে একগাদা লোক। দিলীপ কারও মুখ আলাদা করে দেখতে পাচ্ছিলো না। তার কাঁধে ভর দিয়ে অনাথ চক্কোত্তি নিজের কিউবিকেলে এলো। তখনো ব্যথায় কাতরাচ্ছিলো।

নিজের ঘরে ঢুকে ইজিচেয়ারে গা ঢেলে দেওয়ার আগে অনাথ চক্কোত্তি চাং করে দিলীপের গালে আরেকটা চড় মারলো।

দিলীপ হেসে ফেললো, আরেকটা মারুন।

অনাথ হু হু করে কেঁদে উঠলো। ব্যথা করছে। হাড়ের ভেতর। ডান হাতখানা দেখালো অনাথ।

দিলীপ বেরিয়ে গিয়ে এক বেয়ারাকে আয়োডেক্স আনতে দিলো। আয়োডেক্স এলে খানিক হাতে নিয়ে দিলীপ অনাথের শার্টের হাতা গুটিয়ে ওপরে তুললো। গলার টাই খুলে দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিলো। আয়োডেক্স বোলাতেই অনাথ হু হু করে কেঁদে উঠলো। আমি তো তোমায় সোয়াইন মিন করিনি। মুখে এসে গেছে—তাই—

আমি জানি অনাথদা। দোষ আমারই—

আবার কেঁদে উঠলো অনাথ চক্কোত্তি। হু হু করে। হাতের ভেতর ভয়ংকর যন্ত্রণা হচ্ছে—

আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন। বলে দিলীপ বেরিয়ে এলো। উল্টোদিকের ঘেরা ঘরের দরজা খোলা। ঋষি কলম হাতে শিলিংয়ে তাকিয়ে। দিলীপকে দেখে ঋষি তাকে একটুও বসতে বললো না। তবু দিলীপ ঋষির মুখোমুখি উল্টোদিকের চেয়ারে বসলো। বসেই বললো, এই ডামাডোলে কে আমার হাতঘড়িটা খুলে নিয়েছে—

সত্যি! এই অফিসের ভেতর?

হুঁ। আমাকে যারা জাপটে ধরেছিলো—তাদের ভেতরে কেউ।

আশ্চর্য! এই অফিসেরই কেউ তাহলে।

দিলীপ ঋষির দিকে না তাকিয়ে বললো, চল একটু ঘুরে আসি।

ঋষি না বললো না। বরং আগ্রহ নিয়েই বললো, যাবি? চল্—

হেঁটে গিয়ে ওরা দুজনে ক্যান্টিনে বসলো। মুখোমুখি। দুটো করে একসঙ্গে অর্ডার দিলো। এরকম তিনবার বাম এলো। ততক্ষণে দিলীপের আঁটোসাঁটো নার্ভগুলো ঢিলে দিয়েছে। সে ঋষিকে বললো, তুই, অনন্ত, গোকুলদা—তোরা তোদের মাইনিং শেয়ার আমাকে বেচে দে—

তা কি বেচা যায়? ভৌমিক ট্রাস্ট আপত্তি করবে না?

খাদানের মালিকানা তো পাল্টাচ্ছে না। পাল্টাচ্ছে কয়লা তোলার শেয়ারে ওনারশিপ।

তাহলে আর অসুবিধে কোথায়। কিন্তু অত শেয়ার তুই কিনবি কি করে? অত টাকা?

আমার একটাও টাকা নেই। কয়লার অর্ডার নেব বড় বড়। তারই আগাম টাকা দিয়ে তোদের মাইনিং রাইট কিনে নেবো।

তুই পারিসও বটে। কিন্তু এতসব করতে যাবি কেন?

কিছু লোককে শিক্ষা দিতে।

কিন্তু দিলীপ—কোল ইণ্ডিয়ার মত কোম্পানির সঙ্গে কোন ব্যক্তি—আই মিন ইনডিভিজুয়াল পারে?

জেদ। কল্পনা। ইচ্ছাশক্তি থাকলেই পারে। পাণ্ডবেশ্বরে আমি কি করেছিলাম? মনে নেই? কোল ইণ্ডিয়ার বিজনেসের একটা বড় অংশ ভৌমিক খাদান কেড়ে নিয়েছিলো।

কিন্তু আমাদের বয়স বেড়ে গেছে। আগের মত শরীর নেই কারও। এতবড় ঝুঁকি নিতে পারবি ?

কেন পারবো না ঋষি ? তোর মাইনিং রাইট বেচে দিয়ে তুই আমাদের খনিতে চলে আয়। কোল ইণ্ডিয়ার চেয়ে বেশি মাইনে পাবি। কলকাতার খোলা খাতা আমাদের সামনে। শুধু তার ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া একবার—

এত টাকা-পয়সা কোত্থেকে পাবি দিলীপ ?

কেন ? যেভাবে পালাবারে খনি করতে গিয়ে পেয়েছিলাম।

এবারও যে পাবি—তার সিওরিটি কোথায় ?

সেবারও তো সিওরিটি ছিলো না কোন।

তুই একটা জিনিস ভুলে যাচ্ছিস দিলীপ। ভৌমিক খাদান এখন ইতিহাসের বিষয়। বাঙালীর কয়লাখনির ইতিহাস লিখতে গেলে ভৌমিক খাদানের নাম আসবেই। যেমন গুনের ইতিহাস লিখলে কয়েকটা নাম আসবেই। ঠাকুর অ্যাণ্ড কার কোম্পানি। ব্যাঙ্কের কথা, কয়লার কথা লিখতে গেলে দ্বারকানাথ আসবেনই—তেমনই আসবে ভৌমিকদের নাম।

দিলীপ মনে মনে নিজেকে বললো, ঋষি, তোর মাথায় এই মিউজিয়ম-বোধ কবে এলো ? কিন্তু তা না বলে অন্য কথা বললো। ইতিহাস তো বটেই। কিন্তু ভৌমিক খাদান—আসলে তো একটা ব্যবসা।

শুধু ব্যবসা নয় দিলীপ। ব্যবসা প্লাস সামথিং।

সেই সামথিংটা কি ?

ঐতিহ্য। ইতিহাস। যা ইচ্ছে বলতে পারিস। এসব সাবধানে নাড়াচাড়া করার জিনিস।

একটা লোকের চেয়ে ঐতিহ্য বড় ?

কখনো কখনো। বলে ঋষি রামের গ্লাসে চুমুক দিলো।

আজ বিকেলে ঋষির সঙ্গে এভাবে বসে খাওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক। বনি পুলিস কাসটোডিতে। অনাথদা ঘর অন্ধকার করে ইজিচেয়ারে শুয়ে। আমি ও দিলীপ—পাণ্ডবেশ্বর এরিয়ার একটা প্রায় সারফেস মাইনিংয়ের খনি—ভৌমিক খাদানে কয়লা তোলার রাইট কিনতে চাইছি। আমার বন্ধু ঋষি- ইতিহাস ঐতিহ্যের দোহাই দিচ্ছে। কাচের দরজার বাইরেই শীতের কলকাতা।

দিলীপ বুঝলো, তার আর বেরোবার রাস্তা নেই। সময়টাই শত্রু।

অনাথদার গায়ে হাত দেওয়া তোর উচিত হয়নি।

আমি দিতে চাইনি।

তুই অ্যাভয়েড করলে পারতিস।

সব সময় করা যায় না ঋষি। জানি—ব্যাপারটা অনেকদূর গড়াবে।

দু'জনে আবার কোল ইণ্ডিয়ার সিক্সথ্‌ ফ্লোরে ফিরে এলো। এখন সন্ধ্যেবেলা প্রায়। টেবিলে টেবিলে আলো। ঋষি তার কিউবিকেলে গিয়ে বসলো। অফিস বন্ধ হওয়ার মুখে।

দিলীপ অনাথ চক্কোত্তির ঘরে গিয়ে দেখলো, ঘর অন্ধকার। ইজিচেয়ার খালি।

তখন দিলীপ নিজের টেবিলে ফিরে এসে বসলো। যদিও সে আজ সই করেনি—তবু টেবিলে বসলো।

একজন বললো, অনাথ চক্কোত্তি সাহেব তো নার্সিংহোমে যাওয়ার জন্যে গাড়িতে ওঠার আগেও বলে গেছেন—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে—দিলীপকেও প্রোমোশন দেওয়া উচিত ছিলো। আই রেকমেণ্ড হিজ প্রোমোশন—

কথাটা শুনে অবাক লাগলো দিলীপের। অফিসে তখনো যারা ছিলো—তারা সবাই বললো, চক্কোত্তি সাহেব কিন্তু আপনাকে খুব ভালোবাসেন।

দিলীপ অফিসের প্যাড নিয়ে কোল ইণ্ডিয়ার এম ডি-কে অ্যাড্রেস করে চিঠি লিখতে বসলো। সমস্ত ঘটনাটা জানিয়ে—শেষে লিখলো—

আমি খুবই দুঃখিত। শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী আমাকে এ অফিসে এনেছেন এবং নিজের হাতে কাজ শিখিয়েছেন। কিন্তু অপমানকর অবস্থায় এ ছাড়া আমার সামনে আর কোন পথ খোলা ছিলো না।

এসট্যাব্লিশমেণ্টের কনকবাবু এসে বললেন, করছেন কি?

দোষ স্বীকার করে সবটা জানাচ্ছি ম্যানেজমেণ্টকে।

খবর্দার। ও-কাজ করবেন না। উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে সব করবেন। এলোপাথাড়ি কিছু করবেন না।

কেন?

ওরা আপনার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেবে। বুঝলেন না—নার্সিং-হোমে যাওয়ার সময়েও কী চাল চেলে দিয়ে গেল।

কিরকম? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি নে—

বলে গেল—আপনার প্রোমোশনের জন্য রেকমেণ্ড করবেন। অর্থাৎ?

কিছু বুঝতে পারছি নে কনকবাবু। একটু খুলে বলুন দয়া করে।

শীগগিরি কার প্রোমোশন হয়েছে! ঋষি সাহেবের। কার হয়নি? আপনার। তাই আপনার জন্যে উনি রেকমেণ্ড করবেন।

করবেন। তাতে কি হলো?

অ্যাজ ইফ প্রোমোশন পাননি বলে ওঁকে আপনি অ্যাসল্ট করেছেন।

ধ্যুস! একথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু চক্কোত্তি সাহেব তা করিয়ে ছাড়বেন। মোক্ষম সময়ে ও-কথাটি তিনি চাউর করে দিয়ে ভালোমানুষ হলেন। আর লোকেও ভাববে ঋষি সাহেবের প্রোমোশনে আপনি এনভিয়াস হয়ে এ-কাণ্ডটি করেছেন।

এ-সব পাগলের গল্প মশাই।

এ-বাজারে মানুষ এসব বিশ্বাস করতেই রেডি হয়ে থাকে। আমি তো চক্কোত্তি সাহেবকে কম দিন দেখছি নে—।

বলতে বলতে কনকবাবু চলে গেল। এ ফ্লোর প্রায় ফাঁকা। একা একা ভাবতে লাগলো দিলীপ—অনাথদা কেন হঠাৎ—বিশেষ করে এই সময় --ওকথা বললেন? আমার প্রোমোশনের জন্যে রেকমেণ্ড করবেন। এ-কথা তো আগে বলতে পারতো। পরেও বলতে পারতো।

কিন্তু তখন তখনই অনাথ ওকথা কেন বললো?

খানিক বাদে দিলীপ নিজেই নিজের লেখা চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়লো। তারপর লিফ্‌ট ছাড়াই একা একা নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে। আশ্চর্য! কে আমার হাতঘড়িটা খুলে নিতে পারে! এটা একটা অফিস!

দিলীপ বাড়ি ফিরে পুরো ব্যাপারটা ব্রিফলি রাণীকে বললো। রাণী আস্তে বললো, কাজটা ভালো করোনি। হাজার হোক তিনি তোমার চেয়ে বড।

দিলীপ শুধু একবার তাকালো। তাকিয়ে বুঝলো, এ রমণীকে কিছু বুঝিয়ে বলে লাভ নেই। সব শুনে হয়তো বলবে—যেখানে তোমার সঙ্গে ক্ল্যাস হতে পারে কারও সঙ্গে—সেখানে যাও কেন?

তখুনি দিলীপ নিশ্চয় বলে উঠতো, আমার ওই সব জায়গায় যেতেই ভালো লাগে সবচেয়ে। দেখি না কেন? কি হয়।

শীতকালে অসময়ে বৃষ্টি হচ্ছিলো। ঠাণ্ডা হাড়-কাঁপানো বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি হচ্ছিলো। তার ভেতরেই কালু ঘোষকে ডাকলো দিলীপ। চলো যাই। ঘুরে আসি কোথাও।

এই বৃষ্টিতে? সর্বাঙ্গ ভিজে যাবে।

তোমার আবার ভেজা না ভেজা কি? সবই তো সমান!

ঠাণ্ডা লাগতে পারে তো।

ঠাণ্ডা লাগে না কি তোমার? চলো ঘুরে আসি একটু।

চলো। ভালো কথা দিলীপ। শেফালী তোমায় কোন চিঠি দিয়েছে?

কার্ড পাঠিয়েছিলো ক্রিসমাসের। খুব সুন্দর কার্ড।

অ।

অস্টিন ট্যুরারটা কমাণ্ড হসপিটালের পাশ দিয়ে যেতে যেতে চিড়িয়াখানায় এসে পড়লো। দিলীপ তাকাতেই সেই হরিণটার সঙ্গে চোখাচোখি। দিবি নকল পাহাড়ে উঠে মন দিয়ে দেওয়ালের বাইরের পৃথিবী দেখছে।

কালু ঘোষ কমন দিলো। রাস্তা দেখে চালাও। আরেকটু হলেই তো অ্যাকসিডেণ্ট করতে।

ওই হরিণটাকে দেখেছো কালুদা?

ওটা তো! আমি বেঁচে থাকতে ওর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতো আমার। কত-দিন চিড়িয়াখানায় গিয়ে ওকে খাবার দিয়ে এসেছি।

ওকে আমাদের সঙ্গে নেবে কালুদা?

এখন যাবে কোথায় আগে বলো?

দিলীপ বললো, গোকুলদা, ঋষি আর অনন্তর বাড়ি।

সে তো শহরের তিন জায়গায়। তার চেয়ে বাড়ি ফিরে ফোন করে ছাখো ওনারা বাড়ি আছেন কি না।

মন্দ বলোনি। দিলীপ ফিরে এসে ডায়াল করলো। তিনজনের কেউ বাড়ি নেই। তাহলে তিনজন কোথায়?

দিলীপ আবার গিয়ে গাড়িতে বসলো। কালু ঘোষ বললে, আবার বেরোবে? গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে।

চলো একটুখানি। অর্ডিনান্স ক্লাবে যাবো আর আসবো।

রেসকোর্স ফেলে হেস্টিংসের দিকে যেতে খানিক গিয়েই দেওয়াল ঘেরা ক্লাব। দিলীপ ক্লাবের ভেতরে গেল না। বাইরে পার্ক করানো গাড়িগুলো দেখে তার ভেতর পর পর দাঁড়ানো তিনখানাকে চিনতে পারলো। পেছনে ঋষির গাড়ি। মাঝখানে অনন্তর। শেষে গোকুলদার।

সাতাশ

আজ সরস্বতী পুজো। হাড়-কাঁপানো শীতের সঙ্গে অকালে বৃষ্টি। গুঁড়িগুঁড়ি। কেউ কোন ফোন করে তার খোঁজ করেনি। বরং দিলীপ নিজেই ঋষির বাড়ি গেল। দুটো-তিনটের সময়। আজ অফিস ছুটি। চারদিকে মাইক।

ঋষি বসার ঘরেই ছিলো। দিলীপকে দেখে বললো, বেরিয়ে পড়েছিস? এখন

এত ঘোরাঘুরি করিস নে। বাড়ি গিয়ে বরং খাওয়াদাওয়া কর্। ঘুমো। মাথাটা ঠাণ্ডা হোক। তোর বিশ্রাম দরকার।

দিলীপ অবাক হলো। আমার তো অসুখ করেনি।

তোর নার্ভের রেস্ট দরকার। ঘুমিয়ে শান্ত হ আগে।

কেন ?

তোর শরীর এখন ঠিক নেই—অনাথদা তোর সঙ্গে দেখা হলে, বলতে বলেছে, তুই যেন এখন নার্সিংহোমে গিয়ে হাজির না হোস—

কেন ?

ওঁর আত্মীয়-স্বজন থাকবেন। তাঁরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারেন তোকে দেখে—

ও। কেমন আছেন এখন ?

প্লাস্টার করা হয়েছে।

দিলীপ খানিক সময় চুপ করে থেকে বললো, আমার কেউ বন্ধু হয় না কেন বল্ তো ?

কেন ? আমিই তো তোর বন্ধু দিলীপ। তুই কথা শুনবি না। মাথা গরম করবি।

বাইরে ঠিক এই সময় কাঁপানো বাতাসে বৃষ্টির গুঁড়ো। সরস্বতী পুজোর মাইক।

আমার সমর্থ কোন বন্ধু পাইনি ঋষি।

কেন ? আমার বন্ধুত্ব পাসনি তুই ?

দিলীপ কি বিড়বিড় করলো। তারপর বললো, চলি।

চললি ? সেই কিম্ভূত গাড়িতেই ঘুরে বেড়াচ্ছিস ?

দিলীপ বললো, হুঁ।

বাইরে রাস্তায় নেমে দিলীপের মনে পড়লো, অনাথ চক্কোত্তির আত্মীযস্বজন আমায় দেখলে ক্ষেপে উঠতে পারে। অনাথদা যখন চড় মারছিলো আগে—সোয়াইন বলছিলো—সে সময়টা যদি ওরা দেখতে পেতো—তাহলেও কি এখন আমায় দেখে ক্ষেপে উঠতে পারতো ? ঋষি আমায় লম্বা ঘুম দিয়ে শান্ত হতে বলছে। আমি তো কোন পাগলাগারদ থেকে পালিয়ে আসিনি। তাহলে ?

জিনের ট্রাউজারের ওপর কালো টুইড্। বুকের ওপরের দিককার দুটো বোতাম খোলা। মাথার চুলগুলো বৃষ্টিতে বাতাসে ন্যাতানো আর উসকোখুসকো। স্টিয়ারিংয়ে ডান হাতখানা রেখে দিলীপ তার মাথার চুল ঠিক করতে যাচ্ছিলো বাঁ হাতের আঙুল চালিয়ে। আঙুল থামিয়ে কালু ঘোষকে বললো, কোথায় যাওয়া যায় বল তো ?

বাড়ি চলো। এই বেয়াড়া ওয়েদারে কোথায় যাবে ? তাছাড়া তোমার ফ্যামিলি

আছে। তাদের সঙ্গেও তো সময় দিতে হয়। নাতিটি দিব্যি স্টিয়ারিংয়ের পাশে বসে থাকে। তাকে নিয়ে বেরোলে পারো।

বেরোই তো। ও বেটা তোমার আমার মত এ গাড়িটাকেই ভালোবাসে। চলো একটু ঘুরে আসি।

চলো। তোমার অফিসে কী হয়েছে ?

কিচ্ছু না।

একদম যে যাচ্ছো না অফিসে—চাকরি থাকবে ?

এমনিও থাকবে না। ওপরওলাকে চড় মারলে চাকরি থাকে।

তাও মেরেছো! ছিঃ!

উপায় ছিলো না কালুদা।

বাঁয়ে কাটাও। বাঁয়ে কাটাও। ফুটপাথে চাকা তুলে দিচ্ছিল। এমন কি হয়েছিলো দিলীপ ?

হয়ে গেল। লোকটা যে কি ভালো ছিলো দশ বছর আগেও—তা তুমি ভাবতে পারবে না। কি সুন্দর।

এখন ?

ঠিক উল্টো।

ইউ. এস. আই. এসের কাছাকাছি এসে জ্যাম। সুরেন বাঁড়ুয্যে রোডে। একটা বড় বাড়ির গলিপথটা ফাঁকা দেখে দিলীপ সেখানে গাড়িটাকে রাখলো। মাটিতে নেমে বললে, জ্যাম খুলতে দেরি আছে। একটু সিগারেট নিয়ে আসি—গাড়িটা দেখো কালুদা—

সিগারেট ধরিয়ে ফেরার পথে দিলীপের চোখ ইউ. এস. আই. এসের শো উইণ্ডোতে আটকে গেল। বিরাট ফটো ডিসপ্লে। আগেকার একখানা ফোর্ড টি দৌড়চ্ছে। তার পাশে এক ঘোড়সওয়ারও ঘোড়া ছোটাচ্ছে। কোন মারকিন খামারবাড়ির আগেকার ছবি। কাঠের ফেনসিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে একদল আমেরিকান চাষী—তাদের বউ ছেলে মেয়েরা ঘোড়াটাকে জিতবার জন্যে চিয়ার আপ করে যাচ্ছে—হাত পা তুলে।

দেখতে দেখতে দিলীপের মনে হলো, টি ফোর্ড গাড়িটার চাকা চারটে খুলে গিয়ে ছুটন্ত ঘোড়াব চারখানা পায়ের জায়গায় ফিট হয়ে গেল।

আশপাশে রাস্তার লোকজন হঠাৎ দেখলো—ইউ. এস. আই.এসের শো উইণ্ডোর সামনে একটা লোক ধপাস করে পড়ে গেল। গায়ে কোট-প্যান্ট। দিলীপকে যখন রাস্তার লোক তুলে ধরলো—তখন দিলীপ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কী

লজ্জার কথা! চেনাশুনো কেউ দেখতে পায়নি তো! একজন লোক বললো. কোথায় যাবেন?

কোথাও না।

যেতে পারবেন—ট্রামে তুলে দেবো—

না না। ধন্যবাদ। বলে কয়েক পা এগিয়ে দিলীপ দেখলো—সে একা। ভিড়ের ভেতর একদম একা। ঠিক তখনই তার মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে এলো —বিড়বিড় করে—চড়টা মারা উচিত ছিলো সাধন গুপ্তর গালে। ভুল জায়গায় - ভুল জায়গায়—একদম ভুল জায়গায়—

দিলীপ গাড়ি পেরিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দেখে কালু ঘোষ চেঁচিয়ে উঠলো। এই যে দিলীপ! এখানে। সিগারেট কিনতে এত সময় লাগে?

ভিড় ছিলো দোকানে—

দিলীপ ফাঁকা রাস্তায় চালাতে গিয়ে বেলভিউ নার্সিংহোমের কাছাকাছি নির্জন রাস্তাগুলো পরেপর পেয়ে যাচ্ছিল। আরে, এখানেই তো গোপালকে গান শেখাতে এনেছিলাম। একটু গান শুনবে কালুদা? আমার বন্ধুর গান। ভালো গায়।

গান-ফান আমার ভালো লাগে না।

চলো না কালুদা—

না। তুমি যাও। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরবে -

কেন? একা থাকতে ভয় করে!

আজকাল আমার আর একা ভালো লাগে না।

বলো ভয় করে! তাঁ তোমাদের তো ভয় পাওয়ার কথা নয়—

যাও। দেখে এসো। বন্ধু আছে কিনা বাড়িতে—বলে কালু ঘোষ মতিলাল নেহরু রোডের সব কটা বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে একটা পাক খেয়ে এসে অস্টিন ট্যুরারের পেছনের সিটে বসলো।

দোতলায় উঠে দেখলো, সেই গান শেখানোর বন্ধুটি বাড়ি নেই। ফিরেই আসছিলো। পাশের ফ্ল্যাট থেকে স্বাতী বেরিয়ে এলো। কত দিন খোঁজ করেছি তোমায়। অফিস বলে বাড়িতে। বাড়ি বলে অফিসে। ডায়াল করে করে আঙুল ব্যথা হয়ে গেছে।

দিলীপ এতদিন পরে স্বাতীকে দেখে অবাক হয়ে তাকালো। এ কি ড্রেস! লালপেড়ে গরদ? কপালে সিঁদুর?

হ্যাঁ। পরেছি। ভেতরে এসো।

দিলীপ ভেতরে বসতেই স্বাতী বললো, আমি যাঁর সঙ্গে ছিলাম—তিনি ফ্ল্যাটটা

আমায় দিয়ে পাটনায় চলে গেলেন।

তাই বুঝি!

তোমার পায়ের নিচে কার্পেট দেখেছো?

হ্যাঁ। তাইতো! কি ব্যাপার স্বাতী?

আমি বিয়ে করেছি।

কোথায়? কবে? এবারও আমি বাদ পড়লাম। সুধীরের সঙ্গে সেপারেশন?

দাঁড়াও। একসঙ্গে অত কথা বলতে পারবো না। তুমি কিছু খাবে?

না। শুধু কফি চলতে পারে। দু' কাপ নাও—

আমি এখন খাবো না। সন্ধ্যে করা হয়নি—

সন্ধ্যে?

হ্যাঁ। ও আর আমি পুজো করি। ওই তো তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।

দিলীপ চমকে সামনে তাকালো। বিরাট ছবিতে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক। হাসি মুখে তাকিয়ে।

এখন জ্যোতির্ময় অফিসে। আমাদের বিয়ে হয়েছে তা প্রায় ছ' মাস হয়ে গেল। সুধীরের সঙ্গে ডিভোর্স কমপ্লিট।

তোমার ছেলে নন্দন বাবা বলে ডাকছে জ্যোতির্ময়কে?

না। তবে আর কিছুদিন পরে হয়তো ডাকবে। নন্দনকে ভীষণ ভালবাসে জ্যোতির্ময়। খুব ডিগনিফায়েড মানুষ।

সেটা কি জিনিস স্বাতী?

হায়দ্রাবাদ স্টাফ কলেজে ট্রেনিংয়ে ছিলো। খুব সিমপ্যাথেটিক মানুষ। তা বয়স এই পঞ্চাশ।

বিয়ে ছিলো?

না। আমার মত নয় দিলীপদা। ওর বিয়ে করাই হয়নি এতদিন। খুব মাতৃভক্ত ছেলে।

মাকে বউ দেখাবে বলে তোমায় বিয়ে করলেন?

না। তা কেন? আমার শাশুড়ি মারা গেছেন বছর দুই। আমি ফিরে বাড়ি সাজিয়েছি। জ্যোতির পছন্দ মত। চলো। তোমায় ঘুরে দেখাই।

বাড়িটা একদম পাল্টে গেছে। বেডরুমে জোড়া খাট। ঘরের কোণে ঠাকুরের জন্যে সাজানো জায়গা, একটা কুকুর—লোমে ঢাকা—বিছানায় শুয়ে ছিলো। তাকে দেখে স্বাতী ডাকলো, এই নবাব! বিছানায় শুয়েছো কেন? অ্যাঁ? নাবো বলছি। এখুনি দুষ্টু করে দেবে।—এসব বলে দিলীপের দিকে তাকিয়ে বললো,

ও আমার বডিগার্ড। দ্যাখো তো—কেমন স্কিন রেখেছি—

দিলীপ তাকিয়ে দেখলো। ঘিয়ে আভার প্লেন চামড়া। বয়স এসে ঢুকতে এখনো অনেক দেরি। মাথায় কালো চুল।

এ বারান্দায় এসো। এখানে না এলে তোমার কিছুই দেখা হবে না।

দিলীপকে বারান্দায় নিয়ে এলো স্বাতী। সেখানে পার্টিশন দিয়ে সুন্দর চেম্বার। একখানা গদিমোড়া চৌকি। একটি টেবিল চেয়ার। তার উল্টোদিকে বসবার জন্যে কয়েকখানা চেয়ার। দেয়ালে বিরাট আয়নার সামনে গাদাখানেক লোশন আর গুচ্ছেব ক্রিম।

কেমন হয়েছে?

চমৎকার। জ্যোতির্ময়বাবু তোমাকে সত্যিই ভালোবাসেন।

কেন! তোমার কষ্ট হচ্ছে?

তা কেন? একথা বলে দিলীপের মনে হলো—আমার সত্যিই তো কষ্ট হচ্ছে। আমি কি সব দিকেই শুধু হেরে যাচ্ছি!

এটা আমার চেম্বার। এখানে অনেকে এসে সিটিং নেয়।

ফেসিয়াল নিচ্ছে লোকে?

অনেক বাড়ির মেয়েরাই আসে।

সেই পঁয়ত্রিশ টাকাই রেট?

না। এখন চল্লিশ করেছি। রাউণ্ড ফিগার একদম। বৌদিকে একদিন নিয়ে এসো। ফ্রি করে দেব।

তোমার তো পরিশ্রম আছে।

তা আছে। ঘণ্টাদেড়েক খাটতে হয়।

বড চাকরি করেন তোমার স্বামী। এখন আর এত খাটছো কেন?

বাঃ! এটা আমার একটা স্বাধীন ব্যবসা। ছাডবো কেন?

তোমার তো আর দরকার নেই স্বাতী।

জ্যোতি বলেছে—বসে থাকবে কেন শুধু শুধু। এই ঘরটা আমার বিহেভিয়ার স্কুল। এখানে আমি এটিকেট শেখাই।

কি রকম!

ধরো কোন মেয়ের চা-বাগানের ম্যানেজারের সঙ্গে বিয়ে হবে। কিংবা পাত্র বিয়ে করেই বিলেতে তার কাজের জায়গায় চলে যাবে। তখন পাত্রীকে আমি হাঁটা, চলা, ওঠাবসা, দু-চারটে রান্না, রসিকতা, রুমালের ইউজ, পোশাকের স্টাইল—সবই শিখিয়ে দেব।

মন খারাপ হলে কি করবে পাত্রী ?

মন খারাপ ?

ধরো বাড়ির জন্য মন খারাপ হলো তার। তখন সে কী রকম বিহেভিয়ার করবে ?

এভাবে ভাবিনি কখনো দিলীপদা। মানুষ তো— অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেবে। এসব জিনিস শেখানোর অপেক্ষা রাখে না।

ধরো কোন জিনিস দেখে খুব আনন্দ হলো। আনন্দ প্রকাশ করবে কি ভাবে ?

কেন ? আমরা তো শেখাই। তখন কী ভাবে হাসতে হবে—উচ্ছ্বাস প্রকাশের সময় কতটা চেঁচিয়ে ওঠা ঠিক হবে—তাও আমরা থার্ড লেসনেই বলে দিই। মোট চোদ্দটা লেসনের কমপ্লিট কোর্স।

দিলীপ আচমকাই ঘুরে দাঁড়ালো।

ওভাবে তাকাচ্ছো কেন ? কী হয়েছে তোমার দিলীপদা ?

কিচ্ছু হয়নি।

না। কিছু হয়েছে। তোমার মাথাটা অমন উসকোখুসকো কেন ?

দিলীপ দু হাতে শক্ত করে স্বাতীর দুই কাঁধ ধরলো। তোমার বডিগার্ড তোমায় এখন বাঁচাতে পারবে ?

চমকে গিয়ে ঝাঁকুনির মাথায় স্বাতী বললো, বডিগার্ড ?

কেন ? তোমার ওই কুকুরটা। নবাব ! এই তো আমি তোমায় জড়িয়ে ধরলাম। বাঁচাক তো।

ছাড়ো। ছাড়ো বলছি। আমি এখন বিবাহিতা।

আগেও তো বিবাহিতা ছিলে। তখনো তো তোমায় আমি চুমু খেয়েছি তুমিও খেয়েছো।

ছাড়ো। জ্যোতি আমায় ভীষণ বিশ্বাস করে। ছাড়ো। আঃ ! লাগছে দিলীপদা।

আমি খারাপ। আমি আরও খারাপ হবো।

দিলীপকে এগিয়ে আসতে দেখে স্বাতী মাঝখানে একটা চেয়ার টেনে নিলো কি হয়েছে তোমার বল তো ?

দিলীপ ধপাস করে স্বাতীর টেনে আনা চেয়ারটায় বসে পড়লো। বসে এমন করেই হাঁপাতে লাগলো—যে জন্যে স্বাতী নিজে থেকেই পাশের ঘরে গিয়ে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে এলো। খাও।

দিলীপ খানিকটা খেতে না খেতে হাত থেকে কাঁচের গ্লাসটা পড়ে ভেঙে গেল।

কিচ্ছু হয়নি। আমি ঝাঁট দিয়ে দিচ্ছি।

ভাঙা কাঁচ সরানো হলে দিলীপ আস্তে আস্তে বললো, এই নিয়ে দুবার—

কি দিলীপদা?

এবারও তুমি ফস্‌কে গেলে।

তা কি করবো। তুমি বিবাহিত। বউদি মানুষটা খুব ভালো।

এরপর যদি আবার তোমায় একা দেখি—জোড় বাঁধোনি—আমি কিন্তু এখন তোমায় জোর করে বিয়ে করবো।

বেশ তো। কোরো। সেবারে আমি কোন আপত্তি করবো না। বলে স্বাতী এগিয়ে গিয়ে একটা টুল নিয়ে এলো। তারপর দিলীপের জোড়া পা দু হাতে জড়িয়ে প্রায় বুকের কাছে তুলে আলগোছে টুলের ওপর রাখলো। পা ছড়িয়ে আরাম করে বোসো। কি হয়েছে তোমার? এমন তো কোনদিন দেখিনি তোমায়।

কিচ্ছু হয়নি।

কিছু একটা হয়েছে দিলীপদা। জানি। তুমি কিছুতেই বলবে না।

কিছু বলার নেই আমার।

জ্যোতিকে তোমার কথা বলেছি। থাকলে খুব গল্প করা যেতো।

তাহলে আরেক দিন আসবো স্বাতী।

স্বাতী দরজা অব্দি এলো। বাইরে শীতের বিকেলে পার্কের মাথায় একস্ট্রা একখানা মেঘ। এরকম ল্যাগুস্বেপে মেঘখানার ঢুকে পড়ার কথা নয়। রাস্তায় নেমে দিলীপ বুঝলো বৃষ্টির ফোঁটাগুলো বড় হয়ে গেছে।

গাড়ি স্টার্ট দিতেই পেছন থেকে শুনলো, দাঁড়াও। দাঁড়াও দিলীপ।

কি ব্যাপার? কোথায় ছিলে?

বৃষ্টি দেখে গাড়িবারান্দার নিচে গিয়ে বসে ছিলাম।

দেশপ্রিয় পার্কের পাশ দিয়ে মোড় ঘোরার সময় দিলীপ বললো, তোমার গায়ে আবার জল লাগে নাকি!

আমার বুঝি শীত গ্রীষ্ম—ঠাণ্ডা গরম নেই?

দিলীপ কোন কথা বললো না। অ্যাকসেলারেটরে চাপ দিলো।

অত জোরে চালাচ্ছো কেন? তারপর ব্রেক কষলে ব্রেক-স্যুগুলো ফেল করবে—

দিলীপ সাদার্ন অ্যাভিনুতে পড়ে স্পীড কমিয়ে আনলো। আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না কালুদা।

কি হলো তোমার? চলো না বাড়ি ফিরে যাই। বউ রয়েছে ঘরে। নাতি—

দিলীপ আবার স্পীড তুললো। আশেপাশে ইদানীংকার গাড়ি। তারা পিছিয়ে পড়তে পড়তে এই বুড়ো খোকার টলোমলো দৌড় দেখে আরও আস্তে চালাতে লাগলো। খোকন অ্যাকসিডেণ্ট করলো বলে—এমন একটা আশঙ্কায় বেশির ভাগ গাড়ি পিছিয়ে পড়লো।

গড়িয়ার ব্রিজ পেরোতে অস্টিন ট্যুরার বেশি সময় নিলো না। দেখতে দেখতে ফাঁকা মাঠ, ইটখোলা, সামান্য বসতি, বাগানবাড়ি—এসব দু-পাশ থেকে সরে যেতে লাগলো।

কালু ঘোষ পেছন থেকে আস্তে বললো, কোথায় যাবে দিলীপ ?

জানি না। চালিয়ে তো যাই। তেল আছে ?

ট্যাঙ্ক ফুল।

তাহলে আর চিন্তা কিসের ? বলতে না বলতে মাঝরাস্তায় একটা লাল আলো দেখে দিলীপ অনেক আগেই স্পীড কমিয়ে দিলো।

রাস্তা খুঁড়ে ফেলেছে। এবার গাড়ি ঘোরাও দিলীপ।

খোঁড়া রাস্তার মুখে মাটির উঁচু ঢিবি। সেই অব্দি গাড়ি নিয়ে গিয়ে ব্রেক কষেই নেমে পড়লো দিলীপ। প্রায় সন্ধ্যে। রাস্তার বাঁয়ে কড়াইয়ের চাষ। লতানো চারার মাথায় কড়াইভর্তি ডালি—শীতে, শিশিরে—নিজের ওজনে নুয়ে পড়েছে। দিলীপ দিব্যি তার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগোতে লাগলো।

পিচ রাস্তায় দাঁড়িয়ে কালু ঘোষ চেঁচাচ্ছিলো। থামো দিলীপ! কী হচ্ছে! এসব পাগলামো কেন ?

দিলীপ আর এগোতে পারলো না। তেওড়ে কলাইয়ের লতায় হোক—আর বাবলা কাঁটার শুকনো ডালেই হোক—পা জড়িয়ে পড়ে গেল। উপুড় হয়ে! সন্ধ্যে রাতের বৃষ্টি মাখানো—শিশির মাখানো ভিজে মাটির টানা ঠাণ্ডা দিলীপের কোট, শার্ট ফুঁড়ে বুকে ঢুকে যাচ্ছিলো। চোখে কড়াই চারার লতার রোঁয়া। কপালে ভিজে মাটি। ডান হাতখানা শুকনো বাবলা কাঁটার ডালে। অন্ধকার বলে হাতের কেটে যাওয়া জায়গার রক্ত দেখা গেল না।

দিলীপ! ও দিলীপ!

কোন সাড়া না পেয়ে কালু ঘোষ এবার ঝুঁকে পড়লো একদম। সে কোনদিন দিলীপকে ছুঁয়ে দেখেনি। দিলীপের পিঠে আলগোছে হাত রাখলো কালু। উঠে পড়ো দিলীপ। বুকে ঠাণ্ডা বসে যাবে। নিউমোনিয়া হবে। ওঠো। কী কষ্ট তোমার দিলীপ ?

দিলীপ এই প্রথম পিঠে এক রকমের ভীষণ ঠাণ্ডা পেল। সে ঠাণ্ডা একদম হাড়

ছুঁয়ে যায়। বলতে গেল—হাত সরাও কালুদা।

মুখে ভিজে মাটির গুঁড়ো দলা ঢুকে যাওয়ায় কোন কথাই সরলো না। আরেক বার চেষ্টা করলো দিলীপ। কেঁচোর তোলা মাটি সর্বত্র। লতানো আর গোল। তার খানিকটা এবারও তার দাঁতে, মাড়িতে—নিচের ঠোঁটে মাখামাখি হয়ে গেল। তার ভেতরে জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, আঃ! হাতখানা সরাও না কালুদা। কী ভীষণ ঠাণ্ডা—

কালু ঘোষ তার কিছুই বুঝলো না। সে একা একাই বলে ফেললো, এখন কি করা—

অন্ধকার মাঠ। তার ভেতরে দূরে গোলপাতায় ছাওয়া মাটির ঘর। কাছাকাছি পাখি তাড়ানোর পেটাই টিনের দড়ি ধরে টানাটানি করলো কালু ঘোষ। আর অমনি টিনটা বেজে উঠলো।

একটু বাদেই লণ্ঠন হাতে দুই জোয়ান এসে হাজির। এ কি রে বাবা! খাস্ত একটা ভদ্দরলোক যে—

অন্যজন বললো, বাগানবাড়ি ফেরতা বাবু। একদম বেহুঁশ। ওই তো গাড়ি দাঁড়ানো।

কালু ঘোষ দেখলো, দুজনে মিলে কিসের শলাপরামর্শ করছে।

ওদের ভেতর ঢ্যাঙাজন বললো, এখানে মরে পড়ে থাকলে তো হ্যাঙ্গামা! পুলিস আসবে।

বেঁটেজন বললো, তাহলে গাড়িতে তুলে দি চ।

তাই করলো দুজনে। দিলীপ স্টিয়ারিংয়ের সামনে মাটিমাখা ভিজে শরীরে শুয়ে। পা বেরিয়ে পড়েছিলো। হাতও একখানা গাড়ির বাইরে বেকায়দায় ঝুলে।

ঢ্যাঙাজন পা দুটো ভাঁজ করে গাড়িতেই ভরে দিলো। বেঁটেজন বেকায়দায় ঝুলে পড়া হাতখানা আরও বেকায়দায় স্টিয়ারিংয়ে রেখে দিলো। নিশ্চয় ব্যথা লাগলো দিলীপের। কালু ঘোষ চেঁচিয়ে উঠলো। করো কি? লাগলো যে-

কালু ঘোষের কথা ওদের কানে গেল না। যেমন তাড়াহুড়োয় দিলীপকে চ্যাংদোলা করে এনে গাড়িতে ফেলেছিলো—সেই তাড়াহুড়োতেই দুজনে গোল-পাতার ঘরখানায় ফিরে গেল। আবার সেই অন্ধকার। এটা কি কোন বাতিল বাইপাস? অন্য কোন গাড়ি তো এ-পথে এলো না আর! কোন লোকজনও আসে না। না একখানা গরুর গাড়ি। কি ফেরে পড়লাম রে বাবা!

কালু ঘোষ অনেক দিন পরে স্টিয়ারিং ধরলো। গাড়ি ব্যাক করে মুখ ঘোরালো। সবটা পেট্রল পুড়ছে না। তাই ইঞ্জিন খানিকটা ব্যাক ফায়ার

দিচ্ছিলো। দুটো হাইড্রলিক—দুটো মেকানিকাল ব্রেক। ফার্স্ট গিয়ারে স্লিপ। কতকালের চেনা গাড়ি।

গড়িয়ার কাছাকাছি ফিরে আসতেই দিলীপ জেগে গেল। ভালোই চালাচ্ছো—

উঠে বসে স্টিয়ারিংটা ধরো। নইলে মুশকিল। এবার তো কলকাতা এসে গেল।

দিলীপ উঠে বসলো।

কি হয়েছিলো?

কিচ্ছু না। ডান হাতটা বড্ড ব্যথা করছে।

দেখে চালাও দিলীপ -

পরদিন অফিস যাওয়ার আগে ভালো করে দাড়ি কামালো দিলীপ। চান করে বেরোলে রাণী বললো, কোথায় কোথায় ঘোরো বল তো? গায়ে কাদা। বোটে কাদা, ওই কিম্ভুত গাড়িটা ছাড়বে কবে?

কেন! বেশ তো চলছে। তেল খায় কম। চলে জলের মত। পৃথিবীর ওপর দিব্যি ঘুরে ফিরে বেড়ায়—

যত্তো বাজে কথা। তোমার অ্যামবাসাডরটি তো নষ্ট হয়ে পড়ে আছে।

কেন? চালিয়ে দেখেছো নাকি?

আমি চালাবো কেন? গাড়ি পড়ে থাকলেই তো নষ্ট হয়। নাও, একটু সেন্ট লাগাও গায়ে। খোকা তোমার সঙ্গে খাবে বলে টেবিলে বসে আছে।

টেবিলে বসতে পারে!

দিব্যি পারে। খাইয়ে দিতে হবে। আচ্ছা রবির কোন খোঁজ জানো? কোথাও শোনো কিছু?

নাঃ!

একবার নিজের ছেলেটাকেও দেখতে আসে না। পুলিসে গুলি করে মেরে ফেলেনি তো!

ফেললে ফেলেছে—

ওমা! কিভাবে কথা বলছো!

মেরে ফেললে তো আর কিছু করার নেই। ওরাও তো অনেক পুলিস মেরেছে—

দিলীপের খাওয়ার সময়টুকু খোকাটি টেবিল আলো করে রাখলো। অফিসে যাবার সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দিলীপকে পেছন থেকে রাণীর ভীষণ ভালো লাগলো। অনেক দিন পরে একদম অফিস বাবুদের মত সময়মত অফিসে যাচ্ছে দিলীপ। তাই আজ আর ফ্ল্যাটের লাস্ট রিমাইণ্ডার নোটিশ দিলীপকে সে দেখালো না। থাকগে। দেখলে মন খারাপ হবে। একেই তো অনাথদাকে চড় মেরে বসে আছে। কাজটা কিন্তু ভালো করেনি। কিছুতেই না। কিছুতেই না। রাণীর বুকটা অনেক দিন পরে থরথর করে কেঁপে উঠল।

সময়মত অফিসে যাওয়ায় অনেকে দিলীপের দিকে তাকিয়ে থাকলো। গত-কাল সরস্বতী পুজোর ছুটি ছিলো। আজ ফার্স্ট আওয়ারে অফিসের ক্লাইমেট যেন অঞ্জলি দেওয়ার ভোরবেলা।

টেবিলে বসতে না বসতেই এসট্যাবলিশমেন্টের বেয়ারা এসে একখানা খামে-আঁটা চিঠি দিলো।

সই করে নিতে হলো চিঠিখানা। দিলীপ যখন চিঠি খুলছে—তখন সবাই তার দিকে তাকিয়ে।

যা আশা করেছিলো তাই। ইংরিজিতে লেখা। টাইপ করা লাইনগুলোর ভেতর একটা শব্দই বড় করে চোখের সামনে ফুটে উঠলো। সাসপেনডেড।

দিলীপ চিঠিখানা ভাঁজ করে সেভেন্থ ফ্লোরে এম-ডির ঘরে গেল। এম-ডি তাকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে তাকালো। দিলীপের শরীরের ভেতর দিয়ে শীতের দুপুরে গরম হাওয়া পাস করছিলো। চোখের ফুটো নাকের ফুটো, কথা বলার সময় মুখের ভেতরে নিচের পাটির মাড়ি—সবই একটা শোঁ শোঁ গরম হালকা বাতাসে আপনাআপনি সেঁক দিচ্ছিলো। তার মনে হলো—এরই নাম বোধ হয় তীব্র অপমান—ডিপ হিউমিলিয়েশন।

কি চাই ?

এই চিঠিখানা দেখুন।

আমারই সই করা। না পড়ে সই করবো কেন ? আটচল্লিশ ঘণ্টার ভেতর জবাব চাওয়া হয়েছে।

এ চিঠিখানা ফেরত নিন আপনারা। তাহলে সব মিটে যাবে—

সে আমরা বুঝবো। অফিসে ডিসিপ্লিন বলে তো একটা জিনিস আছে।

সে তো বটেই। কিন্তু তাহলে অনাথ চক্কোত্তিকে এরকম চিঠি দিয়েছেন ?

সেটা অফিস বুঝবে। আর তিনি তো এখন নার্সিংহোমে।

একা আমিই চিঠি পাবো ?

সিচুয়েশন তো তাই।

চিঠিখানা ফেরত নিলে সব মিটে যেত। অনাথবাবুর কাছে পার্সোনালি রিগ্রেট জানাতে আমার কোন লজ্জা নেই। তিনিই আমাকে এখানে এনেছেন। পরন্তু আমি সই করিনি। এর ভেতর কোল ইণ্ডিয়া নাক না গলালেই সব মিটে যায়—

আমরা তো ওই চিঠিতে সবই আপনাকে জানিয়েছি।

চিঠি আপনি ফেরত না নিলে আমাকে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

করবেন। বলে এম-ডি সামান্য হাসলেন। কয়লার এই কর্মকাণ্ডে এই মানুষটি একদম আনকোরা। অনাথ চাক্কোত্তি, সাধন গুপ্তর সেই কোল কোম্পানির আমলের খাটাখাটনির ভিতের ওপর আজকের এই কোল ইণ্ডিয়ার শেকড় নেমেছে। নতুন লেজিসলেশনের দৌলতে আনকোরা এই মানুষটি এখন এম-ডি।

দিলীপ বেরিয়ে এলো। আজ অনেকদিন পরে সে সময়মত অফিসে এসেছিলো দাড়ি কামিয়ে। চান করে। অফিসের পোশাকে। অফিসে অনেকদিন পরে— নিজের টেবিলে গিয়ে বসলো। টেলিফোন, চেনা ফাইল-ট্রে, ওয়েস্টপেপার বাসকেট, গ্লাসটপ। এই ঘোরটা তার কাছে সেই প্রথম যৌবন থেকে একেবারে বারানসী। এখানেই সারাদিনের অনেকখানি জুড়ে কাজ, আড্ডা, হাসিঠাট্টা, তর্কাতর্কি, টেলিফোন—কত কি।

দিলীপ মন দিয়ে চিঠির জবাব লিখতে বসলো। সে বলতে চাইলো, আমি যে গালাগালি খেলাম—আমি যে আগে কটি চড় খেলাম—সেসব কিছু নয়? আর এক চড়ে পড়ে যেতেই টাইপ করা চিঠি দিয়ে সাসপেণ্ড। বাঃ!

কে একজন পাশে এসে দাড়ালো। তারপর বিড়বিড় করে বললো, এভাবে জবাব দিতে নেই মিস্টার বসু।

তবে?

বাড়ি গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করুন। তারপর সন্ধ্যেবেলা ভালো উকিলকে বলে চিঠি ড্রাফট করান। এসব জিনিসে কেয়ারলেসলি বেশি কথা লিখতে নেই।

দিলীপ যা লিখেছিলো ছিঁড়ে ফেললো।

কাল থেকে আপনি আর এ অফিসে ঢুকতে পারবেন না।

কেন?

সাসপেন্সনের তাই নিয়ম। যা-কিছু চিঠি-চাপাটি ডাকে পাঠাবেন। নয়তো কাউকে দিয়ে রসিদ করে পাঠাবেন।

দিলীপ মুখ তুলে তাকালো। এই লোকটির সঙ্গে তার আগে কোনদিন মন

দিয়ে কথা বলা হয়নি অফিসে। অথচ আজ নিজে থেকেই ভদ্রলোক কত সিম-প্যাথি নিয়ে কথা বলছেন। আমি তাহলে এতদিন কাদের সঙ্গে মিশতাম।

দিলীপ চিঠিখানা হাতে নিয়ে ঋষির টেবিলে গেল। আমি সাসপেণ্ড হয়েছি।

তাই নাকি? সাসপেণ্ড করলো?

চিঠিখানা দেখালো দিলীপ। হাতে নিয়ে পড়ে চিঠিখানা ফেরত দিল ঋষি। কি করবি এখন?

জানি না। কোনোদিন তো হইনি আগে। তবে দরকার হলে কোর্টে যাবো।

অনাথদা তোর কথা খুব বলছিলো। নার্সিংহোমে।

দিলীপ চুপ করে থাকলো।

ঋষি বললো, তোকে খুব ভালোবাসে—

তোকেও—

আমি বলি কি—মিটিয়ে নে—

এই চিঠিখানা না দিলেই মিটে যেতো।

ওটা তো অফিসের নিয়ম।

অফিস কি কবন্ধ? অফিস তো তোকে আমাকে নিয়েই।

দিলীপ আবার নিজের টেবিলে ফিরে এলো। তারপর স্বাতীর নতুন জীবনে নতুন আমদানী টেলিফোনটার নম্বর মন থেকে খুঁজে পেয়েই ডায়াল করলো, জ্যোতি ফেরেনি এখনো অফিস থেকে?

কে? দিলীপদা? নম্বর পেলে কোত্থেকে?

তোমার ঘরে বসে থাকতে থাকতে নম্বরটা চোখে লেগে গিয়েছিল।

মুখস্থও রাখতে পারো বাবা! আর খানিক বাদেই ফিরবে জ্যোতি। কেন? তুমি আসবে? তাহলে আমরা বেরোবো না আজ।

না না। আজ যেতে পারবো না। ভীষণ কাজের চাপ আজ অফিসে।

তাহলে কাল এসো।

কাল ট্যুরে বেরিয়ে যাচ্ছি। কলকাতার বাইরে—

কবে ফিরছো দিলীপদা?

লম্বা ট্যুর। ঠিক নেই কবে ফিরি। জ্যোতি ফিরলে আজ একটা কথা বলবে তাকে। বলবে—দিলীপ বসু বলেছে—আমার স্বামী শুধু তুমি নও। তুমি আর একজন। সে হলো দিলীপ।

বেশ তো। বলবোখন। শুনে খুব খুশী হবে জ্যোতি। ও তোমার কথা সব শুনেছে।

বোলো কিন্তু।

নিশ্চয়ই।

দিলীপ লাইনটা আচমকা কেটে দিয়েই বুঝলো, সে একদম অকারণে এই ফোনটা করেছিলো। রিসিভার তুলে যেমন বলা উচিত শুধু তেমন বলে যাচ্ছিলো। এই বলাবলির সঙ্গে তার আসলে এখন কোন যোগ নেই। থাকার কথাও নয়। এমন সময়ে কেউ প্রেমালাপ করে না। খেজুরে আলাপও করে না।

জানালার বাইরে ঠাণ্ডা বাতাসের ভেতর অকালে বৃষ্টি। ফোঁটাগুলোর সঙ্গে সন্ধ্যের মুখে মুখে খানিক খানিক অন্ধকার গুলে গিয়ে মিশে যাচ্ছিলো। দিলীপ অনেক দিন পরে গুডবয়টি হয়ে তার নিজের টেবিলে চুপচাপ বসে থাকলো। মাথা না তুলেই সে বুঝতে পারছিলো—অফিস আওয়ার্স পার হয়ে যাচ্ছে। আশপাশের টেবিলগুলো একে একে খালি। রেলইয়াড থেকে ওয়াগন মুভমেণ্টের যেসব ফোন আসছিলো—সেগুলো সে থার্ড ফ্লোরে ইয়ার্ড অ্যাকাউন্টসে ট্রান্সফার করে দিচ্ছিলো।

সারা ফ্লোরটা যখন ফাঁকা—দিলীপ তখন উঠলো। ঋষিদের দিককার কিউবি-কলগুলো অন্ধকার। নিচে নেমে অস্টিন ট্যুরারে বসতেই কালু ঘোষ বললো, অফিসে তোমার এত কি কাজ থাকে ভাই? সবাই চলে গেল—আর তুমি বসে বসে কি করছিলে?

আমি সাসপেণ্ড হয়েছি।

কালু ঘোষ বললো, কি?

দিলীপ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলো। রেড রোডে পড়ে আস্তে আস্তে বলতে লাগলো। ভিজে বাতাসের সঙ্গে কথাগুলো কালু ঘোষ পেছনে বসে হু-হা করে বেশ লুফে নিচ্ছিলো। ডিটেলে সব শোনার পর কালু ঘোষ বললো, অফিস তো ঠিকই করেছে। আমি একটা কোম্পানির এম-ডি ছিলাম। আমি হলেও তোমাকে এই চিঠিই দিতাম। কোন্‌দিকে যাচ্ছো দিলীপ?

দিলীপ কোন কথা বললো না। বিশ মিনিটের ভেতর দিলীপরা এসে একটা বড় ভ্যানের সামনে দাড়ালো। ভ্যানের গায়ে বড় করে লেখা—গোকুলস্ পিওর ঘি অ্যাণ্ড বাটার।

গাড়ি থেকে নেমে দিলীপ ভ্যানের পেছন দিয়ে রাস্তা ক্রস করলো। বসবার ঘরে গোকুল দত্তর চেয়ার ফাঁকা। লাগোয়া খাটাল থেকে একটা বিলিতি গাই বেয়াড়া ভাবে ডেকে উঠলো।

গোকুলদা কোথায়?

এইতো ছিলেন। খানিক আগে অনন্তবাবু, ঋষিবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন।

কোথায় ?

হাওড়া স্টেশনে যাবেন। হরিপালের ট্রেন ধরতে হবে।

ঘরের বেয়ারার সামনেই দিলীপ প্রায় বলে ফেলেছিলো, কোথায় ? হরিপাল যাওয়ার কথা তো আমি জানি না। সে বুঝলো এখন ওদের প্রোগ্রাম করার সময় হিসেবের ভেতর আমি পড়ি না। এখানেও কোল ইণ্ডিয়া এসে পড়ছে।

আঠাশ

বাড়ি ফেরার পথে কালু ঘোষ বললো, সকাল সকাল বাড়ি ফিরলে পারো। তাতে ফ্যামিলি লাইফ সুন্দর হয়।

দিলীপ স্টিয়ারিংয়ে বসে পাকা ড্রাইভারের স্টাইলে গাড়ি চালাচ্ছিল। হাত আর পায়ের অর্কেস্ট্রা। খোলা চোখ রাস্তা দেখে যে খবর ব্রেনকে দেবে—সে-খবর মত ব্রেন হাত আর পায়ের অর্কেস্ট্রা চালু রাখবে। দিলীপ কোন জবাব দিলো না।

কালু ঘোষ আবার নিজের মত বলতে শুরু করলো। গাড়িটা তখন ভিজে সেণ্ট্রাল অ্যাভিনুতে লাল সিগন্যালের মুখে দাঁড়ালো। আমি যে ভুল করেছিলাম জীবনে—সে ভুল কোরো না দিলীপ। আমি ভেবেছিলাম—আগে প্রতিষ্ঠা হোক—আগে টাকা হোক—তারপর ফ্যামিলি লাইফ। ফলে শেফালীর মা আমার সঙ্গে মানাতে পারলো না।

এবারও দিলীপ কোন জবাব দিলো না। সন্ধ্যের ভিজে বাতাসে ইণ্ডিকেটারে চাপ দিয়ে মিশন রো ধরে ইউ. বি আই. বিল্ডিং-এর দিকে চললো। বেড রোড ধরবে।

ভালো কথা দিলীপ। একটা জিনিস বলাই হয়নি তোমাকে। সেদিন তো বেসমেণ্টে আমায় গুডনাইট বলে লিফ্‌টে উঠলে—তুমিও ওপরে গ্যাছো—আর অমনি তোমার অ্যামবাসাডর থেকে গালপাট্টা এক গুণ্ডা মত লোক বেরিয়ে এ-গাড়ির সিট, বনেট—সব আতিপাতি করে তুলে তুলে দেখতে লাগলো। আমি তোমায় দিলীপ—দিলীপ বলে ডাকলুম—তুমি শুনতেই পেলে না। অথচ একটু পেছন ফিরলেই সব দেখতে পেতে। শুনছো ?

হুঁ।

লোকটা বোধহয় বেসমেণ্টে আগেভাগেই লুকিয়ে ছিলো।

হুঁ।

হুঁ কি ? তুমি শুনছোই না দিলীপ।

সব শুনেছি।

তাহলে ?

লোকটা বেসমেণ্টে ছিলো না--

তবে কোথায় ছিলো ?

তোমার মাথায়।

রাবিশ! আমি নিজের চোখে দেখলাম তোমার পেছন পেছন গেল। লিফ্‌ট বন্ধ হয়ে যেতে ফিরে এলো।

বেশ তো। সেরকম কেউ হলে নিশ্চয় আবার দেখা হবে।

আমার নিজের চোখে দেখেছি দিলীপ।

তোমার আবার চোখ কোথায়।

সে-কথা আলাদা। কালু ঘোষ এখানে এসে জমে গেল। তার শরীর নিয়ে কথা উঠলেই সে মিইয়ে যায়। শরীর হয়ে ভেসে উঠতে বেশ কষ্ট হয়। চাপ পড়ে কালু ঘোষের ওপর। প্রথমবার ক্লাবে সাত পেগের পর কালু ঘোষ দিলীপের উল্টোদিকে ফাঁকা চেয়ারে ভেসে উঠেছিলো। তাও টেবিলের ওপরের দিকটায় বুক থেকে মাথা অব্দি কালু নিজেকে ফুটিয়ে তুলেছিলো। তাতেই তার যথেষ্ট কষ্ট হয়েছিলো। আর দ্বিতীয়বার ঃ সেই তেওড়ে কলাইয়ের ক্ষেতে দিলীপ সন্ধ্যেবাতে উপুড় হয়ে পড়ে গেলে একখানা হাত রেখেছিলো তার পিঠে—দিলীপের ঘাড় ফিরিয়ে আনার জন্যে। তাতেই—

কালু ঘোষ নিজের ভেতরেই গজগজ করছিলো। আমার চোখ নেই ? হাত নেই ? আমি ফুটে উঠলে তো তোমাদেরই অসুবিধে

বেসমেণ্টে গাড়ি রেখে দিলীপ লিফ্‌টে ওঠার মুখে বললো, তেমন কাউকে দেখলে ওপরে উঠে এসো কালুদা।

আমি তো কোনদিন ওপরে যাইনি।

কোন অসুবিধে নেই। ওই যে বোর্ডে নামের পাশে ফ্লোর লেখা আছে। ফ্ল্যাট নম্বরও লেখা আছে। দেখে নিয়ে ওপরে উঠে এসে আমায় ডাকবে। গুডনাইট।

ডোরবেল টিপতে হলো না। আধো খোলা। কি ব্যাপার ? রাণী তো এমন অসাবধানী নয় ! ভেতরে ঢুকে অবাক হয়ে গেল দিলীপ। তুমি গান গাইছো ?

লজ্জা জিনিসটা অনেকদিন পরে রাণীকে আক্রমণ করলো। খোলা হারমোনিয়মের ওপর গানের খোলা খাতা। খাতাখানা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো। কি করবো ? রবির ছেলেটা নাছোড়। গান না গাইলে ঘুমোবে না—

ঘুমিয়েছে ?

অনেকক্ষণ। অনেকদিন পরে পুরনো খাতাখানা নেড়েচেড়ে দেখছিলাম।

আমার নাতির ভাগ্য তার দাদু করে আসেনি !

তুমি কিন্তু গান গাইতে বলতে পারবে না এখন।

এগুলো কোথায় ছিলো এতদিন ?

ওই তো জুতোর খোপের পাশে। পুরনো শিশি বোতল বের করতে গিয়ে—

গান না গাও—একটা সুর বাজাও না রিডে—

রিডগুলো ভালো নেই।

তবু বাজাও না।

তুলে রাখছি—বলে রাণী নিজেই সব তুলে ফেললো।

তাহলে খালি গলায় একটা গান করো।

হাসবে না কিন্তু। বলে গুনগুন করে শুরু করলো রাণী। কিন্তু ধরতাইটা চড়ায় শুরু হওয়ায় দু কলি পরেই রাণীর গলা চিরে গেল। রাণী থামলো। থামতে গিয়ে কাশলো। দু-বার। থেমে গিয়ে বললো, কুটু এখনো ফেরেনি।

গ্যাছে কোথাও। ফিরে আসবে নিশ্চয়ই।

রাণী আশা করেছিলো—দিলীপ আরেকটু উতলা হবে। কিন্তু কোথায় কি। দিলীপ যে একদম নিশ্চিন্ত। কোন গ্রাহ্যিই নেই।

সকালে বেরিয়েছে।

তোমায় বলে গেছে তো ?

হ্যাঁ।

তবে চিন্তা কিসের !

বিশ্বনাথদের কী এক কম্পিটিশনে—সঙ্গে সঙ্গে গেছে—

তাহলে তো নিশ্চিন্ত হলাম। জানা গেল কার সঙ্গে ও গেছে।

আচ্ছা তুমি কি রকম বাবা বল তো ?

কেন ?

একমাত্র ছেলের কোন হদিশ নেই। বাঁচলো কি মরলো তা আমরা জানি না। মেয়েটা ভোরে বেরিয়ে এখনো ফেরেনি। আমি মা হয়ে একা আর কত দুশ্চিন্তা করবো ? তোমার কি সংসার করতে একটুও আগ্রহ নেই ? এখানে এসে রাণীর গলা জড়িয়ে গেল। আঁচলে চোখ চেপে ধরলো রাণী।

যাকে বলে বিমূঢ়—অফিস ফেরত সেই পোজে দিলীপ বসু তখন তার লার্জ লিভিং রুমের ডাইনিং টেবিলের তিন নম্বর চেয়ারে বসে। সে আস্তে আস্তে বললো,

দাঁড়াও। তোমার ছেলের হদিশ পেলে তুমি খুশি হবে?

কোন কথা না বলে রাণী বড় চোখে তাকালো। তার মানে? হ্যাঁ। যদি জেনে থাকো বলোনি কেন এখনো?

দিলীপ তার বউয়ের চোখে এই ভাবটা দেখেও নিজেকে অনেক কষ্টে বোবা করে রাখলো। তারপর বললো, বিশ্বনাথের সঙ্গে কুটু কোথায়—আমি হয়তো চেষ্টা করলে খুঁজে বের করতে পারি। কিন্তু খুঁজে পেয়ে কি কোন লাভ হবে? তোমার ইচ্ছে মত হাওয়া কি এখন উল্টো দিকে বইবে?

এবার রাণী সত্যি সত্যিই যাকে বলে স্ট্যাচু হয়ে নিজের চোখে জল আনলো। কোন কান্না নেই গলায়। শব্দ নেই। দিলীপ সে-কান্নায় কোন বাধা দিলো না। উঠে দাঁড়িয়ে আগে টেলিফোনের কাছে গেল। সেখানে সারাদিনে যে সব ফোন এসেছে—তাদের নাম আর নম্বর লেখা।

অনেকদিন পরে মেজর জেনারেল রায়ের নম্বর। রাণীর হাতের লেখা। দিলীপ ডায়াল করতেই পেয়ে গেল। আমি দিলীপ—

কোথায় ছিলে এতদিন? আসছো না কেন?

এখনো সময় হয়নি।

আমি কতদিন এ পোজিশন খালি ফেলে রাখবো?

আর বেশি দেরি হবে না।

সন্ধ্যেবেলা ক্লাবেও তো আসতে পারো দিলীপ।

এইবার যাবো। রাখছি—

রাণীর দিকে ফিরে বললো, মিছিমিছি চিন্তা করে শরীর খারাপ করছো। তোমার ছেলেমেয়েরা ভালোই আছে।

রবি ভালো আছে?

রাণীর মুখে হাসি দেখে দিলীপ বললো, যতদূর জানি—থাকার তো কথা।

ও দুষ্টু! জেনেশুনে আমার কাছে খবরটা চেপে রেখেছো। বলতে বলতে অনেক দিন পরে রাণী দিলীপের গায়ের কাছে উঠে এলো। জানো, আজ খোকার মায়ের ছবি কাগজে ছিলো। দেখে ঠিক চিনেছে—

কি ব্যাপারের ছবি?

এশিয়ান গেমস্ না কিসের জন্যে ফরেনে যাচ্ছে। ইণ্ডিয়া গভর্মেণ্টের কাছে স্পোর্টস কাউনসিল যাতায়াতের ভাড়া চেয়েছে।

এটা তো একটা সুখবর। কী বোকা মেয়ে! আমরাও তো খানিকটা দিতে পারি।

কোন দরকার নেই। নিজের বাচ্চাকে ফেলে রেখে গেছোমি। একটা পয়সা আমরা দেবো না। রবি ফিরুক—তারপর আমি ছেলের ফিরে বিয়ে দেব। সেই একই নিঃশ্বাসে রাণী বললো, তুমি খেতে বোসো। আমি খাবারগুলো গরম করে আনছি।

এখন খাবো না। কুটু ফিরুক। সবাই একসঙ্গে খাবো।

অনেকদিন পরে খুব খুশি হলো রাণী। একসঙ্গে সবাই বসবে কি করে? খোকন তো অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে।

দিলীপ জামাকাপড় ছেড়ে এসে বসতেই রাণী নিজে থেকেই গাইতে শুরু করলো। একটা। দুটো। শেষে উঠে গিয়ে ভিজে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গান ধরলো।

এই, থামো বলছি। তোমায় কি আজ গানে পেলো! ভিজে পায়ে ঠাণ্ডায় থেকো না। ভেতরে এসো। একরকম জোর করেই রাণীকে ভেতরে নিয়ে এলো দিলীপ। আজ তোমার কি হয়েছে?

কোন কথা বললো না রাণী। স্রেফ কুলকুল করে হেসে উঠলো।

ঠিক এই সময় ডোরবেল বেজে উঠলো। দিলীপ উঠে গিয়ে খুললো। কুটু ফিরলো। তুমি এ সময়? কখন ফিরলে বাবা?

আমারও সেই কোশ্চেন কুটু। তুমি এ সময়?

ওঃ! একটু দেরি হয়ে গেল। বিশ্বনাথ পৌঁছে দিতে দেরি করলো। ওর স্কুটারে—

এই ভিজে রাস্তায় স্কুটারের পেছনে বসে?

না না। কোনো ভয় নেই বাবা। ভালো চালায় বিশ্বনাথ। একদম ব্র্যাণ্ড নিউ স্কুটার।

স্কুটার কিনেছে বুঝি!

এবার রাণী এগিয়ে এসে বললো, ভালো আয় করে এখন বিশ্বনাথ। খুব ভাল গাইছে।

দিলীপ বুঝলো, রাণী তার মেয়েকে এখন প্রোটেকশান দিচ্ছে। কী গায়?

কুটু থতমত খেয়ে বললো, সবরকম গায়। পপ সং।

কোথায় গায়?

আগে বারে গাইতো। হোটেলে। এখন সব জায়গায়। পোস্টারে ওর ছবি দিয়ে বিলি হয় এখন।

আচ্ছা! সে তো ভালো কথা। চলো—সবাই খেয়ে নিই।

খেতে বসে অনেক ঠাট্টা ইয়ার্কি হলো কুট্টুর সঙ্গে। উঠবার আগে দিলীপ কুট্টুকে বললো, তোর বিশ্বনাথকে একটা চার চাকা কিনতে বল্। দু'চাকার স্কুটার খুব রিস্কি।

তোমার অ্যামবাসাডরটা তো পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। ওকে বেচে দাও না। কিনে সারিয়ে নেবে একদম নতুন করে—

এখন আস্তে আস্তে সবই বেচতে হবে কুট্টু।

রাণী অবাক হয়ে তাকালো। খাওয়া প্রায় শেষ রাণীর।

মানে !

আমার চাকরি নেই আজ থেকে। আমি সাসপেণ্ড হয়েছি অফিসে। এখন অর্ধেক মাইনে পাবো কিছুদিন, তারপর—

রাণী বললো, আমি জানতাম। আজ দুপুর থেকেই আমার ডান চোখ লাফাচ্ছে।

কুট্টু চুপ করে ছিলো। আস্তে বলল, মা সব বলেছে আমায়। অনাথ জেঠু তো তোমায় কত ভালবাসতো। এমন তো ছিলেন না।

দিলীপ চুপ করে থাকলো।

কুট্টু বললো, অনাথ জেঠুও সাসপেণ্ড হয়েছে ?

না। বলে কুট্টুর অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো দিলীপ। রাত হয়ে গেছে। তুমি শুয়ে পড়ো গিয়ে।

তুমি কি করবে এখন বাবা ?

আমার বুদ্ধিতে শক্তিতে যতদূর সম্ভব তাই করবো।

তোমাকে একা সাসপেণ্ড করে থাকলে—তোমাকে অপমান করার জন্যেই করেছে।

তুমি শুয়ে পড় গিয়ে।

কুট্টু উঠে যেতে স্বামী স্ত্রী অনেকদিন পরে মুখোমুখি বসলো। দিলীপ রাণীকে পরিষ্কার বললো, চিঠি যখন আমার হাতে ধরিয়েছে—তখন আমার যা করবার আমি তা করবো। ও কথা থাক। আজ অনেকদিন পরে তুমি আবার তোমার গানের পুরনো খাতা খুলেছিলে। গান শেখানোর সেই দিনগুলো ফিরে পাচ্ছিলে ?

কার শেখানো ?

সেই যে প্রবোধ নামে এক ভদ্রলোক যে নাকি তোমায় চুমু খাবার চেষ্টা করেছিলো—

খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। একটা বয়সে অনেকের অনেককেই ভালো লাগে।

সেটা তো দোষের কিছু নয়।

দোষের বলছি ? রাগ করছো কেন ? সেই দিনগুলো মনে আসছিলো ?

যদি এসেই থাকে—তুমি বা আমি—কেউ তো তা আটকাতে পারবো না। আর—সে বেচারাকে নিয়ে এতদিন পরে এত টানাটানি কেন ? শিয়াখালা লাইন উঠে গিয়ে চাকরিটা নেই। বউ পালিয়েছে—

এতদিন পরে এতসব খবর জানলে কি করে ?

রাণী সোজাসুজি তাকালো। দিলীপের চোখে চোখ রেখে বললো, তোমায় বলা হয়নি। একদিন এসেছিলো—

কবে গো ?

তোমার তো খেয়াল থাকে না। ক' পেগ খেয়ে কোথায় কাকে কি বলো !

কেন ? কি বলেছি ?

কোন্ বারে নাকি তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো। বছর দুই আগে। তুমি কার্ড দিয়েছিলে নিজের। আমাদের কথাও বলেছিলে প্রবোধকে—

তাই বুঝি। কোথায় ? আমাকে তো বলোনি কবে এসেছিলো ?

বলা হয়নি। সেও তো দু বছর আগের কথা প্রায়। আমি দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছি।

তা করলে কেন ?

আমাকে দেখতে এসেছিলো। তাই তো বললো।

আর কি বলেছিলো ওগো ?

আবার কি বলবে। বউ পালিয়েছে। রেল উঠে গেছে। চাকরি নেই। শেষে চা খেতে চেয়েছিলো এক কাপ। বললাম—গ্যাস নেই। ইলেকট্রিক স্টোভের প্লাগ লুজ। বললো, ইলেকট্রিকের কাজ জানি—দাও সারিয়ে দিচ্ছি।

দিলে ?

নাঃ। দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলাম। ভালো কথা—তোমার একখানা চিঠি এসে পড়ে আছে।

ফ্ল্যাটের তো ?

হুঁ। লাস্ট রিমাইণ্ডার বোধ হয়। রাণী উঠে গিয়ে চিঠিখানা এনে দিলীপের হাতে দিলো।

চশমাটা এনে দেবে কাইণ্ডলি ?

চিঠিখানা পড়ে টেবিলের ওপর নুনদানী দিয়ে চেপে রাখলো। তারপর রাণীকে বললো, তিন মাসের নোটিশ। কিন্তু এখন অত টাকা কোত্থেকে পাবো ?

তাহলে কি হবে ?

রাণীর সিরিয়াসনেস দেখে হেসে ফেললো দিলীপ। তাহলে রাস্তায় ভেসে যাবো !

এখন তো আর তুমি একা নও। তোমার একটি নাতি আছে।

একটি বউ আছে। এগিয়ে এসে গালে চুমুই খেয়ে বসলো দিলীপ। আজ সন্ধ্যে থেকেই তোমায় ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে।

রাখো। হয়েছে—

আমরা যদি আগের মত হয়ে যাই তো কেমন হয় রাণী ? এ-বাড়ির কিস্তি বয়ে কি হবে আর ?

এতগুলো টাকা দিলে যে—

এখন কাউকে ট্রান্সফার করে দিলে সে আমাদের টাকাগুলো ফেরত দিয়ে দেবে—

তবু পাকাপাকি একটা থাকবার জায়গা তো—

কিসের পাকাপাকি ? কতদিনের পাকাপাকি ?

তাহলে তো বলতে হয়—সবই অনিত্য !

এতকাল কি আমরা এ-ফ্ল্যাটে বড় হয়েছি ? ছেলেমেয়ের বাবা হয়েছি এ-ফ্ল্যাটে ?

তবু ছেলেমেয়ের জন্যেও তো

কুটু তো বিয়ে হয়ে চলে যাবে। আর রবি—। থেমে গেল দিলীপ।

রবি ফিরে এসে থাকবে।

রবির কি এতটা জায়গা লাগবে ?

আমরাও তো থাকবো। কুটু বিয়ের পরে কি আর আসবে না ? আর—

আর কি ?

রবির আমি ফিরে বিয়ে দেবো। নতুন বউ আনবো রুচি দেখে।

সে আর এনেছো ! রবি আগে ফিরুক তো।

এই যে বললে ভালো আছে।

হ্যাঁ। বেঁচে আছে। কিন্তু এ ক'জনের জন্যে এ ফ্ল্যাট না হলেই নয় ?

টাকাগুলো তোমার হাতে পড়লে তো আবার গাড়ি কিনে বেড়াবে।

পাগল হয়েছো ! আমাকে তো কোর্টে যেতেই হবে। তাছাড়া কুটুর বিয়ে আছে না ?

এ টাকা তুমি আর কোর্টে লাগিয়ো না।

আমাকে বাদ দিয়ে তোমার ফ্ল্যাট ?

এরপর আর কথা এগোলো না। দিলীপ উঠে গিয়ে সেই ভিজে ব্যালকনিতেই দাঁড়ালো। এখান থেকে কলকাতাকে দেখতে বড় সুন্দর। এখন ভিজে অন্ধকারে শহরের ফোলা ফোলা আলো। সেদিকে তাকিয়ে প্রথমেই যা মনে হলো দিলীপের —তা হলো, জীবন কত অল্প দিয়ে শুরু করেছিলাম ! আস্তে আস্তে এই বিশ-বাইশ বছরে জীবনের কত জিনিস বেড়ে গেছে। দরকার পড়লে কমানোও যে কঠিন তা আজ সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলো। জীবনের শুরু ছিলো—নিজেকে নিয়ে। এখন তা কতদূর গড়িয়েছে ! টিপ টিপ বৃষ্টি মাখানো হিম সারা শহরটাকে কাবু করে ফেলেছে। দিলীপ অন্ধকারে তাকিয়ে ছিলো। দূরে ইঞ্জিনের বাঁশীর আওয়াজ। মাঝেরহাট, কালীঘাট—নয়তো বেশব্রিজে মালগাড়ি সান্টিং হচ্ছে।

তার মাথার ভেতর একটা রেল লাইন পাতা হয়ে গেল। যে-লাইনের পাটি তুলে ফেলা হয়েছে। কাঠের স্লিপারও উধাও। তবু ঘাসের প্যাটার্ন, জায়গায় ঢাল দেখে বোঝা যায়—এখানে এক সময় রেল লাইন ছিলো। এরকম একটা তুলে ফেলা লাইনের ছাপ তার মাথার মধ্যে বসে যাচ্ছিলো।

দিলীপ জানে শিয়াখালা লাইনে বড় লাইনের পাটি বসানোর কথা চলছে কয়েক বছর ধরেই। কিন্তু বসানোর নাম নেই। ওদিককার ছোট রেল আগে মার খেতো বাসের হাতে। চণ্ডীতলা স্টেশনে একবার শীতকালের সকালে সিঙাড়া খেয়েছিলো। প্রবোধ কি চণ্ডীতলাতেই পোস্টেড্ ছিলো ?

কথাটা জানবার জন্যে লিভিং রুমে ঢুকে দিলীপ রাণাকে পেলো না। ঠাকুমা গিয়ে নাতির পাশে শুয়ে পড়েছে।

দিলীপ আবার এসে ব্যালকনিতে দাঁড়ালো। বৃষ্টির টিপ টিপ থেমে নেই। সেই সঙ্গে ভিজে বাতাস। আকাশের সবটুকু ঝুলবারান্দা থেকে দেখার উপায় নেই। মেঘ আর ফিনফিনে শীতের ভেতরেও আকাশের তালুটা লালচে হয়ে আছে। এখান থেকে সবটা দেখাও যায় না।

দিলীপ শব্দ না করে সদর দরজা খুললো। আলতো করে ভেজিয়ে দিয়ে ওপরের সিঁড়ি ধরলো। ছাদে উঠে আকাশটা বোঝা গেল। বিরাট ছাদ। ডবল চিলেকোঠা। জলের ট্যাঙ্কটা যেন কোন হাসপাতাল বাড়ির। দুদিকের দুটো সিঁড়ি দিয়ে এ-ছাদে ওঠা যায়। তাছাড়াও সরু মত একটা চোরা সিঁড়ি আছে। এমারজেনসি স্কেপ। দরকারে দমকলের লোক এ-সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে পারবে।

দিলীপ জলের ট্যাঙ্কের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ভিজে আকাশটা দেখছিলো। হঠাৎ

তার মনে হলো, ছাদে সে আর একা নয়। আর একজন কেউ আছে। এইমাত্র তার ছায়া পড়েছে জলের ট্যাঙ্কের সাদা দেওয়ালে— কালো ছায়া। এত রাতে কে হতে পারে ছাদে! আর কোন ফ্ল্যাট থেকে তো কেউ আসবে না। কে হতে পারে?

একথা ভাবতে ভাবতে তার মনে পড়লো, কালুদা তো কার কথা বলেছিলো। যে কিনা গাড়ির সিট উল্টে আতিপাতি করে খোঁজে। কালুদা হয়তো ঠিকই দেখেছে। যাগ্‌গিয়ে।

একটু করে সামনে লক্ষ্য রেখে দিলীপ চিলেকোঠার দিকে পিছিয়ে যাচ্ছিলো। একবার সিঁড়ির মুখ পায়ে ঠেকলেই ঘুরে এক দৌড়ে নাইনথ্ ফ্লোর।

খানিক পিছু হটার পরই দিলীপকে চমকে থামতে হলো। প্রায় তার ওপর দিয়েই একজন দশাসই লোক ছুটে গেল। পাঞ্জাবি, সরু পাজামা—পায়ে নাগরা লোকটার। তার পেছনে এই লিকলিকে এক ছায়া প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে চলে গেল। যাবার সময় কালু ঘোষের গলা পেয়ে দিলীপের কাছে ব্যাপারটা খানিক পরিষ্কার হলো।

এই লোকটার কথাই বলেছিলাম—

আর শোনা গেল না কালু ঘোষের কথা। তখন সে এমারজেন্সি এস্কেপের সরু সিঁড়ি দিয়ে সেই দশাসই লোকটাকে ফলো করছে। দিলীপ ভাববার চেষ্টা করলো, কে এভাবে তার পিছু নিতে পারে? সে তো কারও পাকা ধানে মই দেয়নি। তবে কি স্বাতীর আগের স্বামী সুধীর? আমি তো স্বাতীকে বিয়ে করিনি। তবে এরকম লোক লাগানো কেন?

কিংবা এও তো হতে পারে—

ওই লোকটাও আসলে আর নেই। একসময় ছিলো। কালু ঘোষের সঙ্গে এ-পৃথিবীতে ছিলো। কালু ঘোষ তাড়াতাড়ি জায়গা বদলানোর খবর পায়নি হয়তো আগে। নিজে পটল তোলার পর লোকটা কালু ঘোষের সঙ্গেই তার পুরনো হিসেব পরিষ্কার করতে এসেছে।

তাই বা কি করে হয়? তাহলে আমার পেছন পেছন ছাদে আসবে কেন? দিলীপ কিছু বুঝতে না পেরে অন্ধকার এমারজেন্সি এস্কেপের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। সরু মত একফালি কাটা সিঁড়ি। ঘুরে ঘুরে নিচে নেমে গেছে। সেই সিঁড়ি অন্ধকারে এখন প্রায় পাতালের পথ। তার শেষদিকে দুপদাপ নেমে যাওয়ার শব্দ।

দিলীপ সেই পাতালের পথ ধরে নামতে লাগলো। টপ ফ্লোর থেকে গ্রাউণ্ড —সে প্রায় গোলকধাঁধা। দেওয়াল ধরে নামতে নামতে দুবার ডাকলো, কালুদা— ও কালুদা—

তারপর আর তার কিছু মনে নেই। একবার আবছা মত মনে হলো—নিচে এই বড় বাড়িটার পেছন দিকটায় নতুন তৈরি বাগানে দুড়দাড় করে কে ফুলগাছ, চারাগাছ মাড়িয়ে দিচ্ছে।

তারপর সেই বাগানে সব গাছপালা সবুজ হয়ে গেল। ডাঁটো হয়ে গেল। ঋষি আর দিলীপ দুখানা বেতের চেয়ারে মুখোমুখি বসে। ঋষির মুখে সেই আগেকার হাসি। আস্তে বললো, এই দিলীপ, ডিমভাজা খাবি? কাঁচের প্লেটে। গরম গরম।

বানা দুটো।

রেডি আছে। বলে ঋষি বাগানের পাশে কাদের একটা রেডিমেড রান্নাঘর থেকে হাত বাড়িয়ে রেডিমেড দুটো ডিমভাজার প্লেট নিয়ে এলো। গরম গরম খেয়ে নে—

দিলীপ অত তাড়াতাড়ি খেতে পারছিলো না।

আচমকা চেঁচিয়ে উঠলো ঋষি। উঃ!

কি হলো?

বড় একটা কাঁচালঙ্কার কুচি। চিবিয়ে ফেলেছি।

বের কর্ তো দেখি।

ঋষি মুখ থেকে বের করে কাচের প্লেটে রাখলো।

তা দেখেই দিলীপ চেঁচিয়ে উঠলো। আরে! এ তো বন্ধুত্ব—

বাঃ! এ তো অর্ডিনারি কাঁচালঙ্কা। তার একটা বড় কুচি—

বন্ধুত্ব চিবিয়ে ফেললে ঠিক কাঁচালঙ্কার সেনসেসন হয়।

তাই নাকি? জানতাম না তো! একই রঙ? অনেকটা পায়রার মেটুলি গন্ধ একদম এক। তবে বন্ধুত্ব দেখতে অনেকটা ডুমো ডুমো কাঁচালঙ্কার মত।

সত্যি দিলীপ? আমি জানতাম না। কিন্তু বন্ধুত্বের রং একটু লালচে হয় বোধহয়।

তুই খেয়াল করিসনি ঋষি। চিবিয়ে ফেলেছিস তো—

কিন্তু ডিমভাজার সঙ্গে মিশে গেল কি করে?

হয়তো ফ্রিজে কাঁচালঙ্কার সঙ্গে একই ট্রেতে ছিলো। তাই লঙ্কা তুলতে গিয়ে ভুল করে বন্ধুত্ব কুচি কুচি করে মিশিয়ে ফেলেছে। তারপর কাঁচা তেলে ভাজা! তাই তোর খেয়াল হয়নি ঋষি।

যাগ্‌গিয়ে! বন্ধুত্ব নিয়ে কে আর মাথা ঘামায় আজকাল। সবাই যে যার মত জীবন করে যাচ্ছে। এখানে বন্ধুত্বের জায়গা কতটুকু! সবাই তো ব্যস্ত।

তবু বোধহয় জিনিসটার দরকার হয়। ধর্ ঋষি—তুই সব পেয়ে গেলি

·কোন্ পুলটিশ

.ত যায়—রেজাণ্ট

।দলাC।   ৰস্তি লাগলো। একটা বিছে হেঁটে আস-
ছিলো। দিলীপ ৬৮৩ বসলো। এটা বোধহয় ফিফথ কিংবা ফোর্থ ফ্লোর হবে।
পাতাল সিঁড়ির শুরু থেকে সকালবেলার আলো তখন ওপরে উঠে আসছিলো।
আজ কোন বৃষ্টি নেই বোধহয়। কেন না আলোটা বেশ চকচকে।

॥ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ॥